প্রজ্ঞাপারমিতা

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই আষাঢ়
১৮৭৯ শকাব্দ

ছয় টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

প্রজ্ঞাপারমিতা মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করেছিল ধনপতিকে। প্রজ্ঞাপারমিতার আলোয় অনেককে আর অনেকের আলোয় প্রজ্ঞাপারমিতাকে চিনতে চেয়েছিল ধনপতি। তার দিনপঞ্জী থেকে মন্থন করা এই উপন্যাস তারই ইতিহাস।

ধনপতি সম্বন্ধে এটুকু বলা দরকার যে তার জীবনে অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন আর কল্পনা আপন আপন সীমান্ত মেনে চলে না। ধনপতির দিনপঞ্জীতেও এ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত।

অ-কু-ব

আজ বিষণ্ণ সন্ধ্যায় থেকে থেকে মনে পড়ছিল একটি গাধার বিষণ্ণ ছুটি চোখ। মন চ'লে যাচ্ছিল অতীতে।

সেই অতীত সন্ধ্যায় গাধাটি সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছিল। বাঙালীর গৌরব প্রোফেসর ট্যালপেট্রোর গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস। আমি গ্যালারিতে, আরও অনেকে গ্যালারিতে। সামনের চেয়ারগুলোও ভরতি—তাদের ভেতর সাদা কালো সায়েব, মেমসায়েব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত নানা জাতের সার্কাস-আমোদী লোক। হাঁ ক'রে খেলা দেখে টিকিটের পয়সা উশুল করছে সবাই।

গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের খেলার ফর্দ লম্বা বা পুরুষ্টু নয়; লম্বা আর পুরুষ্টু হচ্ছে দলের 'লায়ন-টেমার' (lion tamer) ধিঙ্গী ফিরিঙ্গী মেয়েটি। আঁটসাঁট ফরসা গড়ন, আঁটসাঁট হাল্‌কা সার্কাসী পোশাক-পরা। হাতে লম্বা লক্‌লকে সিংহ-পোষমানানো চাবুক। সিংহটি নেই, ছুটো খাঁচা শূন্য ক'রে চ'লে গেছে। চ'লে গেছে 'লায়ন', র'য়ে গেছে 'টেমার'। প্রোফেসর ট্যালপেট্রোই দলের আর সবার চাইতে বেশি মাইনে দিয়ে রেখেছেন তাকে। সিংহটিকে হয়তো বড় ভালবাসতেন, তার স্মৃতি ভুলে যেতে চান না। সেই সিংহস্মৃতি-বিজড়িতা মেয়েটির 'রেবেকা' নাম সার্কাস-দেখিয়েদের মুখস্থ। চাবুকের মত চটপটে, বেপরোয়া। ভ্রূ দিয়ে জানে ভ্রূকুটি করতে, ভ্রূক্ষেপ করে না কাউকে। 'লায়ন' গেলেও তার 'টেমার' জাঁকিয়ে রেখেছে গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস। যৌবন-মদ-মত্তা যৌবন-মাতানো রেবেকা।

চাবুক দিয়ে রেবেকা দীপ নেবানোর খেলা দেখাল—যে চাবুক হাতে নিয়ে এককালে সে সিংহের খেলা দেখাত। পাঁচটা খুঁটির মাথায় পাঁচটা মোমবাতি জ্বলছে, দীপালি রাতের দীপমালার মত। রেবেকার হাতের চাবুকের আওয়াজ: শপ্, শপ্, শপ্, শপ্, শপ্। মোমবাতিগুলো ঠায় আস্ত

দাঁড়িয়ে রইল; শুধু দীপের শিখাগুলো নিবে গেল: দপ্ দপ্ দপ্ দপ্ দপ্। চটাপট হাততালিতে সামিয়ানা কেঁপে কেঁপে উঠল। চাবুকের ঘায়ে নিবে গেল দীপশিখাগুলো। তবু এক ফোঁটা ক্ষোভ নেই কোন চোখে। চাবুক চালালে যে, তার জন্যে ফুটে আছে বাহবার ফুল।

সার্কাসের মালিক ভজহরি তলাপাত্র ওরফে প্রফেসর ট্যালপেট্রো চাঁদনির বুকখোলা কালো কোটের বুকে এক গাদা সাদা মেডেল ঝুলিয়ে এসে জানানী দিলে, এইবারে শুরু হবে অতুলনীয় গাধার খেলা—'দি গ্রেট ডাংকি অ্যাক্ট', ত্বনিয়ার সার্কাসের ইতিহাসে ও ভূগোলে সর্বপ্রথম এবং একমাত্র। পরিচালনা করবেন 'দি গ্রেট লায়ন-টেমার' মিস রেবেকা। প্রচণ্ড হাততালি। সার্কাসের ফোকাস-আলো এসে মুখে আলো দিলে ফিরিঙ্গী ধিঙ্গীর। সে মুখে আলতা-রাঙানো আল্‌তো হাসির অট্টভঙ্গী।

সার্কাসের প্রায়-গোল পৃথিবীর মত উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা আসরে গাধাটির প্রবেশ দেখা গেল। সে এল সামনের ত্বটি পা বাঁধা, লাফাতে লাফাতে। গলায় বাঁধা দড়ির একমাথা, তার বাকি মাথাটা সার্কাসের ভাঁড়ের হাতে। ভাঁড় এল আগে আগে ভাঁড়ামি করতে করতে। ভাঁড়ের পরনে নানা রঙের নানা তালির পোশাক, গাধাটি দিগম্বর। হাততালি। হাততালি। ···আরো হাততালি।

গাধার মুখে আলোর ফোকাস ফেলে নি কেউ। তবু দেখতে পেলাম, তার চোখ ত্বটি ছলছল, শুকনো কান্নায় ভরা।

আমার ত্ব পাশের লোকের মুখে আগাম বর্ণনা শুনে বোঝা গেল, এবারকার খেলাটা খুব 'ইয়ে' হবে। এঁরা এই খেলাটা দেখবার জন্যেই বার বার আসেন।

রেবেকা চাবুক হাতে দাঁড়াল আসরের ঠিক মাঝখানে কাঠের একটা উঁচু টুলের ওপর, ফোকাসের আলোয় সচল পাথরে-গড়া মূর্তির মত। পেছনে শুনতে পেলাম ত্ব-তিনটি প্রৌঢ় কণ্ঠে "ধিঙ্গী ছুঁড়ির রোজ রোজ এই বে-আব্রু বেহায়াপনা দেখছি ছোঁড়াগুলোর মাথা একেবারে······"। ছোঁড়াদের হাত-তালি ততক্ষণে একটু থেমেছিল। আবার শুরু হ'ল।

রেবেকার উঁচু টুল থেকে যতটা পারা যায় ততখানি দূরত্ব বজায় রেখে তার চারধারে ঘুরতে শুরু করল গাধাসুলভ ভঙ্গীতে সার্কাসের ভাঁড়, আর তার আগে আগে গাধাটি, সামনের পা ছুটি ওপর দিকে তুলে পেছনের ছু পায়ে মানুষের ভঙ্গীতে হাঁটবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে। রেবেকার হাতের লম্বা চাবুক গাধার পিছে পিছে ; সামনের পা ছুটি এক-একবার মাটিতে পড়তেই গাধা পশ্চাদ্দেশে চাবুক খাচ্ছে আর ফের সামনের পা ছুটিকে উঁচুতে তুলে হাত বানিয়ে মানুষের নকল ক'রে হাঁটছে।

ছোকরার দল এককণ্ঠে বাহবা দিচ্ছে চাবুকধারিণীকে। ছু-চারজন বুড়ো 'ধিক ধিক' করছে—আমি তাদের বুকের ভেতরকার ধুকধুক শুনতে পাচ্ছিলাম।

দূর থেকে একবার আমার দিকে ইশারায় তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললে গাধা। হাত নেই তার, কিন্তু চোখ দিয়ে হাতছানি দিতে জানে। আরও গভীর ক'রে দেখে নিলাম তার ছুটি বিষণ্ণ চোখের ব্যাকুল নীরবতা আর নীরব ব্যাকুলতা। তাতে ভাষণ নেই, ভাষা আছে।

মন ব্যথিয়ে তুলল তার অসহায় অপমান। মনে হ'ল, ও গাধা বটে, কিন্তু শুধু একজন বিশেষ গাধা নয়। ও যেন ক্রমবিকাশশীল আত্মমর্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন গাধা-সমাজের একজন মুখপাত্র। অথচ তারই সামনে গাধাদের বিদ্রূপ করছে আমাদেরই একজন দ্বিপদ ভাঁড়, গাধাদের ব্যর্থ নকল ক'রে। আর চাবুকের ভয় দেখিয়ে আমাদেরই মত ক'রে হাঁটার অসম্মানও গাধাকে সওয়ানো হচ্ছে।

ওই একটি গাধার বিষণ্ণ চোখের বিষম বেদনার ব্যাকুল অভিব্যক্তি চিরন্তন বিশ্ব-গাধার আর্তনাদের মত আমার হৃদয়ে শেল হেনে গেল। আমারও মন গোপনে আর্তনাদ ক'রে উঠল "হায় ছুনিয়ার সার্কাস! কত চার-পাকে ছু-পা বানাইয়া, আর কত ছুই-পাকে চার-পা বানাইয়া তুমি মর্মান্তিক তামাসা দেখিতেছ এবং দেখাইতেছ! হায়........" ইত্যাদি।

এর পরের খেলাটা আরও মর্মান্তিক। রেবেকার চাবুকের ডগা

থেকে ঝুলানো একগাছা তাজা সবুজ ঘাস গাধার মুখের সামনে ছুলিয়ে দেওয়া হ'ল। গাধা বেচারা খেয়েছে সেই কখন ভোরবেলা, তারপর এখন পর্যন্ত পেটে একটি দানা পড়ে নি। গাধা খাবারের দিকে ক্ষুধার্ত মুখ যেমনই বাড়িয়ে এগোচ্ছে, অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে রেবেকাও টুলের উপর ঘুরে যাচ্ছে, গাধার মুখ থেকে খাবারও স'রে আসছে প্রায় বৃত্তাকারে। গাধা ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে ডিম্বাকৃতি পথে এগিয়েই চলেছে, কিছুতেই মুখ দিয়ে খাবারের নাগাল পাচ্ছে না। পশ্চিমী পুরাণের অভিশপ্ত ট্যান্‌ট্যালাসের মত। পিপাসার্ত ট্যান্‌ট্যালাস জলে দাঁড়িয়ে। তাঁর তৃষ্ণার্ত ঠোঁটের পৌনে এক ইঞ্চি নীচুতে জল। বুকের আটচল্লিশ ইঞ্চি ছাতি পিপাসায় ফেটে চৌষট্টি ইঞ্চি হবার যোগাড়। জলে চুমুক দেবার জন্যে যতই ঠোঁট নামাচ্ছেন ট্যান্‌ট্যালাস, জলও ততই নীচে নেমে যাচ্ছে, ওই পৌনে-এক ইঞ্চি দূরত্ব বরাবর বজায় রেখে। তাঁর ঠিক মাথার ওপরে গাছের বোঁটায় সুদৃশ্য, সুপক্ক, সুপুষ্ট ঝাঁকে ঝাঁকে ফল, ঝাঁকালেই টুপটাপ ক'রে ঝরে পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে যেন। ট্যান্‌ট্যালাস ওপরে হাত বাড়াচ্ছেন, অমনই ফলও ওপরে উঠে যাচ্ছে, তাঁর হাত থেকে পৌনে-এক ইঞ্চি দূরত্ব বরাবর বজায় রেখে। ট্যান্‌ট্যালাসের মিটছে না তৃষা, মিটছে না বুভুক্ষা। অথচ···!···!!···!!!···!!!।

গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের গ্রেট রয়েল ট্যান্‌ট্যালাস এই গাধা। তার আশা-নিরাশার দুরন্ত দৌড়ের পরম ব্যথাকে গরম তামাসা ভেবে হাততালি দিচ্ছে কেউবা মজা পেয়ে, কেউবা টিকিটের পয়সা উস্‌ুল করবার জন্যে। হাততালি শুনে প্রোফেসার ট্যালপেট্রো এসে মাথা নত ক'রে বুকের মেডেল দুলিয়ে গেলেন। ইনি খেলা দেখান না কখনও, দেখান শুধু মেডেলের মালা।

বাঙালীর গৌরব যে প্রোফেসর ট্যালপেট্রো, সে খবর বাঙালী রাখত না। তাই হ্যাণ্ডবিলে আর প্রাচীরপত্রে বড় বড় হরফে ছেপে জানাতে হয়েছে প্রোফেসরকে। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। তাকে আত্মবিস্মরণ ভোলাবার জন্যে হ্যাণ্ডবিল আর পোস্টার দরকার। প্রোফেসরের বুকে

দোলানো মেডেলগুলো ভজহরির জানা পুরাতন স্যাক্‌রার তৈরি। ভজহরিকে সে সস্তায় মেডেল তৈরি ক'রে দেয়—খাতির অনেক দিনের। তারই তৈরি মেডেল বুকে ঝুলিয়ে ভজহরি হয় প্রোফেসর ট্যালপেট্রো।

রেবেকার একরঙা পোশাকের রঙ তার গায়ের রঙের সঙ্গে এমন ঢঙে মেলানো যেন পোশাককে পোশাক ব'লে সহসা চেনা যায় না, চোখের সামনেই চোখকে ফাঁকি দিয়ে চোখের আড়াল হয়ে থাকে। গাধাটা চারদিকের বহু চোখের লক্ষ্য হতে চেয়েও উপলক্ষ্য মাত্র হতে পেরেছে, 'গ্রেট ডাংকি অ্যাক্‌টে'র নায়িকা হয়ে উঠেছে রেবেকা। খাঁ-সাহেবের খেয়ালী আসরে যেন বাইজী বাজি মারছে, লুটছে বাহবা; তাই খাঁ-সাহেবের দুটি চোখ ব্যর্থতার ব্যাকুল বেদনায় বিষণ্ণ।

কিন্তু গাধা উপলক্ষ্য হ'লেও লক্ষ্য থেকে অনেক চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝে উপলক্ষ্যের ওপরও ঠিকরে পড়ছে। ঘুরছে, ঘুরছে, গাধা ঘুরছে মুখের অগ্রবর্তী ঝুলন্ত ঘাসের গুচ্ছের লোভে। তাকে ঘোরাচ্ছে, ঘোরাচ্ছে, ঘোরাচ্ছে সার্কাস-সুন্দরী সিংহ-দময়ন্তী রেবেকা, ঝুলন্ত ঘাসগুচ্ছের লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে। দুরারোগ্য আশাবাদে-ভরা মগজ আর পেট-ভরা ক্ষিদে নিয়ে ঘুরন্ত গাধা ঝুলন্ত ঘাসগুচ্ছের পশ্চাদ্ধাবন করছে।

আমার গ্যালারির সীটের এক লাফ দূরে সবচেয়ে দামী টিকিটের দুটি চেয়ারে পাশাপাশি ব'সে আছে কুমার ভুজঙ্গ চৌধুরী আর কুমারী সানন্দা সান্যাল। নেতাজী সুভাষ রোড যেখানে লালদীঘি পেরিয়ে গিয়ে নেতিয়ে প'ড়ে নেতাজীকে বিদ্রূপ করছে, সেখানে এক মস্ত দালানে চৌধুরী কোম্পানীর বিরাট অফিস, ভুজঙ্গ যার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর প্রায়-মালিক। ভুজঙ্গের কাছে হাজার ছেলেমানুষ, লাখ ছাড়া কথা কইলে ভুজঙ্গের রসনা অপমানিত বোধ করে।

সানন্দা অফিসে ভুজঙ্গের প্রাইভেট সেক্রেটারি। ভাল মাইনেই দেয় ভুজঙ্গ সানন্দাকে—আরও অনেক দেবার বাসনা নানাভাবে জানাবার চেষ্টা ক'রে ক'রে ব্যর্থ হয়েছে আর অবাক হয়েছে ভুজঙ্গ। পরীক্ষা দিতে পারলে গ্র্যাজুয়েট হতে পারত সানন্দা, কিন্তু সাংসারিক বেকায়দায় প'ড়ে

পরীক্ষায় না ব'সে তাকে বসতে হয়েছে চাকুরিতে। রূপ আছে, ভ্যানিটি ব্যাগ আছে, কিন্তু ভ্যানিটি নেই তার। অফিসে তার এত কাছে থেকেও যেন দূরত্বের ব্যবধান বজায় রেখে চলে সানন্দা। ভুজঙ্গের প্রাণের ইঙ্গিত বোঝে না, অথবা বুঝেও না-বোঝার ভান করে। ভুজঙ্গের বিশ্বাস, সে ভানই করে।

ভুজঙ্গের আন্দাজ ঠিক। ভানই করে কুমারী সানন্দা। তার দূরত্ব ভুজঙ্গের পছন্দ নয় তা সে জানে ; এও জানে, বেশি দিন ভুজঙ্গকে এড়িয়ে চললে এই দুর্দিনের বাজারে ভাল মাইনের চাকরিটি যাওয়া অসম্ভব নয়। মাইনে তার বেশি, কাজ অল্প ; আর সেই অল্প কাজটুকু তাকে বাদ দিয়েও চলতে পারে। তা ছাড়া, সে গেলে তার শূন্য স্থান পূর্ণ করবার জন্যে চাকুরি-প্রার্থিনীর অভাব হবে না। সানন্দাকে বিশেষভাবে পছন্দ করে ভুজঙ্গ ; তার সম্বন্ধে আশা সে ছাড়ে নি, সবুরে মেওয়া ফলার অপেক্ষা করছে সে প্রাণপণে। চাকরি যায় নি তাই কুমারী সানন্দা সান্যালের।

'দি গ্রেট ডাংকি অ্যাক্ট' দেখতে দেখতে হঠাৎ লজ্জায় ধিক্কারে, ক্ষোভে ভ'রে উঠল ভুজঙ্গ চৌধুরীর মন। তাঁর মনে হ'ল, তিনি যেন গাধা ব'নে আছেন কুমারী সানন্দা সান্যালের হাতে। ভুজঙ্গ-গাধাকে যেন সানন্দা-রেবেকা ব্যর্থ আশার ঘাসগুচ্ছ সামনে দুলিয়ে রেখে অন্তহীন ঘোরা ঘোরাচ্ছে। ছিঃ! ধিক! দু হাতে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে যে ভুজঙ্গ চৌধুরী, তাকে গাধা বানিয়ে ছিনিমিনি খেলছে একটা সদ্য-কলেজ-ছেড়ে-আসা মেয়ে? সার্কাসের গাধাটা নিশ্চয় টের পেয়েছে—হয়তো সমদুঃখী স্যাঙাৎ ব'লে এসে আদর ক'রে গলা জড়িয়েও ধরতে পারে! হয়তো গাধাটা তাকে দোস্ত ভেবে মুচকি মুচকি হাসছেও। হয়তো মিস সানন্দা সান্যালও······!!!!!

ক্ষেপে উঠল ভুজঙ্গ। বাঁকা ক্রূর চোখে একবার তাকাল সানন্দার দিকে—চোখ এড়াল না আমার। ধনপতির চোখ এড়ানো সহজ নয়। সানন্দা তখন সানন্দে দেখছে গাধার গাধামি, পাতলা ঠোঁটে ফুটে আছে পাতলাতর হাসি ; সে হাসিকে প্রচ্ছন্ন অনুকম্পামিশ্রিত বিদ্রূপ ব'লে মনে

হ'ল ভুজঙ্গের। সে হাসি যেন নীরব অট্ট আওয়াজে ভুজঙ্গকে বলছে, "তুমিও একটি আস্ত গাধা হে ভুজঙ্গ।" ভুজঙ্গ আরও ক্ষেপে উঠল। সার্কাসের তাঁবুর বাইরে তখন ভুজঙ্গর অন্যতম বিশালকায় শৌখিন দামী গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে অন্যতম শোফার রৌশনলাল। এই গাড়িতেই অফিস থেকে শৌখিন চীনে রেস্তোরাঁ হয়ে সোজা সার্কাসে চলে এসেছে ভুজঙ্গ আর সানন্দা একসঙ্গে। সার্কাসের দামীতম তুখানা টিকিট আগেই কিনিয়ে রেখেছিল ভুজঙ্গ—সানন্দা রাজী না-হবার বা কোনও অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়ার পনেরো আনা এগারো পাই সম্ভাবনা ভেবেও। সার্কাস যে ভুজঙ্গ খুব পছন্দ করে তা নয়। তা ওর চেহারা থেকেই বুঝতে পারি। ট্যালপেট্রোর সার্কাসের হ্যাণ্ডবিলে আর পোস্টারে সিংহ-হীনা সিংহ-দময়ন্তী মিস্ রেবেকার সচিত্র বর্ণনা মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল ভুজঙ্গকে। প্রোফেসর ট্যালপেট্রো রেবেকাকে মাইনে দেন বেশি, কিন্তু জানেন সেই বেশি মাইনের বাড়তি খরচার অনেকগুণ উস্থল ক'রে নিতে। তা ছাড়া সার্কাসের টিকিট তুখানায় ভুজঙ্গের আর-একটি মতলবও মাখানো ছিল। সেই মতলব-নাটিকার নায়িকা কুমারী সানন্দা সান্যাল।

অফিসের শেষের দিকে সানন্দাকে অনুরোধ করবার আগে মনে মনে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দোল খাচ্ছিলেন বহুলক্ষপতি ভুজঙ্গ চৌধুরী। অন্তরঙ্গ আর নিবিড় হবার সুযোগ যদি কখনও না চান বা না পান, তবে অনর্থক কেন রেখেছেন মিস্ সানন্দা সান্যালকে এত মাইনে দিয়ে প্রাইভেট সেক্রেটারি? কিন্তু একরোখা মিস্ সান্যাল যদি রুখে উঠে ঘৃণা বা হেলাভরে সার্কাসের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ক'রে ভ্যানিটি ব্যাগ তুলিয়ে চ'লে যান, তখন? সে অপমানের পর তাঁকে বরখাস্ত না করলে লক্ষপতি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মান থাকবে কোথায়? অথচ বরখাস্ত তাঁকে করা মানে, তার আশা চিরদিনের জন্যে ছেড়ে দেওয়া, হয়তো যখন আর তু-চার দিন সবুর করলেই মেওয়া ফলত। সব চেয়ে বেশী ভয় তাঁর উলটো অফিসের সহ-কারবারী এন. ডি. হোড়কে। ওত পেতে আছে হোড়; ভুজঙ্গ চৌধুরীর হাত থেকে কোনও মতে মিস্ সানন্দা সান্যাল একবার

ফস্‌কালেই সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেবে। সানন্দাকে প্রাইভেট সেক্রেটারি পেলে ডবল মাইনের বেশি দিতেও দুবার ভাববে না সে। হোড়কে হাড়ে হাড়ে চেনে চৌধুরী।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে মিস্ সানন্দা বলেছিল, চলুন। তার পর রেস্তোরাঁ, আর সেখান থেকে সার্কাস। খুশি আর আশান্বিত হবার কথা ভুজঙ্গের, কিন্তু হ'ল সে রাগান্বিত আর নিরাশ। গাড়িতে অফিস-বহির্ভূত আবহাওয়ায় অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছিল ভুজঙ্গ—ভেবেছিল "ধরা দেবো গো" বলে কুমারী সানন্দা ইঙ্গিত দিয়েছে এতদিনে। 'মিস্ সান্যাল' আর 'আপনি' থেকে ভুজঙ্গ নেমে আসতে চেয়েছিল 'সানন্দা' আর 'তুমি'তে। গাড়ির দামী নরম কুশনের সীটে কুমারী সান্যালের নরম সান্নিধ্য ঘেঁষে বসতে চেয়েছিল ভুজঙ্গ। নম্র-কঠোর স্বরে বিনীত-দৃঢ় ভঙ্গীতে সানন্দা বলেছিল, "আপনি ওই ধারে স'রে বসুন দয়া ক'রে, মিস্টার চৌধুরী।" একেবারে ও-পাশে স'রে বসেছিল বাধ্য হয়ে ভুজঙ্গ। 'সানন্দা' ডাকেও সাড়া দেয় নি সানন্দা। শুনতে না পাওয়ার ভান করে নি। নির্ভুল ভঙ্গীতে, নীরবে ইঙ্গিত করেছিল শুনেছে সে ঐ ডাক, কিন্তু দেবে না সাড়া ওই ডাকে। এ যেন ভুজঙ্গের ডান গালে সানন্দার বাঁ হাতের প্রত্যক্ষ চাঁটি।

'দি গ্রেট ডাংকি অ্যাক্‌ট' দেখতে দেখতে এই সব ভাবছিল ভুজঙ্গ চৌধুরী। এ চাঁটি চলবে না হজম ক'রে যাওয়া। পোষ-না-মানা পাখিকে পোষ মানাতেই হবে। হবে—হবে—হবে। কিন্তু বরখাস্ত করবার ভয় দেখানো বা বরখাস্ত করা চলবে না মিস্ সান্যালকে ; ওত-পাতা শয়তান এন. ডি. হোড় লুফে নেবার জন্যে তৈরী।

মাথা পেছন দিকে ঘুরিয়ে গ্যালারির দিকে তাকালে ভুজঙ্গ। তাকালে রাহুল রায়ের দিকে, আর মুখে খেলে গেল রহস্যময় হাসি। রাহুল ভুজঙ্গেরই অফিসে মাঝারি-মাইনের কেরানী। ছোকরা দেখতে শুনতে ভাল, কাজও করে ভাল, স্বভাবে বিনয়ের অভাব নেই, ইমানদার ছেলে—এক ফোঁটা বেইমানি জানে না। সানন্দার আধা মাইনেও পায় না রাহুল রায়, তবু এই রাহুলের প্রেমেই হাবুডুবু খাচ্ছে সানন্দা। এ কথা অফিসের

আর কেউ জানে কি না সে খবর জানা দরকার মনে করে না ভুজঙ্গ ; সে নিজে জানে। এও জানে, ওই রাহুলের পরম পূজ্য শ্রীচরণকমলযুগলে নিজেকে অঞ্জলি দেবে ব'লেই নিজেকে ভুজঙ্গের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে চলার এই প্রাণপণ প্রয়াস সানন্দার। অসহ্য! রাহুলের মত এক পুঁচকে পিপীলিকা কিনা ভুজঙ্গ-ঐরাবতের প্রতিদ্বন্দ্বী!

ব্যাস্! ওই রাহুল ছোকরাকে বরখাস্ত ক'রে দিতে হবে। তা হ'লে এ বাজারে চাকরি জোটানো শক্ত হবে ওর পক্ষে। আর তাতেই সানন্দা হবে পরম জব্দ। এই এক মোক্ষম উপায়। রাহুলের সামান্য আয়ের ওপর যে সব প্রাণী ভর ক'রে আছে, তারা তখন একেবারে পথে বসবে। সানন্দাকে তখন আসতেই হবে ভুজঙ্গের কাছে, তার প্রেমিক-প্রবরকে চাকরিতে ফের বহাল করবার অনুরোধ জানাতে। তখন···! সানন্দা তখন কব্জায় এসে যাবে—কোথায় থাকবে তার দম্ভ? কোথায় থাকবে তার এই ছোঁয়াচ-বাঁচানো শুচিবাই?

প্রেমের ভান ক'রে নিবিড় থেকে নিবিড়তর এবং নিবিড়তম সান্নিধ্য দেওয়াই যাদের ঐকান্তিক পেশা বা নেশা, এ জাতের অগুনতি নারী সারি বেঁধে এসেছে গেছে ভুজঙ্গ চৌধুরীর জীবনে ; পিপাসা মেটে নি ভুজঙ্গের। পিপাসা পাছে বা কখনও মিটে যায়, সেই ভয়ে পিপাসা জাগিয়ে রাখার প্রয়াসের শেষ নেই তার। নেশা মিটে গেলে জীবনে আর রইল কি! নেশা মিটে যাওয়া মানেই তো মৃত্যু। নেশার পরিতৃপ্তি হবে দিগন্ত রেখার মত, তার দিকে যত এগোনো যাবে ততই সে দূরে স'রে যাবে। মানুষ রবি ঠাকুরের ভাষায় বলে "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" কিন্তু সুদূর যদি সত্যি সত্যি কাছে এসে তার পিয়াসা মেটায়, চঞ্চল তখন চ'টে উঠে সুদূরকে লাগাবে চাঁটি।

কিন্তু পেশাওয়ালী আর নেশাওয়ালীদের প্রতি কিছুদিন হ'ল একটা প্রবল বিতৃষ্ণা ছেয়ে গেছে ভুজঙ্গের মনে, কেন-না এদের পেছনে ছুটতে হয় না, এরাই ছোটে পেছনে। পকেটে অগুনতি টাকার গন্ধ পেলেই এরা ছেঁকে ধরতে আসে কাঁঠালের গন্ধে মাছি আর মাছের গন্ধে বেড়ালের মত। পুরুষ

—অন্তত ভুজঙ্গ চৌধুরীর মত পুরুষ—হচ্ছে শিকারীর জাত ; যে শিকার আপনি এসে ধরা দেয় তাতে তার আনন্দ নেই।

সানন্দার প্রতি ওর প্রচণ্ড লোভ এজন্যে যে, সানন্দা সুলভ নয়। টাকার কুমীর ভুজঙ্গ চৌধুরীর বিশ্বাস, টাকার জোরে দুনিয়ায় সব কিছু সম্ভব ; এ বিশ্বাস ভঙ্গের অপমান সানন্দার হাত থেকে সে পেতে রাজী নয়।

গাধার খেলা দেখতে দেখতে সানন্দার মনে হ'ল সেও গাধাটার মত মিথ্যা আশার পেছনে ঘুরে মরছে। রাহুল রায় ঘোরাচ্ছে তাকে। রাহুলের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সানন্দা, ভুজঙ্গের এ অনুমান আগাগোড়া সত্য। এ হাবুডুবুর আভাস পাবার জন্যে ডুবুরী নামাতে হয় না সানন্দার মন-পুকুরে। অফিসের সবাই নীরবে জানে। জানে না, বা না-জানার ভান করে রাহুল। সানন্দার বিশ্বাস, রাহুল জানে। সানন্দা সোজাসুজি প্রেম-নিবেদন করে না রাহুলের কাছে, কিন্তু আভাস ইঙ্গিত ইত্যাদি যত রকম আছে সব রকমই ব্যবহার ক'রে দেখবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। দেখেছে যে, তার মন-পাহাড়ের ভেতরে যে প্রেমের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে তার এতটুকু আঁচও যেন লাগ্‌ছে না রাহুলের প্রাণে। রাহুলের মাথা কি এমন নিরেট ? সে কি বুঝতে পারে না নারী-হৃদয়ের ব্যাকুলতা ?

কিন্তু নিজের নারী-হৃদয়ের ব্যাকুলতা রাহুল রায়কে বোঝাবার জন্যে যতটা আকুল সানন্দা সান্যাল, তার এক ছটাক আকুলতাও তার নেই রাহুল রায়ের নর-হৃদয়ের ব্যাকুলতা বুঝবার জন্যে। রাহুলের হৃদয় মাস-কয়েক ধ'রে বেতন বৃদ্ধির জন্যে ব্যাকুল। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে চড়চড় ক'রে ; বেড়েছে রাহুলের কাজে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা আর সেই সঙ্গে কাজের চাপ আর দায়িত্ব ; বেড়েছে অফিসের অন্য অনেকের মাইনে, যাদের মাইনে বরং কমা উচিত ছিল ; বাড়ে নি তবু রাহুলের মাইনে, যা বাড়া উচিত ছিল।

রাহুল জানত না—হয়ত ভুজঙ্গ নিজেও সোজাসুজি জানত না, রাহুলের মাইনে বাড়ছে না সানন্দার জন্যে, সানন্দা তাকে তার কুমারী-হৃদয় দান করেছে ভুজঙ্গকে না দিয়ে, সেইজন্যে। ভুজঙ্গের প্রচণ্ড ঈর্ষা, দুরন্ত রাগ রাহুলের ওপর। তাই তার মাইনে বাড়ছে না।

রাহুলের মনে হতে লাগল, প্রোফেসর ট্যালপেট্রোর গাধাটার চাইতেও সে বড় মূর্খ। গাধাটার সামনে যে ঘাস ঝুলছে সেটা ফাঁকি নয়, খাঁটি। ওই খাঁটি ঘাসের পেছনে সে নকল আশায় ঘুরছে। ভুজঙ্গের মোটা কোম্পানিতে রোগা মাইনেতে যে ভবিষ্যতের আশায় সে ঘুরছে সে যে মিথ্যে, সে যে ফাঁকি, সে যে ভূয়ো—এ সত্যের খোঁচা মেরেই যেন সার্কাসের গাধাটা রাহুলের দু চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিল। গাধাটার কাছে হার মানা চলবে না।—প্রতিজ্ঞা ক'রে বসল রাহুল। এসপার কি ওসপার করবই। দেব চরমপত্র ঃ 'মাইনে বাড়াও, তা নইলে ইস্তফা-পত্র গ্রহণ কর।' মান্‌ব না মানা। শুন্‌ব না অনুরোধ। পুঁজিবাদের শোষণ সইব না আর। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

পুঁজির ওপর রাগ নয়, রাহুলের রাগ পুঁজিবাদের ওপর। পুঁজি শোষণ করে না, শোষণ করে পুঁজিবাদ। এই পুঁজিবাদের সারা অঙ্গে পূঁজ জ'মে গেছে, আর কেন? ডাক্তারের বাবারও সাধ্যি নেই দাওয়াই বাতলায়। —পুঁজিবাদের নাভিশ্বাস উঠতে আর দেরি নেই।

সার্কাসের পালোয়ান ছাতুরাম লাল আলখাল্লা আর সাদা পাগড়ি মাথায় প্রথম সারির চেয়ারের সামনে একটা টুলে ব'সে ব'সে গাধার খেলা দেখছে। গাধার খেলার পরেই আসবে তার পালোয়ানী খেলা দেখাবার পালা। বিজ্ঞাপনে তার বর্ণনা হচ্ছে "কলির ভীম"। মস্ত মস্ত মুগুর দু হাতে নিয়ে অবলীলাক্রমে সে ঘোরায়। হাত দিয়ে, পা দিয়ে, চুলের সঙ্গে বেঁধে বিরাট বিরাট লোহার ওজন সে অনায়াসে তুলে ফেলে। মুগুরগুলো আসলে ফাঁপা আর হালকা, অন্তঃসারশূন্য মানুষের মত। বিরাট ওজনগুলো আসলে হালকা কাঠের তৈরি, তার ওপর এমনভাবে কালো রঙ-করা যেন অল্প দূর থেকে দেখলেও লোহার তৈরি ব'লে মনে হয়। ছাতুরাম বেঁটে হ'লেও তার গড়নটা মোটা আর ভারী, তাই সে যখন কাঠের ওজন তুলে লোহার ওজন তুলবার ভান করে তখন অনেকে বাহবা আর হাততালি দেয়, আর প্রোফেসার ট্যালপেট্রো এসে মেডেল ঝুলিয়ে যান। মাঝে মাঝে প্রোফেসরের আগে-থেকে-ঠিক-করা লোক গ্যালারি বা চেয়ার থেকে কলির

ভীম ছাতুরামের অদ্ভুত শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে রুপোর মেডেল ঘোষণা করে।

কলির ভীমকে আশা দিয়েছে সিংহ-দময়ন্তী রেবেকা, বলেছে "শুধু আর কিছুদিন ধৈর্য ধ'রে থাক। তারপরই আমি তোমার, আর তুমি আমার। তোমার মত গুণী আর পাব কোথায়, পালোয়ান? কিন্তু খবরদার, এ কথা ফকিরচাঁদ যেন না জানে। ও-বেচারা একেবারে—"

ফকিরচাঁদ মানে দলের ভাঁড়, কেউ কেউ তাকে বলে ক্লাউন। রেবেকার প্রেমে নাক পর্যন্ত ডুবে আছে সে। তাই সবাই তার ভবিষ্যৎ স্বপ্নভঙ্গের কথা ভেবে মনে মনে হায় হায় করে। কলির ভীমও।

ভাঁড় ফকিরচাঁদকে ইঙ্গিতে আশা দিয়ে রেবেকা বলেছে, "এ সার্কাসের তুমিই তো জান্, ফকিরচাঁদ। লোক-হাসিয়ে তুমিই তো আসর জমিয়ে রাখ। ছাতুরাম যে ওজন তোলে সে ওজন ঝুটা, যে মুগুর ঘুরিয়ে লোককে তাক্ লাগায় সে মুগুর ফাঁপা, হালকা। তোমার ভাঁড়ামিতে ভেজাল নেই ফকিরচাঁদ, তুমি যে হাসাও তা সাচ্চা। তুমি সাচ্চা ভাঁড়, আর ছাতুরাম হচ্ছে নকল পালোয়ান। কিন্তু ছাতুকে এখনই এ সব কিছু জানতে দিয়ো না ফকির। সে বড় আশা ক'রে আছে। এখনই তার দিয়ো না স্বপ্ন ভেঙে।"

তাই গাধার খেলা দেখতে দেখতে মেকী পালোয়ান বেচারী গাধার সঙ্গে খাঁটি ভাঁড়ের তুলনা ক'রে অনুকম্পার করুণ হাসি হেসে ভাবে, হায় রে বেচারা! আর গাধার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে খাঁটি ভাঁড় গাধার সঙ্গে মেকী পালোয়ানের সাদৃশ্য চিন্তা ক'রে ঠিক তাই ভাবে।

হঠাৎ গাধাটা হয়রান হয়েই যেন—অথবা বিরক্ত হয়ে?—দাঁড়িয়ে পড়ল। আর নড়ে না, চড়ে না, এগোয় না। চোখ দুটি তার আরও ছলছল। আমার দু পাশের ছোকরারা অবাক হয়ে বললে, এ কি? গাধা শালা আজ এমন করছে কেন রে বাবা?

রেবেকাও থেমে গেল। কি যেন একটু ভেবে নিয়ে টুল ছেড়ে তড়াক ক'রে এক লাফ, তারপর শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মাটিতে

গাধাটার মুখোমুখি। দর্শকমণ্ডলীতে ফিস ফিস শুরু হ'ল, মাটিতে একটা আলপিন পড়লে তার আওয়াজ একটুও টের পাওয়া যাবে না। প্রোফেসর ট্যালপেট্রোও দেখলুম স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। গাধাটা আজ হঠাৎ এ কি করল? 'দি গ্রেট ডাংকি অ্যাক্ট' তো কয়েক রাত ধ'রে হচ্ছে, কোনও রাতে তো এমন করে নি। আর রেবেকাই বা হঠাৎ এ কি ক'রে বসল? এমন তো করবার কথা নয়! কে জানে এর পর কি করবে রেবেকা, আর কেমন ক'রে শেষ রক্ষা করবে? কিন্তু তবু নিজে এগিয়ে গিয়ে এ ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা করলেন না বাংলার গৌরব প্রোফেসর ট্যালপেট্রো। রেবেকার ওপর তাঁর আস্থা আছে।

প্রথম অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের ঝোঁকটা কেটে যেতেই চারদিকের হাতে তালি আর কানে তালা পড়ল। তারপর দেখা গেল ঘাসের গুচ্ছ নিজের হাতে ধ'রে পুচ্ছ-দোলায়মান গাধাকে খাওয়াচ্ছে রেবেকা।

ভুজঙ্গ চৌধুরী এতক্ষণ ভীষণ বিরূপ হয়ে ছিলেন সানন্দার ওপর; এই মুহূর্তে তাঁর সমস্ত বিরূপতা গ'লে জল হয়ে গেল। ভাবলেন সবুরে গাধার মেওয়া ফলেছে, তাঁরও ফলবে। চৌধুরীর বিশ্বাস হ'ল ভুজঙ্গ-গাধাকে সানন্দা-রেবেকা এমনি আদর ক'রে প্রেমের তাজা ঘাস খাওয়াবে। আজ গাড়িতে যেটুকু অভদ্রতা করেছে তা শুধু অভিনয় মাত্র—ধরা দেবার আগে একটু কেবল খেলিয়ে নিচ্ছে। মেয়েদের যা 'সাইকোলজি'।

ভুজঙ্গ চৌধুরী ভুলে গেলেন রাহুল রায়কে বরখাস্ত করার কথা। ভেবে দেখলেন, রাহুলের মাইনে অবিলম্বে বাড়িয়ে না দেওয়াটা নিতান্তই অন্যায় হচ্ছে। কালই অফিসে গিয়ে একটা ব্যবস্থা করবেন ঠিক করলেন।

কুমারী সানন্দা সান্যালের এইবার মনে হ'ল, রাহুল রায়ও একটি দ্বিপদ গাধাবিশেষ, তাকে মুখে গুঁজে খাইয়ে না দিলে সে নিজে থেকে খেতে পারবে না। সানন্দাকেই প্রথমে এগিয়ে যেতে হবে, প্রেমের ব্যাপারে যা নাকি পুরুষের কর্তব্য।

রেবেকার হাত থেকে গাধা ঘাস খাচ্ছে, আর সার্কাসের সমস্ত দর্শক

নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে দেখছে। কে জানে, এর পর হঠাৎ রেবেকা কি একটা নতুন কসরত দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে?

আমার পাশে যে ভাবালু ছোকরা ব'সে ছিল, সে এইবারে বললে, "গাধাটী কি আশ্চর্য কায়দায় ঘাস খাচ্ছেন দেখেছেন? ঠিক মানুষ ব'লে মনে হয় না কি?" আমি বললাম, "অনেক মানুষকেও তো গাধা ব'লে মনে হয়। এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?" ছোকরা বললে, "কিন্তু কি বিষণ্ন দুটি চোখ, লক্ষ্য করেছেন?" অবাক হয়ে উঠলাম, ধূমকেতুর ল্যাজের ঝাপটা-খাওয়া পৃথিবীর আবহাওয়ার মত। সার্কাসের এই ভিড়ে আমি ছাড়া অন্তত আর-একটি প্রাণী লক্ষ্য করেছে গাধাটির বিষণ্ন চোখ!

"কেন বিষণ্ন জানেন?"—ছোকরার প্রশ্ন। উত্তর দিলুম না, উত্তর জানতুম না ব'লে। ছোকরা বললে, "আমায় উনি চিনতে পেরেছেন। উনি আমার দাদু, বাবার বাবা। আমি ওঁর নাতি।"

আমি বললাম, "ধন্য আপনি। কিন্তু চিনতে পারলেন কি ক'রে?"

ছোকরা বললে, "কাশীর ওধারে ব্যাস-কাশীর নাম শুনেছেন তো, যেখানে মরলে পর মানুষ গাধা হ'য়ে জন্মায়? আমার দাদু সেই ব্যাস-কাশীতে মারা গিয়েছিলেন। তার মাস তিনেক পর তিনি এই গাধা হয়ে জন্মান। দাদুর তিরোভাব-তিথি আর এই গাধা ভদ্রলোকের জন্মতারিখ মিলিয়ে দেখেছি কি না! ইনি ছিলেন আমাদের পাড়ার ছিরু ধোপার হাতে। ছিরু মারা যেতে ওর বিধবা ধোপানী গাধাটাকে এই সার্কাস-পার্টিতে বিক্রি ক'রে দিয়েছিল প্রোফেসর ট্যালপেট্রোর কাছে। খুব যত্ন ক'রে রাখেন তাঁকে প্রোফেসর, সেদিক দিয়ে আমাদের কোনো দুঃখু নেই। দুঃখু শুধু এই, দাদু বোঝেন সবই, কিন্তু কিছু কইতে পারেন না, বোঝাতে পারেন না। শুধু বিষণ্ন চোখে চেয়ে থাকেন।"

মনে মনে আমি বললুম, ছোকরাটি গাধাটির নাতি তাতে অবিশ্বাস নেই, কিন্তু গাধার চোখে ওই যে বিষণ্ন ভাব, আসলে ওইটেই বোধ করি গাধাটির সব চাইতে বড় ধাপ্পা। বিষণ্নতার আলগা মুখোশ প'রে গাধাটি

হয়তো ভেতরে ভেতরে ঠাট্টার অট্টহাসি হাসছে! মনে পড়ল সেই উপদেশটুকু—"যাহা দেখিবে বা শুনিবে তাহাই বিশ্বাস করিও না।"

হঠাৎ দেখি গাধাটা রেবেকার ছেড়ে-আসা টেবিলটার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে, ওর চেহারা হয়ে গেছে সক্রেটিসের মত। টেবিলের ওপর ঘুরে ঘুরে চারিদিকে সে দেখছে অসংখ্য মূর্খ মানুষের অগুনতি মাথা, আর তাদের দুঃখ ভেবে 'হায়' 'হায়' করছে। গাধার সক্রেটিসী চোখের আলোয় দেখতে পেলাম সবগুলো মানুষের মুখে গাধাটে ভাব আর তাদের প্রত্যেকের মুখের সামনে ঝুলানো এক গুচ্ছ ঘাস, মুখ বাড়ালেও সেটা নাগালের বাইরেই এগিয়ে থাকছে। তাই দেখে গাধার সক্রেটিসী ছলছল চোখ আরও ছলছল হয়ে উঠছে। সে যেন সবাইকে বল্‌ছে, "নিজেকে জান।" চারিদিকে মানুষেরা হাততালি দিচ্ছে গাধার তামাসা দেখে। আর হতভাগ্য অজ্ঞান মূঢ় মানুষের কথা ভেবে গাধার চোখ বেদনায় বিষণ্ণ।

মহানগরীর এ দিকটায় দখিন হাওয়া যেদিক থেকে আসে রেল লাইন পেরিয়ে, সে দিকে কয়েকখানা অতিকায় পুকুর। শুদ্ধ ভাষায় তাদের কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন 'কৃত্রিম হ্রদ', কিন্তু জনসাধারণ আর সাধারণজন তাদের ইংরাজী নামে ডাকে 'লেক' বলে। বলে "চলো লেকের ধারে বেড়িয়ে আসি একটু" অথবা "চলো লেক ময়দানে হাওয়া খাওয়া যাক" ; বলে না "চলো যাই কৃত্রিম হ্রদের কিনারায়।"

লেকের ধারে ভোরে বিকেলে বেড়াতে আসেন একদল প্রবীণ। কর্মজীবন থেকে এঁরা বানপ্রস্থ নিয়েছেন, অথবা কর্মজীবন এদের বানপ্রস্থ দিয়েছে ; কিন্তু জীবনের রঙ্গভূমি থেকে প্রস্থান ঠেকিয়ে রাখবার আগ্রহে এঁরা দুবেলা লেকের বায়ু খেয়ে আয়ু বাড়াচ্ছেন। কবিগুরু বলেছিলেন

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে"

কিন্তু এঁরা ৺কবিগুরুর মতো সুন্দর-অসুন্দরের বাছ-বিচার করেন না, এঁরা ভাবেন ভুবন হলেই হলো। যে কোন ভুবনেই এঁরা বেঁচে থাকতে রাজী। সুন্দর ভুবনে না-থাকার চাইতে কুৎসিত ভুবনে থাকা ভালো।

বজ্রশেখর বাবুর গেঁটেবাত গাঁট-ছাড়া হচ্ছে না, ওষুধের তাড়া খেয়ে মাঝে মাঝে গা-ঢাকা দিয়ে ফাঁক পেলেই ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এর আর চারা নেই ভেবে বেচারা বজ্রশেখরবাবু অম্লানবদনে সয়ে যাচ্ছেন। মন যদি বা কাঁদে, মুখকে হাসাতে বাধা কি? লাঠি হাতে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁট্‌তে হয় মাঝে মাঝে, তবু হাঁটেন। ভাবেন পা দুটোকে বেশী জিরোতে দিলে তারা শেষটায় ঘোড়া দেখে খোঁড়া হয়ে বসবে।

ব্যোমব্রহ্মবাবুর হাঁপানী। লোকে বলে হাঁপানী, তিনি বলেন "হাঁপানীর ধাত।" এ হাঁপানী সার্‌ছে না, সেরে দিচ্ছে। নানা জাতের, নানা খরচের ওষুধে আর তোয়াজে পয়সা খসাতে খসাতে হাঁপিয়ে উঠেছেন ব্যোমব্রহ্ম বাবু। এখন আর খসাচ্ছেন না, ধারণ করেছেন দৈব মাহুলি; আশা করছেন দৈবক্রমেই এ মাহুলি অব্যর্থ হবে।

দিগন্তবিহারীবাবুর একখানা তেতলা বাড়ী আছে লেকের কাছাকাছি। তাতে ছখানা চমৎকার ফ্ল্যাটের পাঁচখানায় বাস করেন ভালো ভাড়া-দেনে-ওয়ালা ভাড়াটে। তিনটি ছেলে কাপ্তানী করে, আড্ডা মারে, আর খায় দায়। পরোয়া করে না দিগন্তবাবুকে; তিনি থাকেন নিজের মনে। সারাজীবন পয়সা রোজগার করে শুকিয়ে থেকে পয়সা জমিয়ে বাড়ী করেছেন শেষ বয়সে।

রামপ্রসাদবাবুও আসেন এঁদের সঙ্গে লেকের ধারে আড্ডা দিতে। ইনি কোন এক সওদাগরী দফ্‌তরে ছিলেন বড়বাবু, বড়সাহেবের মেহেরবানিতে আর আপন বাহাদুরিতে দু পয়সা জমিয়ে নিয়ে অবসর প্রাপ্ত হয়েছেন। খবর রাখেন অনেক, যা খবরের কাগজে বেরোয় না। যা খান তা ভালো হজম হয় না, যা ভালো হজম হয় তা খান না। অ্যাদ্দিন বড়বাবুগিরি করে তারপর অন্যকে চেয়ার খালি করে দিয়ে বেরিয়ে আসার ব্যথা শেল হয়ে বুকে বিঁধে আছে।

এই কজনে মিলেই প্রথমে লেকের ধারে সকালে কম বিকেলে বেশী জমা হবার জন্যে জায়গা ঠিক করেছিলেন যেখানে গোল হয়ে বস্‌বার বাঁধানো আসন আছে। সকালবেলা আসর তেমন জমে না, শীগ্‌গীর রোদ উঠে যায় বলে। বুড়ো বয়সে রোদ সয় না। গোধূলি লগ্ন পেরোলে পর বৃদ্ধ-সমিতির অধিবেশন জমে ভালো। সন্ধ্যেবেলা রোদ ওঠে না, চাঁদ ওঠে—কোনো কোনো রাতে। আর চাঁদ উঠলে অনেক অতীত চাঁদিনীরাতের স্মৃতি দোলা লাগায় সভার চুলপাকা সভ্যদের মনে।

বিকেলবেলা লেকের ধারে এই বাঁধানো জায়গার সামান্য খানিকটা জুড়ে বসেছিলুম একা।

সহসা খেয়াল হলো গোধূলির লগ্ন ফুরিয়েছে, এসেছে সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা কালোর আমেজ। বৃদ্ধ সমিতির বৃদ্ধেরা এসে বসেছেন অনেকে, এঁদের কেউ কেউ এখানে বসেই সান্ধ্য ভ্রমণ কর্‌তে ভালোবাসেন।

দিগন্তবিহারী বাবু বললেন, "প্রজ্ঞাপারমিতার ব্যাপারটা কি বলুন তো রামপ্রসাদ বাবু। মারা গেল মেয়েটা, অথচ ওর বাপের চোখে তো একটি ফোঁটা জল দেখতে পেলে না কেউ। এক ছটাক দুঃখ পেয়েছে বলে বোঝবার সাধ্য নেই। লোকটা কি চামার?"

ব্যোমব্রহ্ম বাবু বললেন, "কি যে বলেন দিগন্তবাবু! একমাত্র মেয়ে মরলে চামার দুঃখ পায় না এ আপনাকে কে বললে? আমি তো এক চামারকে জানতুম, মেয়ে মরতে না মরতেই সে যে নাওয়া খাওয়া বন্ধ করলে, আর দুদিনের ভেতর ডাবের জল ছাড়া তার মুখে কেউ কিছু ছোঁয়াতেই পারলে না।"

"ব্যাটা লুকিয়ে লুকিয়ে নিশ্চয় খেয়েছিলো। এককালে অমন ভুখ-সত্যাগ্রহ আমরাও করেছি, জানি।" বলে' রামপ্রসাদ বাবু "হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ" করে হেসে উঠলেন। যদ্দিন অফিসের বড়বাবু ছিলেন তদ্দিন বড়বাবুগিরির ঠাট বজায় রাখবার জন্যে হাসি চেপে চেপে নিজেকে গোমরামুখো করে রেখেছেন। এতকাল না হাসার লোকসান দুরন্তবেগে উশুল করবার নেশায় এক ইঞ্চি সুযোগ পেলে এখন আড়াই গজ হাসবার

চেষ্টা করেন তিনি। তাই হেসে বলে উঠলেন, "হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ। ভুখ-সত্যাগ্রহ করে লুকিয়ে লুকিয়ে ঢের ঢের খেয়েছি। হেঃ হেঃ হেঃ......"

ব্যোমব্রহ্ম বাবু বললেন "হাসির কথা নয় রামবাবু। দস্তুরমতো ভাববার কথা। প্রজ্ঞার মা বেচারা তো কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবার জোগাড়। মরে মা'র বুকে শেল হানলে প্রজ্ঞা, বাপের বুকে কি কিছুই হানলে না?"

বজ্রশেখর বাবু বললেন, "হেনেছে। মোক্ষম হানা হেনেছে। মেয়েটার আর কিছু না থাক, রূপ ছিলো।"

দিগন্তবিহারী বাবু বল্‌লেন, "ছিলো মানে? আগুন। গন্‌গনে আগুন। দূর থেকে আঁচ লেগেই কত ছোকরার হৃদয় পুড়ে ছাই হয়ে গেল। প্রজ্ঞা মরে গেলে পর আমার শ্রীমানরা তো একদিন নাওয়া খাওয়াই ছেড়েছিলো। দুটোই ফের ধরেছে, কিন্তু উদাস ভাবটা এখনো কাটেনি। যখন তখন কেঁদে কেঁদে নাকী সুরে গান গায়।"

রামপ্রসাদ বাবু বললেন, "তা প্রজ্ঞা মারা না গেলেও গাইতো। আমাদের তরুণদের ভেতর ঐটেই তো রেওয়াজ হয়েছে আজকাল। মিহি গলায় মিনমিনিয়ে কাঁদ কাঁদ গান গাওয়া। আমাদের আমলের মর্দ্দানা গান তো এদের গলা দিয়ে বেরোবেই না।"

বজ্রশেখর বাবু বললেন, "মেয়েটা মরে গিয়ে বাপের আশার বাসা ভেঙে দিয়ে গেছে। বড়লোক জামাই বাগাবার তালে ছিল অনাথ। মেয়েটা বেঁচে থাকলে বাগাতো ও নিশ্চয়। কলেজে দু-দুটো লাখপতির ছেলেই তো মেয়েটার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলো। মেয়েটার নাম করে ওদের পকেট অনেক মেরেছেও অনাথ শুনতে পাই।"

"এত খবরও রেখেছেন বজ্রবাবু? হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।" হেসে উঠলেন রামপ্রসাদ বাবু।

"কান খাড়া থাকলে কানে খবর আপনি এসে পড়ে" বললেন বজ্রশেখর বাবু। "মেয়েটা হঠাৎ মরে গিয়ে অনাথের বড়লোক জামাইয়ের শ্বশুর হওয়ার আশায় ছাই দিয়ে গেল। এই ব্যথা যে অনাথের বুকে কি

নিদারুণ বেজেছে, সেইটে বুঝিনে বলেই বুঝতে পারিনে প্রজ্ঞা মরেছে কিন্তু অনাথ কাঁদছে না কেন। খুচরো ব্যথায় মানুষ ডুক্‌রে কাঁদে, পাইকারী ব্যথায় থম্‌কে থেমে থাকে।”

“অনাথপিণ্ডদ রায় চৌধুরীর চরিত্র-রহস্য অত সহজে হজম করবার নয় বজ্রবাবু,” বললেন দিগন্তবিহারী বাবু। “আমার তো মনে হয় অনাথের মোটেই মতলব ছিলো না বড়লোক জামাই করবার। অনাথ এইটে বুঝেছিলো যে একজন বড়লোক জামাইয়ের শ্বশুর হবার চাইতে একপাল বড়লোক ভাবী জামাইয়ের ভাবী শ্বশুর হয়ে থাকার কারবারে মুনাফা ঢের বেশী। তাই তো প্রজ্ঞা-ঘাসগুচ্ছকে সাম্নে ঝুলিয়ে রেখে একগাদা ধনী-দুলাল গাধাকে নানা কায়দায় দোহন করেছে অনাথ। প্রজ্ঞা মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব মোটা উপরি আমদানির রাস্তা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল অনাথের। এ কি একটা সোজা দাগা?”

“বাপের পাপেই অমন মেয়েটা অকালে ঝরে পড়লো। কি বা বয়স, আর কিই বা অসুখটা হয়েছিলো?” বললেন বজ্রশেখর বাবু। “মেয়েটা ছিল রীতিমতো সুস্থ সবল সতেজ প্রাণশক্তিতে ভরা, আমাদের রোমান্টিক্‌ তরুণদের মতো মিহি নেতিয়ে-পড়া ললিত লবঙ্গলতা নয়! ওর প্রাণের আগুন অমন দপ্‌ করে জুড়িয়ে যাবে, এ যে বিশ্বাসই করা যায় না মশাই।”

“আপনার কি বিশ্বাস বাপকে জব্দ করবার জন্যেই দপ্‌ করে নিভে গেল প্রজ্ঞাপারমিতা?” শুধালেন রামপ্রসাদ বাবু।

“বড় প্রশ্ন হচ্ছে” বললেন দিগন্তবিহারী বাবু, “প্রজ্ঞা কি জানতো যে তার নাম ভাঙিয়ে তার বাপ দেবতাটি তার ভক্তদের পকেট মারতেন?”

“কারো মুখ না চেয়ে, নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে বলতে হয়—আরো বড় প্রশ্ন হচ্ছে প্রজ্ঞা নিজে কি তার আপন আগুনের দীপ জ্বেলে পয়সাওয়ালা ভক্ত পতঙ্গদের পকেট মারতো?” বললেন রামপ্রসাদ বাবু। “আমার কিন্তু মনে হয় মেয়েটা ছিলো পাকা রকমের ফ্লার্ট, যাকে বলে ‘ককেট’—বিলিতি বা ফরাসী উপন্যাসের নায়িকা হবার মতো! রূপের নেশায় মাতিয়ে দিয়ে ছোকরাদের—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ !!”

"না না না। এ আমি বিশ্বাস করিনে রাম বাবু।" ঘোর প্রতিবাদের সুরে আর্তনাদ করে উঠলেন ব্যোমব্রহ্ম বাবু। "প্রজ্ঞাপারমিতা ফ্লার্ট? প্রজ্ঞাপারমিতা ককেট্? গোলাপের রূপ দেখে লোকে ভোলে, রূপ দেখিয়ে গোলাপ ভোলায় না কাউকে।" বলে' আমার দিকে তাকালেন; হয়তো আশাও করলেন আমিও কিছু বল্‌বো।

আমি বল্‌লেম "৺প্রজ্ঞাপারমিতার রূপের রিপোর্ট যা শুনছি তার যদি সওয়া পাঁচ আনাও সত্য হয়, তাহলেও আমার মনে হয় তিনি ফ্লার্টও ছিলেন না, ককেট্‌ও ছিলেন না। রূপের অভাবকেই বরং নানা ভঙ্গীর ন্যাকামি দিয়ে পুষিয়ে নিতে হয়—যাকে বলে 'ফ্লার্ট' করা আর 'ককেট্রি' করা। রূপ যার এম্নিতেই মাতায়, তার কি দরকার ফ্লার্ট করে মাতাবার?"

আনন্দের হাইড্রোজেন বোমার মত ফেটে পড়লেন ব্যোমব্রহ্ম বাবু। আমাকে জড়িয়ে ধরতে হলে রামপ্রসাদ বাবুকে টপকে আসতে হয়, তাই পারলেন না। বললেন, "এই সোজা কথাটাই এঁদের বলে বোঝাতে পারছিনে মশাই। আপনি দিনতো একটু বুঝিয়ে।" ৺প্রজ্ঞাপারমিতা ফ্লার্ট আর ককেট্ ছিলো না এইটে এঁদের সকলের মগজে হাতুড়ি মেরে ঠুকে দিতে চাইছিলেন তিনি, হাতুড়ি পাচ্ছিলেন না। দেখলেন আমিই সেই হাতুড়ি।

আমি বল্‌লুম, "এ জিনিস তো বোঝাবার নয়, বুঝবার। যিনি বোঝেন না, তাঁকে বোঝানো যাবে না; যিনি বোঝেন, তাঁকে বোঝানো বাহুল্য।"

ভূতপূর্ব বড়বাবু রামপ্রসাদ বাবু আবার বড়বাবুয়ানী হাসি হাসলেন "হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।" তারপর বললেন "এ হলো এক হেঁয়ালী দিয়ে আরেক হেঁয়ালীকে ধামা চাপা দেবার ব্যবস্থা। অনেক কেরানী আর বড়সায়েব চরিয়ে খেয়েছি, এ আর আমি বুঝিনে? কিন্তু কথা তো তা নয়। আসল কথা হচ্ছে, অনাথের মতো বাপের প্রজ্ঞার মতো মেয়ে হলো কি করে?"

ব্যোমব্রহ্ম বাবু বললেন, "গোলাপ ফুল আর গোলাপ গাছের কথা ভাবলেই সেটা বুঝতে পারবেন রামবাবু।"

বজ্রশেখর বাবু বললেন, "তাহলে এখন দেখতে হয় গোলাপ ঝরে গেলে গোলাপ গাছ কাঁদে কিনা।"

এমন সময় এলেন বিশ্বম্ভর বাবু, মাথায় গান্ধীটুপি। এ টুপির তলায় নেই গান্ধীভক্তি, আছে টাক। টাক ঢাকতে গান্ধীটুপি চমৎকার। বললেন, "আজকের আলোচনার বিষয়টি কি ?"

বজ্রশেখর বাবু বললেন, "কথাটা উঠেছে প্রজ্ঞাপারমিতাকে নিয়ে।"

বিশ্বম্ভর বাবু সভায় আসন গ্রহণ করে বললেন, "প্রজ্ঞাপারমিতা ? আহা, বড় ভালো মেয়েটা ছিল—অমনটি আর দেখিনি, দেখবো না। আমার মেয়ে শর্বরীর সঙ্গে একক্লাশে পড়তো প্রজ্ঞা। দেবী প্রতিমা যেন একখানা। কি রূপ ! কি ব্যবহার ! আমার সহধর্মিণী তো প্রজ্ঞা বলতে পাগলিনী। শর্বরীও তাই। প্রজ্ঞার জন্যে দুজনের সে কি কান্না ! আমি মরলেও বোধ করি অমন কাঁদবে না।"

বিশ্বম্ভর বাবুর এই শেষ কথাটা শুনে সবাই মনঃক্ষুণ্ণ হলেন বোঝা গেল। তাঁরা যে অমর নন, এইটে তাঁরা ভুলে থাকতে চান। খুঁচিয়ে কেউ মনে করিয়ে দিলে তাঁকেই সবাই মিলে চাঁদা করে খোঁচাতে ইচ্ছে করে। আয়ু ফুরিয়ে আসছে, এইটে ভুলতে তাঁরা বায়ুসেবনে আসেন এখানে। ৺প্রজ্ঞাপারমিতা-প্রসঙ্গের আলোচনার পেছনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁদের কল্পনায় তরুণ হবার ইচ্ছা। শিং কেটে বাছুর হওয়া।

"আমার গিন্নী বলেন" বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "প্রজ্ঞাপারমিতা ছিলো কোনো শাপভ্রষ্টা দেবী। শাপের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল, চলে গেল স্বর্গে।"

রামপ্রসাদ বাবু বললেন, "শাপভ্রষ্টা অপ্সরা বলুন।"

"রূপের দিক দিয়ে তাও বলা যায় বই কি," বললেন বিশ্বম্ভর বাবু। "কোথায় লাগে মিশরের ক্লিওপ্যাট্রা, কোথায় লাগে ট্রয়ের হেলেন ?"

"খবর নিয়ে জেনেছি আমি" বললেন রামপ্রসাদ বাবু, "প্রচুর প্রেমিক

আর প্রচুর কেলেংকারি ছিলো প্রজ্ঞাপারমিতার। ইচ্ছে করলে ওর অনেক হাঁড়িই হাটের মাঝখানে ভেঙে দিতে পারি। কিন্তু ভাঙতে চাইনে। হাজার হোক, মরে গেছে মেয়েটা।"

কেউ কিছু বললেন না। নিজে থেকেই বলতে লাগলেন রামপ্রসাদ বাবু, "কলেজে পড়বি পড়, অনেক মেয়েই যেমন পড়ে; অত নাচানাচি কেন রে বাপু? এমন দেখেছি যে হেন ফাংশন নেই যাতে নাচ নেই প্রজ্ঞাপারমিতার। রূপ দিয়েছে ভগবান, বেশ ভালো কথা। তাই বলে যেথায় সেথায় নাচের ঢাক পিটিয়ে রূপের বিজ্ঞাপন ছড়াতে হবে? ছি ছি ছি ছি ছি! আর ছোঁড়াগুলোও আজকাল এম্নি হ্যাংলা হয়েছে। কই, আমাদের সময় তো আমরা এমন ছিলুম না"

দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে দিগন্তবিহারী বাবু বললেন, "আমাদের সময় আমাদের এমন রঙীন সুযোগই বা ছিলো কোথায় রামবাবু? আমরা পাইনি তাই খাইনি।"

বজ্রশেখর বাবু বললেন, "আমাদের সময় কোথায় ছিলো সহ-শিক্ষা? অসহ-শিক্ষার বোঝা বয়েই তো আমাদের মা সরস্বতীর চৌকাঠ পেরোতে হলো। ঘরের মেয়েরা তখন বাইরে নাচবে কি, ঘরেও নাচতে শেখে নি। বিয়ের বয়সের মেয়েরা কেউ কেউ হারমনিয়ামের পর্দা টিপে মক্‌সো করতো 'শুধু সে রেখে গেছে' গানখানা, কনে-দেখিয়েদের হাতে পাশ-মার্কা পাবার জন্যে, গান গাইবার জন্যে নয়।"

"আমার তিনটি পুত্ররত্নই সিনেমা দুনিয়ার খুঁটিনাটি খবর রাখে নখদর্পণে।" বললেন দিগন্তবিহারী বাবু। "তাদেরই বলাবলি করতে শুনেছি একখানা ছবিতে উর্বশী নৃত্যে নামবার জন্যে প্রজ্ঞাকে সাধা হয়েছিলো মোটা টাকা আগামের চুক্তিতে। সে প্রস্তাব হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছিলো প্রজ্ঞা।"

রামপ্রসাদ বাবু বললেন, "ঐ শুনেই আপনারা ভুলে গেলেন? ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ, আপনারা একেবারে ছেলেমানুষ। ওসব বোগাস কথা; অথবা হয়তো আরো ঢের বড় দাঁও মারবার তালে ছিলো মেয়েটা।

নিজের দর কমিয়ে তাই বাজার খারাপ করতে রাজী হয় নি। ঐ যে ছোকরা বোধিসত্ব, প্রজ্ঞার চ্যাংড়া ছোট ভাইটা—দস্যির মতো চেহারাখানা, প্রজ্ঞার ভাই বলে চেনে কার বাবার সাধ্যি ?—ও শুনেছি সিনেমা কোম্পানীগুলোর সঙ্গে দহরম মহরম করে বেড়াতো, প্রজ্ঞার ভাই পরিচয়ে। এর পেছনে কি প্রজ্ঞার কোন মতলব ছিলো না মনে করেন ? তাহলে বলবো আপনাদের মনে করার বাহাদুরী আছে বটে। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ······"

বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "তাহলে বলি শুনুন শর্বরীর জলবসন্তের কথা। শর্বরী তখন অল্পদিন মোটে ভর্তি হয়েছে কলেজে। সহপাঠিনী প্রজ্ঞাপার-মিতার সঙ্গে নতুন আলাপ। কিন্তু ঐ নতুন আলাপেই শর্বরীর প্রাণের মিতা হয়ে উঠলো প্রজ্ঞাপারমিতা। শর্বরীর হলো জলবসন্ত। বসন্ত জল হলে কি হবে, আসলের মত ভোগাতে লাগল শর্বরীকে। শর্বরী আমার একটি মোটে মেয়ে, আদুরে মেয়ে,—সর্দিতেই যে কাঁদে, বসন্তে সে কেঁদে ভাসাবে তাতে আর আশ্চর্য কি ? প্রজ্ঞা দেখতে এলো। শর্বরী যতক্ষণ প্রজ্ঞাকে কাছে পায় ততক্ষণ ভালো থাকে, জেগে উঠে প্রজ্ঞাকে কাছে না দেখলেই অস্থির। কত রাত জেগে প্রজ্ঞা সেবা করেছে শর্বরীর, নিদ্রা নেই, ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। কেঁদে বলেছি, 'তোর সোনার রূপ যে কালি হয়ে গেল, পাগলী মেয়ে।' শুনে প্রজ্ঞা বলেছে, 'রূপ তো একদিন কালি হবেই মেসোমশাই। রূপ আগলে রাখা কি বন্ধুর শুশ্রূষার চেয়ে বেশী জরুরী ?' শর্বরী যে দিন ভালো হয়ে উঠলো সেদিন তৃপ্তির যে হাসি দেখেছিলুম প্রজ্ঞার মুখে, তেমন হাসি আর কারো মুখে তো দেখতে পাইনে।"

ছল ছল হয়ে উঠলো বিশ্বম্ভর বাবুর চোখ দুখানা।

তারপর বল্‌লেন, "শর্বরীর সেবা করতে করতে ছোঁয়াচ লেগে দু একটা ফুস্কুড়ি উঠেছিলো প্রজ্ঞার মুখে। ফুস্কুড়ি মিলিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু রেখে গিয়েছিলো দুটি কালো দাগ—সোনালী চাঁদের মুখে দু ফোঁটা কালো কলঙ্ক। কলঙ্ক তো নয়, সে যেন গৌরবের অলঙ্কার।"

কাহিনী শুনে আমরা নীরব, অভিভূত। শুধু রামপ্রসাদ বাবু হেসে উঠলেন রামপ্রসাদী ভঙ্গীতে।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, এমন সময় পেছনে শুনলুম "আপনারা সবাই আছেন দেখছি। দেখা করবেন তো শীগগীর যান। চন্দ্রবাবু চল্লেন।"

চেয়ে দেখি দিগম্বর বাবু। সবাই বললেন, "কোথায় চললেন?"

"আর কোথায়? যেখানে যাবার।" বলে এমনভাবে হাত ঘোরালেন দিগম্বর বাবু, যে চন্দ্রবাবু কোথায় রওনা হচ্ছেন পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল।

চন্দ্রবাবু এই বৃদ্ধ সমিতির পুরাতন সদস্য। নিয়মিত আসতেন সান্ধ্য ভ্রমণে।

ব্যোমব্রহ্ম বাবু বললেন, "বলেন কি দিগম্বর বাবু? চন্দ্রবাবু চললেন? আশ্চর্য! এই কালকেও তো—"

দিগম্বর বাবু বললেন, "কি মুশকিল! মানুষ যে মুহূর্তে যায়, তার এক মুহূর্ত আগেও বেঁচে থাকে এইটে ভুলে যান কেন? লেকে বেড়াতে আসবার পথে ভাবলুম চন্দ্রবাবুকে ডেকেই নিয়ে চলি। গিয়ে দেখি শেষ অবস্থা, শ্বাস উঠেছে। ডাক্তার বললে, আর বড় জোর আধ ঘণ্টা। কোনো স্নায়ু টায়ু ছিঁড়ে গিয়ে থাকবে। একবার চোখ মেলে দেখলেন আমাকে— শেষ নমস্কার জানিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছি আপনাদের খবর দিতে। অ্যাদ্দিন একসঙ্গে লেকের হাওয়া খেয়েছি, সুখ-দুঃখের কয়েছি কত কথা। আজ উনি চলে যাচ্ছেন, ওল্ড্ কমরেড, আপনাদের প্রত্যেকের উচিত শেষ দেখাটা করে আসা। নইলে উনি মনে বড় ব্যথা নিয়ে যাবেন। যান যান, আর দেরী করবেন না।"

শুনে সকলের মুখে কেমন একটা ভাব জেগে উঠলো, যা ভাষায় আঁকা শক্ত।

ব্যোমব্রহ্ম বাবু বললেন, "এখন গিয়ে আর শেষ দেখা হবে কি? আমরা পৌঁছনো পর্যন্ত উনি কি থাকবেন?"

"সে গ্যারান্টি তো আর ওঁর কাছ থেকে নিয়ে আসি নি। অবিলম্বে যদি চলে যান তো দেখা হতেও পারে। যান, যান, শীগগীর যান।"

রওনা হয়ে গেলেন বজ্রশেখর বাবু, ব্যোমব্রহ্ম বাবু দিগন্তবাবু, রামপ্রসাদ বাবু, বিশ্বম্ভর বাবু।

দিগম্বর বাবু শেষ দেখা সেরে এসেছেন। তিনি লেকের জল-ছুঁয়ে-আসা হাওয়া খেয়ে আয়ু বাড়াতে লাগলেন আপন মনে।

হনলুলু চললেন শ্রীযুত ভিনায়ক ভারমা। কিন্তু কেন? তাহ'লে প্রথম থেকেই বলি।

দশ বছর বিলেতে প্রবাসের পর তিনি ভারতে এসেছিলেন। ঠিক করেছিলেন ভালো লাগলে থেকে যাবেন, তা না হলে ফিরে যাবেন।

গোড়ায় ছিল বাবার দেওয়া নাম বিনয়কুমার বর্মণ, তা থেকে করেছিলেন বিনয় কে. বর্মণ—সর্বশেষে কায়দা করে হয়েছিলেন ভিনায়ক ভারমা। এই নামই এখন ব্যবহার করছেন।

দশ বছর আগে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ইনি এক বড়লোক বন্ধুর সঙ্গে বিলেতে রওনা হয়েছিলেন, তাঁরই খরচে। বন্ধুটি ফিরে এলেন, কিন্তু থেকে গেলেন বিনয় কে. বর্মণ—ভাবী ভিনায়ক ভারমা। তাঁর মনে হলো—"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।" চ্যানেলটা পার হলেই কন্টিনেন্ট। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মেনী, ইতালী···!! ভারত থেকে এসব দেশে আসা মানে সাত সমুদ্র তেরো নদী টপকানোর খরচা, হাঙ্গামা, কালক্ষেপ। কিন্তু বৃটেন থেকে খাল পেরোলেই কন্‌টিনেণ্ট। খরচা কম, হাঙ্গামা কম, সময়ের লোকসান কম। তাই বড়লোক বন্ধুটি যখন ফেরত রওনা হবেন বিলেত থেকে, তখন ভিনায়ক ভারমা (এই নামটাই ব্যবহার করা যাক্) বললেন, "আমি ভাই আর ফিরছি না।"

বন্ধুটি ভারমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন একটু প্রমোদ ভ্রমণ করিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। এখন ভারমার কথা শুনে চমকে উঠে বল্‌লেন, "সে কি

কথা ? এখানে তুমি করবে কি ?" অর্থাৎ এখানে থেকে খাবে কি করে ? জবাবে ভিনায়ক ভারমা হেসে বল্লেন, "তুমি ভাই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে নির্ভাবনায় ঘরকন্না করো। তোমার এই বন্ধুটিকে বেকায়দায় ফেলবে, হেন দেশ ভূপৃষ্ঠে আজও জন্মগ্রহণ করে নি।" বন্ধুটি একটু ভেবে দেখলেন কথাটা বিনয়কুমার একেবারে বাজে বলে নি। বিনয়কুমারের চরিত্রে যে জিনিসটির সব চেয়ে বেশী অভাব সেটি হচ্ছে বৈষ্ণবীয় বিনয় ; আর ঠিক তার পরেই যে জিনিসটির অভাব সেটি হচ্ছে অকারণ হাম্বড়ামি। বিনয়কুমার চলেন বরাবর বিনয় আর বাহাদুরির মধ্যপথ ধরে। তাই তাঁর আশ্বাসে সহজেই বিশ্বাস করে' বড়লোক বন্ধুটি ভারত অভিমুখে নির্ভাবনায় রওনা হয়ে এলেন। বিনয়-চরিত্রের নতুন পরিচয় তিনি পেতে শুরু করেছিলেন লণ্ডনে প্রথম পা দিয়েই। দুনিয়ার সেরা নামী শহর লণ্ডন! ইতিহাসে, ভূগোলে প্রসিদ্ধ লণ্ডন। লণ্ডন স্টেশনে নেমে হৃদয়-ঘড়ির পেন্ডুলাম-স্পন্দন যেন বলেই চলেছে লন্-ডন্, লন্-ডন্, লন্-ডন্। এসেছেন বিশ্ব-বিখ্যাত ভ্রমণ ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান টমাস কুক কোম্পানীর মক্কেল হয়ে। তাদেরই প্রতিনিধি সর্বপ্রকার সহায়তা করে আসছে প্রতিটি বদলি স্টেশনে ; তিনি যেন কোনো বিয়ের মহামান্য বরযাত্রী—কিছুই তাঁকে করতে হচ্ছে না আপন হাতে বা মাথায়। লণ্ডনের হোটেলের সমস্ত মালপত্রাদি সহ তাঁকে পৌঁছে দিলে তবে হবে টমাস কুক কোম্পানীর দায়িত্ব খালাস। হোটেলেও ঘর আগে থেকেই 'বুক্' করে রেখেছে কুক কোম্পানী। সুতরাং কোনোই ঝামেলা নেই। তবু হৃদয়ের দুরু-দুরু যেন ক্রমেই গুরু-গুরু হয়ে উঠছে। কিন্তু বিনয়কুমারের মুখের পানে তাকিয়ে দেখেন তাতে পরম প্রশান্ত নিরুদ্বেগ ভাব। এ স্টেশন যেন লণ্ডন নয়—হাওড়া কিম্বা শিয়ালদা। আনমনা ভঙ্গীতে "ইট্ ইজ এ লং লং ওয়ে টু টিপারারী—ঈ-ঈ-ঈ" গুনগুনিয়ে গাইছেন বিনয়কুমার। কলকাতায় স্নান-ঘরে নাইতে নাইতে নিজেকে গান শোনাচ্ছেন যেন। এলো কুক কোম্পানীর প্রতিনিধি, ট্যাক্সী চড়ে হোটেলের দিকে রওনা হলেন দুই বন্ধু। দু'পাশে দেখতে দেখতে চললেন বিনয়কুমার, মাঝে মাঝে ট্যাক্সী-ড্রাইভারকে সোজা পথের নির্দেশ দিতে দিতে। হঠাৎ বলে

উঠলেন, "একটু রিজেন্ট স্ট্রীটের ভেতর দিয়ে চলো তো ভাই। ও মোড়ে 'জনসন'স্ টুব্যাকো শপে' একটু দাঁড়িয়ো। এক টিন পাইপ-টুব্যাকো কিনতে হবে।" রিজেন্ট স্ট্রীটের যথামোড়ে যথাস্থানে যথাসময়ে ট্যাক্সী দাঁড়ালো, কেনা হলো পাইপ-টুব্যাকো। অবাক হলেন বন্ধু। লণ্ডনের পথ-ঘাট সব জানে নাকি বিনয়কুমার? অথচ লণ্ডনে তো আগে কখনো আসে নি বিনয়!

বিস্ময়ের সেই মোটে শুরু। পরে এলো আরো বিস্ময়! হোটেলে বৈকালিক চা আর জলযোগের পর বিনয়কুমার (ভাবী ভিনায়ক ভারমা) বললেন, "চলো তোমায় শহরটা একটু দেখিয়ে নিয়ে আসি। আজকের আবহাওয়াটা একটু ভদ্রলোকের মতো দেখতে পাচ্ছি। কাল কেমন থাকবে কে জানে? লণ্ডন ওয়েদার কিন্তু ক্যালকাটা ওয়েদারের মতো নয় বন্ধু, এইটে মনে রেখো।"

বন্ধু বল্‌লেন, "হোটেল থেকে একজন গাইড নিয়ে নিই তাহলে। নইলে নতুন লোক বুঝে ট্যাক্সীওয়ালারা মাথায় কাঁটাল ভাঙবে।"

বিনয়কুমার বললেন, "এখানকার ট্যাক্সীওয়ালারা মাথায় কাঁটাল ভাঙে না বন্ধু! অন্ততঃ আমি যতক্ষণ সঙ্গে আছি ততক্ষণ তোমার মাথাটি নিরাপদ। তাছাড়া, ট্যাক্সীতে তো ঘুরবো না, পথঘাটের সঙ্গে খাঁটি পরিচয় হয় পায়ে পায়ে। ট্যাক্সীতে নয়।"

পায়ে হেঁটে অনেক রাস্তা, অনেক গলি ঘুরলেন দুজনে। পথপ্রদর্শক বিনয়কুমার। বন্ধুকে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখালেন এক সন্ধ্যায় লণ্ডনের যতটা দেখানো সম্ভব। কোথায় কোন গলি মিশেছে বড় রাস্তায়, কোথায় কোন গীর্জা, কোথায় কোন বিভাগীয় বিপণিতে কোন কোন জিনিস কম দামে ভালো মেলে, কোথায় কোন খ্যাতনামা লোকের বাড়ী—সব কিছুই তাঁর জানা যেন। বহু বছর যেন এই শহরে বাস করেছেন বিনয়কুমার, নতুন আগন্তুককে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন গাইডের মতো। এই তো গেল প্রথম দিন। এর পর প্রতিদিনই তিনি দেখতে লাগলেন নতুন নতুন বিস্ময়। কোন কোন জিনিস কোথায় ভালো পাওয়া যাবে, লণ্ডনে প্রধান প্রধান

দ্রষ্টব্য কি কি এবং কোথায় কোথায় ভালো সিনেমা আর থিয়েটার-হল, কোথায় কোথায় কোন কোন থিয়েটারে শুধুই ম্যাজিক দেখানো হয়—দেখা গেল সব কিছুই বিনয়কুমারের জানা। বন্ধুটি নিজেকে সম্পূর্ণ বিনয়কুমারের হাতে ছেড়ে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হলেন। হয়ে দেখলেন পস্তাবার কারণ ঘটছে না।

বন্ধুটি জানতেন না, লণ্ডনে আসবার আগেই সগুপ্রকাশিত লণ্ডন-গাইড (লণ্ডন শহরের এবং উপকণ্ঠের মানচিত্রসহ) সংগ্রহ করে বেশ খুঁটিয়ে পড়েছিলেন বিনয়কুমার। লণ্ডনের মানচিত্র বার বার দেখতে দেখতে স্মৃতিতে গেঁথে গিয়েছিল। আর স্মৃতিশক্তি ছিলো তাঁর অসাধারণ। লণ্ডনের নূতনতম ট্রাম-রুট আর বাস-রুটগুলিও মোটামুটি রকম মুখস্থ করে নিয়েছিলেন নতুন লণ্ডন-গাইড দেখে। অনেকখানি মুখস্থ আর স্মৃতিশক্তি এবং কিছুটা উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে বন্ধুকে তাক লাগালেন বিনয়কুমার বর্মণ।

দু'চার দিনের ভেতর লণ্ডন শহরের ভারতীয় মহলের পরম প্রিয় হয়ে উঠলেন বিনয়কুমার, যেন তিনি অনেক দিনের পরিচিত সখা। গম্ভীরের কাছে গম্ভীর, আড্ডাবাজের কাছে আড্ডাবাজ, রসিকের কাছে রসিক, গানপ্রিয়র কাছে গাইয়ে—যে যেমনটি ভালোবাসে তার কাছে ঠিক তেমনটি হবার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা বিনয়কুমারের। দু'-মিনিটের আলাপে খাতির জমিয়ে নিতে তাঁর জুড়ি নেই। চেহারায় চোখ-ধাঁধানো সুপুরুষ ন'ন, কিন্তু কি যেন আছে তাঁর চোখের দৃষ্টিতে আর মুখের মিষ্টি হাসিতে! বোধ হয় সম্মোহনী যাদু, যাতে স্ত্রী-পুরুষ দু'জাতেরই মন মোহিত হয়।

শুধু ভারতীয় নয়, চটপট অনেক ইংরেজ বন্ধুও বানিয়ে ফেললেন বিনয়কুমার। তারা সবাই বিনয়কুমারকে ডাকতে শুরু করলে ভারমা ব'লে। মিস্টার নয়, শুধু ভারমা। বিনয়কুমারও তাদের প্রথম নাম ধরেই ডাকতে লাগলেন। এত দ্রুত পসার করে ফেললেন বিনয়কুমার, যে তিনি আবার ভারতে ফিরে যাবেন শুনে অনেকেরই হৃদয়ে হলো দুঃখ। এই অনেকের ভেতরে বিশেষ কয়েক জন বিনয়কুমারের মুখ থেকেই তার সংক্ষিপ্ত জীবন-

কাহিনী শুনে বললেন, দেশে যখন তাঁর বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই, তখন লণ্ডনেই থেকে গেলে তাঁর এমন কি ক্ষতি? দুনিয়ার সেরা শহর লণ্ডন। আর, এমন নয় যে দেশে তাঁর স্ত্রী বসে আছে স্বামীর পথ চেয়ে, কিংবা কোনো প্রিয়া তাঁর জন্যে যত্নে গেঁথে রাখছে বরণমালা। বেঁচে নেই মা, বেঁচে নেই বাবা।

পরামর্শ টা বিনয়কুমারের মনে গেঁথে গেল। দেশী-বিদেশী এতগুলো দোস্ত লণ্ডনে থাকতে লণ্ডনে কায়েমী হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে এমন কিছু শক্ত কথা নয়। দুনিয়ার সেরা শহরে দুনিয়ার অন্যতম সেরা মগজওয়ালা পুরুষ সিংহের পক্ষে ক'রে খাওয়া সম্ভব হবে না, এ বাতুলের কল্পনা। কয়েক জন ইংরেজ ছাত্র-ছাত্রীর বাংলা ভাষা শিখবার আগ্রহ লক্ষ্য করেছিলেন ভারমা; তারা বাংলা শিখতে চায় বাঙালী নোবেল-লরিয়েট টেগোরের রচনাবলী তাঁর নিজের ভাষায় পড়বার জন্যে। এ ধরণের উৎসাহী আর উৎসাহিনীদের জন্যে বাংলা শেখাবার সান্ধ্য বা নৈশ ক্লাস খোলা যেতে পারে। বাংলা গান, বিশেষ করে রবীন্দ্র-সংগীতের ক্লাস খুললেও হয়তো ছাত্র-ছাত্রীর অভাব হবে না। চোস্ত ইংরিজি জানেন বিনয়কুমার, নিজের দেশের সম্বন্ধে তথ্য ও তত্ত্ব মিলিয়ে প্রবন্ধ আর গল্প লিখেও পয়সা কামানো যাবে। ভারত সম্বন্ধে বৃটেনের লোকের কৌতূহলের অভাব নেই। তাছাড়া, সেল্‌স্‌ম্যানের যে যে গুণ দরকার সবই তাঁর আছে, আর লণ্ডনের মতো কারবারী শহরে একজন পাকা সেল্‌স্‌ম্যানের টাকা উপায় করবার ভাবনা কি? সেলস্‌ম্যানের চাহিদা ছিলো, আছে, থাকবে সব সময়ে।

সুতরাং বন্ধুকে অনায়াসে আর অম্লানবদনে বললেন একা ফিরে যেতে। একাই ফিরে গেলেন বন্ধু, ফেরবার পথে ভারমার সঙ্গসুখ পাবেন না বলে দুঃখিত মনে। ভারমা তাঁর সঙ্গে ফিরে গেলে ভারমার জন্যে যে টাকাটা তাঁর খরচা হতো, সে টাকা তিনি ভারমাকে দিয়ে গেলেন, বিদায়-বেলায় প্রিয় বন্ধুর প্রীতি উপহার। ভারমা খুশী হয়ে ভাবলেন কিছু দিনের খরচার জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

লণ্ডনের টাকা রোজগারের মাঠে নেমে দেখলেন, যত সহজে যত

বেশী উপায় করবেন ভেবেছিলেন ততটা সম্ভব হচ্ছে না। ক্রমে বুঝলেন বিলেত দেশটাও মাটির, সেটা সোনা-রূপোর নয়। টাকার হরির লুট ছড়িয়ে নেই লণ্ডনের পথে পথে।

এবারে আর "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" হবে না, বন্ধু হয়েছেন ভারত পথের পথিক। হোটেলের রাজসিক খরচায় হিমসিম খেয়ে শেষে হোটেল ছেড়ে দিলেন ভিনায়ক ভারমা—উঠলেন কোনো এক শ্রীমতী লিওনোরা ব্রাউনের বাড়ীতে পেয়িং-গেস্ট অর্থাৎ খরচা-দেনেওয়ালা অতিথি হয়ে।

রুটীন মাফিক বাঁধাধরা কাজ করা ভারমার স্বভাববিরুদ্ধ। পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙা বরাবর অভ্যাস তাঁর ; তাই করবার জন্যে হৃদয় আকুল হয়ে উঠলো।

ভারতে থাকতেই খৃষ্টভক্ত ছিলেন ভারমা। ল্যাণ্ডলেডি (বা গৃহকর্ত্রী) শ্রীমতী লিওনোরা ব্রাউনের অতিথি হবার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে প্রতি রবিবারে নিয়মিত গীর্জায় প্রার্থনা করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, এর জন্যে শুধু তাঁর খৃষ্টভক্তিই দায়ী নয়। আর কী আশ্চর্য যোগাযোগ! ৺শ্রীযুত ব্রাউনও এমনি করেই প্রতি রবিবারে গীর্জায় প্রার্থনা করতে যেতেন শ্রীমতী ব্রাউনের সঙ্গে। ৺শ্রীযুত ব্রাউন আর নেই, খৃষ্টের মধ্যস্থতায় পরম পিতার অনন্ত আশ্রয়ে চলে গেছেন। শ্রীমতীর জন্যে বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেন নি এক চোদ্দ বছরের মেয়ে ছাড়া। সে মেয়ে এখন ষোড়শী, নাম আইরিন। শ্রীযুত ব্রাউনের খৃষ্টপ্রাপ্তির পর নিজেকে কন্যাসহ আকুল পাথারে ভাসমানা কল্পনা করেছিলেন শ্রীমতী ব্রাউন। কিন্তু করিৎকর্মা মহিলা তিনি, পাথারে কূল নিজেই তৈরি করে নিলেন বাড়ীতে 'পেয়িং-গেস্ট' রাখবার ব্যবসা শুরু করে। শ্রীমতী ব্রাউনের রান্না, ব্যবহার, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি চমৎকার ; ফলে অতিথির সংখ্যা এক থেকে একাধিকে পরিণত হয়ে বড় বাড়ীতে বদ্‌লি হয়ে আসার প্রয়োজন হলো। বর্তমান গৃহে পাঁচজন পেয়িং-গেস্ট, যাদের একজন মিস্টার ভিনায়ক ভারমা। হোটেলের চাইতে খরচা এখানে কম, অথচ এখানে মেলে ঘরোয়া আবহাওয়া (যাকে বলা যায়

'হোম অ্যাটমস্‌ফিয়ার'), মেলে না হোটেল-সুলভ ব্যবসাদারী বারোয়ারী গন্ধ। সুতরাং পাঁচটি অতিথির ঘর খালি থাকে না কখনো দু-এক দিনের বেশী, এক অতিথি গেলেই অন্য অতিথি আসেন। মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা তাই শ্রীমতী ব্রাউনের। কুমারী আইরিন স্কুল ছেড়ে পড়ছে কলেজে। পরম ভারমা-ভক্ত হয়ে উঠেছে আইরিন, তাঁকে ডাকছে আঙ্কল্ ভারমা বলে। পতিবিরহিণী শ্রীমতী ব্রাউন দুনিয়ায় বড় একাকিনী বোধ করছিলেন। অচিরেই ভিনায়ক ভারমা হয়ে গেলেন আইরিনের ড্যাডি ভারমা, এবং শ্রীমতী লিওনোরা ব্রাউন হয়ে গেলেন শ্রীমতী লিওনোরা ভারমা। পরম নিশ্চিন্ত হলেন ভারমা, লণ্ডন শহরে নিখরচায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। শ্রীমতী ভারমা (ভূতপূর্বা ব্রাউন) শ্রীযুত ভারমার চাইতে বছর কয়েকের বড়ো, গিন্নীভাবাপন্না মহিলা। কিন্তু ভারমার তাতে এক ফোঁটা আপত্তি হলো না। প্রেমতৃষ্ণা আর রূপতৃষ্ণা মেটাবার জন্যে তো ঘরের বাইরে ছড়ানো রয়েছে অজস্র প্রেম, অফুরন্ত রূপ ; আর বাইরে বাইরেই তো ভারমার সময় কাটবে বেশী, এক আড্ডা থেকে আরেক আড্ডায়।

কালচারের মহা কেন্দ্র লণ্ডন শহর। ভারমা দেখলেন চরিত্র হারাবার কালচারেও পরম তীর্থক্ষেত্র লণ্ডন। লণ্ডনের প্রদীপে আছে অনেক আলো, আর সেই প্রদীপের তলাতেই অনেক অন্ধকার। লণ্ডনের অলি-গলি অন্ধি-সন্ধি যেমন দ্রুত বেগে তাঁর নখদর্পণে এসে গেল, তেমনি বৃহত্তর লণ্ডনে (অর্থাৎ লণ্ডন শহরে এবং তার চারধারে শহরতলীতে) ছড়ানো নিষিদ্ধ ফলের বাগ-বাগিচার ঠিকানা ও বিবরণীও দ্রুতবেগে মুখস্থ হয়ে গেল ভারমার।

শুধু এই নয়। নীচুতলা, মধ্যতলা, উঁচুতলা—সব তলারই খবর রাখতেন ভারমা।

মাতালের মদ্যপানে যত আনন্দ, তত আনন্দ অন্যকে মদের নেশায় মাতিয়ে। পাইকারী হারে চরিত্র হারিয়ে যিনি পাকাপোক্ত চরিত্রহীন হয়েছেন, তাঁর সেরা আনন্দ অন্যকে চরিত্রহীন বানিয়ে। আপন চরিত্র অনেক হারিয়ে হারিয়ে এখন আর নিজের চরিত্রহীনতায় তেমন নেশা ধরে না

ভারমার। সুতরাং মনোনিবেশ করলেন অপরকে নিষিদ্ধ ফল খাবার নেশায় মাতিয়ে দিতে! ভাবলেন চরিত্র হারানোর যে আনন্দ নিজে পেয়েছেন সে আনন্দরসের রসিক তৈরি করা তাঁর একটি কর্তব্য। এবং এই কর্তব্য পালন করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু যদি তাঁর পকেটে এসে যায় তো খুবই ভালো।

ভারমার কর্মক্ষেত্র হলো লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রমহলে। তাদের সকলেরই তিনি সাধারণ দাদা, সদাসর্বদা ঘুরে ঘুরে সকলের খোঁজ নেন, অসুখে-বিসুখে সেবা-শুশ্রূষা থেকে আরম্ভ করে নানা রকম সহায়তা করেন, বলেন কত সুখ-দুঃখের কথা। এদের প্রত্যেকের খবরাখবরের ভারমা হলেন জীবন্ত গেজেট। এবং এদের প্রত্যেকেরই মনে হতে লাগলো ভারমার মতো 'মাই ডিয়ার' দাদা যেখানে আছেন সেটা যেন বিদেশ নয়। দাদার ওপর একান্ত নির্ভর করে এখানে নিশ্চিন্তে থাকা যায়।

ভারমার প্রধান প্রধান শিকার হলো ভারত থেকে সদ্য-আগত আনকোরা নতুন ছাত্রদল, লণ্ডন সম্বন্ধে যাদের চোখ এখনো ফুটবার সময় পায় নি, অথবা স্বদেশী শহরের অভ্যস্ত আলো থেকে বিদেশী শহরের নতুন আলোয় এসে যারা চট করে তাদের চোখ দুটিকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। এদের ভেতর যারা বেপরোয়া, ডানপিটে, সুপরিপক্ক বখাটে, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে সুবিধে হবে না বুঝে তাদের মাথার দিকে ভারমা হাত বাড়াতেন না। তিনি জানতেন, বখাটে ছেলেদের নতুন করে বখিয়ে তাদের মাথায় কাঁটাল ভাঙা শক্ত। সুতরাং নজর দিতে লাগলেন সুশীল সুবোধ সচ্চরিত্র ভালো ছেলেদের দিকে, আর তাদের ভেতর থেকে বেছে নিতে লাগলেন তাদেরই যাদের প্রাণভরে (অর্থাৎ পকেট ভরে) শোষণ করা চলবে। কি করে কত ছলে বড়লোক বাবার কাছ থেকে বেশী টাকা আনা যাবে বাড়তি (!!!) খরচের জন্য, বাবার মনে সন্দেহ না জাগিয়ে, সে বিষয়ে পাকা পরামর্শ দিতেন তাদের! সেই বাড়তি টাকা এলে তা থেকে অনেকটা অংশ কেমন করে দাদা ভারমার পকেটে চলে যেতো তা টেরও পেত না এই দাদা-মুগ্ধ ছেলের দল। এদের ধরিয়ে দিতেন ফ্লার্ট মেয়ের পেছনে ঘোরার নেশা, আর সাকীর সঙ্গে সুরার। মেয়েদের মহলে দাদা ভারমার

যে প্রচুর পসার অর্থাৎ 'পপুলারিটি' এবং প্রভাব অর্থাৎ 'ইনফ্লুয়েন্স', ভারমা সযত্নে তার প্রচুর প্রমাণ দিতেন তাদের লুব্ধ এবং মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে। সুন্দরী তরুণীদের বাঁশবনে ডোমকানা নতুন-লণ্ডন-আসা ধনিপুত্র ভালো ছেলের দল (হায় ভালো ছেলের দল !) হৃদয় হারিয়ে হায় হায় অবস্থায় শরণ নিত দাদা ভারমার। তারা ভাবতো সুন্দরীদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে তাদের হৃদয় জয় করতে হলে দাদার সহায়তাই হচ্ছে সেরা উপায়। ফলে হৃদয়-বিনিময়ের ঘটকালি করে এই ছেলেদের পকেট মেরে ঘটক-বিদায় আদায় করতেন ভারমা। ঋণ নিয়ে শোধ করতে ভুলে যেতেন ; জানতেন শোধ এরা চাইতে পারবে না ! রূপের এবং পানের নেশা ধরিয়ে একাধিক 'ব্রিলিয়াণ্ট' ছেলেকে 'ব্রিলিয়াণ্ট' চরিত্রহীনে পরিণত করতেন ভিনায়ক ভারমা, নিজে চমৎকার কায়দায় আড়ালে থেকে গা বাঁচিয়ে !

এভাবে বছরের পর বছর "ছোট ভাই"দের শোষণ করে করে বেশ ভালো স্টাইলেই লণ্ডনে কাটালেন ভিনায়ক ভারমা। এবং এই দাদাটিরই নেপথ্য প্রভাবের ফলে একাধিক চমৎকার ছেলে চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ দুটোই হারিয়ে ভারতে ফিরে গেল কিন্তু কোনো বদনাম হলো না ভিনায়ক ভারমার। তিনি শেষ পর্যন্ত থেকে গেলেন তেমনি জনপ্রিয় 'মাই ডিয়ার' দাদা। নিজের কাছে তিনি নিজেই প্রমাণ করলেন যে আসল শয়তান হচ্ছে সেই, যে চূড়ান্ত শয়তানী করে গেলেও শয়তান বলে তাকে চিনতে পারে না কেউ, অথবা চিনেও চিনতে পারে না। এমন কি যে সব ছেলের ভবিষ্যৎ তিনি একেবারে ঝরঝরে করে দিলেন, তারাও এই বিশ্বাস নিয়েই দেশে ফিরে গেল যে তাদের এই সর্বনেশে অধঃপতনের জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী। তাদের মনে কোনো নালিশ রইলো না ভিনায়ক ভারমার বিরুদ্ধে।

এ ভাবে কাটলো প্রায় দশটি বছর। এ দশ বছরে উক্ত উপায়ে, তাছাড়া আরো নানা বিচিত্র ভাবে যে উপার্জন করলেন ভিনায়ক ভারমা, তা প্রচুর না হলেও প্রচুরের কাছাকাছি। কিন্তু দশ বছরের শেষেও ব্যাঙ্কে জমলো না বলবার মতো কিছু। এতদিন ধরে এক হাতের আয় অন্য হাতে অকাতরে ব্যয় করেছেন। ডুবে ডুবে অনেক জল পান করেছেন

শ্রীমতী ভারমাকে এতটুকু টের না পাইয়ে ; সেই জলপথে ভেসে গেছে অনেক টাকা।

শ্রীমতী ভারমা যেদিন হঠাৎ মারা গেলেন হার্ট ফেল করে, তার মাস ছয়েক আগেই মেয়ে আইরিন প্রেম করে বিয়ে করে স্বামীর ঘরে চলে গেছে। শ্রীমতী বেঁচে থাকতে তাঁর প্রতি শ্রীযুত ভারমা কোনো আকর্ষণ বোধ করেন নি ; শুধু একটু হয়তো কৃতজ্ঞ ছিলেন লণ্ডনে থাকা-খাওয়াটা তাঁর কল্যাণে নিখরচায় চলছে বলে। এইবার মারা গিয়ে শ্রীমতী ভারমা যেন প্রমাণ করলেন তিনি ছিলেন। হঠাৎ কেমন ফাঁকা-ফাঁকা বোধ করতে লাগলেন ভিনায়ক ভারমা ! এ লণ্ডন যেন আর সে লণ্ডন নেই। মনে হতে লাগলো এতদিন শ্রীমতী তাঁকে যে পরম যত্নে পরম নিশ্চিন্ত আরামে বিনা খরচায় লণ্ডনে রেখেছেন তার বিনিময়ে বলতে গেলে কিছুই তাঁকে তিনি দেন নি, শুধু ভারমা পদবীটুকু ছাড়া।

শ্রীমতীর অতিথি-ভবন পরিচালনার ব্যাপারে ভিনায়ক ভারমা কখনো মাথা ঘামান নি। এখন ভেবে দেখলেন, এ ব্যবসা চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীমতীর জন্য দুঃখে বক্ষ ভরে উঠলো। লিওনোরাহীন লণ্ডন আর ভালো লাগছে না। শুনতে পেলেন ভারতের ডাক। দীর্ঘ দশ বছর পরে মাতৃভূমির আহ্বান।

প্রথমে ভেবেছিলেন, "ভারমা লজ"-এর গুড-উইল বিক্রি করে দিয়ে ফিরে যাবেন ভারতে। কিন্তু ৺লিওনোরার আপন হাতে গড়ে-তোলা প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হৃদয় রাজী হলো না। তাই গুড-উইল্ বিক্রি না করে ভাড়া দিয়ে এলেন ৺লিওনোরার দূর-সম্পর্কীয় এক ইংরেজ-দম্পতির হাতে। শর্ত হলো, তাঁরাই প্রতিষ্ঠানটি চালাবেন, গুড-উইলের ভাড়া বাবদ ভারমার প্রাপ্য টাকা মাসে মাসে জমা করে দেবেন ভিনায়ক ভারমার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্টে। এই ব্যবস্থা করে ভারতে ফিরে এলেন ভারমা।

এই পর্যন্ত এবং এইটুকুই শোনা ছিল অম্লান বাড়রীর মুখে। এবং অম্লান বাড়রী বলেছিলেন ভারমা সম্বন্ধে এটুকু বলা মানে অতি সামান্য

বলা। তারপর ভারমার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হলো তাঁর সুসজ্জিত আলো-উজ্জ্বল হাওয়া-উচ্ছল ড্রয়িং-রুমে। চারদিকের দেওয়ালে হুক্ থেকে ঝুলানো হেলেনের অথবা হেলেন-সংক্রান্ত রঙীন এবং একরঙা ছবি। বিশ্বের সর্বকালের সর্বদেশের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা "হেলেন অভ ট্রয়"—ট্রয়ের হেলেন, যার জন্যে লড়াইতে ট্রয় ধ্বংস হয়েছিলো, আর তাই নিয়ে মহাকাব্য লিখে অমর হয়েছিলেন মহাকবি হোমার।

ভৃত্য বললে, "আপনারা একটু বসুন। সাহেব এখ্খুনি আসছেন।" সোফার পাশে একটা নীচু গোল টেবিলের ওপর সযত্নে ছড়ানো মাসিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকা, সবগুলোই সিনেমা সংক্রান্ত। সপ্তাহ দুয়েক আগের একটা সাপ্তাহিক তুলে নিয়ে তাই থেকে আমায় খানিকটা পড়ালেন অম্লান বাড়রী।

"শ্রীভিনায়ক ভারমা বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীকন্হৈয়ালাল কম্বলওয়ালার প্রযোজনায় ত্রিভাষী চিত্র 'হেলেন অভ ট্রয়' তুলিবার জন্য ভারতে আসিয়াছেন। শ্রীযুত ভারমা তাঁহার দীর্ঘ দশ বৎসর প্রবাসকালে লণ্ডনে ও হলিউডে সিনেমা-সংক্রান্ত অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। 'হেলেন অভ ট্রয়'-এর মূল ইংরাজী চিত্রনাট্য ও সংলাপ শ্রীযুত ভারমা নিজেই সম্পূর্ণ অভিনব আঙ্গিকে রচনা করিয়াছেন। সংলাপের বাংলা ও হিন্দী তর্জমা ভারমা নিজেই করিবেন। প্রত্যেকটি ভূমিকায় অভিনয় করিবেন নূতন অভিনেতা ও অভিনেত্রী। হেলেনের ভূমিকায় কে নামিবেন জানা নাই, এখনো তাহার জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে। সুঠামদেহা সুন্দরী যাঁহারা চিত্র-জগতে নামিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে ইহা সুবর্ণসুযোগ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। ভারতের, তথা সমগ্র সভ্য পৃথিবীর, চিত্রজগতে কম্বলওয়ালা প্রোডাক্শন্সের 'হেলেন অভ ট্রয়' আলোড়ন আনিবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।"...

এর পর আরো ছিল, কিন্তু এসে পড়লেন ভিনায়ক ভারমা। বসলেন আমাদের মুখোমুখি সোফায়। বল্লেন, "নমস্কার ধনপতিবাবু!"

বল্লুম, "নমস্কার। চেনেন নাকি আমাকে?"

"বিলক্ষণ!" বললেন ভারমা। "অম্লানের কাছে শুনেছি যে আপনার কথা। যাক ভালো দিনেই তোমরা এসে পড়েছো অম্লান! অতুল চম্পটী কন্হৈয়ালাল কম্বলওয়ালাকে নিয়ে যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে।"

"অতুল চম্পটীটি কে?" শুধালেম অম্লানকে।

অম্লান বাড়রী কানে কানে বললেন, "দালাল, কিন্তু আমার মতো জীবনবীমার নয়। ফিনান্শিয়ার কম্বলওয়ালাকে উনিই জুটিয়েছেন।"

ভারমাকে বললুম, "আপনার এই ছবির সংগ্রহ দেখছিলুম। চমৎকার!" ভারমা বললেন, "সব ভাড়া করা। এ ফ্ল্যাটটাও কম্বলওয়ালা প্রোডাক্শনের হেলেন ছবির জন্যেই ভাড়া করা। কিন্তু এই হেলেন অভ ট্রয় ছবির প্রথম কল্পনা আমার মনে যিনি জাগিয়েছেন তিনি আর নেই ধনপতি বাবু!"

"তিনি কে?"

"আমার স্ত্রী লিওনোরা," বললেন ভারমা। "হোমারের ইলিয়াড আর অডিসি'র গল্প পড়তে তিনি ভারী ভালবাসতেন। ইউলিসিজের কাহিনী পড়তে পড়তে একদিন হাসির ছলে আমায় বললেন, 'সাদাসিধে স্ত্রী পেনিলোপিকে ছেড়ে ইউলিসিজ যেমন ভ্রমণে বেরিয়ে গিয়েছিলো আমায় ফেলে তুমিও তেমনি বেরিয়ে পড়বে না তো?' আমি বললুম, 'তুমি আমার পেনিলোপি নও লিওনোরা, তুমি আমার হেলেন অভ ট্রয়।' হেলেনকে তার স্বামীর ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস। লিওনোরাকে হরণ করে নিয়ে গেল মৃত্যু। ভেবেছিলুম আমার 'হেলেন অভ ট্রয়' ছবিখানা শেষ হলে লিওনোরাকেই উৎসর্গ করবো। কিন্তু তা আর হবার নয়।"

"কেন নয় দাদা?" শুধালেন অম্লান বাড়রী।

"ম্যান প্রোপোজেস্, গড ডিস্পোজেস্," বললেন দাদা ভারমা। "মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় না অম্লান।" তার পর একটু ভেবে বললেন, "হলে হয় তো দুনিয়ায় টেকা যেত না।" আরেকটু ভেবে আমাকে বললেন,

"ভেবেছিলুম হেলেন পাওয়া শক্ত হবে। কিন্তু শক্ত হলো না। অম্লান সন্ধান দিলে আইডিয়্যাল হেলেনের। প্রজ্ঞাপারমিতা! প্রজ্ঞাপারমিতা! অপরূপ তার নাম। অপরূপ তার মাধুরী। কন্টিনেণ্ট আর আমেরিকায় সুন্দরী অনেক দেখেছি, কিন্তু শুধু সুন্দরী হলেই তো আর হেলেন হওয়া যায় না! প্রজ্ঞাপারমিতাকে দেখে মনে হলো হেলেন হবার মতো এমনটি আর কেউ নেই। প্রজ্ঞাপারমিতাকে মনের সামনে রেখে রচনা করলুম অপরূপ চিত্রনাট্য, হেলেনের জীবনের ট্রাজেডি তাতে অপরূপ মহিমায় ফুটে উঠলো। সে মহিমা পর্দার বুকে ফুটিয়ে তুলতে—হিসেব করে দেখলুম—কমসে কম তিন লাখ টাকা দরকার। টাকা-দেনেওয়ালা জোগাড় করলে অতুল চম্পটী—বাগালে কন্‌হৈয়ালাল কম্বলওয়ালাকে, দশ বিশ লাখ টাকা যার কাছে হাতের ময়লা।"

আমি বললুম, "তারপর?"

ভারমা বল্‌লেন, "ঐ যে বললুমঃ মানুষ যা ঠিক করে ভগবান তা ভেস্তে দেন। শুনুন তাহলে বলি। আমার চিত্রনাট্য পড়ে খুশী হলো প্রজ্ঞাপারমিতা, যখন বিশ্লেষণ করে দিলেম দুঃখিনী হেলেনের চরিত্র। অতুলনীয় রূপ ছিলো হেলেনের জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ। মেনিলাউসের পত্নী তিনি হলেন তাঁর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে নয়, শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে। নইলে কে তাঁকে লাভ করবে তাই নিয়ে হতো মারামারি! মেনিলাউসের অতিথি হয়ে এলেন ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস। মুগ্ধ হলেন হেলেনকে দেখে। হেলেনও মুগ্ধ হলেন অপরূপ সুকুমার পুরুষ প্যারিসকে দেখে। তার সারা দেহ-মন অপূর্ব পুলকে ভরে উঠলো। তবু স্বামী মেনিলাউস আর কন্যা হারমিয়োনির প্রতি কর্তব্য বোধে প্যারিসের প্রেম তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। হৃদয় ভেঙে গেল। তবু নিজের সুখের জন্য স্বামী-কন্যার প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হতে চাইলেন না। প্যারিস তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেলেন ছলে, বলে, কৌশলে। এতে হেলেনের সম্মতি ছিল না; স্বেচ্ছায় তিনি প্রেমিক প্যারিসের সঙ্গে বেরিয়ে যান নি। হেলেনের দুঃখিনী রূপটি অপরূপ করে ফুটিয়ে তুলতে পারবে প্রজ্ঞাপারমিতা, এ বিষয়ে আমার

সন্দেহ রইল না। রাজী হলো প্রজ্ঞাপারমিতা, কিন্তু অদ্ভুত তাঁর শর্ত।"

"কি শর্ত?"

"একটি পয়সা নিতে রাজী হল না প্রজ্ঞাপারমিতা। আমার ত্রিশ হাজার টাকার 'অফার' সে হেলায় প্রত্যাখ্যান করলে। দাবী করলে তার অভিনয়ের বিনিময়ে নয়, উপলক্ষ্যে, কম্বলওয়ালা প্রোডাক্‌শন্‌স্‌ অথবা কন্‌হৈয়ালাল কম্বলওয়ালা ত্রিশ হাজার টাকা দেবে গোলাপডাঙায় নিরালা বাবার আশ্রমের শিশুমঙ্গল ফাণ্ডে। ছবিটির পরিকল্পনা, পরিচালনা, স্টুডিও-র পরিবেশ সব কিছু পুরোপুরি প্রজ্ঞাপারমিতার রুচি মতো হওয়া চাই, তাতে কখনো এতটুকু ত্রুটি হলে তখ্‌খুনি বিদায় নিয়ে চলে যাবার অধিকার তার থাকবে। অর্থাৎ এক কথায় প্রজ্ঞাপারমিতা হবে এ ছবির ডিক্‌টেটর, আমি শুধু ডিরেক্টর মাত্র। জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু প্রজ্ঞাপারমিতার মতো মেয়ে কখনো দেখি নি, দেখবো না। রাজী হয়ে গেলুম তার সমস্ত শর্তে। এদিকে ফিনান্‌শিয়ার কন্‌হৈয়ালাল কম্বলওয়ালাও এক পয়সা দেবে না, যদি না তার মর্জিমাফিক ছবি তোলা হয়। সে-ও চাইলে ছবির ডিক্‌টেটর হ'তে। আমার চিত্রনাট্য ওর পছন্দ হলো না, হুকুম করলে ঢোকাতে হবে অনেক নাচ, গান, দৃশ্য, সিচুয়েশান। সে নিজেই সব বাৎলে দেবে। জোলো নিরামিষ ছবিতে সে তার টাকা মারা যেতে দেবে না। জানতুম ওর মর্জিতে রাজী হবে না প্রজ্ঞাপারমিতা, যাকে নইলে ব্যর্থ হবে আমার হেলেন অভ ট্রয়। অথচ তিন লাখ টাকা নইলে হবে না আমার ছবি, যে টাকা দেবার একমাত্র লোক ঐ কন্‌হৈয়ালাল কম্বলওয়ালা। দোটানায় পড়ে অধীর হয়ে উঠলুম। কি করে সমাধান করি? সমাধান করে দিলে প্রজ্ঞাপারমিতা।"

"কি করে?"

"রূপালী পর্দার সৌভাগ্য হলো না প্রজ্ঞাপারমিতাকে বক্ষে ধারণ করবার। তার আগেই এ জীবনের পর্দা পেরিয়ে ওপারে চলে গেল প্রজ্ঞাপারমিতা।" ব্যথার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভিনায়ক ভারমার বক্ষ থেকে।

"লণ্ডনের লিওনোরা আমায় সাথিহারা একা ফেলে চলে গিয়েছিলো। জীবনে সেই আমার প্রথম মর্মান্তিক আঘাত।" বলতে লাগলেন ভিনায়ক ভারমা। "আর ইণ্ডিয়ার প্রজ্ঞাপারমিতা আমায় হেলেন-হারা করে চলে গেল। জীবনে এই আমার ছু নম্বর মর্মান্তিক আঘাত। লণ্ডনের আঘাতে ইণ্ডিয়ায় ফিরেছিলুম; ইণ্ডিয়ার আঘাতে আবার লণ্ডনে ফিরে যাবো। ইণ্ডিয়ায় আর ভালো লাগছে না। ভারত আমার দেশ। ভালোবাসি এই ভারতকে। দূর থেকেই একে আরো বেশী ভালো লাগবে ধনপতি বাবু! মনে হচ্ছে, এ দেশ বুঝি দূর থেকেই ভালো লাগার দেশ।"

আমি বললুম, "কিন্তু আপনার ছবি? মানে, হেলেন অফ ট্রয়?"

ভিনায়ক ভারমা বললেন, "ছবির পরিকল্পনা ছেড়েই দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু কিছুতেই ছাড়তে দিলে না অতুল চম্পটী।"

"অনেক দিন বাঁচবো হুজুর! স্মরণ করতে করতেই এসে পড়েছি। হেঃ হেঃ হেঃ" বলে মোসাহেবি হাসি হাসতে হাসতে প্রবেশ করলে মিট্‌মিটে চোখওয়ালা ভিজে বেড়াল চেহারার এক ব্যক্তি। তার পর অতি সন্তর্পণে একধারে একটা টুলের ওপর বসে পড়ে বল্‌লে, "ছেড়ে দেবেন কেন হুজুর? শিকার যখন হাতে পাওয়া গেছে তখন শুষে নিতে ছাড়ি কেন? বলে, হরির কৃপায় দশ জনে খায়, আমরাই কেন খাবো না? আমরা ছেড়ে দিলে ফিলিম ওয়ার্ল্ডে কম্বলওয়ালাকে লুফে নেবার লোকের অভাব হবে না। তবে কেন আমরা পেয়ে হারাতে যাই হুজুর? কম্বলওয়ালাকে যখন একবার নেশা ধরিয়েছি, তখন, ঐ যে কথায় বলে, কম্‌লি ছোড়্‌তা নেহি।"

অম্লান বাড়রী হেসে বললে, "বিখ্যাত কালো কারবারী কন্‌হৈয়ালাল কম্বলওয়ালা হবে বাণীচিত্রশিল্পের গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক?"

"আজ্ঞে গুণোগার-টুনোগার কিছু নয়। সোজা কথায় দিল্ খুলে কিছু ফুর্তি লুটতে চায়; ফিলিম্ তোলাটা একটা অজুহাত। কোনো সৎকর্মে বলুন, একটি পয়সা ছোঁয়াবে না। ফুর্তি ওড়াবার রাস্তা বাৎলে দিন, ছু'চার লাখ টাকা খোলামকুচির মতো ছু হাতে ছড়িয়ে দেবে। ফিলিম

গোল্লায় যাক্, ফিল্মিের শুটিংগুলো হলেই হলো, আর তাতে—বুঝছেনই তো সব। মিছে আর খুঁটিয়ে বলা কেন?"

"কিন্তু কম্বলওয়ালার তো তোমার সঙ্গে আসবার কথা ছিলো চম্পটী?" বললেন ভারমা।

"আজ্ঞে, গাড়ীতেও উঠেছিলুম।" বললে চম্পটী। "ড্রাইভারের পাশে। নেমে পড়তে হলো। আমার সীটে উঠে বসে' কম্বলওয়ালা আমায় বললেন ট্রামে-বাসে চলে আসতে। উনি ওর গিন্নীকে কোন আত্মীয়বাড়ী নামিয়ে দিয়ে আসবেন। গিন্নী পেছনের সীটে বসলে সেখানে ওর আর বসবার জায়গা থাকে না কিনা।"

"বলো কি চম্পটী? কম্বলওয়ালার গিন্নী এম্নি—"

"সাড়ে তিন মণ হুজুর! আর একবার চেপে বসলে সহজে উঠতে পারেন না। বালিকা বয়স থেকে বরাবর গায়ে-গতরে একটু ভারী কিনা! শেঠজীকে কাল রাত্তিরে ফরাসী আর বাগদাদী মেমসাহেবদের কাবারে নাচ দেখিয়ে এনেছি হুজুর, পেলিটির হোটেলে। ফিন্‌ফিনে পাতলা সোনালি কাঁচুলি আর সরু সোনালী ফিতের জাঙিয়া পরে' মেমসাহেবদের সে কি নাচ! যেমনি হাল্কা নিটোল পুরুষ্টু গড়ন, তেমনি অঙ্গ তো নয়, যেন কাঁচা সোনা। তার ওপর রঙীন চোখে নেশা-ধরানো আলো, আর মিহি ব্যায়লা, পিয়োনো, বাঁশী বাজছে নাচের আড়ালে আড়ালে! দেখে শেঠজী তো একেবারে ক্ষেপে উঠেছে হুজুর! তার ওপর আরো অনেক দাওয়াই দিয়েছি মোক্ষম। ভালুকের নাকের দড়িটি হাতে পেয়েছি, এই দড়ির টানে তাকে খুশীমতো নাচানো যাবে।"

ভারমা বললেন, "এ জীবনে অনেককে নাচিয়েছি, অনেককে বখিয়েছি চম্পটী, আর নাচাতে ভালো লাগে না।"

"এ অধীনের ওপর ছেড়ে দিন হুজুর! অধীন যা করবে আপনি শুধু তাতে পুরো মনে সায় দিয়ে যাবেন।" বললে চম্পটী। "ওর প্রাণের গোপন কথা সব আমার এই নখের ডগায় ডগায় তুলে নিয়েছি।"

বাইরে গাড়ী দাঁড়াবার আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরে প্রবেশ

করলেন শেঠ কন্‌হৈয়ালাল কম্বলওয়ালা। অপ্রশস্ত বক্ষ, সুপ্রশস্ত ভুঁড়ি! শেষোক্তটির ভারে দেহ টলমলায়মান।

"আইয়ে আইয়ে শেঠজী! আপনার কথাই হচ্ছিল। এ আপনার হিট্ ছবি হবেই। আপনার সন্তানের গা ছুঁয়ে বলতে পারি।" বললে চম্পটী।

"সন্তান উন্তান হমার কোই না আছে চম্পটী বাবু।" বললেন শেঠজী। তারপর সবাইকে নমস্তে করে ভারমার আহ্বানে তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন। ভারমাকে বললেন, "আপনি ভাবছেন কেনো ভারমাজী? এক প্রগারমিতা গিয়েছে, আউর কতো প্রগারমিতা মিলবে। উস্‌মে ক্যা?"

"ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?" বল্‌লে অতুল চম্পটী।

"কিন্তু কৌয়া তো হামার চাহি না চম্পটী বাবু।" বললেন শেঠ কম্বলওয়ালা। "হামার চাহি কোয়েল, হামার চাহি মোর।" তাই তো। কাক চান না শেঠজী, চান কোকিল, চান ময়ূর! আমাদের পানে একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন শেঠজী। আমাদের দেখেন নি আগে।

তাঁকে আশ্বস্ত করে ভারমা বল্‌লেন, "এরা সবাই আমার গেলাসের দোস্ত।" বলে সুরাপানের ঈঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলেন। অর্থাৎ আমাদের সামনে দিল্ খুলতে কোনো বাধা নেই।

"আরে রাম রাম! মদ মান্‌স্ তো হামি ছোঁবে না ভারমাজী!"

"না না, এখানে মদ মাংস আসবে না। ভয় নেই আপনার। আজ শুধু আপনার পরামর্শমতো সিনারিও বদ্‌লানো হবে।"

"রাম কহো।" পরম বিনয়ে শেঠজী বললেন। "সিনারিও তো পুরা আপনারই থাক্‌বে। আমি স্রেফ দো চার চিজ ইধার উধার ঘুসিয়ে দিব।" চারদিকের দেয়ালে শোভিত ছবিগুলির দিকে চেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন কম্বলওয়ালা। ছবিগুলি বুঝিয়ে দেওয়া হলো তাকে। "প্যারিস্ কর্তৃক হেলেন হরণ" ছবিটিতে হেলেন প্রায় আপাদমস্তক নিরাবরণ, বোধ করি তাড়াতাড়িতে দেহাবরণ সংগ্রহ করতে পারেন নি। দেখে মুগ্ধ হলেন শেঠজী।

"প্যারিসের বিচার" ছবিটিতে বিচারক প্যারিসের সামনে দাঁড়িয়ে

আছেন তিন দেবী—জুনো, ভিনাস আর মিনার্ভা। প্যারিস বিচার করে দেবে তিনের মধ্যে কে বেশী সুন্দরী। তিন জন দেবীই সম্পূর্ণ অনাবৃতদেহা। দেখে আরো মুগ্ধ হলেন শেঠ কম্বলওয়ালা। বিশ্রী কালো মুখে খুশীর আলো খেলে গেল, বোধ করি গত রাত্রির "ফরাসী আর বাগদাদী" মেমসাহেবদের নৃত্যের উষ্ণ স্মৃতি মনে করে'। বললেন এই দৃশ্যগুলো এই ছবির মতন করেই ফিলমে তুলতে হবে।

"এক ফোঁটা কাপড় থাকবে না গায়ে? এ কি সেন্সর অ্যালাউ করবে?" বললে অম্লান বাড়রী। "কেটে দেবে না?"

"ই সব ছবিতে চলতে পারে, আউর ফিলিমে কেনো চলবে না?" বললেন কম্বলওয়ালা।

অতুল চম্পটী বললে, "শেয়ালে আখ খাবে বলে কি আখের চাষ করবো না বাড়রী মশাই? সেন্সর কি কাটবে সে হলো পরের কথা। তার আগে শেঠজীর মনের মতো করে ছবি তুলতে আটকাচ্ছে কে? শুধু এই এস্‌পেশ্যাল্‌ সিন্‌গুলো ভাড়াটে স্টুডিয়োতে না তুলে আপনার বাগান-বাড়ীতে তুললে কেমন হয় শেঠজী? দিব্যি নিরালায় নির্ঝঞ্ঝাটে তোলা যাবে, আপনিও সারাক্ষণ নিজে দেখা-শোনা করতে পারবেন।" কানে কানে বললে "কাল রাতের নাচের চাইতেও ভালো করে।"

খুশী হয়ে কম্বলওয়ালা বললেন, "সো আপনাদের যেমোন সুবিধা হোবে। হামার কোই আপত্তি না আছে।"

"তবে তাই ঠিক হলো। কি বলেন হুজুর?" বললে অতুল চম্পটী। "তারপর সেন্সর যদি কাঁচিকাটা করে তখন না হয় এই সিনগুলো নতুন করে সেন্সরের খুশীমতো আবার স্টুডিয়োতে তোলা যাবে, কি বলেন শেঠজী?"

"এ বাত তো ঠিক আছে," বললেন কন্‌হৈয়ালাল কম্বলওয়ালা।

"এ সব স্পেশাল সিনের জন্যে স্পেশাল রেট দিতে হবে শেঠজী। আর আগাম দিতে হবে," বললে চম্পটী। "কি বলেন হুজুর?"

"সে হামি দিব।" বললেন কম্বলওয়ালা। আর্টের কল্যাণে টাকা খরচা করতে পিছপা নন আর্ট-ভক্ত কম্বলওয়ালা।

ভারমা, চম্পটী ও কম্বলওয়ালার বুদ্ধি যুক্ত হয়ে ভারমা-রচিত মূল চিত্রনাট্য পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হলো। ঠিক হলো, ছবি শুরু হতেই দেখা যাবে হেলেন তাঁর স্বামী মেনিলাউসের প্রাসাদে শাওয়ারবাথের তলায় স্নানরতা এবং গানরতা। এই স্নান আর গান বেশ কিছুক্ষণ চলবে, দর্শকদের এই দৃশ্যে বুঝিয়ে দিতে হবে হেলেন সত্যি সত্যি আপাদমস্তক সুন্দরী। কোনো ফাঁকি নেই। এর পর পুকুরের জলে হেলেন আর প্যারিসকে একসঙ্গে সাঁতার কাটতে কাটতে দ্বৈতসঙ্গীত গাওয়াতে হবে। ফ্ল্যাশব্যাকে অতীতে চলে গিয়ে দেখাতে হবে তিনটি অনাবৃতা দেবীর মধ্যে প্রেমের দেবী ভিনাসকেই প্যারিস শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে রায় দিচ্ছেন, তাইতে খুশী হয়ে ভিনাস তাঁকে বর দিচ্ছেন সুন্দরীর সেরা হেলেনকে সে পাবে। মাঝে মাঝে—এটি পৃথিবীর সিনেমার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস—ফ্ল্যাশব্যাকের উলটো “ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড” করে পর্দার বুকে দেখাতে হবে মিশরের রাণী সুন্দরী ক্লিওপ্যাটরাকে ; কৌশলে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে হবে ক্লিওপ্যাটরাই অতীতে হেলেন ছিল। অবশ্য ক্লিওপ্যাটরার রূপ এবং রূপসজ্জা হেলেনের চাইতে অন্য রকম দেখাতে হবে। ক্লিওপ্যাটরার তিন রকম স্নানের দৃশ্য দেখাতে হবে—শাওয়ার বাথে, বাথ-টাবে এবং নদীতে। আর দ্বৈতসঙ্গীতও তাকে গাওয়াতে হবে তার বিভিন্ন প্রেমিকের সঙ্গে।

প্যারিস কর্তৃক হেলেন-হরণের দৃশ্য দেখাবার পরই ক্যামেরার মুখ ঘুরিয়ে দিতে হবে ভারতের দিকে। দেখাতে হবে রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণ। হেলেন-উদ্ধারের জন্য ট্রয়ের লড়াই দেখাবার ফাঁকে ফাঁকে দেখানো হবে সীতা-উদ্ধারে জন্য লঙ্কার লড়াই। ওদিকে হেলেন-হারা মেনিলাউসের হাহাকার দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এদিকে সীতা-হারা রামচন্দ্রের বেদনাও দেখাতে হবে। বাণীচিত্র শিল্পে এ-ও এক অভিনব আঙ্গিক, ‘ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড’-এর মতো এর জন্যেও একটা নাম পরে ভেবে ঠিক করা যাবে’খন। এতে দেখানো হবে পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের মধ্যে ভূগোলের ব্যবধান থাকলেও এরা একই আনন্দ-বেদনার সুরে বাঁধা।

হেলেনের ছুটি নাচ দিতে হবে। একটি তার হরণের আগে, একটি

হরণের পরে প্যারিসের প্রাসাদে। হেলেনের একদল সখী থাকবে—কমপক্ষে জনা দশেক। এরা দল বেঁধে বিভিন্ন অজুহাতে অন্তত বার পাঁচেক নাচবে, পেলিটি হোটেলের নৈশ 'কাবারে' নর্তকীদের মতো। (হোটেলে চললে পর্দায় চলবে না কেন ?—প্রশ্ন কম্বলওয়ালার।)

ট্রয়-বিজয়ের পর মুক্ত তরবারি দিয়ে কলংকিনী হেলেনের মুক্ত বক্ষে আঘাত হানতে উদ্যত হয়েও মেনিলাউস অসি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হেলেনকে বক্ষে ধারণ করবেন। এইখানে মেনিলাউস ও হেলেনের একটি দ্বৈতসংগীত।

উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে অতুল চম্পটী বললে, "অ্যায়সা ফিলিম হলিউডের বাবাও তুলতে পারবে না। তামাম দুনিয়ায় আপনার এ ফিলিম হৈহৈ জাগিয়ে দেবে, বিলকুল শোরগুল মচা দেগা শেঠজী।" পুলকের আতিশয্যে ক্ষুদে ক্ষুদে দু'চোখ টিপে টিপে হাসিমুখে হিন্দী বলে ফেললে চম্পটী।

"হালিউডের বেদিং বিউটি তো হামি দেখিয়েছে," বল্‌লেন, কম্বলওয়ালা। "বেদিং বিউটি-কে বিলকুল ভেড়া বানিয়ে দিবে হামার হেলিন আফ ট্রায়। হাঁ। হালিউডকে হামি দেখিয়ে লিব। আভি রামজীকি ঔর ভারমাজীকি কিরপা।"

"হাঁ হাঁ। রামজী আর হনুমানজীর কৃপা তো আপনার ওপর আছেই শেঠজী! ভারমাজীও রইলেন।" বললে অতুল চম্পটী। "কিন্তু ঐ স্পেশ্যাল সিনগুলো—ঐ যে বলেছি—প্রাইভেট্‌লি তোলা হবে আপনার বাগান-বাড়ীতে। আর আপনি নিজে সর্বক্ষণ হাজির থাকবেন। এটুকু কষ্ট আপনাকে করতেই হবে শেঠজী!"

এ কষ্ট সইতে আগেই একবার রাজী হয়েছিলেন শেঠজী। এবারে আবার রাজী হয়ে বল্‌লেন, "হাঁ হাঁ, সে হামি কোরবে।" তারপর কি যেন ভেবে হঠাৎ শেঠজী বলে উঠলেন, "হাঁ, আউর এক বাত ভারমাজী! এক দফা ইন্দার সাভা ভি দিখাইয়ে দিবেন। ইন্দার সাভায় নাচবে উর্‌বাসি, মেন্‌কা, রাম্ভা, তিলোৎমা ঔর ঘির্‌তাচী।"—নাচাধিক্যে অধীর হয়ে ভারমা বললেন, "আবার নাচ ? আর ইন্দ্রের সভাই বা ঢোকাবো কোন ছুতোয় ?"

"ইস্‌মে মুস্‌কিল ক্যা ?" বললেন কম্বলওয়ালা। "উধার পেরিস। ইধার ইন্দরজী। উধার তিন সুন্দরী জুনো, মিনরবা ঔর, ঔর ক্যা চম্পটী বাবু ?"

"ভিনাস।"

"হাঁ হাঁ, বিনস্‌।" বল্‌লেন শেঠজী। "ইন্দার সাভায় পাঁচ সুন্দরী নাচবে। উধার ভি পেরিসের সামনে তিন সুন্দরীকে নাচিয়ে দিন। যো সুন্দরী সবসে বঢ়িয়া নাচবে ওর পহেলা প্রাইজ মিলবে। কেমন পছন্দ হচ্ছে আপনাদের ?"

চম্পটী বল্‌লে, "চমৎকার! চমৎকার! আপনি নোট করে নিন হুজুর।"

চিত্রনাট্যের খস্‌ড়ার ওপর খস্‌ খস্‌ করে নোট করে নিলেন ভিনায়ক ভারমা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন কম্বলওয়ালা। চিত্রনাট্য কম্‌প্লিট। একটা বড় কাজ হয়ে গেল।

"একবার তাহলে আমায় হনলুলু যেতে হবে শেঠজী!" বললেন ভারমা। "কিছু নগদ টাকা সঙ্গে নিয়ে।"

"হনলুলু ?" বললেন শেঠজী। "হাঁ হাঁ, হনলুলুর নাম হামি শুনিয়েছে। হনলুলুর হুলা নাচ বহুৎ বঢ়িয়া আছে।"

চোখ টিপে চম্পটী বললে, "নাচের চাইতে যারা নাচে, তারা ঢের বেশী বঢ়িয়া শেঠজী। আর আমাদের মেয়েদের মত ওদের অতো ঢাকাঢুকির বালাই নেই। কোমরে পৈতে জড়িয়ে তা থেকে সরু সরু ঘাসের ফালি পাৎলা করে ঝুলিয়ে রাখে, ব্যাস্‌। স্রেফ ঐ।"

"ব্যাস্‌ ?" চোখ বড় হয়ে উঠলো শেঠজীর।

"ব্যাস্‌।" বললে অতুল চম্পটী। "হুজুর অ্যাল্‌বাম থেকে শেঠজীকে দেখিয়ে দিন না হনলুলুর হুলা নাচের ছবিগুলো।"

অ্যাল্‌বামের ছবিগুলো দু' চোখ ফুলিয়ে শেঠজী গিল্‌তে লাগলেন প্রাণপণে, দু' চোখ যেন যথেষ্ট নয়। পরে একান্ত অনিচ্ছায় অ্যালবাম ফেরৎ দিয়ে বললেন, "হেলেন অফ ট্রয়"-এর প্রযোজক হিসেবে পরিচালক ভারমার

সঙ্গে তিনিও হনলুলু যাবেন। অনেক করে তাঁকে নিরস্ত করলেন ভারমা। ঠিক হলো ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে ভারমা রওনা হয়ে যাবেন হনলুলু। সেখান থেকে বাছাই করে বিশ জন নিখুঁত হাওয়াইয়ান সুন্দরী নিয়ে আসবেন। জুনো, ভিনাস, মিনার্ভা, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা আর উর্বশীর নাচগুলোতে এরা নির্ঘাত বাজীমাত করবে। আর এদের ভেতর সেরা সুন্দরীকে নামাতে হবে হেলেনের ভূমিকায়। কথা আর গানগুলোকে প্লে-ব্যাক করালেই চলবে। শেঠজীকে ভরসা দিলেন ভারমা, যে সুন্দরীদের আগাম বায়না দিয়ে আমদানী করে আনবেন হনলুলু থেকে, তাদের কাছে অ্যালবামের সুন্দরীরা নিতান্ত ছেলেমানুষ। শেঠজী খুশী হয়ে বিদায় নিলেন, বললেন, আজই ভারমাজীকে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা নিজে দিয়ে যাবেন।

অম্লান বললে, "এ যে বিশ্বাস হয় না দাদা! মেঘ না চাইতেই জল বেরোবে এই ঝানু কম্বলওয়ালার পাথুরে হাত থেকে!"

"পাথরের বুকে রসের সাগর একবার কায়দা মতো উথলে দিতে পারলেই জল বেরোয় স্যার!" বললে চম্পটী। "যেমন দেবতার যেমন দাওয়াই। আর হুজুর যে কি হিপনোটিজমই করেছেন ওকে! যদি বলেন আকাশের চাঁদ ধরে এনে দেবেন, তাই ও বিশ্বেস করবে। তা ছাড়া আবলুশ-কালো সাড়ে তিন মণ নিয়ে ঘর করে করে তো জীবন কাবার করে আনলে, টাকার পাহাড়েও স্যাঁতলা পড়ছে। অ্যাদ্দিনের শুকিয়ে-থাকা জীবনটা খতম হয়ে যাবার আগে প্রাণ ভরে ফূর্তি লুটে নিতে চায়। এ অবস্থায় শুধু কম্বলওয়ালা নয়, আরো অনেকেরই এমন হয়। নইলে আমরাই বা করে খাবো কি করে? হেঃ হেঃ হেঃ।"

তারপর বল্‌লে, "ফূর্তির জন্যে লাখ লাখ ওড়াতে এখন পরোয়া করবে না। এ তো বলেইছি। গুরুদেব ঠাকুর বলে গেছেন, কত ধন যায় রাজমহিষীর এক প্রহরের আমোদে। আর আমাদের কম্বলওয়ালা তো রীতিমতো রাজমহিষ। স্বচক্ষেই তো দেখলেন? আর ঐ যে আগেই বলেছি, ওর এই ফিলিম করা মানে নল্‌চে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়া।" বলে চম্পটী আবার হাসলে "হেঃ হেঃ হেঃ।"

এর পর সন্ধ্যেবেলা ভারমার সঙ্গে দেখা হলো লেকের জলের ধারে বেড়াতে বেড়াতে। বললেন, "শীগগিরই এমনি ক'রে বেড়াবো টেম্‌স্ নদীর ধারে, ধনপতি বাবু!"

"শীগগিরই? তাহলে হেলেন অভ ট্রয়?"

"তুলবে তারিণী তরফদার। নামী ডিরেক্টর নয়। খান তিনেক ফ্লপ ছবি তুলেছে; কিন্তু পার্টস্ আছে লোকটার। টাকার অভাবেই মার খেয়েছে। তারিণীকেই চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছি। কম্বলওয়ালা তারিণীকে জানে আমার অ্যাসিস্‌ট্যান্ট বলে। এখনো জানে না আমি চলে যাচ্ছি আমার আসনে তারিণীকে বসিয়ে। আমার চিত্রনাট্য নিয়ে তারিণী যদি ছবি করে তো হিট ছবি হবে বলেই আমার বিশ্বাস।"

"আপনি সরে পড়লে কম্বলওয়ালাও কেটে পড়বে না কি?"

"কেটে পড়বার মতো অবস্থা তার আর নেই ধনপতি বাবু।"

"আর হনলুলু?"

"কালই রওনা হচ্ছি। কিন্তু হাওয়াইয়ান সুন্দরী আমদানীর জন্যে নয়, হাওয়াই দেখে লণ্ডন ফিরে যাবো বলে। ত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছিলো কম্বলওয়ালা। সে টাকা আমি গোলাপডাঙায় শিশুমঙ্গল ফাণ্ডে দিয়েছি, প্রজ্ঞাপারমিতার ইচ্ছা অনুযায়ী। হনলুলু গিয়ে বিদায়ী চিঠিতে কম্বল-ওয়ালাকে বুঝিয়ে লিখে দেবো। কম্বলওয়ালা বুঝবে আশা করি। না বুঝলেও ক্ষতি নেই। তাছাড়া ত্রিশ হাজার টাকা কিছু নয় কম্বলওয়ালার কাছে। হয়তো থাকতুম, হয়তো হেলেন অভ ট্রয় ছবি নিজেই ডিরেক্ট্ করতুম, হয়তো কম্বলওয়ালার মাথায় অনেক কাঁটাল ভাঙতুম। কিন্তু আমায় একেবারে বদলে দিয়ে গেছে প্রজ্ঞাপারমিতা।"

★

৺প্রজ্ঞাপারমিতার জীবন-নাটকে সিকি শতাব্দীও পুরো হবে না, তার আগেই যবনিকা পতন ঘটবে, এ কথা কে জান্‌তো ?

এ পাড়ার অনাথ রায়চৌধুরী আর সংঘমিত্রা দেবীর একমাত্র কন্যা ছিল প্রজ্ঞা। এখন বেঁচে রইল একমাত্র পুত্র বোধিসত্ত্ব, ৺প্রজ্ঞার ছোট ভাই।

রোগ-শয়ন বেশী দিন করে নি ৺প্রজ্ঞাপারমিতা। ভোগে নি বেশী, ভোগায় নি বেশী। রায়চৌধুরী বাড়ীর বেশী পয়সা চালান করায় নি ডাক্তারের পকেটে আর ওষুধের দোকানে।

কিছুদিন হলো এসেছি এ পাড়ায় ; সুযোগ করে দিয়েছে বীমা-দালাল অম্লান বাড়রী। এ পাড়ায় তার পাতানো মা, মাসী, পিসী, দিদি, দাদা, খুড়ো, মামা, ছোট ভাই ইত্যাদির অভাব নেই ; এ পাড়ার অসংখ্য বাড়ী অম্লান বাড়রীর জন্যে অবারিত-দ্বার। জীবন-বীমার দালালও যে এমন জনপ্রিয় হতে পারে, অম্লান বাড়রীকে না দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত। বীমা-দালাল বিদায় করা মানেই আপদ বিদায় করা, এই বরাবর জেনে এসেছি ; অম্লানের বেলায় দেখি সে যে বাড়ীতে যায় সেখানেই সাদর আহ্বান শোনা যায় 'এসো এসো অম্লান,' 'আসুন অম্লান দা' অথবা 'এসো হে বাড়রী।'

অম্লান বল্‌লে, "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে ? একথা মাইকেল লিখে গেছেন, আপনিও জানেন, আমিও জানি। প্রজ্ঞাপারমিতা এসেছিলো, চলে গেছে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আপনিও যাবেন ; আমিও যাবো। কিন্তু আর ক'টা দিন সবুর করে দশ দশ হাজার টাকার কেস্‌ দুটো করিয়ে দিয়ে গেলে কি ওর লোকসানটা হতো ?"

বললাম "প্রজ্ঞাপারমিতা কি আপনার হয়ে জীবন-বীমার দালালিও করতেন নাকি ?"

জিভে কামড় দিয়ে অম্লান বল্‌লে, "ছি ছি, প্রজ্ঞা যাবে দালালি করতে, আর আমি ওকে দিয়ে দালালি করাবো ? তাহলে গোড়া থেকে বলি শুন্থন। কলেজে প্রজ্ঞার সহপাঠী ছিলো মহানন্দ মজুমদার আর ভাস্কর ভট্টাচার্যি। বাপের ব্যাংক-ব্যালান্স গ্যালপিং থাইসিসের মতো হু হু করে বাড়ছে তুজনেরি। তুজনে একই সঙ্গে প্রজ্ঞাপারমিতার এক বছর উঁচুতে পড়তো, প্রজ্ঞার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়বার জন্যে তুজনে একই সঙ্গে এক বছর লোকসান করলে। তা একটা বছর কি আর এমন বেশী ? বিদ্যাপতি বলেছেন—লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল। লাখ লাখ যুগের তুলনায় এক বছর তো ছেলেমানুষ। এই ভাস্কর আর এই মহানন্দর আমার হাতে দশ দশ হাজার টাকার বীমা করিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছিলো প্রজ্ঞা ; প্রজ্ঞার মুখের একটি কথায় ওরা তুজনে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যেতো। কিন্তু ঐ কথাটুকু ওদের বলবার আগেই প্রজ্ঞা চিরদিনের জন্যে চলে গেল হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে অসুখে পড়ে। প্রজ্ঞা বেঁচে থাকলে ওর মুখের কথায় আরো অনেক মক্কেল পাকড়াতে পারতুম। কিন্তু সব প্ল্যান ভেস্তে গেল। একেই বলে পাথর-চাপা কপাল ধনুদা।"

আমি ভরসা দিয়ে বললুম, "হতাশ হবেন না অম্লানবাবু। পুরুষ সিংহের উদ্যোগের ধাক্কায় কপাল-চাপা পাথরও বোঁটা-ছেঁড়া আপেলের মতো খসে পড়ে।"

বাড়রী বললে, "হতাশ আমি হই নি ধনুদা। জীবন-বীমার দালালকে কখনো হতাশ বা সেন্টিমেন্ট্যাল হলে চলে ? প্রজ্ঞা চলে গেছে তাতে ব্যথা পেয়েছি, কিন্তু অভিভূত হই নি। ওর শেষ ইচ্ছা ছিল মহানন্দ আর ভাস্কর আমাকে দিয়ে অন্তত দশ হাজার ক'রে জীবন-বীমা করায়। এ ইচ্ছা তার যেন অপূর্ণ না থাকে এ আমাকে দেখতেই হবে। অন্ততঃ চেষ্টা আমাকে করতেই হবে—সাক্ষী থাকবেন আপনি। চলুন তুজনের কাছেই যাওয়া যাক ধনুদা।"

আমি বললুম, চলুন।"

অম্লান বাড়রীর সঙ্গে যেতে হলো মহানন্দ মজুমদারের কাছে। গিয়ে

দেখি মহানন্দের চোখে উদাস ভাব, পায়ে বেডরুম স্লিপার। আমরা ঘরে ঢুকতেই মাথা হেলিয়ে সে আমাদের ইসারায় বললে সোফার ওপর আসন গ্রহণ করতে। করলুম আসন গ্রহণ।

মহানন্দ আমরা আসবার একটু আগেই হয়তো উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবারে ওপাশে আমাদের মুখোমুখি একটা সোফার ওপরে গা ছেড়ে দিয়ে অর্ধশায়িত হলো।

সিগারেটটা পাশের টেবিলের অ্যাশ্-ট্রের ওপর হাত বাড়িয়ে রেখে বললে, "পৃথিবীর অর্ধেক আলো নিভে গেল অম্লানবাবু। চাঁদের হাসি বাসি হয়ে গেল। পাখীর গান শুনলে মনে হয় বেটারা রেডিয়োতে খেয়াল গাইছে।"

"শেষ সময় পর্যন্ত লক্ষ্য করেছি" অম্লান বাড়রী অম্লান বদনে বললে, "আপনার প্রতি ওর একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিলো। সে যে কি অতুলনীয়, কি অনির্বচনীয়, কি স্বর্গীয়, তা আপনাকে আমি বোঝাবো কি করে মহানন্দবাবু?"

উদাসভাবে মাথা নেড়ে মহানন্দ বললে, "পারবেন না। অসম্ভব।" তারপর একটু থেমে বললেন, "শেষ বিদায়ের ক্ষণে আপনি ছিলেন কাছে?"

অম্লান বললে, "থাকতে হয়েছিলো।"

মহানন্দ বললে, "আপনি সৌভাগ্যবান।···অথবা হয় তো দুর্ভাগ্যবান বস্‌রাই গোলাপের পাপড়ি ধীরে ধীরে চোখের সামনে ধুলোয় মিশিয়ে যাচ্ছে, সে-দৃশ্য তিল তিল করে চোখে দেখা! ওঃ! সে আমি সইতাম কি করে?"

অম্লান বাড়রী ছলছল স্বরে বললে, "পারতেন না সইতে। পারবেন যে না, তা প্রজ্ঞা দেবীও বুঝেছিলেন। তাই আপনার নাম করেছেন কতবার, কিন্তু আপনাকে কাছে আনাবার কথা উঠলেই মানা করেছেন। শুধু খোঁজ নিয়েছেন আপনি কেমন আছেন; পড়াশুনো কেমন হচ্ছে—এই সব।"

শুনে মহানন্দের চোখে মুখে মহা আনন্দের ভাব ফুটে উঠলো। সে বললে, "ভাস্কর সম্বন্ধে কিছু?"

অম্লান বাড়রী বললে, "ভাস্করের নাম একটিবারের তরেও মুখে আনেন নি প্রজ্ঞাপারমিতা।"

"অথচ ভাস্কর···ওঃ! আই পিটি মাই পুয়োর ফ্রেণ্ড।" বললে মহানন্দ। "ভাস্করকে কিন্তু এ কথা একটিবারও বলবেন না। তার ভুলের স্বর্গ আস্তই থাকুক। লেট দি পুয়োর বয় এন্‌জয় হিজ্‌ ফুল্‌স্‌ প্যারাডাইজ্‌।"

থিয়েটারী ভঙ্গীতে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা কইছিল মহানন্দ। বেশ লাগছিল শুনতে। ভাবলাম, বাংলা কথার সঙ্গে ইংরেজী বুলি এসে জুটেছে; নেশাটা জমেছে ভালো।

"কিন্তু ভাস্করের প্রেমে এতটুকু ভেজাল নেই, তার প্রেম নির্জলা খাঁটি, এক্‌শা নাম্বার ওয়ান্‌, এ কথা আমি বুক চাপড়ে বলবো।" বললে মহানন্দ; যেন আয়েষার মহাপ্রস্থানের পর জগৎসিংহ প্রেমের সার্টিফিকেট দিচ্ছে ওস্‌মানকে, অথবা ওস্‌মান জগৎসিংকে।

এদিকে অম্লান বাড়রীর পকেটে জীবন-বীমার ছাপানো আবেদন-পত্রখানা আগুনের শিখার মতো মাথা উঁচু করে রয়েছে।

মহানন্দ বলতে লাগলো, "প্রজ্ঞা বেঁচে থাকলে ভাস্করের এ ভুল এক দিন ভেঙে যেতোই। ভুল ভাঙার সে ব্যথা সইতে পারতো না ভাস্কর। মরে যেতো, নির্ঘাত মরে যেতো। প্রজ্ঞা চলে গিয়ে ভাস্করকে বাঁচিয়ে রেখে গেছে। এই কল্পনা বুকে নিয়ে বাঁচবে ভাস্কর যে, প্রজ্ঞা তাকে ভালোবেসে-ছিল। তাই বাঁচুক।" বলে হাতের সিগারেটে মুখ লাগিয়ে একটা জোর টান দিল মহানন্দ।

এতক্ষণে আমার দিকে দৃষ্টিপাত হলো মহানন্দের। সপ্রশ্ন কৌতূহলী নীরব দৃষ্টি।

অম্লান বাড়রী বললে, "আমাদের ধনুদা। এরই নাম ধনপতি···"

মহানন্দ বললে, "আপনাকে এতক্ষণ খেয়ালই করিনি, কিছু মনে করবেন না। কি অসীম ব্যথায় যে আত্মহারা হয়ে আছি, অম্লানবাবু হয়তো আপনাকে তার কিছু আভাস দিতে পারবেন।···সিগারেট চলে?"

মাথা নেড়ে মানা করলাম।

মহানন্দ বললে, "আজ মনে হচ্ছে আখেরে গিয়ে সব সমান। গোল্ড ফ্লেক, মার্‌কোভিচ, প্লেয়ার্স, ক্যাপস্ট্যান্‌, থ্রী কাস্‌ল্‌স্‌, লাকি স্ট্রাইক্‌, ক্যামেল, ক্র্যাভেন্‌-এ—শেষ পর্যন্ত সবই ধোঁয়া হয়ে যায়।"

অম্লান বাড়রী বললে, "গোল্ড ফ্লেকও ধোঁয়া হবে, আর বাঁদর মার্কা বিড়িও ধোঁয়া হবে, কিন্তু ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তফাত হবে বই কি মহানন্দবাবু।"

যেন অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া কথা হঠাৎ মনে পড়ে মহানন্দ বললে, "কিন্তু কেন এসেছেন অম্লানবাবু, সে কথা এখনো তো বলেননি।"

"এসেছি প্রজ্ঞা দেবীর শেষ অনুরোধটুকু রাখতে।" বললে অম্লান বাড়রী। "বয়সে ছোট হলেও প্রজ্ঞাপারমিতা আমার দিদি। তাঁকে হারিয়ে আমি দিদিহারা হয়েছি। তাঁর শেষ অনুরোধ, তাঁর শেষ কথাগুলো—যা তাঁর বলা হয়নি—তাঁর হয়ে আমি যেন আপনাকে বলে যাই। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম, মহানন্দবাবু। আর সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্যেই আজ আমি এসেছি।"

মহানন্দ বললে, "শেষ কথাগুলো? হায় রে শেষ কথা!" বলে জড়িয়ে জড়িয়ে আবৃত্তি শুরু করল:

"হায় রে হৃদয়!
শেষ কথা কখনো কি শেষ হয়?
মুখ থেকে শেষ হয়ে মনের দুধারে
গুঞ্জরিয়া ফেরে বারে বারে।
জীবনে অসংখ্য কথা শোনা যায়,
তাদের না গোনা যায়,
কে তাদের রাখে মনে?
কিন্তু শেষ ক্ষণে
যে কথাটি বলা হয়
সে কথাটি মনে জেগে রয়
'শেষ' বলে—'কথা' বলে নয়।..."

অম্লান বাড়রী আমার কানে কানে বললে, "প্রজ্ঞাপারমিতার কবিতা মুখস্থ ঝাড়ছে।"

আবৃত্তি সাঙ্গ করে মহানন্দ বললে, "বলুন অম্লানবাবু।" মনে হলো দ্বিজু রায়ের 'সাজাহান' নাটকে দারা বলছে, "এসো ঘাতক। আমি প্রস্তুত।"

অম্লান বাড়রী বললে, "প্রজ্ঞা দেবী বলে গেছেন, যদি সম্ভব হয় আপনি যেন তাঁকে ভুলে যান।"

মহানন্দ বললে, "অসম্ভব। প্রজ্ঞাকে ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব অম্লানবাবু। ইম্‌পসিব্‌ল্‌।"

"তাহলে ভুলবেন না। যদি কোনো মধ্যরাতে সহসা ঘুম ভেঙে আপনার মনে পড়ে যায় তাঁর কথা, তাহলে ভাববেন তিনিও এই অনন্ত বিশ্বের কোনোখানে আপনার কথা ভাবছেন।"

পর পর ৺প্রজ্ঞাপারমিতার অনেক শেষ কথাই বানিয়ে বলে গেল অম্লান বাড়রী। জীবন-বীমার পাকা দালাল অম্লান বাড়রীর মুখ-নিস্থত ৺প্রজ্ঞাপারমিতার শেষ কথামৃতের মন্ত্রগুণে একেবারে গদগদ এবং কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠে অম্লান বাড়রীর হাত ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো মহানন্দ মজুমদার।

জীবন-বীমার আবেদন-পত্রখানি পকেট থেকে বার করে অম্লান বাড়রী বললে, "আপনার সম্বন্ধে প্রজ্ঞা দেবীর যে শেষ ইচ্ছাটুকু ছিলো, মহানন্দবাবু, সেটুকু আর অপূর্ণ রাখবেন না। এইখানটায় একটা সই করে দিন।"

নিজের ঝর্ণাকলমটাকে মহানন্দের হাতে তুলে দিল অম্লান বাড়রী। সই করে দিল মহানন্দ। পনরো হাজার টাকার পনরো বছর মেয়াদী বীমার আবেদন-পত্র। এক বছরের প্রিমিয়ামের জন্যে একটা আগাম চেকও সই করিয়ে নিল অম্লান বাড়রী। আবেদন-পত্রে সাক্ষীরূপে আমিও একটা সই দিলাম—মানে, দিতে হলো।

চোখের ইশারায় অম্লান জানালে এবারে রওনা হওয়া যেতে পারে। বিদায়ের পালাটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেরত রওনা হলাম।

আস্তে বললাম, "ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যাপারটা?"

অম্লান বাড়রী বললে, "সে ঠিক করে নেবো'খন। আসল কাজটা তো হয়ে গেল।"

মহানন্দের বাবা বললেন, "আমি মহানন্দের বাবা। আপনিই ধনপতিবাবু?"

আমি বললাম, "কি করে জানলেন?"

"একটু আগে যখন আপনি মহানন্দের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন তখন আমি পাশের ঘরেই ছিলাম।" বললেন মহানন্দর বাবা সচ্চিদানন্দ মজুমদার, আইনের কারবার করে নামজাদা বড়লোক।

বুঝলাম অম্লান বাড়রী যে মহানন্দকে ৺প্রজ্ঞাপারমিতার শেষ ইচ্ছার ভাঁওতা দিয়ে বীমা-আবেদন পত্রে সই করিয়ে এক বছরী প্রিমিয়ামের চেক নিয়ে গেছে এবং সাক্ষীরূপে আমিও যে আবেদন-পত্রটির ওপর সই দিয়েছি তাও তাঁর নজর এবং কান এড়ায়নি। কাজটি সেরে অম্লান বাড়রী কেটে পড়লো দ্রুতবেগে। আর আমি বেগটা ওর মত দ্রুত করতে না পেরে সচ্চিদানন্দ মজুমদারের মুখোমুখি আটকা পড়ে গেলাম। কে জানে, হয়তো মহানন্দকে বীমা করানোর দায়িত্ব অনেকখানি আমার ওপর চাপিয়ে তিনি কিছু মিঠে-কড়া বচন শোনাবেন আমায়।

কিন্তু তার ধার দিয়েও তিনি গেলেন না। শুধু বললেন, "ফিরবার তাড়া তো নেই? তা হলে দু' চার কাপ চা খাবেন আসুন। আর একটু কথাবার্তাও কওয়া যাবে।"

আমি বললাম, "কিন্তু আপনার সময়ের যে অনেক দাম।"

সচ্চিদানন্দ মজুমদার বললেন, "আজ নয়। সপ্তাহের বাকী ছ'টা দিন এত টাকা রোজগার করি যে, রবিবারে আইন থেকে বাণপ্রস্থ নিই। অবশ্য ডাক্তারের হুকুমে। ডাক্তার বলে হপ্তায় একটা দিন বিরাম না দিলে হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে—ব্লাডপ্রেসার আছে কিনা! অকাল মৃত্যুটা আমার ঠিক পছন্দ নয়। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।"

আইনের কারবারী সচ্চিদানন্দ মজুমদারের সঙ্গে বসলাম বেশ একটা

বড় রকমের ঘরে। চারদিকের দেয়াল আইনের বই-ঠাসা বইয়ের র‍্যাক আর আলমারির পেছনে অদৃশ্য।

"এই ঘরে অন্যান্য দিন মক্কেলরা আসে আমার পরামর্শ কিনতে।" বললেন মজুমদার। "অথচ আজ দেখছেন সেই ঘরটাই কি রকম ফাঁকা। প্রায় মহানন্দ ছোঁড়ার মগজের মতো।"

আমি বললাম, "সে কি? মহানন্দর মগজ······?"

"ফাঁকা, ফাঁকা একেবারে ফাঁকা। কিছু নেই ওর ভেতর।" বললেন মজুমদার।

"কি করে বুঝলেন?"

"তা নইলে অমন মেয়ের প্রেমে পড়ে?" মজুমদার বললেন। "আমার ছেলের যে অমন ধারা রুচি হবে তা কোন জন্মেও ভাবতে পারিনি। যেমন রোগা, তেমনি ফ্যাকাসে গায়ের রং, যেন অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। সবার ওপর টেক্কা মেরেছে নামটি—প্রজ্ঞাপারমিতা। প্রায় পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা-যুগ-যুগ-ধাবিত-যাত্রী আর কি!"

তারপর বললেন, "শুনেছি ভালো নাচতো। মানে ছোঁড়াদের নাচাতো।"

আমি বললাম, "যদি নাচিয়েই থাকে, তাতে অন্যায় দেখিনে।"

"ভালো আপদ। দেখতে বলছে কে আপনাকে? অন্যায় আমিও বলিনি। কিন্তু তুই ছোঁড়া অমন চট করে মজে গেলি কেন? আর কি মেয়ে ছিলো না ভূ-ভারতে?"

মনটা হঠাৎ একটু দমে গেল। প্রজ্ঞাপারমিতার যে রূপ মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিলাম, তা এই আইন-কারবারী ভদ্রলোক এক ধাক্কায় নিভিয়ে দিলেন।

একটি ট্রেতে করে এক পেয়ালা চা এবং এক প্লেট খাবার এলো আমার পাশে। মজুমদার মশায়ের পাশে এলো অন্য জিনিস। তিনি বললেন, "এর আগে এক পেগ্ হয়ে গেছে। এটা টু নম্বর।"

তাতে আমার বিস্ময়ের কিছু ছিলো না। আমি প্রশ্ন করলাম—বিনা

আদেশেই এসব এলো কি করে? ভৃত্য কি অন্তর্যামী? মজুমদার হেসে বললেন, "এটুকু বুদ্ধি না থাকলে কি আর আমার চাকর হয়ে টিঁকে থাকতে পারতো? থাকা, খাওয়া, পরা ছাড়া ওকে মাইনে দিই মাসে একশো টাকা—পুজোয় বোনাস এক মাসের মাইনে।"

"বলেন কি? একটা সাধারণ চাকরকে?"

"চাকর, কিন্তু সাধারণ নয়। তাছাড়া, হোয়াই নট্ ইফ্ আই ক্যান্ গ্ল্যাড্লি অ্যাফোর্ড ইট্? দিতে যখন অনায়াসে পারি, গায়ে লাগে না, তখন দেবো না কেন? আপনার চলে নাকি?"

সর্বশেষ প্রশ্নটি গ্লাসের তরল পদার্থটি সম্বন্ধে।

আমি বললাম, "না।"

তিনি বললেন, "চলা উচিতও নয়। এ জিনিস সবার জন্যে তো নয়। অধিকারী ভেদ আছে। দু' পেগে আমার নেশা হবে না, ভয় নেই। অত সহজে এখন আমার নেশা হয় না। পয়লা পয়লা হতো বটে। তা, কি যেন বলছিলুম? প্রজ্ঞাপারমিতা। মহানন্দ তো প্রজ্ঞা বলতে অজ্ঞান। ঐ প্রজ্ঞা মহাপ্রস্থানের পথে চলে যাওয়ার পর থেকে শরৎ চাটুয্যের দেবদাস হবার রিহার্শাল দিচ্ছে। জানি নে এর পর চন্দ্রমুখীর খোঁজ হবে কি না। কাঁচা বয়সে 'দেবদাস' লিখে কি কাণ্ডই যে বাধিয়ে রেখে গেছেন চাটুয্যে মশায়!"

মজুমদার মশায় বললেন বটে দু পেগেও তাঁর নেশা হয় না, কিন্তু আমার সন্দেহ হতে লাগলো।

মজুমদার বললেন, "শরৎ সাহিত্য এক কালে বাংলার তরুণ মহলের ওপর বেশ প্রভাব ছড়িয়েছিল। 'চরিত্রহীন' বাজারে বেরোবার পর তো কলকাতার মেসগুলোতে সীট-ভাড়াই বেড়ে গেল। কিন্তু কার কথা যেন বলছিলুম?"

"প্রজ্ঞাপারমিতা।"

"হ্যাঁ, প্রজ্ঞাপারমিতা। বেঁচে থাকলে মহানন্দ নির্ঘাত ওকে আমার পুত্রবধূ করবার জন্যে ক্ষেপে উঠতো। হয়তো উঠেছিলোও। কিন্তু, কি

জানেন ? এ জাতের মেয়েরা—মানে প্রজ্ঞাপারমিতার টাইপের মেয়েরা—এরা প্রিয়া হয়ে থাকতেই ভালোবাসে ; বড় জোর বঁধু হতে পারে, কিন্তু বধূ হওয়া এদের ধাতে সয় না।”

আমি বললাম, “কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রজ্ঞাপারমিতা যদি আপনার ঘরে বধূ হয়ে আসতে রাজী হতেন, আপনি কি মহানন্দবাবুকে বাধা দিতেন তাঁকে আনতে ?”

“বাধা ?” বললেন সচ্চিদানন্দ মজুমদার। “বাধা দিতাম আমি মহানন্দকে ? মহানন্দে বরণ করে নিতেম প্রজ্ঞাপারমিতাকে আমার পুত্রবধূ রূপে। মহানন্দকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম—ও মেয়েটার মধ্যে এমন কিছু নেই যার জন্যে কেউ পাগল হতে পারে, যদি না সে আগেই আধা পাগল হয়ে থাকে। কিন্তু বোঝেনি, বুঝতে চায়নি মহানন্দ। বুঝলুম পাগল সে হয়েই আছে। তখন সরে দাঁড়ালুম। অস্ত্র অবশ্য ছিলো আমার হাতে। যদি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবার ভয় দেখাতুম—এত একচ্ছত্র সম্পত্তি আর ব্যাংক ব্যালান্সের মায়া কাটিয়ে হয়তো সে ত্যাজ্যপুত্র হতে চাইতো না! হয়তো সে ত্যাগ করতো প্রজ্ঞাপারমিতাকে। কিন্তু বুক ভেঙে যেতো মহানন্দর। বুক-ভাঙা ছেলেকে নিয়ে আমি তখন কি করতুম ধনপতিবাবু ?”

বুক-ভাঙা একটা সকরুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মজুমদার বললেন, “বাপ বলেই ছেলের ওপর জোর খাটাতে চাইনে। তার স্বাধীন মতামত, স্বাধীন পছন্দ-অপছন্দকে মর্যাদা দিতে চাই। গায়ের ওপরই জোর চলে, মনের ওপর তো আর জোর-জুলুম চলে না! আমার নিজের জীবনের ট্র্যাজেডি থেকে আমি এই বুঝেছি ধনপতিবাবু।”

বললাম, “যদি বাধা না থাকে, আপনার ট্র্যাজেডিটুকু শোনাবেন কি ?”

মজুমদার বললেন, “নিশ্চয়ই শোনাবো। শোনাবার মত লোক খুঁজেই তো বেড়াচ্ছিলাম এতদিন। পাইনি। আজ তোমাকে পেয়েছি ধনপতি।”

'আপনি' এবং 'বাবু' থেকে একেবারে 'তুমি' এবং বাবু-হীনতায় নেমে এসেছেন সচ্চিদানন্দ মজুমদার।

"শোনো তাহলে সংক্ষেপে বলি।" বললেন মজুমদার। "আমারো এককালে মহানন্দর মতো বয়স ছিল। এ কথা বিশ্বাস করো তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমিও তখন গলা পর্যন্ত প্রেমে ডুবেছিলুম, মহানন্দেরই মতো। যার প্রেমে, তার সঙ্গে প্রজ্ঞাপারমিতার কোনো তুলনাই হয় না। কি তার অপরূপ সুন্দর সুঠাম দীর্ঘ দেহ-বল্লরী—তন্বুলতা নয়, লক্ষ্য কোরো ধনপতি—, হরিণীর মতো রমণীয় দুটি কাজলকালো আয়ত নয়ন, মুখে তার স্বর্গীয় হাসির জ্যোৎস্না—মানে এক কথায় অতুলনীয়া। প্রথম দর্শনে প্রেম, দ্বিতীয় দর্শনে আরো প্রেম, এমনি করে যত তাকে দেখতে লাগলুম, প্রেম তত বেড়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু বাবার কাছে ধরা পড়ে গেলুম। আমার প্রেম টের পেয়ে বাবা ক্ষেপে উঠলেন। ফলে তার সঙ্গে আমার দেখা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর বাবার হুকুমে বাবারই পছন্দমত আমাকে বিয়ে করতে হলো। পরে মহানন্দের বাপ হতে হলো।"

"কিন্তু ট্র্যাজেডিটা কোথায়?"

ব্যথিত বক্ষে চাপড় মেরে মজুমদার বললেন, "এই বুকে ধনপতি, এই বুকে। সেই থেকে সারাটা জীবন তার স্মৃতি বুকে জেগে রয়েছে। সে-ই মহানন্দের মা হতে পারতো, কিন্তু সে আজ মহানন্দের মা নয়। তুমি বুঝতে পারবে না ধনপতি, তাকে না পেয়ে আমার জীবনটা কি ভয়ানক ফাঁকা, কি প্রকাণ্ড মরুভূমি হয়ে গেছে। তাকে প্রাণপণে ভুলতে চেয়েছি, কিন্তু ভুলতে পারিনি। মহানন্দের মাকে ভালোবাসতে চেষ্টা করেছি প্রাণপণে। তাকে ভালো লেগেছে, কিন্তু তাকে ভালোবাসতে পারিনি। বোধ করি গোপনে গোপনে সে টের পেয়েছিল, কিন্তু টের যে পেয়েছিল আমাকে তা জানতে দেয় নি। আর শেষ পর্যন্ত সেই দুঃখেই হয়তো সে মারা গেল। তাহলে বোঝো, বাবার একগুঁয়ে অন্ধ অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তিন তিনটে প্রাণের কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

"আপনাদের কি তারপর আর দেখা হয়েছে ?"

"আজ পর্যন্ত হয়নি। তাকে দেখাবার মতো মুখও আমার আর নেই ধনপতি। সে জানে না তাকে না-পাওয়ার ব্যথা ভুলবার জন্যেই আমি আইনের কারবারে নিজেকে এমন করে বিলিয়ে দিয়েছি। অজস্র টাকার একটা নিজস্ব মোহ আছে ধনপতি, কিন্তু আমার এ জীবনে সেটা বড় নয়। আইন জগতে আমার যে অসামান্য সাফল্য দেখতে পাচ্ছ, এর মূলে আছে আমার জীবনের এই বিরাট ট্র্যাজেডি, অথবা তাকে ভুলে থাকার ঐকান্তিক প্রয়াস।"

আমি বললাম, "কোনো বড়ো ব্যথাই বিফলে যায় না। জগতের প্রত্যেকটি বড়ো সৃষ্টির উৎস খুঁজতে গেলেই দেখা যাবে তার পেছনে রয়েছে একটা গভীর ট্র্যাজেডি। এ আর আমি নতুন করে কি বলবো আপনাকে ?"

আগেকার কথার জের টেনে বলে চললেন মজুমদার, "লোকে বাইরে থেকে আমায় তারিফ করে; বাহবা দেয়, হিংসা করে, ঈর্ষ্যা করে, ধন্য ধন্য করে। আইন ব্যবসায়ে দেশবন্ধু আর রাসবিহারী ঘোষের সঙ্গে আমার তুলনা করে। কিন্তু আমার এ ইতিহাস আসলে আমার জীবনের বিরাট ব্যর্থতার ইতিহাস, সাফল্যের ইতিহাস নয়। হ্যাঁ, ভালো কথা, রোসো, তোমায় দুখানা ফোটো দেখাই।"

বলে তিনি একটা দেরাজ খুলে একখানা নব-বিবাহিত দম্পতির ফোটো বার করে দেখিয়ে বললেন, "ঠিক আমার বিয়ের পরে তোলা ছবি। আমি আর আমার সহধর্মিণী, ভুবনেশ্বরী।"

দেখলাম ভুবনেশ্বরী দেবী রীতি মতো রূপবতী। দেখে মুগ্ধ হবার মতো। কিন্তু সচ্চিদানন্দ মজুমদার মুগ্ধ হননি!

তারপর যে ছবিখানা বার করলেন সেটি ভুবনেশ্বরী দেবীর দিদি-বয়সী জনৈকা মহিলার। চেহারায় শ্রী বা লালিত্য কিছুমাত্র নেই। এই ছবিটির দিকে তাকিয়ে দুটি চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো শ্রীমজুমদারের। পরমুহূর্তেই ব্যথায় তাঁর দুটি চোখ ছলছল করে উঠলো। বুঝলাম জীবনে এঁকে না পেয়েই মজুমদার মশায়ের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বললেন, "এর তুলনা হয় ?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "অসম্ভব।"

মজুমদার বললেন, "এই ফোটো দেখে শুধু খানিকটা আভাস পাচ্ছ। চাক্ষুষ দেখলে বুঝতে যা আমি হারিয়েছি তার কাছে আমার জীবনের সাফল্য কত তুচ্ছ।"

ভৃত্য এসে খবর দিল প্রফেসরবাবু এসেছেন।

মজুমদার ভৃত্যকে বললেন, "আসতে বল। আর দাবার সরঞ্জাম দিয়ে যা।" আমায় বললেন, "ইংরিজীর প্রফেসর শান্তনু সেন। বেড়ে দাবা খেলে। শেষ পর্যন্ত হেরে যায় অবশ্য, কিন্তু লড়ে ভালো।"

আমি দাবা-রসে বঞ্চিত। "তাহলে এখন আসি।" বলে আমি বিদায় নিলাম।

মজুমদার বললেন, "এসো। কিন্তু এ কথা মনে রেখো, যে কোনো রবিবার তুমি সু স্বা গ ত ম্। অন্য কোনো দিন আমার এক মুহূর্ত ফুরসত নেই। কিন্তু রবিবারে আমি একেবারে আলাদা মানুষ।"

দুটি মোটর গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে, অতটা দরাজ বুক নয়; গলিটির গলিত্ব তবু নামে প্রকাশ পায় নি। নাম নকড়ি নস্কর রোড। নকড়ি নস্কর বেঁচে নেই, ৺সাধনোচিত ধামে চ'লে গেছেন, তাঁর নাম বেঁচে আছে এই রাস্তানামধারী গলিটির মোড়ের মাথার নাম-ফলকে। নাম বেঁচে আছে, কিন্তু স্মৃতি বেঁচে নেই। নকড়ি নস্কর রোডের সন্ধানে যাঁরা আসেন, তাঁরা নাম-ফলকে রোডের সন্ধান পেয়েই অমুক বা তমুক নম্বর বাড়ির সন্ধানে ঢুকে পড়েন। অনুসন্ধান করেন না—নকড়ি নস্কর কে ছিলেন, কবে ছিলেন, কোথায় ছিলেন, কেন ছিলেন! হায় রে নাম-কাঙালের দল! নাম টিকে থাকলেই স্মৃতি টিকে থাকে না। স্মৃতি মুছে গিয়ে জেগে থাকে শুধু নাম।

তারপর নামও মুছে যায় ; পুরাতন নামের চিতাভস্মের বুকে ফুটে ওঠে নতুন নামের মঞ্জরী।

নকড়ি নস্কর রোডে কোন নস্করের বাড়ি নেই। তরুণ কেরানী রাহুল রায় যে পুরাতন বাড়ির এক খুপরিতে বাস করার অভিনয় করে, সে বাড়িটা দময়ন্তী দালালের বাবা এবং সৌদামিনী দালালের স্বামী দিবাকর দালালের দখলে। বাড়ির সামনে গলির মুখোমুখি সাদা পাথরের ফলকে কালো হরফে লেখা আছে 'সৌদামিনী ভবন'।

দিবাকর দালাল এককালে দালালি করতেন কিনা জানি না, কিন্তু এই বাড়িটি দখলে আনবার কয়েক বছর আগে থেকে তিনি ছিলেন তাঁর আপন-হাতে-গড়া 'দি গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাংক'-এর কর্ণধার। ব্যাংকটিকে তিনি অনেক শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়েছিলেন। তাঁর সচিত্র জীবন-কাহিনী বিচিত্র কায়দায় ছাপা হয়েছিল বাংলার অনেক দৈনিকে, সাপ্তাহিকে আর মাসিকে ; সে সব প্রশস্তি প'ড়ে গর্বে প্রশস্ত হয়ে উঠেছিল অনেক বাঙালীর অপ্রশস্ত বুক। যুগাবতার দিবাকর দালাল বাঙালী জাতির আর্থিক বনেদ পোক্ত করার জন্যেই ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন—এ বিষয়ে বাংলা দেশের কোনও কাগজের এক ফোঁটা সংশয় ছিল না ; আর জাতিকে বাঁচাতে হ'লে জাতির কাগজগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত দরকার, তাই তাদের জীবন-প্রদীপে দরাজ হাতে 'দি গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাংকে'র বিজ্ঞাপনের তেল যোগাতেন দিবাকর দালাল। বাংলার গৌরব দিবাকর দালালের ব্যাংকের উদাত্ত আহ্বানে অনেক বাঙালী সধবা, বিধবা, কেরানী, মাস্টার, দোকানদার, কারবারী, বাড়িওয়ালা, ডাক্তার, মোক্তার ইত্যাদি অনেকের টাকা এসে উদার ছন্দে পরমানন্দে জমা হ'ত গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাংকের মহাতীর্থে। সে সব টাকাকে ব্যাংকের বাইরে পাঠিয়ে নানা কায়দায় বেনামে খাটাতেন ব্যাকিং-যাদুকর দিবাকর দালাল। খাটতে খাটতে ব্যাংকের অধিকাংশ টাকা হয়রান হয়ে ভেগে গেল। তারপর ব্যাংকের শেকড় থেকে শাখা-প্রশাখায় একদিন সর্বত্র যে বাতি জ্বলে উঠল তার রঙ লাল—টাটকা তাজা খুনের মত লাল। আর শোনা যেতে লাগল দিবাকর দালালও লাল হয়েছেন। বাংলার

অলিখিত অর্থনৈতিক ইতিহাসে অলক্ষ্যে জেগে রইল এই একটি লাল তারিখ।

এই লাল তারিখের আগে এই বাড়িটির (যার নাম এখন 'সৌদামিনী ভবন') মালিকের শেষ পাইটি পর্যন্ত জমা ছিল গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাংকে। লাল তারিখের পর তিনি ভেবে দেখলেন, মাথায় হাত দিয়ে ব'সে থেকে কোন লাভ নেই ; আর্থিক প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে তিনি বাড়ির মালিকানা বেচে দিয়ে অন্যত্র ভাড়াটে হতে চ'লে গেলেন। তারপর চক্ষুলজ্জার মেয়াদ-শেষে বাড়ি হয়ে গেল 'সৌদামিনী ভবন'।

সৌদামিনী ভবনের গ্যারাজে যে ছোটখাট অস্টিন গাড়িখানা গলিতে দাঁড়ালে কোলাপ্‌সিব্‌ল্ গেটের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়, তার ভূতপূর্ব মালিকে আর এই বাড়িটির ভূতপূর্ব মালিকে কোনও ভেদ নেই। দিবাকর দালাল সহধর্মিণীর বেনামে এই গাড়িখানার তৃতীয় মালিক।

কম পেট্রোলে বেশী মাইল চলার স্বভাবটা এখনও গাড়িখানা হারায়নি। গ্যারাজের ঠিক ওপরেই গ্যারাজের মতই যে নীচু ছাতওয়ালা ঘরের ছানা, তাতেই কম ভাড়ার ভাড়াটে রাহুল রায় ; কম মাইনেতে সে বেশী খাটে ভুজঙ্গ চৌধুরীর মস্ত সওদাগরী অফিসে। কম নিয়ে বেশী দেবার দুই দোস্ত—নীচে অস্টিন গাড়ি আর তার ওপরে তরুণ কেরানী রাহুল রায়।

আসলে ওপরের ঘরটি তৈরি গাড়ির ড্রাইভারের জন্যে। সেই সঙ্গে প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেবার এবং স্নানের জায়গাও আলাদা আছে, বাড়ির সঙ্গে যার অন্তরঙ্গ যোগ নেই। দিবাকর দালালের কুমার ড্রাইভার গণেশ হালদার বিয়ে ক'রেই এ আবাস ছেড়ে অন্য আবাসে নীড় বেঁধেছে, এখানে রেখে গেছে নব বন্ধু রাহুল রায়কে। গণেশের মাইনে বাড়াতে হয়নি, তার ওপর কিঞ্চিৎ ভাড়া ফি মাসে দিচ্ছে রাহুল রায়—সুতরাং আপত্তি হয় নি দিবাকর দালালের। অর্থাগমে এক ফোঁটা অনাসক্তি বা অনাগ্রহ নেই দিবাকরের—তা সে যত সামান্যই হোক।

আজ রবিবার। কেরানীদের অফিস নেই—ছুটির সুর নীরবে বেজে

চলেছে আকাশে বাতাসে। বাইবেলের ভগবান ছ দিন ধ'রে দুনিয়া সৃষ্টি ক'রে সপ্তম দিনে আরাম করলেন, সেটা হ'ল বিশ্রামের দিন। সপ্তাহের সেই সপ্তম দিন এই রবিবার। দুনিয়ার হে কেরানীকুল, বাইবেলের ভগবানকে অন্তত এই দিনটির জন্য ধন্যবাদ দিও।

আমি ভোরবেলা উঠে চ'লে গেলাম রাহুল রায়ের ঘরে। রাহুল রোজই বেশ ভোরে ওঠে—রবি সোম ভেদ নেই। টোকা দিতেই খুলে দিলে দরজা, দাঁড়াল স্তম্ভিত হয়ে। বললাম, "একটি রাতে আপনাকে দূর থেকে দেখেছিলাম সার্কাসের অগণিত দর্শকের ভিড়ে অন্যতম; আজ প্রাতে আপনার পরিচয় পেতে এসেছি সম্মুখ থেকে—আপনার ঘরের একান্তে একমাত্র রূপে। আমি জানি, আপনার নাম রাহুল। আমার নাম ধনপতি।"

ভেতরে নিয়ে বসাল রাহুল। তক্তপোশ নেই, মেঝের ওপর কায়েমী বিছানা পাতা। ও-পাশে জানালার ধারে একটা সস্তা প্যাকিং-কাঠের টেবিল; তার পাশে একটা হালকা চেয়ার, যাকে ভাঁজ ক'রে গুটিয়ে রাখা চলে। ঘরের দেয়ালে চিত্র-তারকাদের একটি ছবিও টাঙানো নেই। ফ্রেম ছাড়া একখানা ছবি ঝুলানো আছে পুরু পিজ্‌বোর্ডে সাঁটা। ছবিটি রবি ঠাকুরের বুড়ো বয়সের, মুখের আদ্ধেক ঢাকা ঋষিদের মত দাড়িতে। টেবিলের তলায় একটা সস্তা পুরাতন স্যুটকেস।

আমি নিজের পরিচয় যা দিলেম তাতেই খুশি হ'ল রাহুল; খুশি হবার ক্ষমতা তার অসাধারণ। বললে হেঁয়ালির সুরে, "যে ধনে ধনী হয়ে আপনি ধনপতি, বিচিত্র তার সুর, বিচিত্র তার ছন্দ। তবু আমার সত্যিকারের পরিচয় কেউ যদি চায় তো বলব—আমি রবিভক্ত কবি।"

ছবিতে রবি ঠাকুরের দাড়ি দুলে উঠল যেন। না, কি গোটা ছবিটাই বাতাসে দুলছে? তা দুলুক। বুড়ো কবির ছবি দুলুক তরুণ কবির ঘরে। বললাম, "কবিগুরুর ছবি দেখেই আন্দাজ করেছিলুম। রবীন্দ্রকাব্য সব প'ড়ে ফেলেছেন?"

রাহুল রায় বললে, "ক্ষেপেছেন? তা হ'লে তো অনেক বাজে লেখা

প'ড়ে অনেক সময় গচ্চা দিতে হ'ত। উনি লিখেছেন বিস্তর, তাই বিস্তর বাজেও লিখেছেন। আর সেই সব বাজে লেখা তাঁর গ্রন্থাবলীতে ভিড়ও জমিয়েছে, যাদের ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক মূল্য আমি মানি না।"

শুধালাম, "গুরুদেবের ছবিখানা অত আদর ক'রে টাঙিয়েছেন কেন?"

"ওঁকে বড্ড আপন মনে হয় ব'লে।" বললে রাহুল। "আর মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানেন?"

"না।"

"মনে হয়, গুরুদেব বিদায় নিয়ে যাবার আগে 'এসো' বলে যে কবিকে ডাক দিয়ে গেছেন, হয়তো আমিই সেই কবি। মনে নেই আপনার কবিগুরুর সেই আহ্বান?"—ব'লে ৺কবিগুরুর কবি-আহ্বান আবৃত্তি ক'রে শোনাল রাহুল রায়ঃ

"এসো কবি, অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।
প্রাণহীন এ দেশেতে গান-হীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি' দাও তুমি।...
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।"

রাহুল রায় আবৃত্তি মন্দ করে না, কান আমার খুশি হ'ল। কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে উঠল মন, পাছে সে-ই যে ৺কবিগুরুর 'এসো' ব'লে ডাক

দেওয়া অখ্যাত জনের নির্বাক মনের কবি সেইটে প্রমাণ করবার জন্মে রাহুল স্যুটকেস থেকে খাতা বার ক'রে তার স্বরচিত কবিতা শোনাতে শুরু করে। কিন্তু সে আশঙ্কার অমূলকতা অচিরেই প্রমাণিত হ'ল। কবিতা শোনাবার নামগন্ধও শোনা গেল না তার মুখে। সে যে কবি, এবং হয়তো কবিগুরুর 'এসো' ব'লে ডাক দেওয়া কবি, এইটুকু জানিয়েই সে খালাস—প্রমাণ করবার দায়িত্ব সে স্বীকার করে না।

"কিন্তু খারাপ লাগে কি জানেন?" বললে রাহুল রায়। "ওই যে গুরুদেব বলেছেন 'তোমারে করিব নমস্কার'। ওঁর আশীর্বাদ পারব শিরোধার্য ক'রে নিতে, কিন্তু ওঁর নমস্কার গ্রহণ করব কোন্ লজ্জায়?"

কবিতা থেকে কথার মোড়টা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবার জন্মে বললাম, "ঠাণ্ডাটা কি রকম হঠাৎ বেড়ে উঠেছে দেখেছেন?"

মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রাহুল রায় বললে, "ঠাণ্ডার দাওয়াই আসছে। ভাববেন না ধনপতিবাবু।"

দাওয়াই সত্যি সত্যিই একটু বাদে এল একটি কেটলির ভেতরে। কেটলির বাহককে রাহুল বললে, "তুটো কাপে এখন আধাআধি ভাগ ক'রে দাও গোবিন্দ। তারপর আর এক কাপ নিয়ে এস।"

গোবিন্দ বললে, "তু কাপই নিয়ে এসেছি দাদাবাবু। এনাকে আসতে দেখছিলাম কিনা আপনার কাছে। তাই আপনার এক কাপের সঙ্গে এনার জন্যও এক কাপ নিয়ে এসেছি।"

রাহুল খুশি হয়ে বললে, "হাতের ঠোঙার ভেতর কি এনেছ গোবিন্দ?"

"আজ্ঞে, তুটো টোস্ট আর তু টুকরো কেক। তুটো মামলেট ক'রে নিয়ে আসি। কি বলেন?"

রাহুল বললে, "তার আর দরকার নেই গোবিন্দ।"

আমি বললাম, "না না না, মামলেট আবার কেন?"

গোবিন্দ রাহুলের টেবিলের তলা থেকে এক জোড়া পেয়ালা পিরিচ বার ক'রে আমাদের সামনে চা টোস্ট আর কেক সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রাহুল বললে, "এ হচ্ছে গোবিন্দ গড়াই। এ গলির ও-মোড়ে যে 'চা-ভারতী' নামে রেস্তোরাঁ আছে, গোবিন্দ তার একমাত্র মালিক। চমৎকার চা ওর চা-ভারতীতে, তাই অন্য পাড়া থেকেও এ পাড়ায় লোক আসে চা-ভারতীতে চা খেতে। ধারের কারবার করে না গোবিন্দ গড়াই। কিন্তু আমার বেলায় ওর নিয়ম আলাদা। সারা মাস আমায় চা খাওয়ায়, মাসকাবারে মাইনে পেলে টাকা দিই। অতিথি এলে নিজে সে এখানে এসে চা পৌঁছে দিয়ে যায়, তার জন্যে একটি আধলাও বেশী নেয় না। কেন আমায় সে এ খাতির করে জানেন? কেমন ক'রে ও টের পেয়েছে—আমি কবি। কবিদের ওপর শ্রদ্ধা ওর অসীম।"

আবার কবির প্রসঙ্গ এসে পড়েছে দেখে বললাম, "আপনার এখানে তো রান্নার কোন ব্যবস্থা দেখছি না। আহার করেন কোথায়?"

রাহুল বললে, "চা-ভারতীর পেছনেই গোবিন্দ গড়াই থাকে তার বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে। ওর বাড়ির হোটেলে আমায় সে একমাত্র খদ্দের ব'লে যেচে নিয়েছে, তাও মাসিক হিসেবে। গড়াইয়ের এই সড়াইখানার জন্যে গড়াইয়ের কাছে আমি ঋণী ধনপতিবাবু। এ ঋণ আমি শোধ করতে পারব না কোনদিন।"

আমি বললাম, "কোন ঋণই কোনদিন শোধ করা যায় না রাহুলবাবু। যে ঋণ শোধ ক'রে চুকিয়ে দেওয়া যায়, সে ঋণ ঋণই নয়।"

এমন সময় বাইরে শোনা গেল কার পরুষ কর্কশ কণ্ঠ—"স্কাউনড্রেলটাকে কাল বার বার ব'লে দিলাম, সাতটার আগে এসে গাড়ি বার ক'রে রাখবে। আটটা বাজতে চলল, এখনও তার দেখাটি নেই। পৌঁছুতেই যদি শেষে বারোটা একটা বেজে যায় তো পিকনিক করবে কখন? চাবুক মেরে শায়েস্তা করা দরকার এই সব বেইমান দায়িত্বজ্ঞানহীন লোককে।"

মেয়েলী কণ্ঠে শোনা গেল—"জিভে একটু লাগাম কষতে শেখো বাবা! একে রবিবার, তায় এমনি ঠাণ্ডা পড়েছে। আসতে একটু দেরি হচ্ছে ব'লেই ভদ্রলোকের ছেলেকে যা-তা বলবে, এ তোমার ভারি অন্যায়।

উনি যে আজ ছুটির দিনেও কাজ করতে রাজী হয়েছেন সেইজন্যেই তো তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। রাজী না হ'লে কি করতে তুমি?"

আমার নীরব প্রশ্নের জবাবে রাহুল রায় বললে, "আমার বাড়িওয়ালা দিবাকর দালাল এবং তাঁর একমাত্র সন্তান কুমারী দময়ন্তী দালাল। সম্পর্কটা অবশ্য বিশ্বাস করা শক্ত।"

"চাকরি খতম ক'রে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতাম।" বললেন দিবাকর দালাল। "দিবাকর দালালের গাড়ি চালাবার জন্যে ড্রাইভারের অভাব হবে না কোনদিন। ভাত ছড়ালে অনেক কাক জোটে।"

কুমারী দময়ন্তী দালাল বললেন, "ওই যে ড্রাইভারবাবু আসছেন। তুমি কোনও কথা ব'লো না বাবা, চুপ ক'রে থাক।"

ড্রাইভার গণেশ হালদার এসে জানালে, তার স্ত্রীর হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে, শরীর বিশেষ খারাপ। তাকে এ অবস্থায় একা ফেলে আসা চলে না, তাই পাশের বাড়ির গিন্নীকে বিশেষ অনুরোধ ক'রে রাজী করিয়ে তার জিম্মায় স্ত্রীকে রেখে গণেশ এসেছে। অর্থাৎ বাধ্য হয়েই এসেছে সে দুর্দিনের চাকরি বজায় রাখতে। অসুস্থা স্ত্রীকে ফেলে সে সপরিবার প্রভু দিবাকর দালালকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে শহর থেকে দূরে কোথায় বাগান-বাড়িতে পিকনিক করতে। স্ত্রী যদি না-ই বা বাঁচে, চাকরি বাঁচবে।

স্ত্রীর হঠাৎ-আসা জ্বরের বর্ণনা শুরু করতেই গণেশকে ধমক দিয়ে দিবাকর বললেন, "বাক্য আর ব্যয় না ক'রে গাড়ি বার কর তাড়াতাড়ি। সূর্য তো ওদিকে মাথায় উঠছে! কিন্তু তোর মা যে এখনও নামছেন না দময়ন্তী। যা মা, তুই তাড়া দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি।"

আবদারী আদেশের মিঠে-কড়া সুরে দময়ন্তী বললে, "তুমি যাও বাবা। আমি দাঁড়িয়ে ততক্ষণে গাড়িটা বার করিয়ে রাখি।"

সহধর্মিণী শ্রীমতী সৌদামিনী দালালকে নামিয়ে আনতে ওপরে চ'লে গেলেন দিবাকর দালাল। এই ফাঁকে রাহুলের ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সৌদামিনী-ভবনের গেটের ধারে দণ্ডায়মানা দময়ন্তী দালালকে

দেখলাম। দময়ন্তী কালো নয়, ফরসাও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি। স্বাস্থ্যের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল পাতলা গড়ন। রূপের ব্যাকরণ মানলে হয়তো রূপসী বলা চলে না তাকে। অথচ সব কিছু মিলিয়ে রূপের যেন অভাব নেই তার। আশ্চর্য! এই দময়ন্তীর জীবনের উৎস ওই দিবা-দ্বিপ্রহরে-পুষ্করিণী-অপহারক দিবাকর দালাল? রাহুল ঠিকই বলেছিল—সম্পর্কটা বিশ্বাস করা শক্ত।

নেমে এলেন দিবাকর দালাল, এলেন শ্রীমতী সৌদামিনী কিন্তু ঝিমঝিম ক'রে উঠল কুমারী দময়ন্তী দালালের মাথা। দুটি চোখের সামনে দু হাজার সরষে-ফুল। সারা দেহ কম্পমান, অবসন্ন। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন দালাল-দম্পতি। তারপর ফোন গেল ডাক্তারের কাছে। ওপরে শয্যাশায়িতা হতে চ'লে গেল দময়ন্তী। গ্যারাজের গাড়ি রইল গ্যারাজে। ছুটি পেয়ে ফিরে গেল ড্রাইভার গণেশ হালদার তার অসুস্থা স্ত্রীর কাছে। মুখে তার উদ্বেগ আর হাসি।

আমি বললাম, "আহা!"

রাহুল রায় বললে, "ভাববেন না আপনি। কুমারী দময়ন্তী স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে গণেশ হালদারের ছুটির ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে গেল, যেন স্ত্রীর কাছে সে সারাক্ষণ থাকতে পারে। অভিনয়, শুধু অভিনয়। কিছু হয়নি দময়ন্তীর।"

শুনে সত্যি আশ্বস্ত হলাম, দময়ন্তীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠল মন।

রাহুল বললে, "শুনুন তা হ'লে দময়ন্তী দালালের আর একটি কাহিনী। আমার এই ঘরে এক বিকেলে আমার বন্ধু নৃপেন বাজাল সেতার। আহা, কি সে বাজনা! একাগ্র সাধনার আশ্চর্য সাফল্য! আমার এই ছোট ঘরে অল্প লোককেই জায়গা দিতে পেরেছিলাম। শ্রোতার ভিড় জমে গিয়েছিল আমার ঘরের বাইরে, ভিড় জমেছিল রাস্তায়। বাজনা শেষ হ'লে কানে স্মৃতির মধু নিয়ে শ্রোতারা ফিরে গেল, মিনতি জানিয়ে গেল, আর একদিন যেন হয়। ভিড় ক'মে গেলে এল দিবাকর দালালের বাড়ির পুরাতন ভৃত্য কানাই।"

"তারপর ?"

রাহুল বললে, "তারপর কানাই বললে—বাবু ব'লে পাঠালেন তাঁর বাড়িতে যদি একদিন দয়া ক'রে আপনি বাজনা শোনান। নৃপেন বললে—তোমার বাবুকে বল গে, তাঁর বাড়িতে আমি বাজাব না। কানাই চ'লে গেল। বোধ করি মনিবকে গিয়ে খবরটা দিয়েওছিল। তার একটু পরেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব দময়ন্তী দালালের। সে যে গ্যারাজের ওপরের ঘরে এমনভাবে উঠে আসবে তা কে কবে ভাবতে পেরেছিল ? দময়ন্তীর দুই চোখে চাপা আগুনের ইশারা। সেতারী নৃপেনের দিকে তাকিয়ে দময়ন্তী বললে—ওঃ, আপনি বুঝি পেশাদার ? পয়সা না নিয়ে বাজান না ? নৃপেন সেতারের মীড়ের মত অচপল সুরে জবাব দিলে—জায়গা-বিশেষে বাজাই। সর্বত্রই যদি খাতিরে বাজাতে হয়, তা হ'লে আমরা শিল্পীরা বাঁচি কি ক'রে ? দময়ন্তী বললে—বেশ। আপনার দক্ষিণা কত ? পঁচিশ ? পঞ্চাশ ? এক শো ? নৃপেন বললে—যদি বলি এক শো ? দময়ন্তী উত্তর দিলে—তাই দেব। আপনি কবে বাজাবেন বলুন ? কাল ? পরশু ? তার পরদিন ? কিংবা তারও পরদিন ? কিংবা—। নৃপেন হাতজোড় ক'রে বললে—মাপ করবেন। কোন দিনই নয়। আপনার বাবার বাড়িতে বাজিয়ে আমি সঙ্গীত-সরস্বতীর অপমান করতে পারব না, কলুষিত করতে পারব না আমার সেতারযন্ত্র। ক্রোধে দাঁতে অধরোষ্ঠ চেপে তারপর দময়ন্তী বললে—তার মানে ? নৃপেন বললে—তার মানে আপনার বাবার প্রত্যেকটি টাকা পাপার্জিত। আগে তিনি আরও কত কি করেছেন তার খোঁজ আমি জানি না। কিন্তু জানি তাঁর গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাংকের কাহিনী—বাঙালী জাতির বিরাট কলঙ্কের কাহিনী। তাতে লাল বাতি জ্বালাবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে আপনার বাবা লাল হয়েছিলেন, হাজার হাজার বাঙালী পরিবারকে নির্মম ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে। তাঁর এত বড় ঘৃণ্য পাপের ক্ষমা আছে ব'লে আমি মনে করি না। আর তাঁরই বাড়িতে আমি যাব সেতার বাজাতে ? অসম্ভব। মাপ করবেন আমাকে।"

রাহুলের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দময়ন্তী প্রশ্ন করেছিল, "আপনিও কি তাই বলেন ?"

রাহুল বলেছিল, "এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলা বৃথা দময়ন্তী দেবী।"

"বেশ।" বলে দময়ন্তী দ্রুতবেগে নেমে চলে গেল।

রাহুল ভাবলে, যে ব্যাপারটা হয়ে গেল এর ফল ভোগ করতে হবে তাকেই। হয়তো তাকে এই বিশ্রী অপমান করেছে যে তার বন্ধু নৃপেন, তারই বন্ধু ব'লে তাকে তাড়িয়ে ঘরে হয়তো অন্য ভাড়াটে বসাবার ব্যবস্থা করবেন বাড়িওয়ালা দিবাকর দালাল।

তা কিন্তু হ'ল না। পরদিন ভোরবেলার কিছু পরে দময়ন্তী দালাল এসে বললে, "আমি রাগ করেছিলুম বটে, কিন্তু রাগ করবার অধিকার আমার হয়তো নেই। আপনার বন্ধুর কথাগুলো কঠোর হলেও সত্য; জানাবেন তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।"

কাহিনী শেষ ক'রে রাহুল রায় বললে, "আশ্চর্য মেয়ে এই দময়ন্তী দালাল। দময়ন্তীও যে দালাল, এটা বিধাতার একটা বীভৎস ইয়ার্কি ছাড়া আর কিছু ব'লে ভাবতে পারি না। দময়ন্তীর গুণ অনেক, শ্রদ্ধার দাবি তার জোরালো। তবু কিছুতেই ভুলতে পারি না তার বাবা দিবাকর দালাল। আর এ কথা যতই মনে পড়ে, ততই দময়ন্তীর ওপর মন ঘৃণায় ভ'রে ওঠে। এই আমার এক ট্র্যাজেডি। যাকে সারা হৃদয় দিয়ে চাই শ্রদ্ধা করতে, তাকেই কিনা ঘৃণা করতে হয় সবচেয়ে বেশী! এমন বেয়াড়া, বেখাপ্পা, মর্মান্তিক ব্যাপার কখনও দেখেছেন ধনপতিবাবু ?"

কণ্ঠস্বর ভারী রাহুল রায়ের। দুই চোখে তার জল ছলছল ক'রে উঠেছে।

★

এই যে কুকুরটি দেখছেন, ধনপতিবাবু, (বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী) এ হচ্ছে আমার বড় পেয়ারের কুকুর। এর বাপ ছিল অ্যাল্‌সেশিয়ান আর মা ছিল সেইন্ট_বার্ণার্ড ! ছিল মানে এখনো আছে, তবে আমার কাছে নয়। কি রকম তাগড়া হয়েছে দেখেছেন ? অথচ মেজাজটি ঠাণ্ডা, একেবারে পার্‌ফেক্ট জেন্টলম্যান। ওকে যদি না ঘাটান, ও-ও আপনাকে ঘাটাবে না। কিন্তু একবার ঘাটাতে গেছেন কি মরেছেন। একটিবার কামড়ে ধরলে ওকে টুকরো করে কেটে ফেললেও মুখ খুলবে না। আমার বিশ্বাস ওর কোন পূর্বপুরুষ বুলডগ ছিল।

অবশ্য ওর অ্যাল্‌সেশিয়ান বাপও ছিল ভারি জোর একগুঁয়ে। ক্যাপ্টেন বনার্জির অ্যাল্‌সেশিয়ান। ক্যাপ্টেনের বাবুর্চি একবার হঠাৎ চটে উঠে ওকে সোয়াইন বলে গাল দিয়েছিল। আর যায় কোথা ? ক্যাপ্টেনের কুকুর, রীতিমত ইংরেজী জানা। সোয়াইন গাল হজম করে নিতে রাজী হবে কেন ? হুঙ্কার ছেড়ে তেড়ে উঠল। বাবুর্চির বাবুর্চিলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত সেদিনই। বরাত ভাল, হঠাৎ সেই সময় এসে পড়লেন ক্যাপ্টেন বনার্জি। ডাকলেন, 'জুয়ান !' কুকুরটার পুরো নাম ডন জুয়ান ! ক্যাপ্টেন ছোট করে ডাকতেন জুয়ান বলে। মনিবের ডাক শুনে এক সেকেণ্ডে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ডন জুয়ান ; মনিবকে সে বাঘের মত ভয় করতো। একবার কি যেন দুষ্টুমি করেছিল, তাতে ভয়ানক চাব্‌কেছিলেন ক্যাপ্টেন বনার্জি। সেটা ভোলেনি। যাঁরা বলেন কুকুর কিছু মনে ধরে রাখতে পারে না, জানবেন তাঁরা নিজের ভুলো মন কুকুরের ওপর চাপাচ্ছেন। ক্যাপ্টেন বনার্জী বাবুর্চিকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "জুয়ান ভারি সেন্টিমেন্টাল কুকুর। ওকে গাল টাল আর কোন দিন দিসনে ফকিরচাঁদ। মারা পড়বি।" আসলে গাল দেওয়ার মতলব ছিল না ফকিরচাঁদের। সোয়াইন কথাটা

নতুন বলতে শিখেছিল, সেইটেই ঝালিয়ে নিচ্ছিল কুকুরটার ওপর। সে তোবা তোবা করে বললে, "ওর সামনে ইংরেজী আর কখনও কইব না হুজুর।" ব্যাটা ইংরেজীর জাহাজ আর কি! এঃ এঃ এঃ এঃ এঃ! (এমনি কায়দায় টেনে টেনে হাসেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। ওঁর বিশ্বাস বড়লোকী হাসি হাসবার এই হচ্ছে বনেদী কায়দা। যেন হাসির গ্যাস প্রাণপণে বেরিয়ে আসতে চাইছে, আর তিনি রাশভারী ঢঙে রাশ টেনে রাখছেন।)

এমনি বাপের ব্যাটা ডন জোসেফ, ডন জুয়ানের ব্যাটা ডন জোসেফ। সেন্টিমেণ্ট্যাল বাপের সেন্টিমেণ্ট্যাল ছেলে। আমি ওকে শুধু জোসেফ বলে ডাকি—অবিশ্যি কেনেল্ ক্লাবের খাতায় ওর পুরো নামটাই রেজেস্ট্রী করিয়েছি ঃ ডন জোসেফ।

জোসেফকে ট্রেনিংও দিয়েছি ভারি যত্ন করে, ভালো ট্রেনার রেখে। বাপকা ব্যাটা হতে শিখিয়েছি, আর এখনো শেখাচ্ছি।

"কুত্তার বাচ্চারে।
কুত্তা না করিনু যদি কি শিখানু তারে?"

ট্রেনারকে মাইনে দিই দেড়শো টাকা, আর পুজোর সময় দুমাসের মাইনে বোনাস। যেমন আমার আপিসে দিই চাকুরেদের। উঃ ক'রে উঠলেন যে। দেড়শো টাকার কমে ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনার আপনি পাচ্ছেন কোথায়? মেরে-কেটে একশো টাকায় হয়তো সেকেণ্ড ক্লাস ট্রেনার পাওয়া যেতে পারে, বাট আই ডোণ্ট কেয়ার ফর সেকেণ্ড ক্লাস! তাছাড়া ট্রেনার ভালো না হ'লে কুকুরের ম্যানার্স খারাপ হয়ে যাবে যে—আদব কায়দা শিখবে না ভালো করে। ইস্কুলে কলেজে সস্তার মাস্টার প্রফেসার রেখে রেখে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ ভরসারা কেমন তৈরি হচ্ছে দেখছেন তো চোখের সামনে? আমার কুকুরের এডুকেশন আমি অমন হতে দিতে পারি নে। দেখেছেন কি চমৎকার ম্যানার্স? কি খাসা তমিজ আর তরিবৎ? ভেতরে ওর প্রচণ্ড ডাইনামিক এনার্জি ছটফট করছে চেপে-রাখা স্প্রিং-এর মতো; ওর গলায় নীরব হয়ে আছে বাঘের গর্জন। শুধু একটু ইশারা, একটু ইঙ্গিত পেলেই এক নিমেষে কুরুক্ষেত্র করে ফেলতে পারে ডন

জোসেফ। অথচ আমার পায়ের তলায় গুটিসুটি মেরে কেমন চুপচাপ শুয়ে আছে দেখুন। নীরব, নিথর, যেন দুপুর রাতের শেয়ার মার্কেট।

আর প্রভুভক্ত। জান দিয়ে দেবে আমার জন্যে, যদি দরকার হয়। দরকার অবশ্য কোনদিন হবে না। তবে এইটে জানবেন কুকুর বড় প্রভুভক্ত প্রাণী বলে যে ইস্কুলে প্রবন্ধ পড়ানো হয় আর লেখানো হয়, ওর এক তরফা দৃষ্টিভঙ্গিটা আমি পছন্দ করি নে। প্রভু যদি কুকুরভক্ত প্রাণী না হয়, তো কুকুরই বা প্রভুভক্ত প্রাণী হতে যাবে কেন? এ যেন সতীসাধ্বীদের এক তরফা পতিভক্তি আর কি। ওরে বাপু, সতী চাইবার আগে মহেশ্বর হতে শেখ। নিজে রাম না হয়ে সীতা আশা করিস্ কোন্ মুখে? কোন্ লজ্জায় দাবী করিস্ সাবিত্রীকে, যদি না হতে পারিস্ সত্যবান, নিদেন পক্ষে সতীশ? ঐ জন্যেই তো ভুজঙ্গ চৌধুরী এখনো ব্যাচেলার। অসতী স্ত্রী সইতে পারব না, বুকে হাত দিয়ে বলছি ধনপতিবাবু, অথচ সৎ স্বামী হয়ে থাকবারও মুরোদ নেই।

মহাকবির ভাষায়

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।"

সুদূর আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে, হাতের কাছে যাকে পেয়ে যাই তার ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠি হু হু করে। দূরের নেশাই আমায় চঞ্চল করছে ধনপতিবাবু, দূরের সুর-ঝঙ্কারে রক্ত চন-চন করে ওঠে ধমনীতে ধমনীতে। বালজাকের লেখা পড়েছেন? ফরাসী লিখিয়ে অনরে দ্য বালজ্যাক? নাম ডাক যাঁর এমিল জোলার চাইতে কম নয়? ভদ্রলোক গল্প আর উপন্যাস লিখেই থেমে থাকেন নি, মানব-মানবীর প্রেম আর বিবাহতত্ত্ব নিয়েও মাথা ঘামিয়ে গেছেন। এক পত্নীর সঙ্গে সারা জীবন কাটানোর কল্পনায় যারা একঘেয়েমির কথা ভেবে শিউরে ওঠেন, তাদের তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন পাকা বেহালা-বাজিয়ে ওস্তাদ শিল্পী একই বেহালা বাজিয়ে জীবন কাটিয়ে দেন, বহু-বেহালা-বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয় না তাঁর। কিন্তু ইয়াশা হাইফেজ, ইহুদী মেনুহীন, আইজ্যাক স্টার্ন প্রমুখ বেহালা-ধুরন্ধরের তো একাধিক বেহালা আছে বলে জানি। ক্রেসলার, কিউবেলিক আর প্যাগানিনিও তো

শুনি এক-বৈহালিক ছিলেন না। তা ছাড়া বেহালা যতো পুরোনো হোক, তার তার বদলানো যায় খুশি মতো বার বার, এ কথা হয় তো ইচ্ছে করেই মনে রাখেননি বালজ্যাক। কবি-সাহিত্যিকরা উপমার সুবিধের জন্যে ইচ্ছে করেই অনেক কিছু ভুলে থাকেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সেই এক পুরাতন প্রিয় আর একই পুরাতনী প্রিয়া—এতে লায়লা মজনুও ক্ষেপে উঠতো, পাগল হয়ে যেতো রোমিও জুলিয়েট, বিবাগী হয়ে যেতো শিরীন ফরহাদ। ওদের বিয়ে হয়নি বলেই ওরা আজো বেঁচে আছে।

কিন্তু এইটুকু শুনে পালালে ভুল বুঝবেন ধনপতিবাবু। ছুনিয়ার সাড়ে পনেরো আনা ভুল বোঝার মূলে রয়েছে এই একটু শুনে পালানো আর মনে করে নেওয়া যে সবটুকুই শোনা হয়েছে। আর এই ভুল-বোঝার বোঁটায় ফুটছে কত ট্র্যাজেডি, কত কমেডি। আমি বলে গেছি আমার একতরফা কথা, কিন্তু সেইটেই পরম সত্যও নয়, চরম সত্যও নয়। একদিক যার আছে তার আরেক দিকও আছে।

আমার বাবাকে আপনি হয়তো দেখেছেন, না দেখে থাকলে এখনো দেখতে পারেন। আমার মাকে আপনি দেখেননি, আর কোনদিন তাঁকে দেখতেও পাওয়া যাবে না। মা ছিলেন সতীলক্ষ্মী, বাবা সৎনারায়ণ। মা বাবার কথা যখন ভাবি ধনপতিবাবু, তখন মনে হয় বালজ্যাকের কথাই সত্যি। একনিষ্ঠ প্রেমের মত দামী জিনিস নরনারীর জীবনে আর নেই, আমার মত বৈচিত্র্য-মাতালের দল যাই বলুক না কেন। এক কবি-বন্ধু প্রেমের ডেফিনিশান দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

“তুমি ও আমি-র মধ্যে যেটুকু ফাঁকা
সেই ফাঁকাটুকু ফাঁকি দিয়ে ভরে
সেই ফাঁকি ভুলে থাকা—
এরি নাম হ’ল প্রেম।”

এ হ’ল তামাসা করে বানানো হাল্‌কা ডেফিনিশান। আমার মনে হয় কামনার সঙ্গে যখন মেশে শ্রদ্ধা, তখন তাকেই বলা যায় প্রেম। প্রেমের

প্রাণই হচ্ছে শ্রদ্ধা। আজকাল ডাইনে বাঁয়ে, ঝপাঝপ প্রেমে পড়ার খবর শুনি, প্রেমের গল্পের নাম করে ন্যাকামি আর নোংরামির গল্প লিখছে কত নতুন গজিয়ে-ওঠা গল্প-লিখিয়ের দল। প্রেম কথাটাকে এরা মাটির দরে নামিয়েছে।

বড়লোকের একমাত্র ছেলে বড়লোক কাপ্তানের মুখে প্রেমের তত্ত্ব শুনে অবাক্ হচ্ছেন বুঝি? কিন্তু জীবনে প্রেমের ধার ধারিনে বলেই তো মুখে প্রেমতত্ত্বের খই ফোটাতে পারি।

এই জোসেফ! ব্যাটা ঝটপট ন্যাজ নাড়াচ্ছে দেখ! এ হচ্ছে ওর খুশির জানানি ধনপতিবাবু। খুশি যখন চেপে রাখতে পারে না তখনি ন্যাজ নাড়ায়। জেগে জেগে চোখ বুজে দিবাস্বপ্ন দেখছে বোধ হয়। আফিসের অনেক কেরানীর মত, যারা কাজ ফাঁকি দিয়ে ঘুমুতে পারলে বেঁচে যায়। ঘুম শুধু চোখ বুজেই হয় না ধনপতিবাবু, চোখ মেলেও ঘুমোনো যায়। আমাদের এই ঘুমকাতুরে জাতের ভবিষ্যৎ কি বলতে পারেন? আমার আফিসে আমার কারখানায় শুধু শুনি দাবী; আমাদের তরফ থেকেও যেন দাবী করবার কিছু নেই। এই যে একটু আগে আপনাকে বললুম, আই হেট দিস একতরফা ব্যাপার। আমার এক পুরাতন বন্ধু—কলেজে এক সঙ্গে পড়েছিলুম; আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে ব্যবসায়ে ঢুকে পড়লুম, সে চলে গেল বি. এ. পাস ক'রে এম. এ. পড়তে। শুনেছি এম. এ. পাস ক'রে চাকরি জোটাতে না পেরে গণ-দাবী জাহিরের অভিযানে পাণ্ডাগিরি করছে। ভেবেছিলুম ডেকে এনে আমার আফিসে বা কারখানায় একটা চাকরিতে বসিয়ে দেবো। চাকরি অবশ্য খালি নেই, বরং লোক ছাঁটাই করা দরকার, কিন্তু করছিনে—ছাঁটাই করলে লোকগুলো খাবে কি? তবু বন্ধুর জন্যে একটা চাকরি তৈরি করা কিছু কঠিন নয়। মাসে বিরাট মোটা টাকা যাচ্ছে চাকুরেদের মাইনেতে, তার ওপর দেড়শো দুশো টাকা বাড়লে এমন কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু ভরসা হলো না। ঋষি বঙ্কিমের সাবধান বাণী স্মরণ হলো: "খবরদার! বিষবৃক্ষ রোপণ করিও না।" সেদিন তো বন্ধুবর আমার বাড়ি চড়াও হয়ে আমার এই ঘরেই বসে আমারি চা বিস্কুট খেয়ে

বড়লোকের ছেলে বলে গাল দিয়ে গেল। ভালো আপদ! বলি, তোমাকে বড়লোকের ছেলে হয়ে জন্মাতে মানা করেছিলো কে? বললে, আমি কাপ্তানী করে টাকা ওড়াই খোলামকুচির মতো। আরে, কাপ্তানী করে টাকা ওড়াবো না তো এত অজস্র টাকা দিয়ে করবো কি? মুখে রুপোর চামচ তো ছেলে-মানুষ, প্ল্যাটিনামের চামচ নিয়ে জন্মেছি—যেদিকে তাকাই সেদিকে টাকার পাহাড়। ব্যাংকে ব্যাংকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফুলে ফুলে ফেঁপে ফেঁপে উঠছে, তাই তো বলি ঋষি বঙ্কিমের ভাষায়:

"যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?"

বলতে পারেন এত অগুনতি টাকা, তো দাতব্যের হরির লুট লাগাইনে কেন? একেবারে লাগাইনেই বা বলি কি করে? একগাদা দাতব্য ডিস্‌পেন্‌সারী, ধর্মশালা আর বিদ্যালয় চৌধুরীদের টাকায় চলছে বই কি। তাছাড়া অমুক মিশন তমুক মিশনেও ঢের যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে উজাড় করে সবকিছু দাতব্যে ঢেলে দিতে পারিনে। জীবনে একবার বড়লোকের একমাত্র বংশধর হয়ে জন্মেছি, আবার কখনো জন্মাবো কিনা কে জানে? একটু স্ফূর্তি করে নেবো বই কি! শুকনো এসে শুকনো চলে যাবো, এ হয় না। তারপর বিস্কুটে কামড় দিয়ে বন্ধুটি বললে, "তোমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে ভুজঙ্গ চৌধুরী। দেখতে পাচ্ছো কি দেয়ালের লিখন?" আমি বললেম, "দেয়াল কোথায় হে?" শুনে বন্ধুটি চটে এক চুমুকে পেয়ালার বাকী চাটুকু সাবাড় করে বললে, "ইতিহাসের চাকা ঘুরচে।" আমি বললেম, "চাকা তো ঘুরবার জন্যেই।" বন্ধু বললে, "তোমাদের এই ঐশ্বর্যের বনিয়াদ তাসের ঘরের মতো তছনছ হয়ে যাবে; ঘনিয়ে আসছে সেই দিন, যেদিন হবে ডিক্‌টেটরশিপ অব দি প্রোলিটারিয়েট—সর্বহারাদের সর্বাধিনায়কত্ব।" রাজনৈতিক অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক রাজনীতি ভালো বুঝিনে ধনপতিবাবু। জানেন তো বি. এ. ফেল-করা বিদ্যে?

বললুম, "আমাদের নিঃস্ব করে দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে সর্বহারাদের সর্বাধিনায়ক করে দিলেই কি বিশ্ব জুড়ে স্বর্গ বিরাজ করবে বন্ধু?" বন্ধু কি বলতো জানিনে, কিন্তু এই সময় বাবুর্চি তার প্লেটে দুখানা কাটলেট দিয়ে

গেল। আমিই বলে রেখেছিলুম ভেজে দিতে। কাটলেটে মুখ আটকে গেল বন্ধুর; জবাব দিলে না কোন। এ জিনিসটি বরাবর ভালবাসতো আমার এই বন্ধুটি। কলেজে পড়বার সময় হেমন্ত ক্যাবিনে বসে চায়ের সঙ্গে অনেক খেয়েছি দুজনে, সেই ভরসাতেই আমার বাড়ি এসে আমাকে সে শাসাতে পেরেছিল, দেখাতে চেয়েছিল দেয়ালের লিখন। ডন জোসেফ তখনো আমার এখানে আসেনি। জোসেফ থাকলে কি হ'ত জানিনে। আমাকে লক্ষ্য করে কেউ চেঁচালে ক্ষেপে ওঠে জোসেফ। মোসাহেবদের মোসাহেবি শুনে শুনে হয়রান কানে বন্ধুর শাসানি দামী টক-ঝাল চাটনীর মতোই ভাল লেগেছিল। একটা নতুন জিনিস বলে। আপনাকেও ভাল লাগছে, আপনাতেও আছে নূতনত্ব—শাসাচ্ছেন না, মোসাহেবিও করছেন না, আপনি নিউট্র্যাল, নিরপেক্ষ, ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতির মত। এঃ এঃ এঃ এঃ এঃ! (চমৎকার রসিকতা করে ফেলেছেন মনে হলেই বনেদী কায়দায় না হেসে পারেন না ভুজঙ্গ চৌধুরী। ভাবেন, না হাসলে রসিকতাটা মাঠে মারা যাবে।)

কিন্তু আমায় অনেকে ভারি ভুল বোঝে—যারা আমার সংস্পর্শে আসে তারাও, যারা না আসে তারাও। আই ডোণ্ট্‌ কেয়ার, মানে পরোয়া করিনে। তবে, ভারি ভাল লাগে। লোকে যদি ভুলই না বুঝলো তো কিসের আমি অ্যারিস্টোক্র্যাট? আমি তো প্রায়ই ইংরেজীতে বলি "ইট্‌ ইজ্‌ এ সাইন্‌ অব্‌ অ্যারিস্টোক্র্যাসি টু বি মিস্‌আণ্ডারস্টুড"—মানে আভিজাত্যের একটা লক্ষণই হচ্ছে ভুল-বুঝিত হওয়া, একেবারে হুবহু তর্জমা করে দিলুম, আপনার ভুল বুঝবার যো-টি রইল না। এঃ এঃ এঃ এঃ এঃ!

এই ধরুন অনেকের ধারণা আমি লম্পট, আমি চরিত্রহীন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার কুকুরের দিব্বি, মনে আমার কোনো দাগ নেই, আর চরিত্রটি একেবারে স্টিমলণ্ড্রীতে ধোলাই-করা আদ্দীর পাঞ্জাবির মতো পরিষ্কার। যারা আগেই নেমে আছে, তাদের ঐ তলায় যদি বা কখনো নেমে গেছি, ওপরে যারা আছে তাদের কখনো টেনে নামাইনি। অথচ এত অফুরন্ত টাকা আমার হাতে—ইচ্ছে করলে টাকার জোরে কি না করতে পারি

আমি ? কত স্বর্গের কুসুমকে নামাতে পারি জাহান্নামের কাদায়। নামাইনে। কিন্তু এইটে জানবার বা জানাবার গরজ নেই আমার নিন্দুকবৃন্দের। আমি ডেভিল, আমি ষোলো আনা স্কাউন্‌ড্রেল, এইটে জেনে আর জানিয়েই তাদের আনন্দ—ষোলো আনার এক আনা ঘাটতি পড়লেও কেঁদে কেঁদে তাদের চোখ ফুলে লাল হবে। যদি হয়ে উঠি নির্মল, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষ, তাহলে হয়তো পাইকারী হারে হার্ট ফেল করবে তারা। তারা চায় আমার কুৎসা গাইবার, আমায় গালি দিয়ে বেড়াবার সুযোগ; অনিন্দনীয়-চরিত্র সাধুপুরুষ হয়ে তাদের সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলে তারা আমায় ক্ষমা করতে পারবে না ধনপতিবাবু। অ্যাল্‌সেশিয়ান নয়, সেইণ্ট বার্নার্ড নয়, বুলডগ নয়, গ্রে-হাউণ্ড নয়—এরা সব দূর থেকে ভেজা-বেড়ালের মতো মৃদু মিউ মিউ-করা পাতি-কুকুরের দল। কথাটা একটু কড়া শোনাচ্ছে হয়তো। এ পেগটায় সোডা ওয়াটার একটু কম দিয়ে ফেলেছি কিনা! আসল জিনিসের মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেছে। কিন্তু দেখছেন তো কি রকম নেশা-প্রুফ হয়ে গেছি? নেশা ভুজঙ্গ চৌধুরীর দাস। নেশার দাস নয় ভুজঙ্গ চৌধুরী।

ভাল কথা, আপনি কোন্ মতবাদী? পুঁজিবাদী? না সাম্যবাদী? পুঁজি উড়িয়ে দিয়ে সাম্য আনতে চান? না, আপনি এ ব্যাপারে নিউট্র্যাল, নিরপেক্ষ? নিঃসংকোচে প্রাণ খুলতে পারি আপনার কাছে? কাউকে বলবেন না আমার প্রাণের কথা?

শুনুন তবে। ক্যাপিট্যালিজম্—বাংলায় কি বলবেন একে? ধনিক-তন্ত্র? এ আর বেশীদিন টিকবার নয়, এর ইমারতে ভাঙন ধরেছে, এ আমি বিশ্বাস করি। সামন্ত-তন্ত্রই বলুন, ধনিক-তন্ত্রই বলুন, কোন তন্ত্রই চিরদিন টেকে না, হয়তো টেকা বাঞ্ছনীয়ও নয়। মাইকেল মধুসূদনই বলে গেছেন "জন্মিলে মরিতে হবে।" চিরদিন টিকবে না, এইটেই তো এর সেরা আকর্ষণ। এই যে ডন জোসেফকে দেখছেন, আমার পেয়ারের কুকুর। যদি জানতুম ব্যাটা চিরদিন টিকবে, তাহলে চাবকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতুম। আমার বন্ধুটি শাসিয়ে গেছে—অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। নেহি

রহেগা তো বটেই। আর এমন দিন থাকবে না বলেই তো যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ এর রস নিঙড়ে নিঙড়ে পান করে নিতে চাই।

এও মানি যে ধনিক-তন্ত্রের ধ্বংস-বাণ ছুঁড়েছে ধনিকরাই। তা নইলে সাম্যবাদের জিগীর বিশ্ব জুড়ে এমন জোরালো হয়ে উঠতে পারত না দুনিয়ার মজদুর মণ্ডলে। মজদুররা সাম্য অসাম্য নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতো না, ক্ষেপে ওঠা তো দূরের কথা, যদি ধনিক মালিকেরা তাদের মোটামুটি রকম ভালভাবে খেতে পরতে থাকতে দিত। কিন্তু অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। তাদের মোটা ভাত কাপড় কুঁড়েঘর দিয়ে খুশি রাখতেও মন উঠত না অতি-লোভী ধনিকের। খাওয়া পরার প্রাচুর্য চায়নি মজদুরের দল, শুধু যথেষ্ট মাত্র চেয়েছিল—সেটুকুও তারা পেলে না। তাই একটু একটু করে তাদের মনে জ্বলে উঠল মৃদু অসন্তোষের আগুন, আর সেই আগুনকে ইন্ধন দিয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার লোকের অভাব হল না। ক্ষ্যাপামির মাতন যখন একবার জেগেছে, সাম্যবাদের উড়েছে রাঙা নিশান, তখন এ মাতনের মহাস্রোতের মোড় আর উলটো দিকে ফেরানো যাবে না ধনপতিবাবু। বৃথা চেষ্টা, ডন জোসেফের ন্যাজ সোজা করার প্রয়াসের মত।

সাম্যবাদ! প্রাণ মাতানো গালভরা নাম। চমৎকার রঙীন স্বপ্ন! উঁচুতে যারা আছে তাদের টেনে নামিয়ে আনবে নীচুরা, সব একাকার হয়ে যাবে এক সমতলে। ছোট নেই বড় নেই, সব সমান। দুনিয়ার অগুনতি ছোটদের চোখে এ এক চমৎকার স্বপ্ন ধনপতিবাবু। আমার বন্ধু গলা ছেড়ে বলে সেই অনাগত ভবিষ্যতে শ্রেণী থাকবে না। তাই থাকবে না শ্রেণী-সংগ্রাম ; ইতিহাস-রেলগাড়ি হু হু করে ছুটে চলেছে তার সেই শেষ ইস্টিশনের দিকে, সেইখানেই তার যাত্রা শেষ। কিন্তু শ্রেণী কি সত্যিই শেষ হবে? আর শ্রেণী শেষ হলেই কি হবে সংগ্রামের শেষ? মানুষ হয়ে যাবে নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, নিখুঁত, উদার? সে স্বর্গরাজ্য আমিও স্বপ্নে দেখি, আমিও কামনা করি ধনপতিবাবু। কিন্তু সে কি হবার? সে কি সম্ভব? যদি নিশ্চিন্ত জানি এ হবার, তাহলে এ ঐশ্বর্যের আমীরী বোঝা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে এক লাফে রাস্তায় নেমে সবার সাথে হাত মিলিয়ে দাঁড়াতে দু

সেকেণ্ডও দেরি হবে না ভুজঙ্গ চৌধুরীর। তখন তুইও সেই সঙ্গে একই পথের পথিক হবি ডন জোসেফ। তখন ডগ সোপ হয়তো তোর মিলবে না, বিনা সাবানে চান করবি নিজে নিজে। বাবুর্চির রস্থই-করা মোগলাই খানা জুটবে না। তখন—

"এক সাথে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান"

ন্যাজ নাড়াচ্ছে দেখছেন? মানে, সবার সাথে পথের পথিক হতে এক ফোঁটা আপত্তি নেই ডন জোসেফের। যেমন মনিব, তেমনি কুকুর। কিন্তু তখন আর কে কার মনিব, আর কে কার কুকুর? তখন সব সমান। তখন তুই আর আমি সমান রে জোসেফ। এঃ এঃ এঃ এঃ এঃ! (আমি বললুম "কিন্তু······) এই সর্বনাশ! আপনি দেখছি প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠতে চাইছেন। তাই কবির ভাষায় বলি "ক্ষান্ত কর, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ!" আমি শুধু শোনাবার মেজাজে আছি, শুনবার মেজাজে নেই। আপনি বলবেন আমি পুঁজিবাদী, ক্যাপিট্যালিস্ট, ক্যাপিট্যালিজমের চ্যাম্পিয়ানগিরি করছি। ক্যাপিট্যালিস্ট আমি, প্রোলিটেরিয়েট সর্বহারাদের মুফৎ ওকালতী করব এ আশা আপনি নিশ্চয়ই করেন না। পরম পুরুষ বলে গেছেন, "যত মত তত পথ।" মতে মতে ভেদ থাকবে বই কি, যদ্দিন না সবগুলো মানুষের মগজ ফ্যাক্টরীতে এক ছাঁচে তৈরি হয়ে বেরোচ্ছে। বোষ্টমের ছেলে বলবে কেষ্টোর জীবকে জবাফুল দিয়ে পুজো করাই ধর্ম, কসাইর ছেলে বলবে তাকে জবাই করে ছাড়াও চর্ম। কসাই-নন্দন কণ্ঠী গলায় প'রে কণ্ঠ ছেড়ে কেত্তন গাইবে এ আশা অবান্তর। অবিশ্যি বোষ্টম একবার পাঁঠা ধরলে পাঁঠার যম হয় বলে শুনেছি; আর অনেক বোষ্টমই মুর্গী খান না, কেন না পান না।

আমি ক্যাপিট্যালিস্ট, আপনিও ক্যাপিট্যালিস্ট ধনপতিবাবু। তফাত শুধু আমার ক্যাপিট্যাল আছে, আপনার নেই। আমাদের ভগবান ভৃত্যটি —যে আমায় দিয়ে গেল বোতল গেলাস, আপনাকে দিয়ে গেল চা আর খাবার—সে তো আমাদের ঐ প্রোলিটেরিয়েটের দলে, সর্বহারা। ভগবান মাইনের টাকা জমিয়ে জমিয়ে ক্যাপিট্যাল বানিয়েছে, তাই দিয়ে দিব্বি

লগ্নীর কারবার চালাচ্ছে আর গলায় গামছা দিয়ে চড়া সুদ আদায় করছে কাবুলীওয়ালার মত। দেনদারের ওপর ওর পাওনাদারী জুলুম দেখলে তাক লেগে যাবে আপনার। ঝানু ক্যাপিটালিস্ট ভুজঙ্গ চৌধুরীর বাবাও তার কাছে ছেলেমানুষ। আমাদের সর্বহারা প্রোলিটেরিয়েট ভগবান। এই সর্বহারা-দেরই সর্বাধিনায়কত্বের দিকে নাকি এগিয়ে চলেছে ইতিহাসের দুর্বার গতি। এঃ এঃ এঃ এঃ···(আমি বললেম, "কিন্তু এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন শ্রীযুত চৌধুরী যে, এখনকার ভগবান আর তখনকার ভগবানে হবে আসমান জমীন ফারাক? দশচক্রে ভগবান যেমন ভূত হয়ে যায় তেমনি আজকের এই বিষম সমাজগঠনের দুষ্ট চক্রে পড়েই ভগবানও ক্ষুদে ক্যাপিটালিস্ট হবার স্বপ্ন দেখছে। এইটেই ভগবানের আসল রূপ বলে' ভেবে নিলে ভুল করা হবে। তা ছাড়া······")

এই দেখ। আপনার ঘাড়েও দেখছি ভূত চেপেছে। রোমান্টিক রুশো যে রঙীন চশমা রেখে গেছে তাই চোখে এঁটে যা দেখছেন তাকেই ভুল করেছেন আসল রূপ বলে'। ঠুলির চাইতে মন-ধাঁধানো রঙীন চশমা ঢের বেশি মারাত্মক ধনপতিবাবু। আপনাদের কল্পনার সর্বহারাদলের মত শোষণ-লালসাবিহীন ধবধবে-হৃদয় দেবদূত নয় বাস্তব ইতিহাসের সর্বহারা প্রোলিটেরিয়েটের দল। তারাও আমাদের, মানে ক্যাপিটালিস্টদের মতই স্থূল রক্ত-মাংস-হাড়ের মানুষ। তাদের আছে হিংস্র দংষ্ট্রা, হিংস্র নখর, তাদেরও আছে রক্ত-শোষণ লিপ্সা, তারা শোষণ করে না শুধু শোষণ করবার ক্ষমতা আর সুযোগ পায় না বলে। এরা সব মুর্গী-না-পেয়ে-মুর্গী-না-খাওয়া বোষ্টমের দল। দুনিয়ার মেয়ে আর পুরুষের মত শোষক আর শোষিত দুটো আলাদা জাত নেই ধনপতিবাবু। আজ যে শোষিতের ভিড়ে, কাল সেই মওকা মিলে গেলে শোষকের গোষ্ঠীতে লাফিয়ে উঠতে পারে, এর উল্‌টোটাও কিছু অসম্ভব নয়। আজকের আমীর কাল ফকীর, আজকের ফকীর কাল আমীর। তাছাড়া মাৎস্যন্যায়ের লীলা তো চলছেই। ছোট মাছকে গ্রাস করছে বড় মাছ, বড় মাছকে গিলছে বড়তর মাছ। বড় মাছ গিলছে ছোট মাছকে, ছোট মাছ গিলছে ছোটতর মাছকে,

ছোটতর মাছ খুঁজছে ছোটতর-তর মাছকে। আমার চোখে ঠুলি নেই ধনপতিবাবু, রঙীন চশমাও পরি নে।

হ্যাঁ, যা বলছিলুম। আপনাদের ইতিহাসের ঠেলায় এই সর্বহারাদের সর্বাধিনায়কত্বই নাকি হু হু করে এগিয়ে আসছে। সে যে কি চীজ হবে জানি নে। ভরসা এই, সেদিন আমি থাকবো না, ডন জোসেফও থাকবে না। ("সেদিনের মহা দুর্ভাগ্য।" মনে মনে বললেম আমি।)

শান্তি! শান্তি! শান্তি! শান্তি তো আপনিও চান, আমিও চাই। কিন্তু মানুষের পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হবে কি কোনো দিন? আমি আপনাকে বলছি, অসম্ভব। চির অশান্ত মানুষের মন; শান্তিতে তার তৃপ্তি নেই, তাই যুগে যুগে অশান্তির খোরাক খুঁজে বেড়ায়। নিজের মন যাচাই করে দেখেছি, ঐশ্বর্যের পাহাড়ের ওপর বসে বসে ঐশ্বর্যে বিতৃষ্ণা এসে গেছে, কিন্তু ঐশ্বর্য ছেড়ে পালাতে পারি নে। এত বড় পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায়ের দায়িত্ব আর মর্যাদা ভর করে আছে আমার কাঁধের ওপর। এই এলাহি প্রতিষ্ঠানের বেদীমূলে নিজেকে আমি শহীদ করে দিয়েছি; এ স্যাক্রিফাইসের কদর আর কেউ না বুঝুক, আপনি অন্ততঃ বুঝুন ধনপতিবাবু। (কণ্ঠস্বরে এলো ছলছলতা ভুজঙ্গ চৌধুরীর। নেশাটা ধরে এসেছে।) কাপ্তানী করে' করে' হয়রান হয়ে গেছি, টাকায় টাকায় অনেক ছিনিমিনি খেলেছি। মাঝে মাঝে মনে হয় যদি কোনো কল্যাণী হাতের কল্যাণে ছন্নছাড়া কাপ্তান ভুজঙ্গ চৌধুরীর জীবনে লক্ষ্মীশ্রী আসে! সেই কল্যাণী হাতের জন্যে হাত বাড়াই, আবার পিছিয়ে নিয়ে আসি। এই আমার ট্র্যাজেডি, আর এই আমার কমেডি। কিন্তু ব্যবসায়ের তালে ঠিক আছি। কাপ্তানীকে কাপ্তানী, কারবারকে কারবার। একেবারে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাই-লার্ক পাখীর মতো "টু টু দি কিন্‌ড্রেড পয়েন্টস্ অব হেভন্ অ্যাণ্ড হোম্।" অথবা আইডিয়্যাল শ্রীরাধা—শ্যামও রাখি, কুলও রাখি।

আমার অফিসে যদি কোনোদিন যান ধনপতিবাবু, তো দেবো আমার সেক্রেটারীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে। অদ্ভুত মেয়ে! আশ্চর্য সেক্রেটারী।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমার অফিসের সেক্রেটারী যদি আমার জীবনেরও সেক্রেটারী হতো তাহলে আমার জীবনটা—কিন্তু সে আমার মিথ্যে স্বপ্ন ধনপতিবাবু। হাত বাড়িয়ে আমি তার নাগাল পাই নে। সে আমার নাগালের বাইরে। হয়তো সে আমায় ঘৃণা করে ক্যাপিট্যালিস্ট বলে, চরিত্রহীন কাপ্তান বলে। অন্ততঃ শ্রদ্ধা সে আমায় করে না। ও কি জানে ওর শ্রদ্ধা পাবার জন্যে কি হাহাকার আমার হৃদয়ে?

আমার কারখানার মজতুরদের বস্তির চেহারা বদলে দিয়ে চমৎকার পাকা ব্যারাক বানিয়ে দিলুম, দেখলে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। নতুন করে' ওদের জন্যে বানিয়ে দিলেম দাতব্য দাওয়াইখানা, হাসপাতাল—ভালো ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স এলো ভাল মাইনেতে। মজুরদের ছেলেমেয়েদের জন্যে বিনা-বেতনের ইস্কুলের পত্তন করলুম। মজুরদের প্রেমে গলে গিয়ে নয় ধনপতিবাবু, আমার ঐ সেক্রেটারীর শ্রদ্ধা পাবো আশা করে। শ্রদ্ধা ওর পেয়েছি কিনা জানি নে, শ্রাদ্ধ হয়েছে জানি চৌধুরী কোম্পানীর অনেকগুলো টাকার। কিন্তু মন পেয়েছি কি মজতুর সর্বহারাদের? জানি নে কে বা কারা কি বুঝিয়েছে তাদের; শুনেছি তারা বলছে তাদের 'ইন্‌কেলাব' জয়যুক্ত হয়েছে, ভারী ভয় পেয়েই তাদের এসব করে দিয়েছি। এ আমাদের মহানুভবতাও নয়, মানবিকতা-বোধও নয়, আমাদের জলজ্যান্ত পরাজয়। কেউ বা বললে লাখো মন চর্বি মেশান ঘি-র ব্যবসা করে' এ যেন খান দু তিন ধর্মশালা বানানো—বিবেককে প্রবোধ দেবার জন্যে। ওদের দুচার জনা নেতা তো ক্ষেপেই উঠলো। বল্‌লে, এ শুধু মজতুরদের বিপ্লব পিছিয়ে দিয়ে পায়ের শেকল কায়েম রাখবার চালাকী কায়দা, আর কিছু নয়। বুঝুন একবার। মজতুরদের দিকে না তাকালে আমরা হৃদয়হীন শোষক, নিপীড়ক, অত্যাচারী। আর তাকালে আমরা ধূর্ত, শঠ, কৌশলী, কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে বদ্ধপরিকর।

আমরা যত হৃদয়হীন হব, শোষণের যন্ত্রে যত কড়া করে লাগাবো মোচড়, আমাদের অত্যাচার যত উঠবে চরমে, বিশ্বের মজতুরদের বিপ্লবের আগুন তত দ্রুত দাউ দাউ করে জ্বলে' উঠবে। এগিয়ে আসবে চরম বিপ্লব,

ইতিহাস যার জন্যে দিন গুণছে। চলতি কাঠামোর ভেতর মজদুরদের ভাল যে করবে সেই বিপ্লবের শত্রু—সেরা অত্যাচারী ক্যাপিটালিস্ট হচ্ছে বিপ্লবের সেরা অগ্রদূত।

চোখ ছল ছল করবেন না ধনপতিবাবু। ওতে আমি মনে বড় দুঃখ পাই। আমার তরফ থেকে এদিকের সত্য শোনালাম, তার মানে এই নয় যে ওদিকে কোন সত্য নেই। একেবারে ভুয়ো কিছুর ওপর এত বড় একটা মতবাদ এমন দুর্দান্ত ব্যাপকভাবে জোরালো হয়ে উঠতে পারে না। ওদিকের সত্যকে ভুয়ো ভেবে "ভুয়ো" বলে উড়িয়ে দেওয়ার মত বোকামী আর নেই। এও আপনাকে বলি।

কিন্তু এ সত্যটাও ভুলে যাবেন না ধনপতিবাবু যে, দুনিয়ায় শুধু সাদা আর কালোই নেই। যা সাদা নয় তাই পুরোপুরি কালো নয়; যা কালো নয় তাই পুরোপুরি সাদা নয়। যেমন ধরুন এই ডন জোসেফ।

এসব তত্ত্ব নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাতুম না ধনপতিবাবু। খোঁচা মেরে মাথা ঘামিয়ে দিলে আমারই বন্ধুটি। বন্ধুর কাজই করে গেছে। মাঝে মাঝে এ জাতের ঘরোয়া আলোচনা—যাকে বলে 'অ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাশ্যন্'—মন্দ লাগবে না, দিব্যি মুখরোচক হবে। ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল মেলানোর মতো।

যা বলছিলুম আপনাকে। ইতিহাসের চাকা ঘুরে ঘুরে এগোবেই, ব্রেক কষে তাকে আপনি রুখতে পারবেন না। এ চাকা তার আপন চলার বেগ থেকে আপনি নতুন বেগ সংগ্রহ করে এগোবে।

কিংবা যদি স্রোত ব'লে ভাবেন ইতিহাসকে, তাহলে বলি এই স্রোতে ক্যাপিট্যালিজম্ ভেসে যাবেই, যেমন গিয়েছিলো ফিউড্যালিজম্। তারপর যদি আপনাদের রোমান্টিক ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় ধনপতিবাবু, তাহলে আসবে সর্বহারাদের সর্বাধিনায়কত্ব, ক্যাপিট্যালিজমের ধ্বংসস্তূপের ওপর। কিন্তু সেইখানেই থেমে থাকবে না ইতিহাসের গতি। ইতিহাস চলবেই এগিয়ে। শ্রেণী লুপ্ত হয়ে শ্রেণী-সংগ্রামের যদি বা অবসান হয়, সৃষ্টি হবে নতুন সংগ্রামের। ইতিহাসের দুর্বার স্রোতে একদিন ভেসে যাবে ডিক্‌টেটরশিপ

অব দি প্রোলিটেরিয়েট। তারপর কি আসবে তা বলবে ভবিষ্যৎ ইতিহাস। সে প্রশ্নের জবাব ভুজঙ্গ চৌধুরী দিতে পারবে না।

আবার বলি দুনিয়ায় কিছুই চিরদিন থাকবে না ধনপতিবাবু। চলে যাবে ক্যাপিট্যালিজম্, চলে যাবে ডিক্‌টেটরশিপ অব দি প্রোলিটেরিয়েট। চলে যাবেন আপনি, চলে যাবো আমি, চলে যাবে আমার এই প্রাণের কুকুর ডন জোসেফ।

আমি আগে চলে গেলে ডন জোসেফ কি করবে জানি নে। কিন্তু ডন জোসেফ আমার আগে চলে গেলে আমি বড় দুঃখ পাবো। হিঁ ইজ এ গ্রেট ফ্রেণ্ড অব মাইন। এ গ্রেট ফ্রেণ্ড! গ্রেট ফ্রেণ্ড!

অম্লান বাড়রীর সঙ্গে যেতে হলো ভাস্কর ভটচার্যির ওখানেও।

ভাস্কর বললে, "প্রজ্ঞাপারমিতার অভাবে কলেজের ক্লাস, শেয়ার মার্কেট, কল-কারখানা, খবরের কাগজ, দোকান-বাজার, সিনেমা-থিয়েটার—কিছুই বন্ধ হয়ে নেই ধনপতিবাবু। ট্রাম কোম্পানী ট্রাম চালানো বন্ধ করেনি। সরকারী আর বে-সরকারী বাস তেমনি চলছে পথে পথে। ট্যাক্সী আর রিক্‌শারও কমতি দেখছি নে। কেরানীরা তেমনি কলম পিষছে অফিসে অফিসে। ধোঁয়া ছাড়ছে কারখানার চিমনিগুলো। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক···"

বললাম, "অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন প্রজ্ঞা দেবী চলে গেছেন, কিন্তু পৃথিবী তবু তেমনি চলছে।"

ভাস্কর বললে, "ধরেছেন কতকটা। প্রজ্ঞার বাবার কাজের রুটীনে কোনো ব্যাঘাত ঘটেছে বলে শুনিনি। প্রজ্ঞার মা তাঁর একমাত্র কন্যার বিয়োগ ব্যথা সইতে না পেরে আত্মহারা হয়েছিলেন, আবার আত্মস্থা হয়েছেন নিশ্চয়। তাছাড়া আমাদের কথাই ধরুন না—আমরা যারা এক

সঙ্গে পড়েছি প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে, আর সেই সূত্রে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেছি। প্রজ্ঞার প্রয়াণের খবর শুনে প্রথমটা মনে হয়েছিল যেন মাথার ওপর থেকে আকাশ সরে যাচ্ছে, আর পায়ের তলা থেকে মাটি। প্রজ্ঞার বেঁচে থাকা অবস্থাতে অভ্যস্ত মন প্রজ্ঞাহীনতার সঙ্গে নিজেকে চট্ করে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিল না। কিন্তু এই অল্প দিনের ভেতরই খাপ খেয়ে গেছে। সময়ে সব কিছুই সয়ে যায়। এই হলো প্র্যাক্‌টিক্যাল কথা।"

আমি বললাম, "মহানন্দবাবু কিন্তু এখনো মুষ্‌ড়ে আছেন। রকম দেখে মনে হয়নি তিনি শীগ্‌গির এ ভাবটা কাটিয়ে উঠবেন।"

"মহানন্দ আমাদের বরাবর অতি মাত্রায় ভাবালু।" বললে ভাস্কর। "তাই বরাবর আন্‌-প্র্যাক্‌টিক্যাল। চিন্তা করবার শক্তি ওর যত কম, অনুভূতির প্রকোপটা ওর ততই বেশী। কোনো কিছু চট্ করে সামলে উঠতে পারে না—তা সে দুঃখই হোক বা আনন্দই হোক। আপনাকে বলতে বাধা নেই ধনপতিবাবু, মহানন্দ ভাবতো প্রজ্ঞা তাকে ভালোবাসে। কিন্তু আসলে প্রজ্ঞা মোটেই ভালোবাসেনি মহানন্দকে।"

নিজের জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে জীবনবীমার কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে অম্লান বাড়রী বললে, "আমারো তাই মনে হয়। প্রজ্ঞা দেবীর অন্তিম শয়নের পাশে আমি ছিলেম—থাকতে হয়েছিল আমাকে। অনেক কথা আর অনেকের কথাই বলেছেন তিনি, কিন্তু একটিবারের তরেও তো মহানন্দবাবুর নাম মুখে আনেননি।"

"আমার নাম ?"

"আপনার নাম ধরে তিনি ডেকেছেন কতবার।" বললে অম্লান বাড়রী। অম্লান বদনে।

ভাস্কর হেসে বললে, "বোধ করি মহানন্দ নামটার চাইতে ভাস্কর নামটা উচ্চারণ করা বেশী সহজ, এই জন্যে। আমার নাম যদি হতো মহানন্দ, আর মহানন্দের নাম হতো ভাস্কর, তাহলেও অন্তিম শয়নে প্রজ্ঞার মুখে ভাস্কর নামই শুনতেন। সহজের দিকে প্রজ্ঞার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল, যেমন গাছের আপেলের ঝোঁক থাকে পৃথিবীর দিকে।

এই জন্যেই অত ভালো লাগতো প্রজ্ঞাপারমিতাকে—কঠিনের দিক দিয়ে সে যায়নি, যেতে চায়নি। তার ছিলো সহজিয়া সাধনা।”

তারপর একটু থেমে ভাস্কর বললে, “মহানন্দ ছাড়া আর সবাই ভাবতো প্রজ্ঞা ভালোবাসে আমাকে। মহানন্দ এটা বুঝতো না, বুঝতে চাইতো না বলে। প্রজ্ঞাও কোনো দিন মহানন্দকে বোঝাতে চেষ্টা করেনি, পাছে মহানন্দ দুঃখ পায়। কাউকে দুঃখ দেওয়াটা সহজ ছিল না প্রজ্ঞাপারমিতার পক্ষে। কোমল ছিল প্রজ্ঞার হৃদয়। সেই জন্যেই তো আমাদের প্রফেসর শান্তনু সেনের ব্যাপারটা অমন ঘোরালো হয়ে উঠল।”

শান্তনু সেনের নামটা শুনে মনটা কৌতূহলে আর আগ্রহে ভরে উঠল। বললাম, “ইংরিজীর প্রফেসর শান্তনু সেন ?”

“হ্যাঁ, তিনিই। চেনেন নাকি তাঁকে ?”

বললাম, “চিনি বলতে পারি নে। তবে মহানন্দবাবুর বাড়ীতে তাঁকে একটিবারের তরে দেখেছি। তিনি সেদিন দাবা খেলতে গিছলেন মহানন্দবাবুর বাবার সঙ্গে। ভালো দাবা খেলেন বুঝি ?”

“এরা দাবা খেলেন ভালো খেলবার জন্যে তো নয়—শুধু খেলবারই তাগিদে। যতক্ষণ খেলা, ততক্ষণ ভুলে থাকা। দাবা খেলার এই আপন-ভোলানো গুণটি আছে বলেই এরা দাবা খেলেন। মহানন্দকে ইংরিজী পড়াবার জন্যে প্রাইভেট টিউটর হয়ে এসে প্রফেসর সেন হয়ে গেলেন মহানন্দর বাবার রবিবারের দোস্ত আর দাবা খেলার সঙ্গী। মহানন্দকে পড়ানোও অবশ্য চলল—পড়ানো মানে পড়ানো পড়ানো খেলা।”

অম্লান বাড়রীর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো ভাস্কর এমন লম্বা বক্তৃতা শুরু করবে এতটা সে আশঙ্কা করে নি। কথার মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্যে সে বললে, “এই বেলা বলে রাখি ভাস্করবাবু—তা না হলে শেষকালে কথায় কথায় ভুলে বসে থাকবো—আগামী রবিবার বিকেলে আমাদের নতুন গড়া উদয়ন কৃষ্টিকেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সভায় আপনি সভাপতিত্ব করবেন, আমি কিন্তু কথা দিয়ে দিয়েছি।”

ভাস্কর বললে কপালে চোখ তুলে, "করেছেন কি অম্লানবাবু? সভাপতিত্ব আমি যে কোনো দিন করি নি।"

অম্লান বললে "যে মানুষ কোনোদিন জন্মগ্রহণ করেনি সে কি কোনো দিন জন্মগ্রহণ করবে না ভাস্করবাবু? মিস্ বিপাশা বনার্জীও প্রথমে গররাজী হয়েছিলেন আসবেন বলে কথা দিতে। শেষ পর্যন্ত অন্য সব এন্‌গেজমেণ্ট বাতিল করে দিয়ে আসতে রাজী হয়েছেন। এখন আপনি যদি বলেন 'যাবো না' তাহলে তো কেলেঙ্কারী।"

দেখলাম কুমারী বিপাশা বনার্জীর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পরম পুলকের বিদ্যুৎ নেচে গেল ভাস্কর ভটচার্যির দু চোখে।

"আর কি সভাপতি হবার যোগ্য ব্যক্তি পেলেন না অম্লানবাবু?" বললে ভাস্কর। "কোনো প্রবীণ ভারিক্কি কেউ হলে ভালো হতো না? সভাপতিত্বের মালা পরবার জন্যে গলা বাড়িয়েই আছেন এমন বুড়োর তো অভাব নেই এই মহানগরীতে।"

"কি যে বলেন ভাস্করবাবু!" বললে অম্লান বাড়রী। "উদয়ন কৃষ্টি-কেন্দ্র ঝুনোদের জন্যে তো হয়নি। এটা হচ্ছে শুধু তাদেরি সংস্কৃতিমূলক মিলন কেন্দ্র, যাদের জীবন আর হৃদয় থেকে বসন্ত এখনো বিদায় নেয়নি, যাদের ডাক দিয়ে গুরুদেব বলেছিলেন—'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা!' বাবা মা, দাদু-দিদিমারা নয়—শুধু ছেলেরা আর মেয়েরা এই কলায়তনে মাথা গলাবার ছাড়পত্র পাবে।"

আমি ব্যাপারটা কিছুটা আন্দাজ করে নিয়ে বললাম, "মানে, প্রধানতঃ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। এক হিসেবে উদয়ন কৃষ্টি বা কলা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতর কৃষ্টিগত সাহচর্য এবং বন্ধুত্বের সুযোগ-ব্যবস্থা।"

ভাস্কর ভটচার্যি সহজেই রাজী হয়ে গেল।

অম্লান বাড়রী বললে, "সেদিন উদ্বোধন সংগীত গাইতে রাজী হয়েছেন বিপাশা দেবী—মানে মিস্ বিপাশা বনার্জী। শুনবেন একখানা গলা—ওয়াণ্ডারফুল!"

'ওয়াণ্ডারফুল' গলার কথা শুনে সহসা কারুণ্যের উদাস ছায়া হাত বুলিয়ে গেল ভাস্কর ভটচার্যির মুখমণ্ডলে। ৺প্রজ্ঞাপারমিতার ছবি ভেসে উঠল কি তার মনে?

"গলা ছিল বটে প্রজ্ঞার!" স্মৃতি-ছলছল কণ্ঠে বলে উঠল ভাস্কর। "যাদু ভরা সুরের নির্ঝর যেন, যা থেকে অনর্গল অবারিত ধারায় নেমে আসতো নির্মল স্বচ্ছ সাবলীল স্নিগ্ধ শীতল সুরের ধারা—আপন-ভুলানো, স্বপন-বুলানো, হৃদয়-দুলানো, অশ্রু-ঝরানো। কিন্তু কি হবে তার কথা ভেবে? যে চলে যায় সে আর ফেরে না।"

"না ফেরাই হয়তো ভাল ভাস্করবাবু।" আমি বললাম। "তা নইলে মানুষ কাঁদবে কি নিয়ে? না হেসে মানুষ বরং বাঁচতে পারে, কিন্তু কাঁদতে না পেলে তার জীবন মরুভূমি হয়ে যায়। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো—জানি কিছু মনে করবেন না আপনি। আপনি কি প্রজ্ঞা দেবীকে খুবই ভালোবেসেছিলেন?"

একটু ভেবে নিয়ে ভাস্কর বললে, "মোক্ষম প্রশ্নটি করেছেন ধনপতিবাবু। ঠিক এই কথাটি আমিও ভেবেছি। সত্যি বলতে গেলে মনে হয় ভালো ঠিক বাসিনি প্রজ্ঞাকে, ওর ওপর প্রথম ভালোবাসার রিহার্শাল চালিয়েছি মাত্র। অর্থাৎ প্রেমের সা-রে-গা-মা সেধেছি। সা-রে-গা-মা'র পর্যায় পেরিয়ে গানের প্রথম কলি শুরু করবার সময় হবার ঠিক আগেই আসর ছেড়ে বিদায় নিয়ে গেল প্রজ্ঞাপারমিতা।"

অম্লান বাড়রী বললে, "কিছু যদি মনে না করেন তো বলি, মিস্ বিপাশা বনার্জীর মধ্যে আমি অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি, যা মিস্ বনার্জী নিজেও বুঝি জানেন না। মাঝে মাঝে কল্পনায় ভাবি মিস্ বনার্জী প্রজ্ঞা দেবীরই ছোট বোন—একজন গোলাপ, আরেকজন গন্ধরাজ।"

"এক আশ্চর্য দেখেছিলুম প্রজ্ঞাপারমিতা, আরেক আশ্চর্য দেখলেম বিপাশা।" অম্লান বলতে লাগল। "প্রথম আশ্চর্যের সংস্পর্শে এসেছিলেম আমার তুচ্ছ এই কণ্ঠের গানের মধ্যস্থতায়। দ্বিতীয় আশ্চর্যের সঙ্গেও অন্তরঙ্গ পরিচয় একান্ত অপ্রত্যাশিত আকস্মিকভাবেই হয়ে গেছে গানেরই

মধ্য দিয়ে। হায় রে আমার গান! তুচ্ছ করে শেখা, অবহেলা ভরে গাওয়া, তবু সামান্যতার জোরেই কী অসামান্য আদর দখল করিস তুই—জানি নে এ তোর কি জাদু!······সেদিনে কিন্তু আপনার গাড়ীটি একবার চাই ভাস্করবাবু। মিস্ বিপাশাকে নিয়ে আসতে হবে কিনা!"

ভেতরে আগ্রহের ঝড়, বাইরে তবু আগ্রহহীনতার ভান করে ভাস্কর বললে, "কিন্তু আগামী রোববার যে ড্রাইভারকে ছুটি কড়ার করে রেখেছি। জানেন তো কথার নড়চড় করে না ভাস্কর ভটচার্যি। গাড়ীর ভেতর সব স্পেশ্যাল ব্যবস্থা করিয়ে নিয়েছি, আমি আর আমার ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ তো একে ঠিকমতো বাগে আনতে পারবে না। আচ্ছা, মহানন্দকে একবার······"

অম্লান বললে, "তা হয় না ভাস্করবাবু!"

ভাস্কর অমায়িক হেসে বললে, "আপনারা হয়তো জানেন না, কিন্তু মহানন্দের দিল্ তো নয় যেন হীরের টুকরো।"

"তা একশোবার মানি ভাস্করবাবু। কিন্তু কোনো ফাংশন ম্যানেজ করতে হলে শুধু হীরের দিল্ হলেই চলে না। এটা অবিশ্যি মহানন্দবাবুর পক্ষে কিছু দোষের নয়।"

"নিশ্চয়ই নয়।" বললে ভাস্কর ভটচার্যি। মহানন্দের পক্ষে ওকালতী করে নিজের চরিত্রের উদারতা জাহির করবার জন্যে ব্যস্ত ভাস্কর ভটচার্যি।

"আর যাই হোক্" আরো বলতে লাগল ভাস্কর ভটচার্যি, "একথা আমি গর্ব করে বলবো যে মহানন্দের মনটা হাতীর দাঁতের মতো সাচ্চা সাদা, তাতে এক ফোঁটা কালোর গন্ধ নেই। কিন্তু ড্রাইভারকে একবার যখন ছুটি দিয়েছি, আর ফিরিয়ে নেবো না। সভাপতি যখন করতে চেয়েছেন, তখন না হয় সেই সঙ্গে ড্রাইভারও হবো। অবশ্য আপনিও সঙ্গে থাকবেন।"

অম্লান বাড়রী খুশী হয়ে বললে, "চমৎকার। তা হলে এই ঠিক রইল। একটি ব্যাপার সম্বন্ধে অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।"

বলে' আমার দিকে এমন ছন্দে তাকাল অম্লান বাড়রী, যেন বিনা

আওয়াজে বোঝাতে চাচ্ছে "কাজ তো হাসিল হয়ে গেল, এইবারে ওঠা যাক, কি বলেন ?"

বিদায় নেবার উদ্যোগ করতেই হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল যেন। অম্লান বাড়রী বললে, "ঐ যাঃ, আরেকটু হলেই ভুলে যেতুম। এই ফর্মটায় মহানন্দবাবুর বন্ধু হিসেবে আপনি একটা সই করে' দিন। পনরো হাজার টাকার বীমা করেছেন মহানন্দবাবু। জানেন তো বীমাপত্রে বীমাকারীর বন্ধুর রিপোর্ট দরকার হয়? ও একটা নামকা ওয়াস্তে আর কি!"

একটু চোখ বুলিয়ে সই করে দিলে ভাস্কর।

অম্লান বাড়রী বললে, "মহানন্দবাবুই বলেছিলেন আপনার সই নেবার কথা। বললেন বন্ধু বলতে তিনি নাকি আপনাকেই বোঝেন। এও বলেছিলেন যে আপনি বীমা করলে আপনার বন্ধু হিসেবে তিনিও সই দেবেন।"

আমি মনে মনে বললাম, "ধন্য অম্লান বাড়রী, তুমিই ধন্য।" বিদায় নেবার আগে বিশ হাজার টাকার বীমার আবেদন-পত্রে ভাস্করকে দিয়ে সই করিয়ে নিলে অম্লান বাড়রী, আর সেই সঙ্গে প্রথম বছরের প্রিমিয়াম বাবদ একখানা চেক্।

মহানন্দ ৺প্রজ্ঞাপারমিতার শেষ ইচ্ছার মর্যাদা রাখতে পনরো হাজার টাকার বীমা করেছে। মহানন্দের কাছে খাটো হতে পারে না ভাস্কর, সুতরাং নিজের বেলায় বীমার অঙ্ক পাঁচ হাজার চড়িয়ে দিলে সে। করলে বিশ হাজার।

পথে নেমে গদগদ কণ্ঠে অম্লান বাড়রী বললে, "গত জন্মে প্রজ্ঞা-পারমিতা নিশ্চয় আমার দিদি ছিল ধন্নুদা।"

★

"কোমল ছিল প্রজ্ঞাপারমিতার হৃদয়। সেই জন্যেই তো আমাদের প্রফেসর শান্তনু সেনের ব্যাপারটা অমন ঘোরালো হয়ে উঠলো।" বলেছিল ৺প্রজ্ঞাপারমিতার সহপাঠী ভাস্কর ভটচার্যি।

কিন্তু তখন আলোচনার স্রোত অন্য দিকে বয়ে যাওয়ার দরুণ জেরা করে' জেনে নেওয়া হয় নি ৺প্রজ্ঞাপারমিতার হৃদয়ের কোমলতার সঙ্গে প্রফেসর শান্তনু সেনের ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে ওঠার সম্পর্ক কি।

বীমার দালাল অম্লান বাড়রীকে শুধালেম, "কিছু জানেন নাকি আপনি?"

অম্লান বাড়রী বললে, "জানি বই কি? শান্তনু সেনকেও পাঁচ হাজার টাকার করিয়েছি কিনা!"

"কি করিয়েছেন?"

"জীবন বীমা। অম্লান বাড়রী ও-ছাড়া আর কি করাবে?···কিন্তু আপনি যা শুনতে চান সে বড় করুণ কাহিনী ধনুদা; যদিও শুনে কেউ কেউ হেসেছে, এখনো হাসে। শুনবেন নাকি আপনি?"

মাথা নেড়ে আগ্রহ জানালাম। শুরু করল অম্লান বাড়রী, "আমি শুধু বলে যাবো কাহিনীর কংকালটুকু। তার ওপর রক্ত মাংস আপনি নিজে খুশীমত সাজিয়ে নেবেন।···শান্তনু সেন প্রজ্ঞাপারমিতার ক্লাসে পড়াতেন শেক্‌স্‌পীয়ারের ওথেলো নাটক। আপনি ওথেলো পড়েছেন কিনা জানি নে, আমি গল্পটা শুনেছি। ভেনিসের সুন্দরী মেয়ে ডেস্‌ডিমোনা, বাপকে লুকিয়ে বাপের বাড়ী থেকে এক রাত্রে পালিয়ে বিয়ে করে বসলো কুচকুচে কালো ষণ্ডা চেহারার সৈন্য-সর্দার কাফ্রী ওথেলোকে, আর শেষ পর্যন্ত আরেক রাত্তিরে তাকে খুন হতে হলো ঐ ওথেলোরই হাতে। মানে শেক্‌স্‌পীয়ার দেখাচ্ছেন বাপকে ফাঁকি দিয়ে যে মেয়ে বিয়ে করে তার

আখের আরামী হয় না। নাটকে আরো নানা ফ্যাচাং ঢুকিয়েছেন শেক্স্‌পীয়ার—তা নইলে নাটক জমবে কি করে বলুন ?—কিন্তু মোটামুটি ঐ হলো কাঠামো।"

আমি বললাম, "ওথেলো ডেস্‌ডিমোনার কাহিনী আমি পড়েছি অম্লানবাবু। আপনি শান্তনু-প্রজ্ঞাপারমিতার কাহিনী বলুন।"

অম্লান বাড়রী বললে, "তাই বলছি। প্রফেসর শান্তনু সেনের চুলের এখানে সেখানে পাক ধরি ধরি করছে। এদিকে তাঁর ঘরের ঘরনীটি ছিলেন ওথেলোর একটি মহিলা সংস্করণ।"

"বেশ লেখাপড়া জানা তো ?" প্রশ্ন করলাম।

অম্লান বললে, "মাইনর ইস্কুলে কিছুদিন পড়েছিলেন শুনেছি। মেজাজখানা মিলিটারী। তাঁর অতি-সজাগ দৃষ্টির জ্বালায় প্রফেসর সেনের প্রাণ ওষ্ঠাগত। যতক্ষণ ঘরে থাকেন, বচন-সুধায় কান আর প্রাণ একই সঙ্গে জ্বলে। গৃহের এক-তরফা দাম্পত্য কলহের কলকল নিনাদ পাড়াপড়শীর কানের পক্ষে ছিল—"

আমি বললাম, "সংক্ষেপে বলুন।"

অম্লান বললে, "আপনি তো প্রজ্ঞাপারমিতাকে দেখেন নি ধনুদা। কি করে' বুঝবেন সে যে কি অনির্বচনীয়া, কি অতুলনীয়া ছিল! অমন মেয়ে কলেজের ক্লাসে ক্বচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। প্রজ্ঞাকে ছাত্রী পেয়ে প্রফেসর শান্তনু সেনের হৃদয়ের অবস্থা কি হয়েছিল তা আপনি কল্পনাই করে নিন। তিনি প্রজ্ঞাকে শেক্স্‌পীয়ার সাহিত্যের অমৃত নিঙড়ে পান করাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এতদিন ধরে যা শিখেছেন জেনেছেন সব কিছুই তিনি যেন উজাড় করে ঢেলে দিতে চান প্রজ্ঞাপারমিতার মনের ভাণ্ডারে। ক্লাসে যখন 'ওথেলো' পড়ান, তখন মন আর দৃষ্টি থাকে প্রজ্ঞাপারমিতার দিকে। দৈবাৎ কোনো দিন প্রজ্ঞাপারমিতা ক্লাসে না এলে তাঁর আকুল নয়ন ব্যাকুল হয়ে সারাটা ক্লাসের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে ব্যর্থ নিরাশায় ব্যথার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সেদিন তাঁর পড়ানো আর জমে না ; শুধু চক্ষুলজ্জায় আর নিয়ম রক্ষার খাতিরেই পড়িয়ে চলেন তিনি।"

বাঃ! বীমার দালাল কি কাহিনীকার হয়ে উঠল?

"ব্যাপারটা ছাত্র-ছাত্রীদের নজর এড়াল না"—বলে' চলল অম্লান বাড়রী। "জানেন তো আজকালকার ছাত্র-ছাত্রীদের নজর কি রকম চোখা? প্রফেসর সেনের নতুন নামকরণ হলো 'ওথেলো'—এ নামে তাঁকে অভিহিত করা হতো তাঁর অগোচরে। চেহারার দিক দিয়ে কাফ্রী ওথেলোর সঙ্গে তাঁর হয়তো বাহ্যিক সাদৃশ্য ছিল—তফাত এই যে প্রফেসর সেন মানুষটি ছিলেন নিরীহ, নরম সরম। প্রজ্ঞা ক্লাসে না এলে ছাত্র-ছাত্রীরা—বিশেষ করে ছাত্রেরা— বলাবলি করতো 'ডেস্‌ডিমোনা ক্লাসে নেই, ওথেলো আজ পড়াতে পারবে না।'………"

আমি বললাম, "প্রজ্ঞা-শান্তনু সম্পর্কটা ডেস্‌ডিমোনা-ওথেলো সম্পর্কের সঙ্গে মেলে না অম্লানবাবু।"

অম্লান বাড়রী বললে, "কিন্তু ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা তা বুঝতে চাইত না—বুঝলে মজা জমবে না বলে। প্রফেসর শান্তনু সেনের ঘরের কাহিনী, মানে ঘরনীর কাহিনীও কলেজের ছেলে-মেয়েদের জানা হয়ে গিয়েছিল। ঘরনীর নাম ছিল—এখনো আছে—মোক্ষদায়িনী। ছাত্রেরা বলতো শান্তনু সেনের মোক্ষলাভ হয়েছে।"

"প্রজ্ঞাপারমিতা কি জানতো না তাকে আর শান্তনু প্রফেসরকে ঘিরে একটা তামাসার ব্যাপার গড়ে' উঠছে?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"জানি নে।" বললে অম্লান বাড়রী। প্রজ্ঞার উপস্থিতিতে এ নিয়ে আলোচনা করতো না কেউ—তার মুখের ওপর কিছু বলা তো দূরের কথা। প্রজ্ঞাকে দেখলে বুঝতে পারতেন ব্যক্তিত্বের কি অদ্ভুত জাদুমন্ত্র ছিল তার মধ্যে। প্রজ্ঞার বাবাকেও দেখেছি, মাকেও দেখেছি—বুঝতে পারি নে তাদের সন্তানের ভেতর অমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কি করে এলো।…প্রফেসর শান্তনু সেন নিজে ভালো করে পড়েছেন এবং বুঝছেন হয়তো, কিন্তু তিনি ভালো করে পড়াতেও পারতেন না, বোঝাতেও পারতেন না। পারতেন যে না তা-ও বুঝতে পারতেন না। সেই ছিল এক ট্র্যাজেডি। কিন্তু ঠিক ঐ কারণেই প্রফেসর সেনকে ভালো লাগতো প্রজ্ঞাপারমিতার। বিশেষ করে'

প্রজ্ঞাপারমিতার জানা ছিল প্রফেসর শান্তনুর বিবাহিত জীবনের ট্রাজেডি —তাই তাঁর জন্যে প্রজ্ঞার হৃদয়ে ভরা ছিল সহানুভূতি। প্রজ্ঞা শান্তনু সেনের পড়ানো শুনতে শুনতে হয়তো ভাবতো প্রফেসর শান্তনুর ঘরোয়া জীবনের ট্র্যাজেডির কথা—আর তাই দেখে প্রফেসর শান্তনু ভাবতেন প্রজ্ঞা তাঁর 'ওথেলো' পড়ানো শুনে মুগ্ধ হয়েছে, তাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে। খুশীতে ভরে উঠতো শান্তনু সেনের মন। তিনি ভাবতেন 'ধন্য আমি, সার্থক আমার ওথেলো পড়া আর পড়ানো।' প্রজ্ঞাপারমিতার গুণগ্রাহিতা আর রসবোধ কল্পনা করে' মুগ্ধও হতেন।"

আমি বললাম, "কিন্তু কাহিনীটা বড্ড একঘেয়ে হয়ে পড়েছে অম্লান-বাবু। একটু বৈচিত্র্য আনুন।"

অম্লান বাড়রী বললে, "শান্তনু সেনই এনেছিলেন। তিনি অনেক দিন অনেক রাত জেগে 'ওথেলো' নাটকের অনেক নোট লিখে এনে প্রজ্ঞার হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনার জন্যে তৈরি করেছি।' প্রজ্ঞা বললে, 'আমাকে আপনি প্রজ্ঞা বলেই ডাকবেন। আমি আপনার ছাত্রী। আর নোটের জন্যে ধন্যবাদ। আমি সাদরে গ্রহণ করলুম।' শুনে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করলেন প্রফেসর সেন। চমৎকার ছাত্রী! সুন্দর তার বিনয়। অথচ ন্যাকামী নেই—বললে না 'আহা, কেন আবার আপনি আমার জন্যে এত খাটতে গেলেন?'···কিছুদিন পরেই আরো নোট লিখে এনে দিলেন প্রফেসর সেন। প্রজ্ঞা পাতা উলটে দেখলে আগেকার মতোই এবারও সেই একই জাতের 'নোট'—বিভিন্ন বিদেশী পণ্ডিত সমালোচকদের মতামতের সংকলন, শান্তনু সেনের নিজস্ব কোনো মৌলিক মতামত তাতে নেই। দেখে মনে মনে তাচ্ছিল্য আর অনুকম্পার হাসি হাসলে প্রজ্ঞাপারমিতা। নোটের পর নোট পরমানন্দে দিয়ে যেতে লাগলেন শান্তনু সেন, আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন 'ধন্য আমার নোট লেখা।'···"

আমি শুধালেম, "আপনি কি অন্যের মনের কথাও কানে শুনতে পান?"

অম্লান বাড়রী বললে, "সব কথা কি আর কানে শোনা যায় ধনুদা?

অনেক কথা মন দিয়েও শুনতে হয়। কিন্তু ভুল—ভুল—ভুল তাঁর কল্পনা। তাঁর নোট পড়লে না প্রজ্ঞাপারমিতা—চুপি চুপি দিয়ে দিলে সহপাঠিনী শর্বরী রায়কে।"

"শর্বরী রায়টি আবার কে?"

"ঐ যে বললুম প্রজ্ঞার সহপাঠিনী। সার্থক নাম রেখেছিলেন বাপ মা—গায়ের রং রাত্রির নিজস্ব রং-এর মতো। রাত্রির একটা নিজস্ব রূপ আছে—কবিদের কথা যদি মানেন—কিন্তু নিজস্ব বা ধার করা কোনো রূপই ছিল না শর্বরী রায়ের। এখনো নেই। এজন্যে দুঃখ যতটা ছিল শর্বরীর, তার চাইতে ঢের বেশী ছিল লজ্জা। যেন রূপহীনতা তার একটা মস্ত বড় অপরাধ, আর সেই অপরাধের নিদারুণ লজ্জায় সে মাথা তুলতে পারছে না। তার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না কোনো সহপাঠীর, কোনো প্রফেসরের—প্রফেসর শান্তনু সেনের তো নয়ই। এই অবহেলিতা অনাদৃতা, সংকুচিতা রূপহীনা বান্ধবীটির প্রতি দরদ-ভরা ভালোবাসার সীমা ছিল না অপরূপা প্রজ্ঞাপারমিতার। কিন্তু স্নেহের অনুকম্পা দেখিয়ে শর্বরীকে লজ্জা দিয়ে খাট করতে চাইত না প্রজ্ঞা। বালুর নীচেকার ফল্‌গু ধারার মতো গোপন করে রাখতো তার প্রাণের দরদ। প্রফেসর শান্তনুর অনেক খেটে তৈরি-করা নোটগুলো শর্বরীকে গোপনে পড়তে দিয়ে বললে 'আমি ভাই এখন অন্য পড়া পড়ছি। তুই এই ফাঁকে নোটগুলো পড়ে নে। দরকার হলে আমি পরে চেয়ে নিয়ে পড়বো।' কিন্তু পরে চেয়ে নেয় নি সে। পরের ধার করা মতামতের সংকলন প্রজ্ঞাপারমিতার পছন্দ নয়।"

আমি বললাম, "পড়বে না তো প্রফেসরকে আর নোট তৈরি করতে মানা করে দিলেই তো হতো। অনর্থক কেন বেচারাকে খাটানো আর ধাপ্পা দেওয়া?"

"পরমানন্দ থেকে প্রফেসরকে বঞ্চিত করতে চায় নি প্রজ্ঞাপারমিতা। তাছাড়া শর্বরী রায়ের প্রচুর উপকার হয়েছিল নোটগুলো পেয়ে। ওর প্রাণে অদম্য কামনা ছিল পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে নিজের রূপহীনতার ক্ষতি পূরণ করার—তাই প্রাণপণে সে মুখস্থ করলে শান্তনু সেনের তৈরি

নোট। মুখস্থ করবার একাগ্র ক্ষমতা ছিল তার অদ্ভুত। রূপহীনতা অনেক মেয়েকে অনেক কিছু দেয় ধন্মুদা।......'ওথেলো'র নোট তৈরি করা শেষ হয়ে গেলে শান্তনু সেন ব্যথিত হয়ে পড়লেন। কবিতা তিনি পড়াতেন না, পড়াতেন অন্য প্রফেসর। তবু প্রজ্ঞার জন্যে কবিতার নোটও রাত্রি জেগে তৈরি করে দিতে লাগলেন তিনি। মানা করলে তিনি দুঃখ পাবেন ভেবে মানা করলে না প্রজ্ঞাপারমিতা—বললে, 'ধন্যবাদ'। শান্তনু সেন বললেন, 'ছি ছি, ধন্যবাদ কেন ? এ তো আমার কর্ত্তব্য।' সে নোটগুলোও —বলা বাহুল্য—প্রজ্ঞা নিজে না পড়েই দিয়ে দিত শর্বরী রায়কে। নামজাদা প্রকাশক প্রফেসর শান্তনু সেনকে দিয়ে ইংরিজীর নোট লিখিয়ে নিতে চেয়েছিল বেশ মোটা টাকার বিনিময়ে। কিন্তু তাঁর নোট ছেপে বাজারে বেরিয়ে গেলে হবে সাধারণ ছাত্রসমাজের সম্পত্তি—প্রজ্ঞাপারমিতা ভোগ করবে না তার একচ্ছত্র সুযোগ। তাই তাঁর বহু পরিশ্রমে তৈরি-করা নোট মোটা দামে প্রকাশককে না দিয়ে বিনা মূল্যে দিলেন প্রজ্ঞাপারমিতাকে। লিখে লিখে অনেক নোট দেবার পর শান্তনু সেনের মনে হলো প্রজ্ঞাকে মাঝে মাঝে একটু পড়িয়ে দিলে ভালো হয়। কথাটা তিনি পাড়লেন প্রজ্ঞার কাছে। বললেন, 'তুমি আমার বাড়ীতে এসো, প্রজ্ঞা। অবশ্য তোমার যদি অসুবিধা না হয়। আমার লাইব্রেরীতে বসে তোমায় পড়াবো।' প্রজ্ঞার মায়া হলো অ-রাজী হতে। বললে, 'আচ্ছা। মাঝে মাঝে পড়া যাবে।' প্রফেসর বললেন, 'মাঝে মাঝে নয়। অন্তত হপ্তায় দু-তিন দিন না হ'লে...' শেষটায় অনেক অনুনয় বিনয় করে প্রফেসরকে হপ্তায় একদিনে নামালে প্রজ্ঞাপারমিতা।"

"পড়তে লাগলো ?"

"লাগলো। টের পেলেন সহধর্মিণী মোক্ষদায়িনী দেবী। একদিন পড়ানোটা বেশ জমে উঠি উঠি করছে এমন সময় ঝি এসে বললে, মাঠাকরুণ ডাকছেন। পড়ানো স্থগিত রেখে পাশের ঘরের নেপথ্যে চলে গেলেন প্রফেসর শান্তনু সেন। মোক্ষদায়িনী দেবী রীতিমত উঁচু কণ্ঠেই জানিয়ে দিলেন যে তিনি যদ্দিন আছেন তদ্দিন এসব অনাছিষ্টি কাণ্ড চলবে না—

বেহায়া বেম্মো বা খিরিস্টান মেয়েরা কলেজে যা করে করুক, কিন্তু বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করবে কেন ? জানানীটা প্রজ্ঞার কানে গেল—যাওয়ানোটাই উদ্দেশ্য ছিল মোক্ষদায়িনী দেবীর। প্রফেসর শান্তনু সেন অন্দর থেকে পড়ার ঘরে ফিরে এলেন মুখ লাল আর মন কালো করে। প্রজ্ঞা হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। বোবা পুতুলের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রফেসর শান্তনু সেন। তারপর কলেজে এসে কি করে' মুখ দেখাবেন প্রজ্ঞাকে, সেই হলো তার চিন্তা। পড়ার যে ব্যবস্থা হয়েছিল সেটা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেল। অপমান-ব্যথা-ভরা লজ্জাটা বুকে চেপে রইল প্রফেসর শান্তনু সেনের।"

আমি বললাম, "আহা বেচারা!"

"আহা-র এইখানেই শেষ নয় ধনুদা। ক্রমে এল বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষার পর ইংরিজীর খাতা পরীক্ষা করতে গিয়ে বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করলেন শান্তনু সেন, যে কলেজের শ্রেষ্ঠা কুরূপা শর্বরী রায় প্রশ্নপত্রের যে উত্তর লিখেছে তার প্রায় সবগুলোই ভাবে ভাষায় কমায় সেমিকোলনে তাঁর প্রজ্ঞাকে দেওয়া নোটের সঙ্গে আশ্চর্য রকম মিলে যাচ্ছে। অথচ প্রজ্ঞা তার খাতায় যে সব উত্তর লিখেছে তাতে প্রজ্ঞারই নিজস্ব ভাবধারা এবং প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী, প্রফেসর শান্তনু সেনের দেওয়া নোটের সঙ্গে তার মিল নেই। তবে কি তাঁর এত কষ্ট করে তৈরি-করা নোট প্রজ্ঞা কিছুই পড়ে নি ? পরম অবহেলায় দিয়ে দিয়েছে শর্বরী রায়কে ? অথবা হয়তো পড়েছে, কিন্তু তাঁর বাড়ীতে তাঁরই নিমন্ত্রণে পড়তে গিয়ে তাঁরই স্ত্রীর মুখে নেপথ্যে সে যে অপমান বাণী উচ্চারিত হতে শুনেছে, তার প্রতিশোধ নেবার জন্যেই পরীক্ষার খাতায় লেখা উত্তরগুলিতে তাঁর রচিত নোটের কোনো সাহায্যই গ্রহণ করে নি অভিমানিনী প্রজ্ঞাপারমিতা। এ দুটি সম্ভাবনার দুটিই সমান অপ্রিয়, সমান ব্যথা-ভরা। সুতরাং প্রজ্ঞাকে জিজ্ঞাসাও করতে পারলেন না প্রফেসর শান্তনু সেন। লজ্জায় বাধল, অভিমানে বাধল, ব্যথায় বাধল। কিছুই তিনি বলতে পারলেন না প্রজ্ঞাকে। বলে ফেলতে পারলে ভালো হতো—বুকটা হালকা হয়ে বেঁচে যেতেন তিনি।

কিন্তু বলতে না পেরে তাঁর সারাটা বুকের ভেতর অসীম ব্যথা যেন ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। এরি কিছুদিন বাদে অসুখে পড়ল প্রজ্ঞাপারমিতা—তার জীবনের শেষ অসুখ। অবশ্য শেষ যে, সেটা আমরা তখন কেউ বুঝতে পারি নি—প্রফেসর শান্তনু সেন তো নয়ই। শান্তনু সেন দুঃখ পেতে লাগলেন এই ভেবে যে নিশ্চয় তাঁরি দোষে মানসিক আঘাত পেয়ে অসুখে পড়ল প্রজ্ঞাপারমিতা। মনে মনে স্থির করলেন আর লজ্জা নয়, আর কোন প্রকার সংকোচ নয়, প্রজ্ঞাপারমিতা সেরে উঠলেই ক্ষমা চাইবেন, ব্যাকুলভাবে ক্ষমা চাইবেন। কিন্তু হায়! হলো না ক্ষমা চাওয়া। প্রফেসর শান্তনু সেনের বুকে চিরজীবনের জন্যে ব্যথার দাগ রেখে চিরজীবনের জন্যে চলে গেল প্রজ্ঞাপারমিতা।”

আজ চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। সঙ্গে ছিল অতুল চম্পটী, ভৃত্য ভগবান, ঠাণ্ডা পানীয় জলের ফ্লাস্ক, একটা টিফিন-ক্যারিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি। ভগবানকে ভুজঙ্গবাবু ডাকেন ভগু ব'লে, পুরো নামটা তাঁর অপছন্দ। রেস্তোরাঁ আছে চিড়িয়াখানায়, কিন্তু সেটা ফার্‌পো কিংবা গ্রেট ঈস্টার্নের মত নয়। সস্তা রেস্তোরাঁয় ঢোকেন না ভুজঙ্গ চৌধুরী। তাই এ যাত্রায় সহযাত্রী টিফিন-ক্যারিয়ার ইত্যাদি। অতুল চম্পটী একা কোন রেস্তোরাঁতেই ঢোকে না, তার নীতি হচ্ছে ‘একটি আধলা বাঁচানো মানেই এক আধলা রোজগার করা।’ ইংরিজী থেকে ধার-করা নীতিটা; ধার করতে আপত্তি আলস্য নেই চম্পটীর, এ ব্যাপারে সে চার্বাক। ভুজঙ্গ বা অপর কোন কাপ্তান সঙ্গে থাকলে অতুল ফার্‌পো বা গ্রেট ঈস্টার্ন কেন, নিউ ইয়র্কের ওয়াল্‌ডর্ফ অ্যাস্‌টোরিয়া হোটেলে গিয়ে চা খেতেও রাজী।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গণ্ডার দেখলেন ভুজঙ্গবাবু। গণ্ডার দেখলে

ভুজঙ্গবাবুকে। তার নাকের ডগায় একটা ভোঁতা খড়্গ, সারা গায়ে বন্দুকের-গুলি-ঠেকানো সরল চেহারার নির্লোম চামড়া। গণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মনে মনে স্মৃতির হাসি উথলে উঠতে লাগল ভুজঙ্গবাবুর। জাঁদরেল জবরদস্ত প্রায়-মালিক ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভুজঙ্গবাবু, তাঁর অফিসে আড়ালে তাঁকে কেউ কেউ বলতে শুরু করেছে, 'গণ্ডার'। এ কথা তিনি জানেন, আর জেনে খুশিও।

চম্পটী বললে, "বেচারার বউটা সম্প্রতি মারা গেছে হুজুর।"

হুজুর ভুজঙ্গের কিছু যায়-আসে না কারও বউ মরলে। তবু নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "কার?"

চম্পটী জবাব দিলে, "আজ্ঞে, এই গণ্ডারটার।"

ভুজঙ্গ প্রশ্ন করলেন, "দ্বিতীয় পক্ষের ব্যবস্থা করে না কেন?"

"গণ্ডারনী চট্ ক'রে যোগাড় করা তো চাট্টিখানি কথা নয় হুজুর।"—বললে অতুল চম্পটী। "শুনেছি আফ্রিকা না কোথায় নাকি গণ্ডার পাওয়া যায়। অত হাঙ্গামা হুজ্জুৎ আর কে করে? মনের দুঃখ মনে চাপতে গিয়েই এ বেচারা ম'রে যাবে। গণ্ডার বিরহ সইতে পারে না হুজুর।"

ভুজঙ্গ চৌধুরী দেখলেন, বিরহী গণ্ডারের চোখে ঈষৎ উদাস বিষণ্ণ ভাব। অমনি মনে প'ড়ে গেল তাঁর অফিসের কেরানী ছোকরা রাহুল রায়ের কথা। সে ছোঁড়ার আছে কবিতা-লেখার ব্যামো। এখন থাকলে হয়তো এই বিরহী গণ্ডারের ব্যাকুল ব্যথা নিয়ে এক কাঁদ-কাঁদ কবিতা ফেঁদে বসত। এই তো সেদিন অফিসে কুমারী সানন্দা সান্যালের টেবিলে মাসিক-পত্রের পাতায় ভুজঙ্গ ছাপা কবিতা দেখেছিলেন রাহুল রায়ের লেখা, প্রথম লাইনটা হচ্ছে:

"মাটিতে পাতিয়া কান, পৃথিবীর অন্তরের শুনি আর্তনাদ।"

ব্যস্! তবে আর কি! পৃথিবীর চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার ক'রে দিলে হে রাহুল রায়! ঝোঁকের মাথায় ছোঁড়া শেষটায় ভক্ত রামপ্রসাদের মত অফিসের জরুরী কাগজপত্রে কবিতা লিখে না বসে! চিড়িয়াখানার ভেতরেই পরম চিন্তিত হয়ে পড়লেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

"কবিতা তোমার কেমন লাগে হে চম্পটী ?"—শুধালেন চম্পটীকে।

"পদ্যর কথা বলছেন তো হুজুর ? তা, মন্দ কি ? ছেলেবেলায় পড়েছি :

পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।..."

"আহা-হা ! এ যে কানেও ফুল ফুটিয়ে দেয় হে চম্পটী।"—বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। "আর আজকালকার কবিতাগুলো যেন হুল ফোটাতে থাকে। মানে বুঝতে পারে কার বাবার সাধ্যি ?"

"তা যা বলেছেন হুজুর।" বললে চম্পটী। চম্পটী জানে না, কবিতার কানুন বদলেছে অনেক। কবিতা হ'লে তার মানে থাকতে হবে তার কোনও মানে নেই। বেগ মাপা যায়, কিন্তু আবেগ মাপা যাবে কোন্ মাপকাঠিতে ? এখনকার কবিতায় বিশ্বজনীনতা প্রচুর পরিমাণে থাকা চাই ; আর বোঝবার দায় পাঠকের, কবির দায় নয় বোঝানো। যে কবিতা বিশ্বজন যত কম বুঝবে, সে কবিতা তত বেশী বিশ্বজনীন। বোঝা কঠিন, না-বোঝা সহজ, তাই অবোধ্য কবিতা রচনার সহজিয়া পন্থাই হচ্ছে বিশ্বজনীন কবি হবার সহজ পন্থা। এত কথা না ভেবেই চম্পটী বললে, "তা যা বলেছেন হুজুর।"

আবার হুজুর ! চাকরটা 'হুজুর' বলে না, অথচ 'হুজুর' 'হুজুর' করে অতুল চম্পটী ! ভগবান 'হুজুর' বলে না, হুজুর ভাবেও না। বলে দাদাবাবু, ভাবেও তাই।

টিফিন-ক্যারিয়ার, ফ্লাস্ক ইত্যাদি ব'য়ে ব'য়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে ভগবান। চিড়িয়াখানায় সে এর অনেক আগে শেষ যেদিন এসেছিল তখন তু-নম্বর বিশ্ব-মহালড়াই শুরু হবার ঢের দেরি, রিহার্শাল শুরু হব-হব করছে মাত্র। ভারত তখন স্বাধীন হয় নি, পরাধীন চিড়িয়াখানার চেহারায় যে জৌলুস ছিল, স্বাধীনতার তাপস্তিক আবহাওয়ায় তা ঝ'রে গেছে। কমেছে বৈচিত্র্য, কমেছে জানোয়ারেরা প্রকারে আর সংখ্যায়, আর কেমন যেন লঙ্গরখানায় লপ্সী-খাওয়া চেহারা হয়েছে আগাগোড়া জানোয়ার গুলোর।

জলহস্তী আর স্থলহস্তী তু রকম হস্তীই দেখলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

দেখলেন তুলনামূলক ভাবে, জল-পদ্ম আর স্থল-পদ্মের মত। দেখলেন, জলহস্তীর মুখের ওপর একটি লম্বা অঙ্গ কম, তেমনি ঝামেলাও কম। মাথায় মাহুতের গুঁতো খেতে হয় না। হাওদা-বাঁধা পিঠে সওয়ারী ব'য়ে বেড়াতে হয় না, খামখেয়ালী নির্ঝঞ্ঝাট আল্‌সেমির অখণ্ড অবসর। যখন খুশী পাঁচিল-ঘেরা ডাঙায়, যখন খুশী পিঠ-না-ডোবা ডোবার ঘোলা-জলে।

বিরাট বিশ্রী হাঁ জলহস্তীর। নিজের কাছে ভারি সুশ্রী ব'লে মনে হয় বুঝি, তাই মাঝে মাঝে হাঁ ক'রে দেখায়! অতুল চম্পটী বললে, "ঐ হাঁ-র ভেতর একবার একটা বাচ্চা সেঁধিয়ে গিয়েছিল হুজুর।"

"কিসের বাচ্চা ?"

"মানুষের বাচ্চা হুজুর। ছিল মা'র হাতে। রেলিং টপকে পড়বি তো পড় একেবারে জলহস্তীর মুখে।"—চম্পটী বললে, "মা তো তাই দেখে রেলিংয়ের এধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। হায় হায় হৈ-হৈ প'ড়ে গেল। বাচ্চার আদ্ধেক বেরিয়ে আছে জলহস্তীর মুখ থেকে। হল্লা শুনে মারামারি হচ্ছে ভেবে চিড়িয়াখানার অফিসার এলেন বন্দুক হাতে। সবাই বললে—বন্দুক চালাও জলহস্তীর মুখে, তা হ'লে বাচ্চাকে ব্যাটা ছেড়ে দেবে। বন্দুক চালালে না অফিসার, পাছে জলহস্তী মারা যায়। বাচ্চাটাকে আস্ত গিলে ফেললে জলহস্তী। মান্‌ষের বাচ্চা আকৃছার মেলে, কিন্তু জলহস্তী ম'লে জলহস্তী মিলবে কোথায় ?"

"অ্যাঃ!"—এইবারে ভগবান আওয়াজ ক'রে উঠল। এটা আসলে তার প্রশ্ন—মানুষের ছাওয়ালের চাইতে কি একটা জানোয়ারের জানের দাম বেশী ? তারপর বললে, "তারপর ?"

অতুল চম্পটী ভগবানের প্রশ্নের জবাবটা ভুজঙ্গকে দিয়ে বললে, "তারপর শুনেছিলুম চিড়িয়াখানার ডাক্তার এসে ওর একটা জোলাপের ব্যবস্থা করলে। তারপর কি হ'ল জানি না।"

ভুজঙ্গ চৌধুরী বাইরে হেসে মনে মনে বললেন, "গুল্—গুল্, স্রেফ গুল্।" আজ তিনি পুরোপুরি ছুটির মেজাজে, এখানে তিনি মহাদাপটী

অফিস-সিংহ নন। চিড়িয়াখানায় আজ তিনি চান চিড়িয়াখানাই আবহাওয়া আকণ্ঠ পান করতে। অতুল চম্পটী তা জানে, ভুজঙ্গ-চরিত্র তার নখদর্পণে ধরা দিয়েছে।

তারপর গেলেন বাঁদর-বিভাগে। দেখলেন নানা বিভিন্ন জাতের বাঁদর। বললেন, "এরাই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষ, জানলি ভণ্ড ? ডারুইন সাহেব ব'লে গেছে। আস্তে আস্তে ন্যাজ খ'সে আমরা মানুষ হয়েছি।"

চম্পটী ভুজঙ্গ চৌধুরীর মেজাজের নাড়ি টিপে নিয়ে বললে, "তবু বাঁদরামি যায় নি হুজুর।"

আবার টেনে টেনে হেসে হেসে ভুজঙ্গ চৌধুরী বললেন, "বাঁদরামি তবু যায় নি! এঃ এঃ এঃ এঃ এঃ! বলেছ ভাল হে চম্পটী। আর আমাদের চরিত্রের এই বাঁদরামি দেখেই তো ডারুইন সাহেবের কথা বিশ্বাস হয় যে, আমাদের পূর্বপুরুষ বাঁদর।"

কিন্তু ওহে ভুজঙ্গ! তা যদি বল, তা হ'লে তো সাপ, শেয়াল, শকুন, বাঘ, ভালুক, উল্লুক, প্যাঁচা, হায়না—এঁদেরও আমাদের পূর্বপুরুষ ব'লে বিশ্বাস করতে হয়। এঁদের মিশ্র প্রভাব তো আমাদের চরিত্রে অহরহ কিলবিল করছে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, গা-ঘিন-ঘিন ক'রে উঠল ভুজঙ্গ চৌধুরীর। তাঁর পাশ দিয়ে প্রায় গা ঘেঁসে চ'লে গেল এক ঝাঁক গরীব ছোটলোক নোংরা-কাপড়-চোপড়ী নর-নারী বালক-বালিকা। এই জানোয়ারের দল চিড়িয়াখানায় এসেছে জানোয়ার দেখতে! বলিহারি! এদের দুটো একটাকে ভুজঙ্গ চিনতেও যেন পেরেছেন বলে মনে হলো, যারা এখানে ওখানে ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে, ব'সে, শুয়ে নানা ভঙ্গীতে নানা ঢঙে ভিক্ষে করে। ভিক্ষুক এরা।

কিন্তু আমাদের পুণ্য-ভারতে এরা তো তুচ্ছ নয়। ভিক্ষাদান আমাদের আদর্শ মহাব্রত, ভিক্ষুক নইলে এ ব্রতের সাফল্য কি করে হবে? আদর্শ ভারতে তাই ভিক্ষুক চাই—চাই-ই। ভিক্ষুক নইলে আদর্শ ভারত চলতে পারে না। দরিদ্র-নারায়ণ! সত্যি, নারায়ণত্বের বিরাট সৌভাগ্যে এরা

সৌভাগ্যবান্। দারিদ্র্যই এদের জীবনের পরম আশীর্বাদ, চরম গৌরব। অর্থ-প্রাচুর্যের কলুষ এদের স্পর্শ করে নি, বিলাসের ব্যসন এদের পঙ্গু করে নি, ঐশ্বর্যের উদ্বেগ ভারাক্রান্ত করে নি এদের মনকে, সম্পত্তিহীনতাই এদের পরম সম্পদ। এরা সর্বহারা, তাই সর্ব এদের গ্রাস করতে পারে নি। কোন ব্যাংকে এদের একটি কাণা আধলাও নেই, তাই দেশের সবগুলো ব্যাংক একসঙ্গে লালবাতি জ্বালালেও এরা সারারাত অনায়াসে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারে।

তা বটে। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে এই যে সব দরিদ্রনারায়ণের দল কোমর বেঁধে ফি বছর নারায়ণী সেনার সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে, আর উঁচু-তলার মানুষ সংখ্যা-শাসনের হুজুগী-বিলাসে মেতে বছরের পর বছর দলে পাতলা হয়ে চলেছে, তাতে শেষটায় গোটা দুনিয়াটা যে ছোটলোকে ছোটলোকে কিলবিল করে উঠবে। নিজেদের, মানে উঁচুতলার মানুষের, গুরুতর সংখ্যালঘু কোণঠাসা অবস্থার কথা ভেবে শিহরিত হলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

চম্পটী-চরিত অজানা নয় তাঁর। তার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য শুধু বরদাস্ত নয়, উপভোগ করেন তিনি। জানেন কেন সে তাঁর মোসাহেবরূপে পিছু ধরেছে। জেনেও তিনি না-জানার ভান করছেন; আর এ ভান বুঝতে না পারার ভান করছে অতুল চম্পটী।

চম্পটী জানে না (হায় চম্পটী !) যত কম চতুরকে ফতুর করা যায় তত কম-চাতুর্য নেই ভুজঙ্গ চৌধুরীর। অভীপ্সোচিত ক্রিয়াকলাপে যদি টাকা ওড়ায়ও ভুজঙ্গ, কখনও সে যাবে না বরাদ্দের বাইরে। অসংযমের পাকা খেয়ালী সে, দুরূহ শয়তানী খেয়ালের লয়-তানে অদ্ভুত কেরামতি, চমকে তোলে গমকে গিট্‌কিরিতে, আর তারই মাঝে মাঝে লাগায় ঠুংরীর বাহার আর গজলের তর্‌কিফ; ৺রবি ঠাকুরের নবীন গাইয়ে কাশীনাথের মত "আপনি গড়ি তোলে বিপদ-জাল আপনি কাটি দেয় তাহা।" হিসেবিয়ানার পাকা তবলচী তার কালোয়াতির সঙ্গে সঙ্গে ক'ষে দিয়ে চলেছে সঙ্গতি ঠেকা—ধা ধা ধিন্ তেরেকেটে, আর পাকা গাইয়ে ভুজঙ্গ

শক্ত শক্ত তান-কর্তবের জোয়ার বইয়ে দিয়েও ঘুরে ফিরে বার বার ঠিকমত শমে ফিরে আসছে। এক মাত্রা এদিক ওদিক হচ্ছে না কখনও। এ হেন পোক্ত লয়দার গাইয়েকে ঘায়েল করতে পারবে কি অতুল চম্পটীর মত তবল্‌চী ? তা না পারুক, খেলাতে পারবে চম্পটী ; কেন-না খেলতে আপত্তি নেই ভুজঙ্গের।

এদিকে ভুজঙ্গের গাড়ীর ড্রাইভার রৌশনলাল চিড়িয়াখানার বাইরে গাড়ীতে বসে প্রণয়-পত্র পড়ছে। পরিণয় আশা করে দিন গুনছে আর অনেক রাত জাগছে রৌশনলালের প্রণয়িনী রোশনী—নামটা রৌশনেরই দেওয়া কি-না কে জানে ?—এ চিঠি তারই লেখা, দূর সুন্দরগাঁও থেকে। রৌশন চলে এসেছে এ শহরে পয়সা কামাতে, বলে এসেছে—কামানো যথেষ্ট হলেই দু হাত এক করে ফেলবে সে, রোশনী যেন ভেবে ভেবে মাথা না ঘামায়। হয়ে গেছে বছর খানেক, এখনও হয়তো যথেষ্ট কামানো হয়নি রৌশনলালের, তাই দু হাত এখনও আলাদাই থেকে গেছে। এই বছর খানেক ধরে এত প্রেমপত্র পেয়েছে রৌশনলাল রোশনীর কাছ থেকে, যা ওজনদরে বেচলে যে-কোন অর্ডিনারী সিগ্রেটখোরের একদিনের সিগ্রেটের খরচা ওঠে। আসলে হয়তো সেগুলো রোশনীর কাঁচা হাতের লেখা নয়, কোন পাকা হাতের রচনা ; হয়তো রোশনীর বাবাই কোন পাকা প্রেমপত্র-লিখিয়েকে দিয়ে রচনা করিয়ে পাঠিয়েছে ঘন ঘন, পাছে রৌশনলালের মন খালি পেলে সেই সুযোগে কোন শহুরে মেয়ে জুড়ে বসে। এসব প্রেমপত্রের জবাব দিতে রৌশনলাল বটতলা-সংস্করণ 'সরল প্রেমপত্র রচনা শিক্ষা'র সাহায্য নিয়েছে, নিচ্ছে, নেবেও। প্রেম যত সহজে এসেছে রৌশনলালের, প্রেমপত্র রচনা তত সহজে আসে না। প্রেমে পড়লেই প্রেমপত্র লিখতে পারা যাবে, বা প্রেমপত্র লিখতে হলেই প্রেমে পড়তে হবে, এমন কোন কথা নেই।

রৌশনলালের মত স্বাপ্নিক শোফার ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার যুগ থেকে বর্তমান অসভ্য যুগ পর্যন্ত আর-একটি দেখা যায় না। স্বপ্ন,—স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন দেখে রৌশনলাল। রোশনীকে নিয়ে নীড় বাঁধার স্বপ্ন। মাইনে পায় ভুজঙ্গ

চৌধুরীর কাছ থেকে, থাকে খায় ভুজঙ্গ চৌধুরীর কাছে ভুজঙ্গেরই খরচায়, বখশিশ ইত্যাদি পায় কখনও কখনও, পোশাক-আশাকও দেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। শোফার-সমাজের কুলাঙ্গার রৌশনলাল—বিড়ি-সিগ্রেট-চুরুট-তামাক খায় না, পান করে না মদ্য, যায় না ঘোড়দৌড়ে, মারে না আড্ডা। গাড়ি চালিয়ে, স্নান-আহার-ক্ষৌরকর্ম-নিদ্রা-প্রেমোপন্যাসপাঠ-প্রাতর্সান্ধ্যকৃত্যাদি অবশ্যকরণীয় কাজকর্ম করে' বাকি সময়টা অহোরাত্র সে রোশনীর স্বপ্ন দেখে চোখ মেলে মেলে। রোশনী তার কাছে ছ-পাই মানবী আর সাড়ে-পনরো-আনা কল্পনা। রবি-ঠাকুরী কায়দায় মানবী আর কল্পনায় আধা-আধি বখরা নয়। রোশনীর আধ-ইঞ্চি হাসিকে সে স্বপ্নের সাঁড়াশি দিয়ে টেনে টেনে আড়াই ফুট লম্বা করে, আর তার ওপর মোনালিসার রঙ চড়ায়।

রোশনীর এবারের চিঠিখানা আড়াই পাতা লম্বা, আবেগে এত বোঝাই যে হজম করতে বেগ পেতে হচ্ছে। চিঠির প্রেম-গদগদ অন্তিম অনুচ্ছেদটি পাঠ করে দুটি চোখ প্রেম-ছলছল হয়ে উঠলো রৌশনলালের। রৌশন-প্রেম-পাগলিনী রোশনীর মুখচ্ছবি চোখের সামনে কল্পনা করে নিয়ে সপ্রেম স্নেহভরে এবং সস্নেহ প্রেমভরে রৌশনলাল বললে, "পগল্লী কহীঁকা!"

চমকে উঠলাম চিড়িয়াখানার ভেতরে চম্পটী-কণ্ঠে এর তর্জমা-প্রতিধ্বনি শুনে। অতুল চম্পটী হাঁ-হাঁ ক'রে বলে উঠল, "আরে, আরে, করিস কি, করিস কি পাগলী কোথাকার?"

চেয়ে দেখি, এক বুড়ী ভুজঙ্গ চৌধুরীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে' মাথা কুটে বলছে, "দে বাবা, রাজা-বাবা, এই গরিব দুখিনীকে কিছু উপুড়-হস্ত করে যা বাবা।" কেমন করে' ভুজঙ্গকে সে রাজা-বাবা বলে চিনতে পেরেছে।

পা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে ভুজঙ্গ চৌধুরী টের পেলেন, তাঁর মোটা পায়ের চাইতে বুড়ীর রোগা হাতের জোর কম নয়, হস্ত উপুড় না করলে শোভনভাবে পা ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে না। বুড়ী বলছে, সে মানত করেছিল তার ছেলের ব্যামো সারলে জোড়া পাঁঠা দেবে কালীঘাটে। ছেলেকে মা

সারিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর পাওনা-গণ্ডা এখনও মেটানো হয় নি। তাই দে বাবা, একটা পাঁঠার দামও না দিস, অন্তত দুটো টাকা দিয়ে যা।

লম্বগ্রীব জিরাফ দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে হঠাৎ এই বিপত্তিতে বিচলিত হয়ে উঠলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। মনে হলো, জিরাফটা যেন তাঁকে বেকায়দায় দেখে মনে মনে হো-হো করে হাসছে। চট করে এক টাকার একখানা নোট ফেলে দিতেই বুড়ীর হাত আলগা হয়ে গেল ভুজঙ্গ চৌধুরীর পা থেকে। বুড়ী চলে গেল অন্য পায়ের খোঁজে এক টাকার নোটখানা আঁচলে বেঁধে। দেখে বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন, কিন্তু তাঁর অলক্ষ্য হাসিতে দমবার নয় বুড়ী। একদল লোক যেখানে ছোট বড় ক্যাঙারুর তামাসা দেখছিল, সেইখানে গিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে হুকুম ঝরাতে লাগল—আমার সোয়ামী আজ দু মাস ব্যামোতে বিছানায় শুয়ে আছে। পয়সা অভাবে তার ওষুধ-পথ্যি করতে পারছি না। তোমরা এই দুখিনীকে কিছু কিছু সাহায্য কর বাবারা। বাবারা তখন ক্যাঙারুদর্শনে মশগুল, আর রাজা-বাবা কেউ নেই তাদের ভেতর। বুড়ী তাড়া খেয়ে হটে গেল।

জানি বুড়ি মাঝে মাঝে আসে চিড়িয়াখানায়, এসে চিড়িয়া দেখে আর করুণ কাহিনীর অভিনয় শুনিয়ে পয়সা কামায়। নিজের জন্যে একটি আধলা কোনদিন চায় না বুড়ী—দান-ভিক্ষা করে কোন দিন পুত্র, কোন দিন বিধবা কন্যা, কোন দিন স্বামী, কোন দিন বা বিধবা মুমূর্ষু পুত্রবধূর জন্যে। কিন্তু বুড়ী জানে না আমি জানি, বুড়ীর কেউ নেই, কে—উ নেই। ছেলে, বউ, মেয়ে সব মরেছে। আধ-মরা বিবাগী সোয়ামী কোথায় চলে গেছে; ঠিকানা রেখে যায় নি, ফিরেও আসে নি। এতদিন হয়তো বুড়ীকে সে বিধবা করেছে অথবা হয়তো করে নি। এই দু-নম্বর 'হয়তো'টাকেই 'নিশ্চয়' ভেবে নিয়ে বুড়ী বৈধব্যের মুখে তুড়ি মেরে সিঁদুরী-সাধব্য ঘোষণা করে' চলেছে ললাটে সিঁথিতে। এবং যারা তার নেই, তাদেরই অস্তিত্ব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ঘোষণা করে চলেছে, নিজের অস্তিত্বের খোরাক সংস্থানে।

ভগবানের হাতস্থ টিফিন-ক্যারিয়ার থেকে হালকা মিঠে গন্ধ এসে খোঁচা মারছিল অতুল চম্পটীর নাকের ভেতর। সে খোঁচায় উদাস হয়ে

উঠল চম্পটীর মন। চম্পটী শুধালে, "আপনার ঘড়িতে কটা বাজল হুজুর?"

হুজুর ভুজঙ্গের হাতঘড়ি ছিল পাঞ্জাবির চুড়িদার হাতার ঝাপসা আড়ালে। আড়াল ঘুচিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন চম্পটীর দিকে। নীরব ইশারায় বললেন, "দেখে নাও হে চম্পটী, কটা বাজল।" প্রশ্নের জবাব দেওয়াকে কৈফিয়ত দেওয়ার সামিল মনে করেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। আর কৈফিয়ত দিয়ে খানদানের ঝাণ্ডা নিচু করবার ছেলে তিনি নন।

হুজুরের হাতঘড়িতে সময় দেখে বিচলিত হয়ে বিচলিততর কণ্ঠে অতুল চম্পটী সবিনয় নিবেদন জানালে, "এই বেলা কিছু খেয়ে নিন হুজুর।" নিবেদনী কায়দায় হুকুম করতে চম্পটী অদ্বিতীয়। তারপর ভগবানকে বললে, "চাদরটা এই গাছতলে পেতে ফেল হে ভগবান। বেশ ছায়া আছে এইখানটায়।" ওপর দিকে চেয়ে ইতিমধ্যে তার দেখা হয়ে গেছে গাছের ডালে কোন পাখি নেই যে, আপন দেহ থেকে সহসা কিছু ত্যাগ করে নিচে ভোজ-ভণ্ডুল ঘটাতে পারে। ভগবানের নিজের অন্তরের তাগিদও যে ছিল না, একথা বলা যায় না; তাই সবুজ ঘাসের ওপর চট্‌ ক'রে সাদা চাদর বিছানো হয়ে গেল।

হুজুর খুব জাঠরিক তাগিদ বোধ করছিলেন না। কেন-না, প্রথমত প্রাতরাশ খাবার বেলায় মোটেই আজ রাশ টানেন নি; দ্বিতীয় কারণটা মানসিক। তাই বললেন, "পরেই হবে 'খন। এত ব্যস্ত হবার কি চম্পটী?"

জিভে কামড় দিয়ে চম্পটী বললে, "ছি ছি, সে কি কথা হুজুর! ব্যস্ত হব না তো কি? আগেই আমার খেয়াল করা উচিত ছিল। আপনাদের কি আর আমাদের মত চাষাড়ে পেট হুজুর, যে ভোর থেকে ইস্তক এক পেয়ালা চা পর্যন্ত না পড়লেও চোঁ-চোঁ করবে না?"

"সে কি? এক পেয়ালা চা-ও এখন পর্যন্ত মুখে দাও নি চম্পটী?"—ব্যথামুখর জিজ্ঞাসা ভুজঙ্গ চৌধুরীর।—"আমি যে বলেছিলাম, তোমার ভোরের কাজ-টাজ সেরে বাড়ি ফিরে চান-টান করে ঠাণ্ডা হয়ে তারপর আমার কাছে আসবে সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাদ—"

চম্পটী বললে, "চান করে ঠাণ্ডা হয়েছিলাম হুজুর, কিন্তু চা খেয়ে গরম হবার আর সময় ছিল না। এগারোটার ভেতর আপনার এখানে পৌঁছুবার কথা কি না! কথার খেলাপী হওয়া চম্পটীর ধাতে নেই, তাতে চা খাওয়া হোক আর না-ই হোক।"

"ভারি লজ্জার কথা হে চম্পটী। এস, তবে এখুনি বসা যাক।"

জোর করেই বসালেন চম্পটীকে চাদরের ওপর। চম্পটী যাচ্ছিল ঘাসের ওপর বসতে। কেন? না, হুজুরের সঙ্গে কি আর একসঙ্গে বসা চলে? চাঁদের সঙ্গে এক চাদরে বসবে কেরোসিন কুপি? চাঁদ তখন জেদ করে' রেড়ির তেলের মেটে প্রদীপকেও সঙ্গে বসালেন। "ঘাসে নয়, ঘাসে নয় রে ভগু। পাশে আয়। জায়গার অভাব নেই সাদা চাদরে। যাঁহা সবুজ তাঁহা সাদা। আমরা সবাই এক চিড়িয়াখানার চিড়িয়া হে চম্পটী।"

এক চিড়িয়াখানার তিন চিড়িয়া কাছাকাছি বসল এক চাদরে। টিফিন-ক্যারিয়ারের ভেতরের জিনিস বাইরে এসে সদ্ব্যবহৃত হতে লাগল। ড্রাইভার রৌশনলালের টিফিন আলাদা করে গাড়ীতে দেওয়া আছে। তার ব্যবহার তখনও শুরু করে নি রৌশনলাল। রোশনীর মূল প্রেমপত্র পড়া শেষ করে সে তখন তার "পুনশ্চ" পড়ছে শেষ পৃষ্ঠার তলানিতে। রোশনী লিখেছে—এমনিতেই রৌশনলালের বিরহে মন তার অহোরাত্র কাঁদে, তার ওপর সম্প্রতি রোশনীর বাবা মাত্র দু শো টাকা দেনার দায়ে মুশকিলাপন্ন; অথচ এমন কোন মুশকিল-আসান দরদী দোস্ত নেই যে, এই টাকা কটা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিতে পারে। ছলছল চোখে রৌশনলাল রুমাল বুলিয়ে নিলে। কালই দু শো টাকা রৌশনলালের ব্যাংকের জমা থেকে বেরিয়ে রোশনীর বাবার নামে রওনা হয়ে যাবে। আজ ব্যাংক বন্ধ। দুঃখ ভোলবার জন্য সঙ্গে-আনা প্রেমের উপন্যাসখানা পড়তে লাগল রৌশনলাল। তবু থেকে থেকে তার মনে হতে লাগল, দু শো টাকার অভাবে রোশনীর বাবা বিপন্ন।

কিন্তু চিড়িয়াখানার মাঠে পাতা চাদরের মাঝামাঝি বসে ভুজঙ্গ চৌধুরী ভাবছিলেন আজকের মিঠে পরিকল্পনাটা মাঠে মারা গেল। প্রফেসর

ট্যালপেট্রোর গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস দেখতে যেতে এক কথায় রাজী হয়েছিল মিস্ সানন্দা সান্যাল; ভুজঙ্গ ধরে নিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে চিড়িয়াখানায় আসতেও রাজী হবে। প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অনুরোধকে তুড়ি মারতে আর ভরসা পাবে না, নরম যে হয়ে এসেছে তা তো সার্কাসযাত্রার সঙ্গিনী হওয়াতেই বোঝা গেছে। কিন্তু না। চিড়িয়াখানায় আসতে সে রাজী হয় নি। সোজা বলে দিয়েছে, তার সময় হবে না। অথচ এদিকে তার আগেই ভুজঙ্গ চৌধুরী বলে' বসেছিলেন, "কাল ছুটির দিনটা চিড়িয়াখানা দেখব হে রৌশনলাল।" আর রৌশনলাল বলেছিল, "যো হুকুম সাহেব।" তাই আসতেই হয়েছে চিড়িয়াখানায়। সঙ্গিনী হয় নি সানন্দা, সঙ্গী করে' নেওয়া হয়েছে অতুল চম্পটীকে। খুশী হয়ে সঙ্গী হয়েছে অতুল চম্পটী। কেন-না, তার মনের চৌবাচ্চায় সাঁতার কাটছে মতলবের পুঁটিমাছ।

ভুজঙ্গের পাশে বসে সঙ্কুচিত ভঙ্গীতে খেতে খেতে চম্পটী বললে, "কত পুণ্যি করেছিলেম জানি না হুজুর, কিন্তু ঢের অপরাধ জমা হচ্ছে জানি।"

কুমারী সানন্দা সান্যালের অমার্জনীয় অপরাধের কথা মনে করে ভুজঙ্গ চৌধুরী বললেন, "কিছু না চম্পটী। তুমিও যা, আমিও তা। তলিয়ে দেখলে মানুষে মানুষে কোনও ভেদ নেই। মাথায় গাঁট্টা মারলে তোমারও লাগবে, আমারও লাগবে। চায়ে চিনি তোমারও চাই, আমারও চাই—যদি না ডায়েবিটিস থাকে ; শুধু এক-আধ চামচ এদিক আর ওদিক। জ্বর হলে তোমার টেম্পারেচার ওঠে, আমারও ওঠে। শীত তোমার আমার দুয়ের কাছেই ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মিতে দুয়েরই গরম। ক্ষিদে পেলে খাওয়া আর তেষ্টা পেলে পান করা—এ তোমাকেও করতে হয়, আমাকেও করতে হয়।"

"কিন্তু হুজুর আপনারা ছিনিমিনি খেলেন রাজভোগ নিয়ে, আর আমাদের সময় সময় প্রজাভোগও জোটে না।" অনুদাত্ত কায়দায় চম্পটী বললে। "আর আমাদের তেষ্টা সাদামাটা জলেই মেটে, কিন্তু আপনাদের তেষ্টা মেটাবার জন্যে যাদের বোতলে বসতি, তাদের সব কড়া কড়া

বিলিতী নামে আমরা দাঁতও ফোটাতে পারি না হুজুর।"—ব'লে হুজুরের আমীরী দেহ থেকে নিজের গরিবী শরীরটাকে সরিয়ে নেবার ভান একটু করলে অতুল চম্পটী। ভ্রূক্ষেপবিহীন ভগবান তখন আনমনে টিফিন খাচ্ছে। ভুজঙ্গ চৌধুরী তার হুজুর নয়, দাদাবাবু; আর মানুষে মানুষে সাম্য বা অসাম্য নিয়ে সে মাথা ঘামাবার দরকার বোধ করে না। মাঝে মাঝে দু-একবার উদার অবস্থায় ভুজঙ্গ ভগবানকে বলেছে, তোতে আমাতে কোনও তফাত নেই রে ভগু। আর ভগবান অম্লানবদনে বিনা দ্বিধায় সেই তফাতহীনতা মেনে নিয়েছে; বলেছে, তা তো বটেই দাদাবাবু। প্রতিবাদের নামগন্ধও আনে নি মনে বা মুখে। এই সব অপ্রতিবাদী পাঁঠার কাছে সাম্যবাদী তত্ত্ব আউড়ে আনন্দ মেলে না। আনন্দ পেলেন চম্পটীর কাছে, চম্পটীর বিনয়-বিগলিত বচনামৃতধারায়। এমন সবিনয়-জোরালো-প্রতিবাদমুখর বশম্বদ বয়স্য থাকলে তার কাছে নিজের পরম ঐশ্বর্যকে পরম দৈন্যের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে পরমানন্দ মেলে। ভুজঙ্গ চৌধুরীর হৃদয়ের বৈঠকখানা পেরিয়ে একেবারে অন্দরমহলের অন্তরঙ্গ অতিথি হয়ে বসল অতুল চম্পটী।

পুরো দিনটা চিড়িয়াখানায় না কাটিয়ে ফিরে গেলে খবর পেয়ে (আর পাবে তো নিশ্চয়) সানন্দে অট্ট-উপহাসি হাসবে সানন্দা। সানন্দা-সঙ্গ-হীনতা ভুজঙ্গ চৌধুরীর চিড়িয়াখানা-দর্শন-পরিকল্পনাকে জব্দ করতে পারে নি, এইটে প্রমাণ করবার জন্যেই বিকেলের আগে ফেরা চলবে না।

"তুমি তো অনেক খবরই রাখ, অনেক কিছুই জান চম্পটী।" বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। "বল দেখি, অফিস ছুটির দিনে কোন ম্যানেজিং ডিরেক্টর যদি তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বলে, আমার সঙ্গে অমুক জায়গায় যেতে হবে—এই ধর কোন পার্টিতে কিংবা অপর কোথা, তা হলে প্রাইভেট সেক্রেটারির কি 'না' বলার হক্ আছে? অফিসের চৌহদ্দির বাইরে আর লাল তারিখগুলোতে কি প্রাইভেট সেক্রেটারির কোন ডিউটিই নেই?"

চম্পটী বললে, "তা হলে আর প্রাইভেটই বা কি হলো, আর

সেক্রেটারিই বা কি হলো ? প্রাইভেট সেক্রেটারিকে প্রাইভেটও হতে হবে, সেক্রেটারিও হতে হবে। তার আবার অফিসের ভেতর আর বার। তার আবার কালো তারিখ আর লাল তারিখ। প্রাইভেট সেক্রেটারি তো আর অর্ডিনারী কেরানী নয় হুজুর। বে-আদবি করলে হুজুর, অমন প্রাইভেট সেক্রেটারিকে সটান জবাব দেওয়া উচিত।"

আনমনা উদাসভাবে ভুজঙ্গ চৌধুরী বললেন, "কিন্তু জবাব দিলেও তার কাজের অভাব হবে না চম্পটী। এমন লোক আছে যে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।"

সঙ্গে সঙ্গে বিধাতার চাঁটির মত এক প্রকাণ্ড চিল এসে প্রচণ্ডবেগে ছোঁ মেরে ভুজঙ্গ চৌধুরীর হাতের সিকি-খাওয়া খাবারগুলো প্লেটসুদ্ধ ছড়িয়ে ফেলে দিল চিড়িয়াখানার অবুঝ সবুজ মাঠে।

"আহা হা হা হা!"—আর্তনাদ করে উঠল অতুল চম্পটী। "কাণ্ডটা দেখলেন হুজুর ? আপনার ভোগে লাগতে দিলে না, অথচ ওর নিজের ভোগেও লাগল না।"

"এমনই চিলের ভয়েই জবাব দিতে চাইলেও দেওয়া যায় না, চম্পটী।" মনে মনে বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী তাঁর উল্টো অফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন. ডি. হোড়ের কথা ভেবে।

চম্পটী বললে, "আপনার জন্যে হুজুর ওই রেস্টুরেন্ট থেকেই বরং কিছু—"

"দরকার নেই চম্পটী। পেটে আর ঠাঁই নেই।"

"তেষ্টা যদি পেয়ে থাকে হুজুর, তা হলে সে ব্যবস্থাও বলেন তো—"

"ক্ষেপে গেলে না কি হে চম্পটী ? তেষ্টা পেলে ফ্লাস্কের দিশি জলেই চলবে। এটা চিড়িয়াখানা হে চম্পটী, বাগানবাড়ি নয়।"

"এইবারে তা হলে বলি হুজুর, যদি নির্ভয় দেন।" বললে অতুল চম্পটী। "ভোরে যে আজ বেরিয়েছিলাম সে আপনারই কাজে। তোফা একখানা বাগানবাড়ি জলের দামে পাওয়া যাচ্ছে হুজুর। শহরেরই উপকণ্ঠে, মোটরে গেলে মাইল বারোর পথ।"

"বাগানবাড়ী? বাগানবাড়ী দিয়ে কী হবে চম্পটী?"

চম্পটী জানে, এই বাগানবাড়ী-বৈরাগ্যের বাণী বেরিয়েছে ভুজঙ্গের মুখ থেকে, বুক থেকে নয়। সোজা জবাব দিলে না প্রশ্নের। বললে, "জীবনে অনেক বাগানবাড়ী দেখেছি হুজুর, কিন্তু এটির মত আর দেখি নি। মোগলাই আমীরী কায়দার ওপর এ যুগের রঙ-চড়ানো।" চম্পটী বর্ণনায় ভবভূতির আর উপমায় কালিদাসের বাবা! কথার ফুলঝুরি দিয়ে রামধনু রঙে মন-পাগলানো ছবি এঁকে মায়াকাজল বুলিয়ে দিল ভুজঙ্গ চৌধুরীর চোখে। চম্পটীর চমক-লাগানো বর্ণনা শুনে ছ'নম্বর বাগানবাড়ীর জন্য লোভাচ্ছন্ন হয়ে উঠল তাঁর অন্তরাত্মা।

"কথাবার্তা মোটামুটি কয়েছি। নেয্য দাম হেসে-খেলে দেড় লাখ হবে, কিন্তু আপনাকে হুজুর লাখেই করিয়ে দিতে পারব।" বললে অতুল চম্পটী।

"গোটা চারেক শূন্যের আগে দশ আর পনরোর তফাত কিছু আকাশ-পাতাল নয় চম্পটী। কিন্তু দেড় লাখের বাগানবাড়ী যে এক লাখে ছাড়বে, মালিকানার কোন গোলমাল আছে? না, কি ভূতের দৌরাত্ম্যি?"

চম্পটী বললে, "মালিক মেয়েমানুষ হুজুর। দিবাকর দালালের নাম শুনেছেন তো? দেবতুল্য ব্যক্তি। ওঁরই ধর্মপত্নী সৌদামিনী দেবীই হচ্ছেন বর্তমান মালিক।"

"দিবাকর দালাল? যার গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাংক লাটে উঠেছিল হে চম্পটী?"

"হ্যাঁ হুজুর। অন্য ব্যাংকগুলো সব একসঙ্গে জোট বেঁধে সাঁট করে লাটে তুলে দিয়েছিল।" বললে চম্পটী। "ভাড়াটে দালাল লাগিয়ে চারধারে গুজব রটিয়ে দিলে—গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাংক পটল তুলবে, তার আগে যে যার জমা টাকা তুলে নিয়ে সরে পড়। অমনি মরিয়া হয়ে টাকা তোলার হিড়িক পড়ে গেল। এক সঙ্গে সবাই সব টাকা ফেরত চেয়ে বসলে দুনিয়ার কোন ব্যাংক টেঁকে হুজুর? গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাংক—

বাঙালীর একটা কত বড় বুক-ফোলাবার জিনিস, ভেবে দেখুন, দশচক্রে পড়ে লাল বাতি জ্বালাতে হলো তাকে। আর কেউ হলে সেই দুঃখে আত্মঘাতী হতো হুজুর। দালাল মশাই শুধু একবার লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'মা তারা, তোরই ইচ্ছে।' দেবতুল্য লোক হুজুর।"

"তা তো বটেই চম্পটী। এত বড় একটা ধাক্কা অমন সহজে সামলানো!"

"বাগানবাড়ীখানার মালিকের যত কিছু টাকা তার শেষ পাইটি পর্যন্ত ছিল এই গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাংকে। তা হলেই বুঝুন হুজুর, শেষটায় দেনার দায়ে ঠেকে বাগানবাড়ীটা তাঁকে বেচে দিতে হলো। তার পরেই মালিক হলেন সৌদামিনী দেবী, মানে তাঁর বেনামীতে দিবাকর দালাল মশাই। তাঁরই সঙ্গে আজ ভোরে কথা কয়ে এসেছি হুজুর। বললুম, আপনি তো বাগানবাড়ী এক রকম ব্যবহারই করেন না, তার ছায়াও মাড়ান না বলতে গেলে। তা হলে আর খামোখা ওটাকে রেখে দিয়েছেন কেন?"

"বল কি চম্পটী? এমনি ফেলে রেখে দিয়েছেন?"

"এক রকম তাই হুজুর। এই ন'মাসে ছ'মাসে হয়তো এক-আধবার পিকনিক করতে গেলেন। ওর জন্যে তো হুজুর চিড়িয়াখানা আছে, বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে—বাগানবাড়ী পুষে রাখার দরকারটা কি? এ যেন হলো গিয়ে আপনার ইয়েও করব না, রাস্তাও ছাড়ব না।" হুজুরের চেহারা চোখ দিয়ে একটু চেখে নিয়ে খাটো গলায় চম্পটী অবার শুরু করলে, "দেবতুল্য ব্যক্তি তিনি, মানি। কিন্তু হুজুর, বাগানবাড়ী রাখতে হ'লে কাপ্তেনী কল্‌জে চাই। দেবতুল্য মানুষ মাথায় থাকুন, তাঁদের ভক্তি-ছেদ্দা করতে পারি, ভালবাসতে পারি নে। তাঁরা আমাদের আপনার জন নয়। আমাদের চাই মানুষের মত মানুষ।"—বলে চোখের ইশারা ছুঁড়লে ভুজঙ্গ চৌধুরীকে লক্ষ্য করে।

চম্পটী আমড়াগাছি করছে এটা ভুজঙ্গ চৌধুরী বুঝলেন না এমন নয়। বুঝলেন যে, সেটা চম্পটীও বুঝলে। কিন্তু চম্পটী জানে, তোয়াজ করলে তোয়াজকে তোয়াজ বলে চিনতে পেরেও মানুষ খুশী হয়।

চম্পটী বলতে লাগল, "শুনে হুজুর, দালাল মশাই বললেন, তা তো বটেই; আমি তো হলেম গিয়ে ও-রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস। নেহাত ভদ্রলোক দায়ে ঠেকেছিলেন বলেই টাকা দিয়ে রাখতে হয়েছিল বাগানবাড়ীটা। খদ্দের পেলেই ছেড়ে দেব, তবে কিনা এমন খদ্দের হওয়া চাই যে এ বাগানবাড়ীর মর্যাদা দিতে পারবে। তখন হুজুর আমি বললুম—আপনার কথা ভেবে—খদ্দের আমার হাতেই আছে। কি বলেন হুজুর? আছেন না?"

একটু ভাবলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। যেন হিমালয় পাহাড়ের বুকে পেণ্ডুলাম দুলছে। চৌধুরীর চোখে চোখে চেয়ে রইল চম্পটী, চোখের চাউনি দিয়ে হিপ্‌নোটিক পাস দিচ্ছে যেন। তারপর বললেন ভুজঙ্গ, "ব্যবস্থা তা হলে কর চম্পটী। বাগানবাড়ী আমি নোব। অবিশ্যি তার আগে একদিন নিজের চোখে একবার দেখে আসা দরকার।"

চম্পটী হাসি-গদগদ মুখে বললে, "সে তো একশোবার হুজুর।" খনার বচনে তো বলেইছে: 'বলে বলুক হাজার লোকে, আগে দেখ নিজের চোখে।' নিজের চোখের ওপর হুজুর, আর কোন কথা নেই। দেখাবার ব্যবস্থা আমি করছি হুজুর। তবে কিনা, আপনি যেন কেনবার তেমন একটা গরজ দেখিয়ে বসবেন না। গরজ দেখলে হয়তো ওই দেড় লাখেই উঠে বসে থাকবেন, লাখে নামতে চাইবেন না দালাল মশাই। আপনি হুজুর, দেড় লাখ ঝনাৎ করে ফেলে দিতে পারেন; কিন্তু আমার একটা ডিউটি আছে তো আপনার কিফায়েত দেখা! নইলে ধর্মে পতিত হব যে! কি বলেন হুজুর?"

"সে কথা যথাসময়ে ভেবে ঠিক করা যাবে 'খন চম্পটী।" বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

তিনি ভাবছিলেন, আজকেই এ সময়ে এন. ডি. হোড় কেন এল চিড়িয়াখানায়! ভুজঙ্গের উলটো অফিসের সর্বেসর্বা এন. ডি. হোড়; অফিসে আসতে যেতে প্রায়ই মুখোমুখি হয়। মাঝে মাঝে হয় মামুলী প্রীতিহীন প্রীতিসম্ভাষণ, অবশ্য নেহাতই যখন চোখোচোখি হয়ে যায়। হোড়

কথা কয় কম—হয়তো অনেক বেশী ভাবে ব'লেই বেশী কইবার সময় মেলে না তার।

এন. ডি. হোড় দূরে দাঁড়িয়ে শিম্পাঞ্জী দেখছিলেন। ভুজঙ্গের মনে হলো ওটা হোড়ের ভান, নিছক ভণ্ডামি। শিম্পাঞ্জী দেখবার ভান করে আড়চোখে লক্ষ্য করছে অতুল চম্পটী-সম্বলিত ভুজঙ্গ চৌধুরীকে।

এন. ডি. হোড়ের স্পর্ধা কল্পনা করে মনের গহনে পরম গোপনে ক্ষেপে উঠলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। ক্ষ্যাপামির কোন আভাস বাইরে বেরুতে দিলেন না ; পাশেই অতুল চম্পটী রয়েছে। এন. ডি. হোড় বড় কোম্পানীর কর্তা, কিন্তু ভুজঙ্গ চৌধুরীর কোম্পানী প্রায় অনায়াসেই সেটাকে তুড়ি মেরে কিনে নিতে পারে। অবশ্য হোড় যদি বেচে। কিন্তু বেচবে না, বেচবে না, বেচবে না এন. ডি. হোড়। কথা কম কয়, ভাবে বেশী—এ লোক মানুষ খুন করতে পারে। এন. ডি. হোড়কে খুন করতে পেলে খুশী হতেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। মেকলে সাহেবের তৈরী পেনাল কোড চালু না থাকলে হয়তো চেষ্টার ক্রটি রাখতেন না।

সন্দেহের প্রলয় ঝঞ্ঝায় তচনচ হতে লাগল ভুজঙ্গ চৌধুরীর মন। অমন ন্যাকা সেজো না হে এন. ডি. হোড়। নিশ্চয় তুমি খবর পেয়েছ ভুজঙ্গ চৌধুরীর আজকের নিমন্ত্রণকে মুখোশ-পরা আদেশ জেনেও প্রাইভেট সেক্রেটারি কুমারী সান্যাল সে নিমন্ত্রণ হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছে, আসে নি ভুজঙ্গের সঙ্গে চিড়িয়াখানায়। সেক্রেটারি-বঞ্চিত ভুজঙ্গ চৌধুরীর ট্র্যাজেডি-তামাসা দেখতে ধাওয়া করেছ চিড়িয়াখানা পর্যন্ত। সামান্য মেয়ে সানন্দার এই যে অসামান্য বুকের পাটা, এই দুর্দিনের বাজারেও এমন মোটা-মাইনে রোগা-কাজের সেক্রেটারিয়ানাকে অনায়াসে তুড়ি দেখানো, এর মূলে ভরসার মূলধন যোগাচ্ছ তুমিই হে এন. ডি. হোড়। কুমারী সান্যাল অবলীলায় দেখাচ্ছে এই দুঃসাহসিক উঁচু ট্রাপিজের খেলা ; সে জানে তুমি নিচে আছ জাল ছড়িয়ে, পড়তে না পড়তেই তোমার জালে তাকে লুফে নেবে।

ত্রাণকর্তা ৵যীশুর পুণ্যস্মৃতি-ধন্য আজকের এই দিন। সেই উপলক্ষে আজ চিড়িয়াখানায় একটু বিশেষ ভিড়, অনেকে এই শুভদিনে জানোয়ার

দেখতে এসেছেন। ৺যীশু বলেছেন "প্রতিবেশীকে ভালবাস"। কিন্তু জানোয়ার এন. ডি. হোড়কে ভালবাসতে পারছিলেন না ভুজঙ্গ চৌধুরী।

"হাল্-লো! মিস্টার চাউডরী যে! হোয়াট এ প্লেজার টু মিট্ ইউ ইন দি জু! একাই এসেছেন দেখছি।"

ভুজঙ্গ চৌধুরী চেয়ে দেখলেন ইন্টার-কন্টিনেণ্টাল এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট করপোরেশনের মোটা অংশীদার মিস্টার জি. গসেইন (আদি নাম গীষ্পতি গোস্বামী)। তিনি কিন্তু একা নন, তাঁর বামহস্ত-লগ্না জনৈকা তন্বীগৌরী শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী ভ্যানিটিব্যাগ-পাণি। সঙ্গিনীটির কেশপাশ আস্কন্ধলম্বিত বব-ছাঁটা মোলায়েম বিদেশী আমদানী ভঙ্গীতে গোল করে পাকিয়ে রাখা। মাথা থেকে শুরু করে উঁচু হীলের নিচুতলা পর্যন্ত একটা সলজ্জ নির্লজ্জতার বিজড়িত ভঙ্গিমা বুলানো। চরণযুগলে অভিনব ফ্যাশানের শৌখিন বিনামা; দুটি চরণপদ্মের সবগুলো পাপড়ির ডগায় মাখানো পুরু লাল প্লাস্টার। বেশবাসের স্বচ্ছ উদারতা এবং বাহুল্যবিহীন হ্রস্ব সারল্য কল্পনার অবকাশ অল্পই রেখেছে। দেহোর্ধ্ব-ভঙ্গিমার নিবিড়-ঔদ্ধত্য-সংবর্ধন ব্যবস্থা সযত্নে সদ্ব্যবহৃত।

মিস্টার গসেইন সঙ্গিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভুজঙ্গ চৌধুরীর। বললেন, "আমার পার্সোনাল সেক্রেটারি মিস রীটা বিসোয়াস। মিস্টার বি. চাউডরী, যাঁর কথা তোমার কাছে আর নতুন করে বলার কিছু নেই রীটা।"

আত্ম-যৌবন-অসচেতনতার বিগলিত ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে মিস বিসোয়াস বললেন, "হাউ ডু ইউ ডু?" যেন উচ্চারণে হা-ডু-ডু শোনায়।

অচেনা মেয়েমানুষ দাদাবাবুর সঙ্গে হাত বাড়িয়ে হাডুডু খেলতে চাইছে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত ভগবান ভূতের মত চুপ করে রইল।

ভুজঙ্গ চৌধুরী জানিয়ে দিলেন, তিনি মিস বিসোয়াসের সঙ্গে এই প্রথম আলাপিত হয়ে কৃতার্থ বোধ করছেন এবং আশা করছেন এ আলাপই শেষ আলাপ হবে না। জবাবে রীটা বিসোয়াস লিপস্টিক-রাঙা এক ঝলক হাসির ফাঁক দিয়ে জানালেন, এই কৃতার্থবোধ এবং আরও আলাপের আশাটা উভয়ত।

ভুজঙ্গের মনে হলো, তিনি ছোট হয়ে গেছেন এই তিন জনের কাছে। মনে হলো রীটা বিসোয়াসের যে পুরু লাল প্লাস্টারমাখা পাতলা হাসি, তাতে যেন একটু প্রচ্ছন্ন অনুকম্পা মেশানো আছে। মনে হলো আই. সি. ই. আই. কর্পোরেশনের সিনিয়র পার্টনার মিস্টার গসেইন যেন বাঁকা হেসে বলছেন, "সেক্রেটারিটি এল না বুঝি? মান করেছে না কি?" এ প্রশ্নের কি একটা তুখোড় জবাব দেওয়া যায় ভেবে ঠিক করতে না পেরে মুখর হতে পারলেন না ভুজঙ্গ চৌধুরী। কিন্তু এটা বুঝলেন যে, সঙ্গিনীবিহীন চৌধুরীর কদর হলো না সঙ্গিনী-সৌভাগ্যবান গসেইনের কাছে—এ ক্ষেত্রে ৫৫৫-ক্লাবের রীতি অনুযায়ী সঙ্গিনী-বিনিময় সম্ভব নয় বলে। ৫৫৫-ক্লাবের ঝুনো সভ্য গসেইন, সাম্প্রতিক সভ্য ভুজঙ্গ চৌধুরী। ইংরিজী বুলিতে আর আদব-কায়দায় (অর্থাৎ বে-আদবি বেকায়দায়) তেমন পোক্ত নন বলে চৌধুরী নিজেই প্রাণপণে এই অভিজাত নিশাচরদের ক্লাবকে এড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভুজঙ্গ চৌধুরীর দ্রুতবর্ধমান অগুন্‌তি টাকার ঝাঁজালো গন্ধ ৫৫৫-ক্লাবের কার্যকরী সমিতির নাসারন্ধ্রে এমন অপ্রতিরোধ্য খোঁচা দিতে শুরু করল যে, নাছোড়বান্দা ৫৫৫-ক্লাবের পাল্লায় পড়ে অ-সভ্যপদে ইস্তফা দিয়ে সভ্য-তালিকায় নাম লেখাতে বাধ্য হলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। তাই "আচ্ছা, এখন তবে আসি, নমস্কার" গোছের কি যে বললেন সেটা ঠিক খেয়াল করলুম না, কিন্তু কেটে পড়লেন মিস্টার গসেইন তাঁর সহচরী সেক্রেটারি মিস রীটার কটি-বেষ্টন করে।

শিম্পাঞ্জীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। শিম্পাঞ্জী আছে, এন. ডি. হোড় নেই। হয়তো অন্য দিকে অন্য কোন জানোয়ার দেখতে চলে গেছে অথবা সটান বেরিয়ে গেছে চিড়িয়াখানা থেকে। তামাসা যা দেখবার তা তো দেখা হয়েই গেছে, আর কি? ভুজঙ্গের সন্দেহ হতে লাগল, গসেইনের স-সেক্রেটারি আবির্ভাবের পেছনেও কাজ করেছে ভিজে বেড়াল শয়তান এন. ডি. হোড়ের অদৃশ্য হস্ত। হোড় ৫৫৫-ক্লাবের সভ্য নয়, কিন্তু গসেইনের সঙ্গে আছে তার কারবার-সূত্রী দহরম মহরম। সে-ই

পাঠিয়েছে গসেইনকে তামাসা দেখতে। যাও, দেখে এস সেক্রেটারিকে আনতে পারে নি ভুজঙ্গ। সেক্রেটারি-বিরহী বেচারা ভুজঙ্গকে দেখে এস চিড়িয়াখানায়।

ধীরে ধীরে দূরে অপস্য়মানা গজগামিনী রীটা বিসোয়াসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে "চিড়িয়াখানায় এলে দুটো চারটে জানোয়ারের দেখা মিলে যায়। কি বল হে চম্পটী ?" বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

হুজুরের মুখে হাসি না দেখে শুকনো মুখে চম্পটী বললে, "তাই তো দেখে গেলুম হুজুর।"

"এইবারে তা হলে চল, ফেরা যাক।"

নীরবে ফিরে চললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী ; পেছনে চলল চম্পটী আর ভগবান। পিছে পড়ে রইল চিড়িয়াখানা।

★

৮প্রজ্ঞাপারমিতার বাবা শ্রীঅনাথপিণ্ডদ রায়চৌধুরী রহস্যময় পুরুষ। বোঝা শক্ত তাঁর কোন্ কথাটা সত্যি, কোন্‌টা ফাঁকি। বাইরে যখন বিষণ্ণ তখন হয়তো ভেতরে ভেতরে হাসছেন ; আবার মুখ যখন হাসছে, তখন মনে হয়তো এক ফোঁটা হাসি নেই। মনের ভেতর ডুবুরি নামালেও ওঁর মনের পরিচয় মেলে না।

"প্রজ্ঞার মা সংঘমিত্রা দেবীকে মাসী বলি বলেই অনাথবাবুকে মেসো বলতে হয়।" বললে অম্লান। "কিন্তু সহজে ওঁর কাছে ঘেঁষিনে। ওঁরই মেয়ে যে প্রজ্ঞাপারমিতা, সেটা বিশ্বাস করা শক্ত। বোধিসত্ত্ব হয়তো বাপকা বেটাই হয়ে উঠতো। শুধু প্রজ্ঞার মতো দিদি ছিল বলেই হতে পারে নি ; পরশমণির ছোঁয়ায় লোহাও খানিকটা সোনালী হয়ে ওঠে কিনা।"

অনুরোধ এড়াতে না পেরে অম্লান আমায় নিয়ে গেল অনাথ ভবনে।

অনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েই মক্কেল পাকড়াতে যাবার অজুহাতে কেটে পড়ল।

"অম্লান যখন তোমায় দাদা বলে, তুমি তো আমার ঘরের ছেলে হে ধনপতি।" বললেন অনাথবাবু। "অম্লান জানে না ওকে আমি কত ভালবাসি। অম্লান বলে নয়, বীমা-দালাল বলে। অম্লানের কাছে আমার কোনো দাম নেই; জীবনবীমার বয়স পার হয়ে এসেছি, তাছাড়া আমার মুখের কথায়ও কেউ বীমা করবে না। সে করতো প্রজ্ঞার কথায়। তাই প্রজ্ঞার ভক্ত হয়েছিল অম্লান। কিন্তু প্রজ্ঞা তো চলে গেল।"

বোঝা গেল না প্রজ্ঞা চলে যাওয়ায় তিনি দুঃখিত হয়েছেন, না প্রজ্ঞার অকাল প্রয়াণে অম্লান বাড়রীর জব্দ হওয়াটা উপভোগ করছেন।

"অম্লান এখন ধরেছে দেউলে ব্যারিস্টার ও. পি. বনার্জীর সোসাইটি গার্ল মেয়ে বিপাশা বনার্জীকে।" বললেন অনাথবাবু। "প্রজ্ঞা চলে গেছে, তার পুরো সুযোগ নিচ্ছে, ঐ ব্রীফলেস ব্যারিস্টারের মেয়েটি। কিন্তু হঠাৎ আমাতে উৎসাহিত হয়ে উঠলে কেন ধনপতি? আমি অনাথ বলে', না প্রজ্ঞাপারমিতার বাবা বলে?"

"অনাথ রায়চৌধুরী আর প্রজ্ঞাপারমিতার বাবা কি আলাদা?"

"আলাদা, আলাদা, একেবারে আলাদা, ধনপতি।" বললেন অনাথবাবু। রহস্যময় হাসি খেলে গেল তাঁর মুখে। পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হয়ে তিনি শুধালেন, "প্রজ্ঞার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল কি?"

বললেম, "দেখি নি তাঁকে চোখে। শুনেছি তাঁর তুলনা ছিল না।"

"তাই বুঝি দেখতে এসেছো অতুলনীয়ার বাপের তুলনা আছে কিনা?"

"পাড়ার একজন প্রতিবেশী হিসাবে আপনাকে সমবেদনা জানাতে এসেছি।"

"ভুল করছো ধনপতি। বেদন অত সহজে সম হয় না। তা ছাড়া, যে গেছে সে তো কিছুতেই আর ফিরছে না।"

"কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে তিনি—"

"যে যাবেই, তার তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াই তো ভালো ধনপতি। মিথ্যে দেরি করে ভুগে ভুগে ভুগিয়ে ভুগিয়ে ডাক্তার আর ডিস্পেনসারির মুখে হাসি ফুটিয়ে লাভ কি?"

"কিন্তু হৃদয় কি সে কথা মানে, অনাথবাবু? যুক্তির ঝাড়ন দিয়ে হৃদয়াবেগকে তো মানুষ ঝেড়ে ফেলতে পারে না।"

"পারে ধনপতি। মানুষই পারে। আর পারা উচিত। হৃদয়াবেগের শেকল কাটার সাধনাই তো মানুষ হবার সাধনা হে।" বললেন অনাথবাবু। "যারা শেকল পরিয়ে রাখতে চায়, সেন্টিমেন্টের উস্কানি তারাই দেয়। বুদ্ধু দধীচিদের সেন্টিমেন্ট উস্কে দিয়ে অস্থি দেওয়াচ্ছে চালাক নেপোরা, আর নিজেরা মারছে দই। সেন্টিমেন্টের শহীদ এ জীবনে অনেক দেখেছি। তারা সব ইন্স্পায়ার্ড ইডিয়ট্স্, উদ্বুদ্ধ বুদ্ধুর দল। দুনিয়ায় টিকে থাকতে হলে সেন্টিমেন্ট ভুলতে শেখো ধনপতি। রবি ঠাকুরের ভাষায় 'হৃদয় তাপের ভাপে ভরা ফানুস' হলে চলবে না।'

সমবেদনাটা মাঠে মারা গেল দেখে মনটা বেদনায় ভরে উঠল। বললাম "শুনেছি সংঘমিত্রা দেবী—"

"কন্যা-শোকে অধীরা হয়েছেন? ভুল শোন নি ধনপতি। প্রচুর কেঁদেছেন, আরো কাঁদবেন। আমি কাঁদতে পারি নে, কান্না বরদাস্ত করতেও পারি নে।"

"কিন্তু কান্নারও তো সার্থকতা আছে অনাথবাবু।" বললাম আমি। "তাই কথায় বলে কাঁদতে যে জানে না, মানুষ খুন করা তার পক্ষে শক্ত নয়।"

"প্রয়োজন হলে তা আমার পক্ষেও শক্ত নয় ধনপতি। অবশ্য নিজের ঘাড়টাকে নিরাপদ রেখে। বোধিসত্ত্বর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোমার?"

"এখনো হয় নি।"

"এক ফোঁটা কাঁদে নি সে।" বললেন অনাথবাবু। "আমার স্বভাবটি পেয়েছে, বাজে সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না। কিন্তু একটি তফাত আছে।"

"কি সে তফাত, অনাথবাবু ?"

অনায়াসে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা কয়। আমাদের সময় আমরা কিন্তু বাপের চোখে চোখে তাকাতে সাহস করি নি। ঐ যার ছবিখানা দেখছো, উনি আমার পিতৃদেব ৺অজাতশত্রু রায়চৌধুরী। উনি যেদিন বললেন বিয়ে করতে হবে, এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। যথাকালে বিয়ে করে ফেললাম তোমার সংঘমিত্রা মাসীকে। আর ঐ যে ছবিখানা দেখছো, ওটি আমার ঠাকুর্দা ৺বিম্বিসার রায়চৌধুরী। উনি যখন বাবাকে বললেন—।"

আমি বললাম, "সেকালে একালে এত তফাত বলেই তো শাস্ত্রে লিখেছে —কালস্য কুটিলা গতি।"

অনাথবাবু বললেন, "শাস্ত্রের কথা যদি তুললে তো বলি, এ দুনিয়ায় আসলে কেউ কারো নয়। প্রজ্ঞাপারমিতার কথাই ধরো। সে যখন এসেছিল, তার আসা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। পেরেছিল কি ?"

"আজ্ঞে না।"

"আর সে যখন চলে গেল তখন তাকে ধরেও রাখতে পারা গেল না। সে যখন যাবার, যেখানে যাবার চলে গেল, রেখে গেল না কোনো ঠিকানা। তাছাড়া, আমার ঘরে না এসে অন্য কোনো ঘরেও সে যেতে পারতো না কি ?"

"আজ্ঞে তা পারতো।"

"আবার, সে যদি আমার ঘরেই জন্মাতো ছেলে হয়ে, তাকে আমি ঠেকাতাম কি করে ?"

"অসম্ভব। পারতেন না ঠেকাতে।"

"তাহলেই দেখ, মানুষ যে আমার আমার করে, সে তার নিছক মোহ ছাড়া কিছু নয়। এ সত্য মানুষ যতদিন না উপলব্ধি করছে ততদিন তার শান্তি নেই। তোমার সংঘমিত্রা মাসীর কথা বলছিলে না একটু আগে ? চল আলাপ করিয়ে দিই।"

* * * *

"প্রজ্ঞা যে কি ছিল তা তোমায় কেমন করে বোঝাবো ধনপতি ?"

বললেন সংঘমিত্রা মাসী। "সবাই এক কথায় বলতো ওর তুলনা নেই। কিন্তু সে বলা যে কত সামান্য বলা, তা প্রজ্ঞাকে শুধু একটিবার দেখলেও তুমি বুঝতে পারতে। মাঝে মাঝে মনে সংশয় জাগতো সত্যিই ও কি আমার মেয়ে? সত্যিই কি আমি ওর মা?"

বললাম, "তলিয়ে দেখলে সত্যিই তো আমরা কে কার? দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে আমরা তো শুধু অভিনয় করেই যাচ্ছি।"

"আমার গুরুদেবও ঠিক এই কথা বলেন, ধনপতি?"

"কে আপনার গুরুদেব, মাসীমা?"

দু'হাত একসঙ্গে কপালে ঠেকিয়ে সংঘমিত্রা দেবী বললেন, "শ্রীমৎ নিরালা বাবা। ভগবানের অংশ-অবতার।"

"অংশ-অবতার?"

"হ্যাঁ বাবা। এবারে ইচ্ছে করেই পূর্ণ ব্রহ্ম হন নি। কিন্তু, কি জানো বাছা? গোটা সমুদ্রের জল যেমন সমুদ্রের জল, সমুদ্র থেকে এক আঁজলা তুলে নিলেও তাই। কি অসাধারণ ক্ষমতা বাবার! এক আসনে ধ্যানে বসে তিন কালের আর ত্রিভুবনের খবর জানতে পারেন। তাই তো বাবার ওপর অভিমানে মন ভরে আছে। প্রজ্ঞা যে চলে যাবে, থাকবার জন্যে আসে নি, তা যদি বাবা আগে আমায় জানিয়ে দিতেন তাহলে প্রজ্ঞাকে হারাবার জন্যে মন আগে থেকেই তৈরী রাখতুম, হঠাৎ হারিয়ে বুকটা ফেটে এমন চৌচির হয়ে যেতো না। শোকের ঝোঁকে বাবার ওপর অভিমান করেছিলুম, মনে মনে। কিন্তু তিনি তো অন্তর্যামী, জেনে গেলেন।"

"তারপর?"

"ক্ষমা করলেন আমার অপরাধ, দর্শন দিলেন স্বপ্নে।"

বললাম, "বলেন কি মাসীমা? স্বপ্নে?"

"হ্যাঁ বাছা।" বললেন সংঘমিত্রা মাসী। "দেখলুম তাঁর আশ্রমে দাঁড়িয়ে মৌন হাসি হাসছেন আমার দিকে তাকিয়ে। চোখ দুটি তাঁর নীরবে বলছে—'অপরাধ করেছিস, ক্ষমা করেছি। জীবন শূন্য হয়েছে, পূর্ণ হবে। চলে আয়।'......"

"সে ডাক শুনে আপনি কি করলেন মাসীমা ?"

"সেই স্বপ্নের ক্ষমা সইতে না পেরে অনুতাপের কান্না অনেক কেঁদেছি ধনপতি। প্রাণ কাঁদছে গোলাপডাঙায় বাবার নিরালাশ্রমের আশ্রয়ে চলে যেতে ; বাকী জীবনটা আশ্রমের সেবাতেই কাটিয়ে দেবো বলে। কিন্তু কোন্ লজ্জায় তাকে গিয়ে এখন মুখ দেখাবো ধনপতি ? তুমি যাবে বাবা, আসবে আমায় পৌঁছে দিয়ে ?"

"যদি আদেশ করেন তো যাবো বইকি মাসীমা। কিন্তু আপনার সংসার ?"

করুণ হাসি হেসে সংঘমিত্রা মাসী বললেন, "সংসার ?······তাহলে গোড়া থেকেই বলি শোনো ধনপতি। আমার বাবা আর শ্বশুর ছিলেন দাবা-খেলার বন্ধু। একদিন শখের বাজী রেখে দুজনে খেলা শুরু করলেন ; বাজীর পণ রইলাম আমি আর তোমার মেসোমশায়। খেলায় শ্বশুর হেরে গেলেন। বাবা বললেন, 'তুমি বাজী হেরেছো। তোমার ছেলেকে জিতে নিয়েছি আমি।' শ্বশুর খুশী হয়ে সায় দিলেন। তারপর পাঁজি দেখে শুভলগ্নে শুভদিনে আমাদের দু' হাত এক হয়ে গেল। দুজনেই মাকে হারিয়েছিলাম অল্প বয়সে, তাই দুজনেরি তখনকার হিসেবে বেশী বয়সে বিয়ে হলো। দুহাত এক হলো। কিন্তু মন এক হল না ধনপতি। আমরা দুটি নাচের পুতুল যেন সুতোর টানে ঘরকন্নার লোক দেখানো নাচ নেচে গেছি মাত্র। হাসি দেখিয়েছি বাইরে। পুড়ে ছাই হয়ে গেছি ভেতরে ভেতরে।"

বললাম, "থাক্ সে সব কথা মাসীমা। ভেবে কেন অকারণ দুঃখ পান ?"

থামলেন না মাসীমা। বলতে লাগলেন, "এলো মা হবার সম্ভাবনা। শুনেছি মেয়েরা খুশী হয়, আমি আশংকায় শিউরে উঠলুম। আমার প্রথম সন্তান যখন জন্মালো আমি তখন অজ্ঞান। জ্ঞান ফিরে পেলে মুগ্ধ হয়ে গেলুম, তৃপ্তিতে ভরে উঠল সারা দেহ মন। এমন সুন্দর শিশুর মা আমি ! সেই মেয়েই আমার প্রজ্ঞাপারমিতা।"

তারপর দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল সেই শিশুকন্যা, রূপের শতদল উঠতে লাগল বিকশিত হয়ে। চলায় তার নৃত্য-ছন্দ, কণ্ঠে তার সংগীতের মাধুর্য। কিন্তু হিংসুক পাড়াপড়শীর তা সইল না। তাই সে পাড়া ছেড়ে এ পাড়ায় চলে এলেন অনাথবাবু। তারপর এ পাড়ায় জন্ম নিয়ে এ পাড়াতেই বেড়ে উঠছে বোধিসত্ত্ব।

"যার জন্যে ছিলুম সংসারে, সেই চলে গেল। এখনকার প্রয়োজনও আমার ফুরিয়ে গেছে। কাল ভোরেই তুমি আমায় গোলাপডাঙায় নিয়ে চলো। গুরুদেবকে দর্শন করে তুমিও খুশী হবে বাবা।"

"কিন্তু—"

"এতে আর কিন্তু নেই ধনপতি। আমি চলে গেলে তোমার মেসোমশাই খুশী হবেন। আর বোধিসত্ত্ব? মার অভাব সে কিছুমাত্র বোধ করবে, মার সঙ্গে এমন ভাব তার কখনো হয় নি।"

কাল ভোরে আসবো কথা দিয়ে বিদায় নিলাম। পথে নামবার সময় দেখা হলো অনাথবাবুর সঙ্গে। বললাম তাঁকে। চাইলাম অনুমতি।

অনাথবাবু বললেন, "নিশ্চয়। অনুমতি দেবো বই কি। ধর্ম-জীবনের পথে যেতে তোমার মাসীমাকে তো বাধা দিতে পারি নে ধনপতি।"

নির্বিকার চেহারা অনাথবাবুর। বোঝা গেল না সংঘমিত্রা মাসী সংসার ছেড়ে গুরুর আশ্রমে চলে যাবেন বলে মনে তাঁর ব্যথিত অভিমান, না রেহাই পাবার আনন্দ!

বললাম, "কিন্তু আপনি এ বয়সে—একা—"

অনাথবাবুর নির্বিকার মুখে এবার একটু হাসির বিকার দেখা দিল। তিনি বললেন, "একা থাকবার দুঃখ ভুলবার জন্যেই মানুষ জীবনে দোসর খোঁজে বটে, তবু মানুষ যে একা সেই একা। ওটা মানুষের কোনো দিনই ঘোচে না ধনপতি।"

"কিন্তু বোধিসত্ত্ব?"

"নিজের ভাবনা সে নিজেই ভাবতে পারবে। আমার সন্তান সে,

বাপকা বেটা, এইটে জেনে রাখো ধনপতি।" পুত্রগর্বের সুর বেজে উঠল অনাথবাবুর কণ্ঠস্বরে।

হঠাৎ বললেন, "প্রজ্ঞাপারমিতাকে আমার সংসারে আমিই এনেছিলাম। এতে তোমার মাসীর কোনো হাত ছিল না।"

"সে কি?"

"সে অনেক কথা।" বললেন অনাথবাবু। "দিনে দিনে শশিকলার মতো বেড়ে উঠতে লাগল প্রজ্ঞা; বুঝলুম ভুল করেছি, অন্যায় করেছি মেয়েটার ওপর। আমার ঘরে না এসে অন্য ঘরে গেলে মেয়েটা হয়তো—কিন্তু তখন আর ভেবে লাভ নেই। বিধির বিধান খণ্ডাবে কে? সময়ের স্রোত কিছুতেই পিছু হাঁটে না। মেয়েটার সামনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতুম। নিজেকে অপরাধী মনে হতো, ছোট হয়ে যেতাম যেন ওর কাছে। বুঝলে ধনপতি? তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না, বুঝিয়ে হয়তো লাভও হবে না।"

তবে কি প্রজ্ঞাপারমিতার মহাবিদায়ে রেহাই পেয়েছেন অনাথবাবু, প্রজ্ঞার কাছে আর ছোট হতে হবে না বলে?

"আমায় ঘৃণা করাই হয়তো ওর পক্ষে উচিত হতো, স্বাভাবিক হতো।" বলতে লাগলেন অনাথবাবু। "কিন্তু প্রজ্ঞা আমায় ঘৃণা করে নি, অবজ্ঞা করেনি। পিতা বলে আমায় ভালোবেসেছে। সেই ভালোবাসা, সেই শ্রদ্ধা আমার অসহ্য মনে হতো।" বলতে বলতে আবার কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁর দুটি চোখ এক সঙ্গে জ্বলজ্বল করে উঠল।

আমি মুখ খুলবার উপক্রম করতেই ইশারায় আমার মুখ বন্ধ করে দিয়ে অনাথবাবু বললেন, "একবার জ্বরে কয়েক দিনের জন্যে বিছানায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। প্রজ্ঞাপারমিতা তখন ছোট্ট মেয়ে। কি আশ্চর্য মেয়ে! সেবায় শুশ্রূষায় কর্তব্যের দিক দিয়ে কোনো ত্রুটি ছিল না তোমার সংঘমিত্রা মাসীর; কিন্তু তাতে ত হৃদয় তৃপ্ত হয় না ধনপতি, হৃদয় চায় হৃদয়ের রঙ্। একদিন রোগশয্যায় আধঘুমের ঘোরে কখন হয়তো অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিলুম। চোখ মেলে দেখি ছোট্ট মেয়ে, প্রজ্ঞাপারমিতা।

বসে আছে আমার রোগশয্যায় আমার মুখের পানে তাকিয়ে। অপরূপ সুন্দর মুখখানা চিন্তায় পাণ্ডুর, আমার রোগ-যন্ত্রণা ও যেন সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করছে। বললে, 'বড্ড কষ্ট হচ্ছে? কপালে ও-ডি-কলোনের পটি লাগিয়ে দেবো বাবা?' বেদনাবিহ্বল করুণা-ছল-ছল চোখ দুটি তার। প্রাণ আমার জুড়িয়ে গেল ধনপতি। কিন্তু হঠাৎ যেন মগজে বিজলীর ধাক্কা লাগিয়ে দিলে ওর মুখের 'বাবা' ডাক। ও পাশের আয়নায় চোখে পড়ছিল আমার মুখের চেহারা। কুৎসিত, কদর্য ; দেখে আমি নিজেই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার মুখের ছবি আমার আপন চোখেও সইলো না। নিজের ওপর নিজেই ক্ষেপে উঠলুম আমি, আমার পিতৃত্ব অমন মেয়ের ওপর চাপিয়েছি বলে। মেয়েটার ওপর ক্ষেপে উঠলুম কেন সে আমায় বাবা বলে ডাকলে, কেন সে আমায় ঘৃণা করলে না? চীৎকার করে তাড়িয়ে দিলুম মেয়েটাকে, মুখ কালো করে' চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলে গেল মেয়েটা।"

"তারপর?"

"তারপর থেকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি ওকে, ওর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি নিজেকে। ওর সুমুখ থেকে এক রকম পালিয়ে ফিরেছি বলতে পারো। ওর মুখোমুখি পড়ে যাবার যে কি ভীতি ছিল আমার মনে, তা তোমায় বলে বোঝাতে পারব না ধনপতি। পারো তো অনুভব করে নাও। এই ভীতিটাই শেষ পর্যন্ত আমার সারা মন জুড়ে ছিল, আর তাই থেকেই আমায় রেহাই দিয়ে চলে' গেল প্রজ্ঞাপারমিতা।"

মুখ থেকে বেরিয়ে গেল "আশ্চর্য!"

"মৃত্যুটা কিছু আশ্চর্য নয় ধনপতি, জীবনটাই আশ্চর্য।" বললেন অনাথবাবু। "প্রজ্ঞার শেষ লেখা কবিতার খানিকটা তোমায় শোনাই, শোনো তবে।" বলে আবৃত্তি করে শোনালেন :

মৃত্যু যত কাছে আসে, তত মনে হয়
এ জীবন পরম বিস্ময়,

মরণ রহস্য নহে, রহস্যের চির অবসান।
প্রাণের দোসর মৃত্যু, মৃত্যুর দোসর তাই প্রাণ।
মহাকালো মহাকাল মরণের মরুভূমি যেন,
তারি মহাবক্ষে কবে, কেমনে ও কেন,
কোন্ মায়াবীর যাতুদণ্ড স্পর্শ লেগে
মরুত্থান জেগে
মরণেরে তুচ্ছ করে' উঠেছিল জীবনের গান ?

মৃত্যু তবু বারে বারে জীবনেরে মুছে দিতে চায়,
বারে বারে ব্যর্থ হয়ে যায় ;
দুই দীপ এক হয়ে নব দীপ জ্বেলে রেখে শেষে
মরণ-তিমির তলে মেশে,
দীপ হতে দীপান্তরে যুগে যুগে প্রাণবহ্নি জ্বলে অনির্বাণ।

আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে আবার বললাম, "আশ্চর্য !"

অনাথবাবু শুধালেন, "কোন্‌টা ? কবিতা, না আবৃত্তি ?"

বললাম, "দুটোই। আপনি যে এমন চমৎকার আবৃত্তি করতে পারেন—"

"সেটা আমার চেহারা দেখে বিশ্বাস হয় না। এই তো ? চেহারা দেখে অনেক কিছুই বিশ্বাস হয় না ধনপতি। বিশ্বাস আমি করাতেও চাই নে।"

"আর প্রজ্ঞাপারমিতা যে কবিতা লিখতেন সেকথাও আমি জানতুম না। আমায় কিছুই বলেন নি এবিষয়ে অম্লানবাবু।"

একটু হেসে অনাথবাবু বললেন "প্রজ্ঞা তো কাউকে জানিয়ে কবিতা লেখে নি ধনপতি। লিখেছে নিভৃতে আপন খেয়ালে। চলে গেল প্রজ্ঞা, পিছে ফেলে গেল তার কবিতার খাতা।"

আমি পরমাগ্রহী হয়ে বললাম, "খাতাখানা একবার আমায় দেখাতে পারেন ?"

মাথা নেড়ে অনাথবাবু বললেন, "কাউকেই দেখাতে পারি নে। আরেকখানা কবিতা শুনতে চাও তো বরং শোনাতে পারি।" বলে উদাত্ত ভঙ্গীতে আবৃত্তি করে শোনালেন অনাথবাবু :

ঠক্! ঠক্! ঠক্!
আজি এ নিশীথ রাত্রে দূর বহু দূর হতে
গম্ভীর বাতাসে
শব্দ ভেসে আসে—
ঠক্! ঠক্! ঠক্!
গাছের জীবন্ত কাঠে জীবন্ত ঠোঁটের ঠোকা মেরে
একি রে আহত-চঞ্চু কাঠ-ঠোকরার হাহাকার?
অথবা চঞ্চুর ঘায়ে আহত তরুর আর্তনাদ?
কিংবা একি শুনিতেছি ত্যাগধর্মী বিবেকের বাণী :
'ঠকাস্ নে, ঠক শুধু, ঠক্, ঠক্, ঠক্'?
অথবা এ হুঁশিয়ারী দিতেছে সবারে
'দুনিয়ায় কারো 'পরে ভরসা না রাখিস্ কখনো,
ওরে, হেথা সাধু নাই, আছে শুধু ঠক, ঠক, ঠক'?

মনে হয় মৃত নহে, ঘুমন্ত মর্ত্যের মানবতা,
মিথ্যা ইতিহাস যেন তাহারেই পুরেছে কফিনে,
কাফনের বস্ত্র দিয়া সযতনে জড়ায়ে জড়ায়ে;
তারপর তারি 'পরে রাখিয়া কাষ্ঠের আবরণ
কফিনে আঁটিছে তারে সারি সারি পেরেক পুঁতিয়া
হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে : ঠক্! ঠক্! ঠক্!

মনে হয় যীশু যেন ক্রশেতে শয়ান,
দুই হস্ত দুই পদ বিদ্ধ তার ক্রশ-কাষ্ঠ সাথে;
নির্মম হাতুড়ি-ঘায়ে কাষ্ঠপ্রাণ ঘাতকেরা পুঁতিছে পেরেক :
ঠক্! ঠক্! ঠক্!

ঝরিতেছে রক্তবিন্দু, স্বেদবিন্দু ক্রুশকাষ্ঠ 'পরে,
ব্যথিত নয়ন তবু কাঁদিয়া কহিছে উর্ধ্বপানে
'ওগো পিতা, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো এ মূঢ়গণেরে।'
চিরন্তন ক্রুশ-বিদ্ধ চিরন্তন যীশুর প্রার্থনা
ছাপায়ে উঠিছে যেন হাতুড়ির নির্মম আঘাত ঃ
ঠক্! ঠক্! ঠক্!...............

"অপূর্ব রূপক কবিতা।" মুগ্ধকণ্ঠে বললাম আমি। অনাথবাবু হেসে বললেন, "অপূর্ব কাকে বলে জানি নে। রূপক কাকে বলে তাও জানি নে ধনপতি।"

"এ কথাও কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন আপনি?"

"বানানো কথা অজস্র বলি, ধনপতি," বললেন অনাথবাবু, "কিন্তু সব কথাই বানিয়ে বলি নে।"

বলে বোধহয় তিনি একটু হাসলেন—গভীর রহস্যময় হাসি। বোঝা গেল না, কেমন করে বুঝবো কোন্ কথাগুলো তাঁর বানানো আর কোন্ কথাগুলো বানানো নয়।

ভোরে হাজির হয়ে বললাম, "মাসীমা, আমি এসেছি।"

সংঘমিত্রা দেবী বললেন, "তুমি আসবে তা আমি জানতুম ধনপতি। জানতুম না যে আজ আমার যাওয়া হবে না। তোমার মেসোমশায়ের শরীর ভালো নেই বাবা।"

ভেতরে চলে গেলাম অনাথবাবুর ঘরে। শুয়ে শুয়ে কি যেন বার বার মনে মনে আওড়াচ্ছেন তিনি। আমি কাছে যেতেই ধীর মৃদুকণ্ঠে বল্লেন, "আজ আমার জন্মদিন ধনপতি।"

এই সেদিন চির বিদায় নিয়ে চলে গেছে কন্যা প্রজ্ঞাপারমিতা, আর আজই পিতা অনাথপিণ্ডদ রায়চৌধুরীর জন্মদিন। হায় রে জন্ম আর মৃত্যু!

"এ নিয়ে হৈ হৈ করে বিলিতী কায়দায় বার্থ ডে সেলিব্রেট করি নে। তোমার মাসীমাও জানেন না, খোঁজ রাখেন না, আজ আমার জন্মদিন।" বলতে লাগলেন অনাথবাবু। "আমার মৃত্যুদিনের ঠেলা অনেককে সামলাতে হবে, কিন্তু জন্মদিনটি একান্তই আমার। ফি বছর জন্মদিনে এমনি বাড়ী বসে বসে পেছন পানে তাকাই। মনে পড়ে কত অট্টহাসি, কত দীর্ঘশ্বাস। নাটকের শেষ হয়ে যাওয়া দৃশ্যের মতো। আর প্রশ্ন করি নিজেকে, এ জীবনটার অর্থ কি? জীবনটা একেবারেই অর্থহীন ভেবে ক্ষেপে উঠে নিজেকে একবার সাবড়ে দিতে গিয়েছিলুম—যাকে তোমরা বলো সুইসাইড।"

"সাবড়ে দিলেন না কেন?" শুধালেম।

অস্ফুট হাসি হেসে অনাথবাবু বললেন, "ভেবে দেখলেম জীবনের যদি অর্থ না থাকে, মরণ হয়তো তার চাইতেও ঢের বেশী অর্থহীন। তবে আর মিছেমিছি গলা বাড়িয়ে মরতে যাওয়া কেন? কতো অবোধ এই সোজা কথাটা বুঝতে না পেরে সুইসাইড করে মরে।"

অপলক চোখে তাকিয়ে দেখলেম ৺প্রজ্ঞাপারমিতার বাবার চেহারা। তারপর দৃষ্টি আমার আপনি চলে গেল খোলা বাতায়ন টপকে পথের ওপর, যে পথ দিয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা যেতো কলেজে। অনেক চোখ থাকতো তাকিয়ে, অনেক হৃদয়ে লাগতো দোলা, খেয়াল করতো না প্রজ্ঞাপারমিতা, চলে যেতো আপন মনে যেমন করে বয়ে চলে দখিনা বাতাস।

অনাথবাবু বললেন, "আজকের দিনে তুমি যে এসে পড়েছো ধনপতি, এর পেছনে রয়েছে বিধাতার ইঙ্গিত। আমার জন্মদিনে তাই ছোট করে আমার জীবন কাহিনীটা তোমায় শোনাই, শোনো। আজ মনে হচ্ছে এ জীবনটা যেন কোনো অতি-আধুনিক লিখিয়ের লেখা ছন্নছাড়া উপন্যাস। ছিল অনেক সম্ভাবনা, তার একটিও সম্ভব হয়ে উঠল না। জীবন শুরু হলো অসুন্দর চেহারা নিয়ে, যা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম বাবার কাছ থেকে। অথচ সুপুরুষ হবার কামনা আমার ভেতর সুপ্ত ছিল জন্মের আগে থেকেই,

যখন ছিলেম মাতৃগর্ভে। আমার মা ছিলেন সুন্দরী, লোকে বলতো দেবী-প্রতিমা। এও শুনেছি, মাকে আর বাবাকে দেখে অনেকে বলতো বিউটি অ্যাণ্ড দি বীস্ট্। শুনতে হয়তো তোমার খারাপ লাগছে, বলতেও আমার প্রাণে কিছু খুশীর জোয়ার বইছে না, কিন্তু সত্যের আগুনকে তবু ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাই নে ধনপতি। জানো তো সত্য নিয়ে আজীবন পরীক্ষা করে করে সত্যের জন্যেই শেষ জীবনে প্রাণ দিয়ে গেলেন মহাত্মাজী?"

অন্তিম প্রার্থনাসভায় ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন সত্য-অহিংসার একনিষ্ঠ পূজারী বাপুজী। মুখে করুণার সুধাহাস্য জ্যোতি। বিশ্বের বন্ধু আমি, বিশ্ব আমার বন্ধু—ভাবছেন তিনি। যত এগিয়ে চলেছেন তিনি প্রার্থনাবেদীর দিকে, তত এগিয়ে আসছে মৃত্যুদূত তাঁর উদার ক্ষীণ বক্ষ লক্ষ্য করে। সেই অগ্রগতি অলক্ষ্যে লক্ষ্য করছেন বিধাতা। এ দৃশ্য কি জীবন্ত হয়ে ফিরে এল অনাথপিণ্ড রায়চৌধুরীর কল্পনার চোখের সামনে? তাই কি অভিভূত ভঙ্গীতে তাঁর দুটি চোখের পাতা নেমে এল তাঁর দুটি চোখের ওপর?

"গডসের গুলিতে প্রাণ দিলেন বাপুজী।" চোখ মেলে বললেন অনাথবাবু। "তাঁর প্রিয়তম সত্যের বেদীতলে প্রাণ দিয়ে তিনি শহীদ হলেন। আর গডসে নির্ভয়ে প্রাণ দিলে তার আপন সত্যের জন্যে, সরকারী ফাঁসুড়ের হাতে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলে। নিজের সত্যের ওপর ষোলো আনা আস্থা ছিল তার। তাই অনায়াসে বেপরোয়া হয়ে ঝুলে পড়তে পারলে। তাই বলি ধনপতি, সত্যকে ধামাচাপা দিতে চাই নে। কিন্তু কি যেন বল-ছিলুম? হ্যাঁ, মার কথা। মা আশা করেছিলেন বিধাতা একদিকে যখন তাঁকে মেরেছেন, তেমনি সন্তানের দিকে পুষিয়ে দেবেন। একান্ত আশা করেছিলেন তাঁর প্রথম সন্তান আমি তাঁর চেহারার কিছুটা অন্ততঃ পাবো। মায়ের সে আশার বুকে আমি এসে পড়লেম অ্যাটম বোমার মতো। শৈশবে মাকে হারালেম। মাতৃহীন আমি কেমন করে বড় হয়ে উঠলুম তার ফিরিস্তি নাই বা শুনলে ধনপতি। কাহিনী অকারণ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোমায় হাঁপিয়ে তুলতে চাই নে। বড় হয়ে উঠেছি যে তাতো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু

কত দুঃখে রাস্তা পেরোতে হয়েছে, কত কাঁকর ফুটেছে পায়ে, কত কাদায় ডুবেছে পা, তা দেখ নি তুমি। ছবি এঁকে দেখাতেও চাই নে। এইটুকু শুধু বলি, মা যখন মারা গেলেন আমাকে দুগ্ধপোষ্য রেখে, তখন বাবা—”

“ডবল স্নেহে বুকে করে রাখতে লাগলেন আপনাকে।”

“ডবল ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন।” বললেন অনাথবাবু। “জন্মেই আমি মাকে খেয়েছি, এই তাঁর আক্রোশের গোড়ার কথা। কিন্তু বিধাতা যাকে বাঁচিয়ে রাখবেন সে বাঁচবেই। আমি বড় হতে লাগলুম। মাতৃহারা আমাকে নতুন মা দেবার জন্যে চেষ্টার কসুর করেন নি বাবা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নতুন মার আমদানী সম্ভব হয়ে উঠল না। তাতে আমার ওপর পিতৃদেবের মাথা আরো গরম হয়ে উঠল। সত্যি বলছি ধনপতি, আমার নিঃসন্তানা বিধবা পিসী আর তাঁর হাতে কিছু পুঁজি না থাকলে আমার এ কাহিনী আজ তুমি এখানে বসে শুনতে পেতে না।”

আমি বললেম, “জুটে যায়, জুটে যায় অনাথবাবু। ছায়াছবির গল্প-লিখিয়ের মতো বিধাতাপুরুষও অমন অবস্থায় এক আধখানা পুঁজিবতী বিধবা পিসী বা মাসী জুটিয়ে দেন। তারপর?”

“পিসী ছিলেন দূর সম্পর্কের, তাই চেহারার দিকেও দূরত্ব ছিল তাঁর আর বাবার মাঝখানে।” বললেন অনাথবাবু। “তাঁকে দেখলে ডারুইন বা ডাইনীর কথা মনে হতো না। প্রথম জ্ঞান-নেত্র খুলে যখন পিসীকে দেখলুম তখন পিসী আমার পুরোনো বিধবা। আরেকটু জ্ঞান হয়ে পিসেমশায়ের ফোটো দেখলুম, তাও কম দিনের নয়। তরুণ প্রায়-সদ্য-গোঁফ-ওঠা চেহারা, ক্যামেরার সামনে ফটোগ্রাফারের তাগিদে যেমন হাসতে হয় তেমনি হাসছেন। বুড়ী পিসী বললেন, ‘এই তোর পিসেমশাই।’ আমি বললেম, ‘যাঃ।’ এমন বুড়ীর অমন ছোকরা স্বামী? মন মানলে না, ভেবে নিলে পিসী আজন্ম বিধবা। কিন্তু—”

“কিন্তু কি?”

“পিসেমশাইর দশ হাজারী জীবনবীমা করা ছিল এক নাছোড়বান্দা বন্ধুর পাল্লায় পড়ে, যার রুটির উৎস ছিল জীবনবীমার দালালি। আমাদের

অম্লান বাড়রীর মতো। এই জন্যেই অম্লান বাড়রীকে ভালো লাগে। শুধু ওকেই বা বলি কেন, বীমার দালাল জাতটাকেই। পিসের জীবনবীমা বিহনে টেঁসে যেতেন পিসী, আর পিসী বিহনে আমি।”......

আত্মজীবন-কাহিনী এগিয়ে চলল ৺প্রজ্ঞাপারমিতার বাবার। পিসীর একান্ত আগ্রহে আর নাছোড়বান্দা তাড়ায় ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল বালক অনাথপিণ্ডদকে। ভর্তি করলেন পিতা অজাতশক্র, কিন্তু খরচটা অনাথের বিধবা পিসীর। ইস্কুলে পড়তে আপত্তি ছিল অনাথের। পিসী বললেন, “জানিস নে—লেখাপড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই? পরীক্ষে পাশ দিবি, বিছে শিখে বিদ্বান হবি, কতো নাম-ডাক হবে দেশ-বিদেশে, কতো সম্মান, কতো—”

বালক অনাথ বললে, “ওসব কিচ্ছু চাইনে।” ঐ কারণেই বিছা অর্জনে আপত্তি অনাথের, বিছা বর্জনে আগ্রহ। পিতার ওপর বিজাতীয় বিদ্বেষ অনাথপিণ্ডদের—অনাথের ওপর অজাতশক্রর বিদ্বেষেরই প্রতি-বিম্বায়ন। পিতা অজাতশক্রর এক নম্বর ধারণা অনাথপিণ্ডদই তাঁর বিপত্নীক হওয়ার জন্যে দায়ী পয়লা নম্বর আসামী, অতএব ক্ষমার অযোগ্য। দুনম্বর ধারণা, অনাথপিণ্ডদের জন্যই তাঁর ফের সপত্নীক হওয়া সম্ভব হচ্ছে না; যে সব কন্যাপক্ষ দোজবরে গররাজী নয়, তারাও পূর্বপক্ষের পুত্র বেঁচে আছে দেখে পিছিয়ে যাচ্ছে। তিন নম্বর ধারণা, অনাথ তাকে জব্দ করার জন্যেই অমন বিচ্ছিরি চেহারা নিয়ে জন্মেছে, পাড়ার সবাই অজাতশক্রকে না শোনাবার ভান করে শুনিয়ে শুনিয়ে অনাথকে বলছে—‘কার্তিকের ব্যাটা নবকার্তিক।’ এই তিনটি ধারণা এক সঙ্গে তাল পাকিয়ে অনাথের প্রতি পরম বিষিয়ে রেখেছে অজাতশক্রর বিপত্নীক মন। সে বিষ বেড়ে চলেছে চক্রবৃদ্ধি সুদে। সে বৃদ্ধির আঁচ লাগছে বালক অনাথের গায়ে, আর চক্রবৃদ্ধি হারে তেতে উঠছে অনাথ।

অজাতশক্রকে দেশ-বিদেশে নামডাকওয়ালা বহু সম্মানিত গাড়ী-ঘোড়া-চড়া বিদ্বান পুত্রের পিতৃত্বগৌরবে বুক ফোলাবার সুযোগ দিতে চায় না অনাথপিণ্ড। তাই ঘোর আপত্তি জানিয়ে বললে, “পড়বো না ইস্কুলে।

হবো না বিদ্বান। হবো মুখ্যু, হবো লক্ষ্মীছাড়া। ঘেন্না করুক লোকে, করুক ছি ছি, করুক—”

বাপের মুখে কি করে কত কায়দায় চুন-কালির ব্যবস্থা করা যায় সেই স্বপ্নে মুখর হয়ে উঠল অনাথের মন।

“কিন্তু তোর বাপ যে ম্যাট্রিক ফেল রে অনাথ।” বললেন পিসী। “এমন বাপের ছেলে হয়ে তুই ইস্কুল যাবি নে, বলিস্ কি?” বিদ্বান ভাইয়ের গরবে গরবিনী দিদি বিদ্বান ভাই-পোর গরবিনী পিসী হতে চান।

চট করে মত বদলে গেল অনাথের। ম্যাট্রিক ফেল বাপকে জব্দ করতে হবে ম্যাট্রিক পাস করে। কোমর বেঁধে ইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেল অনাথ। পড়া করতে লাগল কোন রকমে পাস করে যাওয়ার মতো মন দিয়ে, তার বেশী নয়। বিদ্বান হতে চায় না অনাথ, চায় শুধু কোনো রকমে ম্যাট্রিক পাস করতে।

সপ্তাহে একদিন করে ইস্কুলের প্রত্যেক ক্লাসে নীতিশিক্ষা দেওয়া হতো ছেলেদের চরিত্র গড়ে তুলতে হবে বলে। ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে বেড়াতেন হেডমাস্টার, হারুণ-অল রসিদের মতো। দেখে বেড়াতেন মাস্টাররা নীতি-শিক্ষার পাঠ কেমন দিচ্ছেন, আর ছেলেরাই বা কেমন নিচ্ছে সে পাঠ। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোনো ক্লাসে ঢুকে পড়ে ছাত্রদের কিছু নীতিগর্ভ উপদেশ শুনিয়ে যেতেন।

বাবারও বাবা থাকে। একদিন ইস্কুল ইন্‌সপেক্টর মহোদয় এলেন স্কুল-পরিদর্শন করতে। সেদিন হেডমাস্টারী নির্দেশ জারি হলো ক্লাস-বদল বন্ধ থাকবে। ইন্‌সপেক্টর মহোদয় যতক্ষণ বিদায় নিয়ে না যান ততক্ষণ কোনো শিক্ষকই ক্লাস ছেড়ে ক্লাসান্তরে যাবেন না। ইন্‌সপেক্টর সাহেব ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে দেখবেন কেমন পড়াচ্ছেন মাস্টার মশায়েরা, আর ছাত্ররাই বা কেমন পড়া তৈরি করছে। প্রশ্নমালা ছাত্রদের আগেই জানিয়ে দিয়ে তার শুদ্ধ জবাবগুলোও তাদের ভালো করে মুখস্থ করিয়ে রাখা হলো, যেন ইন্‌সপেক্টর সাহেবের সামনে প্রশ্ন করলে চটপট জবাব দিতে পারে।

"আমাদের ক্লাসে তখন ভূগোল পড়াচ্ছেন ঘটোৎকচবাবু, বুঝলে ধনপতি?" বললেন অনাথপিণ্ডদ। "ওটা ওর পিতৃদত্ত নাম নয়, ছাত্রদত্ত। রোজ আসেন ধুতি পাঞ্জাবি পরে, সেদিন পরে এসেছেন ঢলঢলে কোট পাঁতলুন, ধার করে না ভাড়া করে তা জানি নে। তাঁর পেয়ারের ছাত্র ছিল টাকাওয়ালা লোকের দুটি মাকাল ছেলে। ঘটোৎকচবাবু কয়েকটি বাছাই প্রশ্নের জবাব তাদের ভালো করে মুখস্থ করিয়ে বার বার ঝালিয়ে নিলেন। তারপর—আমি ছিলাম পেছনের বেঞ্চে—আমায় ডাকলেন: 'ওহে নবকার্তিক।' ঐ নামেই ডাকতেন তিনি আমায়। পৃথিবীর আকার কিরূপ আর তার প্রমাণই বা কি কি, আমাকে তাই মুখস্থ করালেন। শাসিয়ে দিলেন সময় মতো যেন ঠিক ঠিক জবাব দিই ইন্‌সপেক্টর সাহেবের সামনে, তা নইলে বিপদ ঘটবে। বিপদটা যে আমার দেহের ওপর ঘটবে সেটা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন। ইন্‌সপেক্টর সাহেবকে খুশী করতেই হবে, যেন রিপোর্ট ভালো লেখেন, বুঝলে ধনপতি?"

"আজ্ঞে বুঝলুম।"

"ঘটোৎকচবাবুই আমাদের নীতিশিক্ষার ক্লাস নিতেন। তারপর পালে বাঘ পড়ল। ইন্‌সপেক্টর মহোদয় এলেন আমাদের ক্লাসে। হাসি হাসি মুখ, ভারিক্কি কাশি কাশছেন মাঝে মাঝে। সদয় ভঙ্গীতে ইশারা করলেন, ক্লাসের পড়া যেমন চলছিলো চলুক। ঘটোৎকচবাবু পড়াবার ভান করতে করতে আগে শিখিয়ে-রাখা ছাত্রদের প্রশ্ন করতে লাগলেন, তাদের জবাব শুনে খুশীর হাসি হাসলেন ইন্‌সপেক্টর। খাসা পড়িয়েছেন শিক্ষক মশাই, খাসা শিখেছে ছেলেরা। পেছনের বেঞ্চের ছেলেরাও যে কম শেখে না সেইটে দেখিয়ে ইন্‌সপেক্টরের আরো বাহবা নেবার জন্যে ঘটোৎকচবাবু আমায় শুধানো শুরু করলেন প্রশ্ন। জবাব আমার মুখস্থ, তবু ইচ্ছে করে ভুলের পর ভুল করে গেলুম। রেগে ক্ষেপে উঠলেন ঘটোৎকচবাবু, হেসে চলে গেলেন ক্লাসান্তরে ইন্‌সপেক্টর। তারপর খেতে হলো ঘটোৎকচের বেত, কিল, চড়, কানমলা আর অশিক্ষকোচিত গালি, আর সহপাঠীদের টিটকারি, ধিক্কার। লক্ষ্মীমন্ত ছেলেভরা ক্লাসে আমি তখন

একমাত্র লক্ষ্মীছাড়া। কেন? না ইন্‌সপেক্টর-ঠকানো নাটকের রিহার্শাল-দেওয়া পার্ট আমি অভিনয়ের বেলায় ভুল বলেছি ইচ্ছে করে। হতচ্ছাড়া, শয়তান, পাজীর পা-ঝাড়া! ঘটোৎকচ ভবিষ্যৎ বাণী করলেন এ ছেলে বড়ো হলে ডাকাত হবে—ডাকাত, ডাকাত। তাই হতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু হতে আর পারলুম কোথায় ধনপতি?"

ডাকাত হতে না পারার ব্যথা মূর্ত হয়ে উঠল অনাথবাবুর আর্ত দীর্ঘশ্বাসে।

আমি শুধালেম, "তারপর?"

"আমাদের নীতি-মাস্টার ঘটোৎকচবাবু আমার শয়তানীর কথাটা ঘটা করে তুলে দিলেন বাবার কানে।" বললেন অনাথবাবু। "বাবা পরম খুসী হয়ে গরম করে তুললেন আমার কান দুটি মলে মলে। পিসী না থাকলে দুদিন খাওয়াও বন্ধ থাকতো বাবার শাসনে। বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল ঘৃণার, বিরক্তির, শত্রুতার। ভালোবাসা পাই নি বাবার, ভালোবাসা চাইতে বা আশা করতেও ভুলে গেলাম। পিতৃস্নেহ আর পিতৃভক্তির অনেক গল্প শুনেছি, অনেক গল্প পড়েছি। কি মনে হয় জানো? সব বোগাস। ভুয়ো। ধাপ্পা। ফাঁকি। তারপর বছরের পর বছর চলল গড়িয়ে, সেই গড়ানে ইতিহাস শুনলে হাঁফিয়ে উঠবে তুমি। থাক সে ইতিহাস। পাস-ফেলের বেড়া ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত ম্যাট্রিক ফেল্—বাবার মুখ ছানাবড়া করে দিলুম—পাস করে গেলুম থার্ড ডিভিশনে। ফার্স্ট ডিভিশন এড়িয়েছিলুম প্রাণপণে, দেমাক করে বাবা যেন বলে বেড়াতে না পারে, 'আমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করা ছেলের বাপ।'..."

৺পিতৃদেব ৺অজাতশত্রু রায়চৌধুরীর স্মৃতি আগুন জ্বালিয়ে দিল অনাথপিণ্ডদের দুটি চোখের তারায়।

"পিসীর পুঁজি ফুরোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিসীর আয়ুও গেল ফুরিয়ে। চলে গেলেন তোমরা যাকে বলো অনন্তধামে।" বললেন অনাথবাবু। "বাবা রইলেন। রইলেম আমি। নানা কায়দায় পরের পয়সা নিজের পকেটে আনছি তখন—কায়দাগুলো নাই বা শুনলে ধনপতি।

বাবা হয়ে পড়লেন পুত্রভক্ত ; চাইলেন শ্বশুর হতে, তা নইলে নাতির মুখ দেখবেন কি করে ? তোমার কাছে বলতে বাধা নেই ধনপতি, ম্যাট্রিক পাসের পর থেকেই প্রাণের ভেতর বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। অন্তরের সে তৃষ্ণা তোমায় বোঝাতে গেলে এখন গণ্ডায় গণ্ডায় বোষ্টম কবিতা পড়ে শোনাতে হবে। কিন্তু আমার পিতৃদত্ত মুখশ্রী আর মেঘবরণ দেখে মেয়ের পর মেয়ে মুখ বেঁকিয়ে নাক সিঁটকে ভেগে গেল, আমার ভেতরের হৃদয়টাকে দেখলে না কেউ। মেয়ে জাতের ঘৃণা পেয়ে পেয়ে মেয়ে জাতের ওপর মন উঠল বিষিয়ে। স্বামী হবার আকাঙ্ক্ষাটা প্রাণের ভেতর আরো জোর দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। আর জ্বলতে লাগল প্রতিশোধের তৃষ্ণা —পৌরুষের অপমানের প্রতিশোধ। তাই বাবা যখন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বেয়াই সম্পর্ক পাতাবার পাকা ব্যবস্থা করলেন, তখন বাবার ওপর পূর্ব আক্রোশ সব ভুলে গিয়ে খুশী হয়ে উঠলুম। সারা জীবনের জন্যে পতি পরম গুরু হলুম সংঘমিত্রার, যিনি এই সেদিন থেকে তোমার মাসী হয়েছেন, ধনপতি।"

হায় সংঘমিত্রা মাসী!

"শুভদৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই আমায় অশুভ দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলেন তোমার মাসী।" বললেন অনাথবাবু। "ঘৃণা করলে, কিন্তু ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না। সাত পাকের বন্ধনে বাঁধা পড়েছে হিন্দুর মেয়ে, সনাতন সংস্কারের সাঁড়াশী চাপে পেষা মন তার। বুক ফেটে গেলেও হাসি ফুটিয়ে রাখতে হবে মুখে। আর আমি তার ভেতরে দেখলুম সেই জাতকে যে জাত ঘৃণা, অপমান, উপহাসের তীর বিদ্ধ করে জর্জর করেছে আমায়। উঠতে বসতে নির্মম কঠোরভাবে তাকে প্রতি মুহূর্তে এইটে বুঝিয়ে দিতে লাগলুম যে আমি তার পরম গুরু, এইটে তাকে ভুলতে দেবো না। কখনো ভুলতে দিই নি, দেবোও না ভুলতে।"

আমি শুধালেম, "তারপর?"

অনাথবাবু বললেন, "কন্যাদায়-মুক্ত হয়ে শ্বশুর মারা গেলেন। তারপর মারা গেলেন বাবা। শ্রাদ্ধ করতে হলো, দাড়ি রাখলুম। সেই দাড়ি আর কামাই নি। পিতৃদত্ত চেহারাটা দাড়িতে অনেকখানি ঢাকা পড়ে দেখলুম।

সুপুরুষ হতে কার না ইচ্ছে হয় ধনপতি? কুঁজোরও চিত হয়ে শোবার শখ হয়। কিন্তু কিছুতেই তোমার মাসীর মন পেলুম না আজ পর্যন্ত। শুকনো একটা নিয়ম মাফিক স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, তাতে তো হৃদয় ভেজে না ধনপতি।"

অবাক্ কাণ্ড! হৃদয়ও আছে অনাথপিণ্ডদ রায়চৌধুরীর?

"তাই তো গোটা হৃদয়টাই আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।" বললেন অনাথপিণ্ডদ। "কোনো দিন পাইনি এক ফোঁটা প্রাণের পরশ, এতটুকু দরদ, ভালোবাসা।"

"আর কেউ না হোক অন্ততঃ আপনার সেই বিধবা পিসী—"

"রাম বলো। ও হলো গিয়ে আত্মদরদ। আপন সন্তান ছিল না বলে সেই ফাঁকটা আমায় দিয়ে ভরিয়ে রাখার ফাঁকি বই তো নয়! তামাম দুনিয়াটাই মতলবী হে ধনপতি। খুব হুঁশিয়ার। দুনিয়ার জঙ্গলে আমরা সবাই জংলী জানোয়ার। আমাদের সম্পর্ক শুধু ঠকবার আর ঠকাবার। এখানে ঠকাতে যদি না পারো তো আলবত ঠকবে, আর ঠকতে না চাও তো ঠকাতে শেখো। ঠকা আর ঠকানো, এদের মাঝখানে আর পথ নেই। নান্য পন্থা বিদ্যতে। মাথা নেড়ো না ধনপতি—এ হচ্ছে আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা। ঠকতে চাই নে, তাই জীবনের 'মটো' করে নিয়েছি ঠকানো। স্রেফ আত্মরক্ষা নীতি—'অফেন্স ইজ দি বেস্ট ডিফেন্স।'..."

"সংঘমিত্রা মাসীকেও ঠকিয়েছেন আপনি?"

কি করে হঠাৎ এ প্রশ্ন মুখ দিয়ে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো বেরিয়ে গেল জানি নে। চমকে উঠলেন যেন ধমক খেয়ে অনাথবাবু। তারপর বিশিষ্ট অনাথপিণ্ডদী হাসির তুলি মুখে বুলোতে বুলোতে বললেন, "অবান্তর, অবান্তর। এ প্রশ্ন তোমার অবান্তর হে ধনপতি। যাকে বলে ছেলেমানুষি। রবি ঠাকুরের সেই কবিতাটা ইস্কুলে পড়েছো তো? সেই যে:

সাধু কহে, শুন, মেঘ বরিষার
আপনারে নাশি' দেয় বৃষ্টিধার,
সর্ব ধর্ম মাঝে ত্যাগ ধর্ম সার
ভুবনে।

এই ত্যাগ-ধর্ম সার করেছি আমার জীবনে। ত্যাগ করেছি ঘৃণা, লজ্জা, ভয়।"

"কিন্তু প্রজ্ঞাপারমিতা—" বলতে গেলেম আমি।

"আসছি হে, আসছি।" বললেন অনাথপিণ্ডদ। "শোনাবার জন্যেই বসিয়েছি তোমায়। অকারণ খুঁচিও না। যেদিন জানলুম প্রথম বাপ হতে চলেছি, সেদিন থেকে ভাবনায় পেলো আমায়, ভূতে পাওয়ার মতো। রাতের ঘুমে আর দিনের জাগরণে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা—যেন কুৎসিত, কালো, কদাকার সন্তানের পিতা হয়েছি; ওকেই দেখে আর দেখিয়ে পাড়া-বেপাড়ার লোক উপহাস করছে, টিটকারি দিচ্ছে আমাকে। আতঙ্কে শিউরে উঠতে লাগলুম পাছে আমার সন্তান তোমার মাসীর কিছু না পেয়ে পুরো আমার চেহারাটাই পায়। কুরূপ বাপের কুরূপ ছেলের প্রাণান্ত নেশা চাপলো সুরূপ সন্তানের বাপ হয়ে নিন্দুকদের মুখে চুনকালি পরাতে হবে··· পরিয়েও ছিলাম ধনপতি। সেই চুনকালি পরাবার তুলি হলো প্রজ্ঞাপারমিতা, নার্সিং-হোম আলো-করা শিশু। তারপর দিনে দিনে বড় হতে লাগল মেয়ে। পাড়াপড়শীর শুরু হলো হিংসা-উপহাসের গুঞ্জন। অপরূপা মেয়ের বাপ হয়ে যেন অপরাধী অনাথ চৌধুরী। আমায় উত্যক্ত, অতিষ্ঠ করে তুললে। আমার বড়ো জ্বালার কারণ হয়ে উঠল প্রজ্ঞাপারমিতা। জ্বালাতন হয়ে শেষ পর্যন্ত পাড়া বদল করতে হলো আমাকে। ভেবে দেখো একবার!"

ভেবে দেখলেম। সত্যিই এর মত লোককে পাড়া-বদল করানো সোজা কথা নয়।

"মেয়ে যতো বড়ো হতে লাগল, ততই যেন ওর চোখে আমি ছোটো হয়ে যেতে লাগলুম।" বললেন অনাথবাবু। "প্রজ্ঞাপারমিতাকে আমার জীবনে এনেছিলুম আমিই, কিন্তু সে এসেছিল আমার অশুভ গ্রহের মতো।"

"অ-শু-ভ-গ্র-হে-র ম-তো ?? ?? ??"

"হ্যাঁ। অশুভ গ্রহের মতো। তাই—ওকি, কোথায় চললে ধনপতি ?"

"মাসীমার কাছ থেকে নিয়ে আসি থার্মোমিটারখানা। আপনার টেম্পারেচার দেখতে হবে।"

"দেখবার মতো টেম্পারেচার হয় নি ধনপতি। ভুল বকছি বলে ভুল কোরো না। এ আমার খেয়াল নয়, খামখেয়াল নয়, নিছক স্বকপোল-কল্পনা বলে একে উড়িয়ে দিলে মুখ্যু গোঁয়ার বলবো তোমাকে।"

'অশুভ গ্রহ' প্রজ্ঞাপারমিতাকে চির-বিদায় দিয়ে যেন চির-রেহাই পেয়েছেন অনাথপিণ্ডদ রায়চৌধুরী।

"কয়েক বছর ধরে অ্যাসট্রলজি পড়ছি ধনপতি—যাকে বলে ফলিত জ্যোতিষ। লুকিয়ে লুকিয়ে।" বললেন অনাথপিণ্ডদ। "ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান গণনায় একেবারে অব্যর্থ। এই বিদ্যে দিয়ে গুণে দেখেছি নির্ভুল আমার অনুমান। জ্যোতিষ শাস্ত্রই বলে দিচ্ছে আমার বরাতে ভক্তিহীনা নীরব-ঘৃণাময়ী স্ত্রী, যার সঙ্গে জীবনে কোনো দিনই আমার বনতে পারে না। আর তাই তো দেখলুম ধনপতি। আমার ভবিষ্যৎ যেন ভূগোলের নক্সার মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি জ্যোতিষের দূরবীণ দিয়ে। তাই গুরুদেবের আশ্রমে চলে যেতে চাইছেন তোমার মাসী, জানি সে আমার পরম রেহাই। দেবো না বাধা। বোধিসত্ত্ব আমার বাপকা-বেটা ছেলে, ভরসা আমার ওরি ওপর। ওকে কেউ বলে ডানপিটে, কেউ বলে শয়তান, কেউ বলে এঁচোড়ে পাকা, কেউ বলে ডাকাত—আর সবাই বলে যেমন বাপ তেমনি ছেলে। দুনিয়াকে ডোণ্ট কেয়ার করি আমি, আমার সেই ডোণ্ট কেয়ার-করা রক্ত টগবগ করে বইছে বোধিসত্ত্বের ধমনীতে ধমনীতে—এ আমি বোধিসত্ত্বের পানে তাকালেই যেন পরিষ্কার দেখতে পাই। ভালোবাসি নি বাপকে, ভালোবাসতে পারি নি তোমার মাসীকে, স্নেহ আমার পায় নি প্রজ্ঞাপারমিতা; হৃদয়ের সব ভালোবাসা ঝরিয়ে দিয়েছি বোধিসত্ত্বের ওপর। সে আমার আত্মজ, সে-ই আমার ভবিষ্যৎ, ধনপতি।"

"কিন্তু তাকে যে লাগাম ছেড়ে দিয়েছেন একেবারে খোদাই ষাঁড়ের মতো।"

"সংসার সমুদ্রে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়তে লড়তে পোক্ত হবে বলে।

কেউ টের পায় না আমি নেপথ্যে কত নজর রাখি। আমি যা চাই, ঠিক তেমনটিই হচ্ছে ও। লক্ষ্মী ছেলে তো আমি চাই নে। আচ্ছা, এবারে তুমি বরং তোমার মাসীর সঙ্গেই একটু কথা কও গে, নইলে তিনি আবার— জানোই তো মেয়েদের সাইকোলজি। যাও যাও, আর দেরি কোরো না ধনপতি। কিন্তু একটা কথা যাবার আগে শুনে যাও। কি যে বলেছি আর কি যে বলি নি, গুলিয়ে গেছে তার হিসেব। আমার সব কথাই যেন একেবারে বেদবাক্য বলে মেনে নিও না।"

"সে কি? আপনি কি রঙ চড়িয়েছেন?"

"চড়াতে হয় না, আবেগের বেগে রঙ কখন আপনি চড়ে যায় কেউ জানে না। দুনিয়ার সব কথাই বেদবাক্য হলে দুনিয়ায় টেকা যেতো না ধনপতি।"

বলে আমার দিক থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি বোধ করি আত্মজীবনের তিন কালের মানচিত্র দেখতে লাগলেন তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে। বুঝলাম আমার প্রতি এই হলো তাঁর প্রস্থানের নির্দেশ।

এলেম বেরিয়ে, ঘরে তাঁকে একা থাকতে দিয়ে। মন আমার ঘুরতে লাগলো গোলক-ধাঁধাঁয়—অনাথপিণ্ডদী আত্মকাহিনীর কতটুকু রাখবো, আর বাদ দেবো কতটুকু? আর আসল কথার কতখানিই বা বাদ দিয়ে গেলেন অনাথবাবু?

★

বিরিঞ্চি বটব্যাল মশাই ছিলেন প্রবাসী বাঙালী। বেশ কিছু টাকা প্রবাস থেকে কামিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসে কাপ্তানী-করে-ফতুর এক ভদ্রলোকের শখের তৈরী বাড়ী তিনি কিনে নিয়েছেন। বাড়ীর গেটে সাদা একখণ্ড পাথর গাঁথিয়ে নিয়েছেন, তার সাদা বুকে মোটা কালো হরফে লেখা "উদয়ন ভবন"।

ভদ্রলোকের পরিবারে ছিলো স্ত্রী, এক ছেলে এবং এক কনিষ্ঠা কন্যা। কন্যাটিকে বিয়ে দিয়েছেন প্রবাসে থাকতেই। ছেলে উদয়ন বটব্যাল সেখান থেকেই পরলোকে গেছেন। সেটা উদয়ন কৃষ্টি কেন্দ্রের পক্ষে হয় তো ভালোই হয়েছে, কেন না ছেলে বেঁচে থাকলে বিরিঞ্চিবাবু হয় তো তাঁর ভবনের একতলার বড় ঘরটা উদয়ন কৃষ্টি কেন্দ্রের কাজের জন্যে ছেড়ে দিতেন না। দিয়েছেন তিনি তাই, অত্যন্ত খুশী হয়ে শুধু নয়, অত্যন্ত গরজ দেখিয়ে। এ ব্যবস্থা করেছে বীমা-দালাল অম্লান বাড়রী। বিরিঞ্চিবাবু বাড়ীটি কিনে যেদিন গৃহপ্রবেশ করেছেন, সেদিনই অম্লান সকলের আগে অযাচিত ভাবে গিয়ে আলাপ জমিয়েছে বিরিঞ্চিবাবু এবং তাঁর সহধর্মিণী হেমাঙ্গিনী দেবীর সঙ্গে। সেদিন থেকেই হেমাঙ্গিনী দেবী অম্লানের মাসীমা, এবং বিরিঞ্চিবাবু তার মেসোমশাই।

বিরিঞ্চিবাবু অম্লানকে বলেছেন, "অনেক বছর আগে অনেক দুঃখে অনেক হতাশায় বাংলা দেশ ছেড়ে ভেবেছিলুম বাংলা দেশে আর ফিরে আসবো না। তাই প্রবাসেই বাড়ী করেছিলুম জায়গা কিনে। সে চমৎকার বাড়ী, দেখলে চোখ জুড়োয়। ছেলের আপত্তি ছিল ওখানে বাড়ী করতে, সে আপত্তি আমি মানি নি। তাতে সে দুঃখ পেয়েছিল। বড় বাড়ী। একতলাটা ভাড়া দিয়েছিলুম—তাতেও মত ছিলো না আমার ছেলের। টাকার নেশা ছিলো না তার আমার মতো। তার ইচ্ছে ছিলো একতলাটা যদি দিতেই হয় তো কোনো সমাজকল্যাণ সমিতি বা সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানকে ছেড়ে দিতে বিনা ভাড়ায়। বলা বাহুল্য আমি রাজী হই নি তাতে। তার ফল কি হলো জানো ?"

অম্লান বাড়রী বলেছিলো, "কি হলো ?"

বিরিঞ্চিবাবু বলেছিলেন, "যেদিন বাড়ীর একতলা ভাড়া দিলুম তার একবছর পাঁচমাস সতরো দিন পর—আমি হিসেব করে দেখেছি বাবা অম্লান—উদয়নের হলো টাইফয়েড। প্যারাটাইফয়েড নয়, একেবারে আসল টাইফয়েড। ডাক্তারেরা বললে হেন থেকে হয়েছে, তেন থেকে হয়েছে। কিন্তু আমার আজ পর্যন্ত বিশ্বাস, আমার ছেলের টাইফয়েড হয়েছিলো শুধু

মানসিক কারণে। আমার দুটি ব্যবহার—তার মত না মেনে প্রবাসে বাড়ী করা, আর একতলাটা ভাড়া দেওয়া—তার বুকে বিঁধেছিলো শেলের মতো। ব্যথার সেই নিদারুণ শেল তার বুকে গুমরে গুমরে নীরবে বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো টাইফয়েডে। এমন কি হয় না বাবা ?”

অম্লান বললে, “হয় বই কি।”

বিরিঞ্চিবাবু বললেন, “ত্রিশ বছর বয়সের একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোক কখনো ভুগেছ বাবা ?”

বত্রিশ বছরের অম্লান বাড়রী বললে, “আজ্ঞে না”।

“তাহলে তুমি বুঝবে না কি দুঃসহ দহনের ঝড় দাউ দাউ করে জ্বলছে আমার বুকের অন্ধকারে।” বললেন বিরিঞ্চি বটব্যাল। “উদয়নকে আর এ জীবনে ফিরে পাবো না বাবা অম্লান। তাই তার ইচ্ছা পূরণ করে একটু শান্তি পেতে চাই। বাড়ীর একতলাটা তাই তোমাদের উদয়ন কৃষ্টি কেন্দ্রের কাজে লাগিয়ে আমার ছেলের আত্মাকে তোমরা তৃপ্তি দাও ; একতলা আমি ভাড়া দেবো না।”

উদয়ন কৃষ্টি কেন্দ্র বিরিঞ্চিবাবুর ৺ছেলের আত্মাকে তৃপ্ত করবার ভার নিয়েছে। উদয়ন ভবনের একতলার বড় ঘরখানা হয়েছে কেন্দ্রের বৈঠকী ঘর। এখানেই আজকের উদ্বোধনী অধিবেশন, যাতে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করবে উদয়ন কৃষ্টি কেন্দ্র।

সারা ঘর জুড়ে একটা বিরাট গালিচা বিছানো। বিকেল পাঁচটায় অধিবেশন শুরু হবার কথা, পাঁচটা প্রায় বাজে। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন বিরিঞ্চিবাবু। মুখে তাঁর আনন্দের হাসি—বোধ করি তাঁর লোকান্তরিত একমাত্র পুত্রের আত্মার তৃপ্তির কথা ভেবে তিনি আনন্দ অনুভব করছেন। আমি চুপচাপ বসে বসে দেখছি আর শুনছি। বিরিঞ্চিবাবু আমার অল্প দূরে। তাঁর মাথার ওপর হুক্ থেকে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝুলছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একখানা বড় পূর্ণদেহ ছবি। কবি সম্মুখ দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। হাসছেন তিনি। ধন্য ছবি। কবি চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর ছবি এখনো হাসছে।

বিরিঞ্চিবাবু কিছুক্ষণ ধরেই বোধ করি আমাকে কিছু বলি বলি করছিলেন। এইবারে বলেই ফেল্লেন, "আপনিই বোধ হয় ধনপতিবাবু ?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বিরিঞ্চি বললেন, "বড়ই প্রীত হলুম। অম্লানের কাছে শুনেছি আপনার কথা। আমার নাম বিরিঞ্চি বটব্যাল।"

বললাম, "নমস্কার। আপনার কথাও শুনেছি অম্লান বাড়রীর মুখে।"

"বড় ভালো ছেলে অম্লান। অল্পদিনের আলাপ। এরি ভেতরে মেসো বলতে অজ্ঞান। আমার সহধর্মিনীকে মাসী বলে কিনা!"

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, "এতক্ষণে তো সকলের এসে পড়া উচিত ছিল।"

বিরিঞ্চিবাবু বললেন, "অম্লান গেছে ভাস্কর ভট্টচার্যির ওখানে। ওর গাড়ীতেই বিপাশা বনার্জীকে নিয়ে আসবে কিনা!"

বলতে বলতেই ভাস্করের গাড়ী এসে থামলো। নেমে এলো অম্লান বাড়রী, ভাস্কর, মিস্ বিপাশা বনার্জী।

অম্লান বাড়রীর কাছে জানলাম মহানন্দকেও যথারীতি আসতে বলা হয়েছে। কিন্তু আসেনি সে এখনো। কে জানে সে অভিমান বা রাগ করেছে কিনা ?

কুমারী বিপাশার চলার ভঙ্গীতে নাচের ছন্দ। গলার স্বর চেপে সরু করে কথা বলেন চিবিয়ে চিবিয়ে, অনেকটা কথা গেলার ভঙ্গীতে। দুই চোখেই রিহার্শাল দেওয়া সুদূর পিয়াসী আনমনা ভাব।

ভাস্কর ভট্টচার্যি নিজের গাড়ীতে বিপাশাকে নিয়ে এসে আত্মপ্রসাদে আত্মহারা। প্রজ্ঞাকে কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে ভাস্কর ? অথবা হয়তো অতীতের কল্পনার চাইতে বর্তমানের বাস্তব তার কাছে বেশী মূল্যবান।

রবি ঠাকুরের ছবির তলায় বসেছিলেন বিরিঞ্চিবাবু। অম্লান বাড়রী তাঁরই কাছাকাছি বসালো ভাস্কর আর বিপাশাকে, তারপর বিরিঞ্চিবাবুর দিকে তাকিয়ে বল্লে, "মেসোমশাই অনুমতি করেন তো সভার কার্য শুরু করা যাক।"

বিরিঞ্চিবাবু বল্লেন, "বিলক্ষণ।" তারপর অম্লানের ইশারার খোঁচা খেয়ে যেন ধড়মড় করে উঠে বললেন, "গৃহস্বামী হিসেবে আমি আপনাদের সকলকে সাদর অভিনন্দন আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং প্রস্তাব করছি আজকের এই সভায় ভাস্কর ভট্চার্যি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।"

"আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।" বল্লে অম্লান বাড়রী। ভাস্কর ভট্চার্যির মুখ জীবনে প্রথম সভাপতি হবার আনন্দ-লজ্জায় লাল হয়ে একটু আনত হলো।

অম্লান তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে হারমোনিয়াম নিয়ে এসে বল্লে, "আমাদের আজ বিশেষ সৌভাগ্য যে বিপাশা দেবী—যাঁর পরিচয় আশা করি আপনাদের কাছে দিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র—আমাদের এই অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছেন এবং উদ্বোধন সংগীতটি গাইতে রাজী হয়েছেন। উদ্বোধন সংগীতটি রচনা করে দিয়েছেন যিনি তাঁর নাম বলতে বাধা আছে। সভাপতি মহাশয় অনুমতি করলেই—"

সভাপতি বল্লেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারে উদ্বোধন সংগীত হোক।"

অম্লান ধরলে হারমোনিয়াম। মিস্ বিপাশা বনার্জী হারমোনিয়ামে কণ্ঠের সুর মিলালেন "আ···আ···আ···"

গলার সুরে হারমোনিয়ামের সুর মিলিয়ে কুমারী বিপাশা বনার্জী গাইলেন ঃ

অনেকখানি অন্ধকারে
একটু আলো জ্বালা—
এই আশাতেই শুরু গানের পালা।
না জানারে আড়াল থেকে
আলোর বুকে আনবো ডেকে,
অচিন কণ্ঠে পরিয়ে দেবো
পরিচয়ের মালা।

অনেক ঘৃণা, অনেক ব্যথা,
অনেক হানাহানি,
তারি মাঝে প্রেমের পরশ
একটু দেবো আনি'।
চলার পথে অনেক কাঁটা,
বন্ধ তবু রয় না হাঁটা,
তাই তো ক্ষণিক বিরাম তরে
রচি পান্থশালা।...

বিপাশা বনার্জীর গান থামলো। হাততালি দিলেন কেউ কেউ ভদ্রতা করে'। সভাপতি ভাস্কর বলে উঠলো, "মারভেলাস!" গৃহস্বামী বিরিঞ্চি বটব্যাল ছলছল চোখে বললেন, "সাধু সাধু!"

সভাপতির অনুমতি নিয়ে কৃষ্টি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অম্লান বাড়রী শুরু করলে তার সম্পাদকীয় বক্তব্য। সেটা লিখে আনে নি অম্লান, কেন না অনর্গল বকতে সে সিদ্ধমুখ এবং খই তার মুখে যত ফোটে কলমের ডগায় তত ফোটে না।

অম্লান বাড়রী বললে, "মাননীয় সভাপতি ও উপস্থিত সভাবন্ধু সভা-বান্ধবীগণ! আজ আমাদের পরমানন্দ উদ্বোধন সন্ধ্যা, উদয়ন কৃষ্টি কেন্দ্রের। যা এতদিন শুধু ছিল অন্তরের কল্পনায় গোপন, তাই আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বাইরের বাস্তবে করেছে রূপ-গ্রহণ।...শাস্ত্রে লেখা আছে —আপনারা সবাই জানেন—মধুরেণ সমাপয়েৎ, অর্থাৎ কিনা মিঠে জিনিস দিয়ে শেষ করবে। কিন্তু আমার শাস্ত্রে বলে মধুরেণ আরম্ভেৎ। তাই আমাদের এই উদ্বোধনী সভার উদ্বোধন হলো বিপাশা দেবীর অমৃত-ঝরা মধু কণ্ঠের অতুলনীয় সংগীত দিয়ে। কণ্ঠের অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি যে মুহূর্তমাত্র আপত্তি না করে আমাদের সবাইকে সুরের নির্ঝরে ভাসিয়েছেন, সেজন্যে উদয়ন কৃষ্টি কেন্দ্র তাঁর কাছে চিরদিনের জন্যে অসীম কৃতজ্ঞতার ঋণে বাঁধা রইল।"

বলে অসীম-ঋণ-ভরা দৃষ্টিতে মিস্ বিপাশার দিকে তাকালো ধীমার ঝানু দালাল অম্লান বাড়রী। মিস্ বিপাশা আনন্দ-অহঙ্কার মাখা বিনয়ে সলাজ কায়দায় মাথা নীচু করলেন। ভাবটা যেন "যাঃ, কি যে বলেন!"

অম্লান বলতে লাগলো "আপনারা সবাই শুনে আনন্দিত হবেন, মিস্ বিপাশা শুধু যে আজ তাঁর মধুর সংগীত দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করিয়ে দিলেন তাই নয়, তিনি বরাবর অন্তরঙ্গ ভাবে আমাদের কৃষ্টি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। শুধু আজকের জন্যে নয়, তাঁকে আমরা চিরদিনের জন্যে পেলাম।"

শুনে সভায় একটা হাততালির ঢেউ খেলে গেল। বিরিঞ্চিবাবু বললেন "সাধু! সাধু!" মিস্ বিপাশা ভ্যানিটি ব্যাগ মৃদু মৃদু নাড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

অম্লান বাড়রী বললে, "তারপর একটা কথা গোড়াতেই বলে রাখি, আমাদের আজকের এই উদ্বোধনী বৈঠক সম্ভব হওয়া হয় তো অসম্ভব হতো, যদি এই ঘরখানা আমাদের না ছেড়ে দিতেন পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিরিঞ্চি বটব্যাল মহাশয়—আমাদের মেসোমশাই।"

বলে ডান হাত দুলিয়ে দিলে বিরিঞ্চিবাবুর দিকে।

অম্লান আরো বললে, "এ ব্যাপারে কল্যাণহস্ত অবশ্য আছে আমাদের মাসীমারও। তাঁরও সঙ্গে আপনাদের যথাসময়ে পরিচয় হবে। তিনি—"

"তিনি এখন ভেতরে তোমাদের জন্যে লুচি ভাজছেন বাবা অম্লান।" ব্যস্ত চিন্তিত হয়ে বললেন বিরিঞ্চিবাবু।

"লুচি!···!!·· !!!"

সারা বৈঠকে একটা অভূতপূর্ব আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার দমকা হাওয়া বয়ে গেল।

বিরিঞ্চিবাবু বললেন, "লুচি, ফুলকপির শিঙাড়া, আলু আর ফুলকপির একটা তরকারী, ছোলার ডাল, আলুবখরার চাটনী, আইস্‌ক্রীম সন্দেশ আর লেডিকেনি। সামান্য একটু জলযোগের ব্যবস্থা······"

অম্লান বাড়রী খুশী হয়ে বললে, "ছি ছি! এ আপনি করেছেন কি মেসোমশাই?"

কিন্তু মেসোমশাই যে ভালোই করেছেন সে বিষয়ে উপস্থিত কারো চেহারায় মতভেদ দেখা গেল না। দেখলাম কৃষ্টি কেন্দ্রের সবার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বিরিঞ্চিবাবু বললেন, "তোমাদের মাসীমা কিছুতেই ছাড়লেন না বাবা অম্লান। বললেন বৈঠকে চা তো থাকবেই। কিন্তু বৈঠক ভাঙলে ছেলে-মেয়েরা একটু জলযোগ করে যাবে না সে কি একটা কথা হলো? তাই এই 'মেনু' তিনি নিজেই ঠিক করেছেন। এতে তোমরা কিছু অমত কোরো না বাবা। তাহলে উনি মনে বড় দুঃখ পাবেন।"

শুনে একবার জিভ কেটে আমাদের সকলের তরফ থেকে অম্লান বাড়রী কথা দিলে যে আমরা মাসীমাকে দুঃখের আভাসমাত্র দেবো না। ইতিমধ্যে বিরিঞ্চিবাবুর বাড়ীর ভৃত্য একটা বড় ট্রেতে করে বারো পেয়ালা চা এনে নামিয়ে দিয়ে আরো আনবার জন্যে ভেতরে চলে গেল।

অম্লান বাড়রী বললে, "সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়াটাই রেওয়াজ। কিন্তু শুধু শুকনো ধন্যবাদে তাঁকে জর্জরিত করবো না—তিনি তার অনেক ওপরে। তিনি বয়সে তরুণ হলেও কৃষ্টিতে প্রৌঢ়। সিনেমা বলুন, নৃত্য বলুন, সংগীত বলুন, চিত্রশিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন—সবেতেই তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ আমাদের প্রত্যেকের আদর্শস্থানীয়। এঁর বৈঠকখানার শো-কেসে যত আনকোরা নতুন বই সাজানো দেখেছি, অত বই আমি অনেক পণ্ডিত লোকের পড়ার টেবিলেও দেখি নি।"

বিরিঞ্চিবাবু গদগদ কণ্ঠে বললেন, "সাধু! সাধু!"

অম্লান বাড়রী বললে, "উপস্থিত সকলকেও স্বাগত অভিনন্দন জানিয়ে আমি এই কৃষ্টি কেন্দ্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। কৃষ্টি কি—এ নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই নে, কৃষ্টির ডেফিনিশান্ নিয়ে চাই নে মাথা ঘামাতে। সন্তান তার মাকে মা বলে ডাকে, বলে না আগে মা-র ডেফিনিশান্ বলো। বুক ভরে হাওয়া নিয়ে বাঁচি, দাবী করিনে হাওয়ার

ডেফিনিশান্। গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা জলে গা এলিয়ে দিয়ে প্রাণ জুড়োই, বলিনে তার আগে জলের ডেফিনিশান্ দাও। কৃষ্টিও আমাদের তেমনি। এ নইলে আমরা প্রাণে বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু মানুষ হয়ে বাঁচতে পারিনে। আমাদের সভ্যতা, আমাদের ঐতিহ্য—সবের মূল এই কৃষ্টি। কৃষ্টিতে আমাদের জন্মগত অধিকার—এ হলো গিয়ে যাকে বলে আমাদের বার্থরাইট্। কৃষ্টিতে যারা উৎসাহী এবং উৎসাহিনী তাঁদের অন্যতম মিলন-কেন্দ্র হবে এই উদয়ন কৃষ্টি কেন্দ্র। মিলন-তীর্থও বলতে পারেন। এখানে চলবে দেয়া, চলবে নেয়া। আমরা সবাই মিলে যতটুকু পারি জ্বালবো আলো। আমরা এখানে মিলবো জানতে আর জানাতে; এই জানা-জানানোর মধ্য থেকেই ফুটে উঠবে কৃষ্টির গোলাপ-চাঁপা-যুঁই-চামেলী। এইটুকু বলে' আমি আমার কথা শেষ করছি।"

বলে ভাস্কর ভট্টাচার্যির পাশে বসে পড়লো অম্লান বাড়রী। কি যেন বললো ভাস্করের কানে কানে। ভাস্কর (বোধ করি অম্লান বাড়রীর নির্দেশে) বললে, "আমি অনুরোধ করছি আমাদের মেসোমশাই কিছু বলুন।"

বিরিঞ্চিবাবুর চোখ আবার ছলছল করে উঠলো। তাঁকে বোধ হয় এর আগে কেউ কখনো এমন আগ্রহ করে কিছু বলতে বলে নি। তিনি বলতে লাগলেন, "সভাপতির আদেশ যখন হয়েছে তখন কিছু বলতেই হবে; না বলে রেহাই নেই। তবে কিনা, ঐ যে চাণক্য বলেছেন—তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে। তাই ভাবছিলুম মুখ আর খুলবো না। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ! তাহলে বলি শোনো। কৃষ্টির সত্যিকারের রং হচ্ছে সবুজ, তাই তোমরা সবুজের দলই একে গড়ে তোলো আর বাঁচিয়ে রাখো। আমরা ঝুনোর দল মাতি কৃষ্টির ছোবড়া নিয়ে। তার শাঁস-এর স্বাদ পেতে হলে আমাদের কেটে ফেলতে হবে শিং, আর ভিড়তে হবে তোমাদের সঙ্গে, বাছুরের দলে। পৃথিবীর ইতিহাস কি বলে জানি নে, কিন্তু এই হলো আমার মনের কথা। আমি আপন হাতে শিং কেটেছি, এবারে তোমাদের দলে ভিড়িয়ে নাও আমাকে। এই প্রার্থনা আমার। আর কিছু বলবার নেই।" বলে চুপ করলেন বিরিঞ্চিবাবু।

"দলে তো ভিড়িয়ে নিয়েছিই।" বললে অম্লান বাড়রী। "আপনার শিং-কেও আর গজাতে দিচ্ছি নে মেসোমশাই। আর আপনার শিং যখন কাটা যাচ্ছে, তখন মাসীমা তো আমাদের দলে রইলেনই।"

"আপনারা আর কেউ কিছু বলতে চান?" প্রশ্ন করলে সম্পাদক অম্লান বাড়রী। দেখা গেল আর কেউ কিছু বলতে চান না।

বিপাশার নিকট উপস্থিতিতে নিজেকে যে ধন্য ভাবছে ভাস্কর ভট্টচার্যি, সে কথা বিপাশাকে জানাতে পরম ব্যস্ত ভাস্কর। সে হয়তো ভাবছে আজ ধন্য হয়েছে তার মোটর গাড়ী বিপাশাকে বয়ে এনে, আর ধন্য হয়েছে তার দুটি হাত সে গাড়ী চালিয়ে এনে।

অম্লান কি যেন বললে ভাস্করের কানে কানে, তারপর ভাস্কর তার জবাব দিলে অম্লানের কানে।

অম্লান একটু এগিয়ে বসে বললে, "এবারে সভাপতির অভিভাষণ। এঁর অনেক কিছুই বলবার ছিল, আজই ভোরবেলা আমার সঙ্গে লম্বা আলোচনাও হয়েছে; তাতে ওঁর বক্তব্য সবই আমার শোনা হয়েছে। আমি ওঁর কথা ওঁর হয়ে সংক্ষেপে বলছি। ইনি আমাদের কৃষ্টি কেন্দ্রের স্থায়ী সভাপতি পদ গ্রহণ করতে রাজী হয়েছেন। আশা করি এতে সবাই আনন্দিত হবেন। যাঁর অমত আছে তিনি হাত তুলুন।······তাহলে ভাস্কর বাবুই সর্বসম্মতিক্রমে স্থায়ী সভাপতি হলেন। (হাততালি) আমাদের মেসোমশাই প্রাণে সবুজ হলেও বয়সে ঝুনো, তাই বয়স-বাহুল্যের দরুণ তাঁকে সভাপতি করা গেল না। কংগ্রেসের যেমন ছিলেন বাপুজী, তেম্নি ইনি হলেন আমাদের কৃষ্টি কেন্দ্রের মেসোমশাই। (সভায় উল্লাসধ্বনি, হাততালি ইত্যাদি)। আপনারা সবাই হয় তো জানেন না, আজ আমাদের মাননীয়া অতিথি মিস্ বিপাশা বনার্জীকে—যিনি আমাদের সভ্যার তালিকায় নাম দিতে রাজী হয়েছেন—নিজের গাড়ীতে নিজের হাতে ড্রাইভ্ করে নিয়ে এসেছেন আমাদের সভাপতি। (সমবেত হর্ষধ্বনি)। শুধু তাই নয়, সভাপতি বলেছেন তাঁর নিজের দুখানা গাড়ীর যে কোনো একখানা তিনি আমাদের এই কৃষ্টি কেন্দ্রের কাজের জন্যে উৎসর্গ করে

দেবেন। (আবার হর্ষধ্বনি)। তা ছাড়া বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রয়োজনে দুখানা গাড়ীও সাময়িক ভাবে আমাদের কৃষ্টিমূলক কাজে তিনি ধার দেবেন। (তুমুল হর্ষধ্বনি)। এ ছাড়াও আরো যে কোনো রকম সাহায্য দরকার—"

এইখানে ভাস্করের বাধা পেয়ে অম্লান কান নিয়ে গেল ভাস্করের মুখের কাছে। তারপর বলতে লাগলো, "সাহায্য কথাটায় সভাপতি আপত্তি করছেন। তিনি বলছেন সাহায্য নয়, সহযোগিতা। কৃষ্টি কেন্দ্রের কাজে যখন যে কোনো রকম সহযোগিতা দরকার তাই তিনি দিতে প্রস্তুত।"

মেসোমশাই বিরিঞ্চিবাবু বললেন, "সাধু! সাধু!"

অম্লান বাড়রী পকেট থেকে একটা লাল ফিতে বার করে তার এক মাথা সভাপতি ভাস্করের হাতে দিয়ে এসে আরেক মাথা আমার হাতে গুঁজে দিলে। তারপর একটা] ছোট কাঁচি বিপাশা দেবীর হাতে দিয়ে তাঁকে ফিতের মাঝামাঝি জায়গায় নিয়ে এসে বললে, "এইখানটায় কাটুন।"

কুমারী বিপাশা কাঁচি দিয়ে ক্যাঁচ্ করে কাটলেন। লাল ফিতেটা কেটে দু'টুক্‌রো হয়ে গেল। অম্লান বাড়রী বললে, "এই শুভ মুহূর্ত থেকে উদয়ন কৃষ্টি কেন্দ্রের যাত্রা হলো শুরু। তার যাত্রাপথে থাকবে না কোনো লাল ফিতের বাধা। বিপাশা দেবীর কল্যাণী হাতে আমাদের লাল ফিতে আজ কাটা পড়লো।"

হাততালি দিতে হলো। কাঁচি ফেরত নিলে অম্লান বাড়রী। তারপর ডাক পড়লো ওপরের ঘরে। গরম গরম ফুল্‌কো লুচি—বনস্পতির নয়, বিশুদ্ধ মাহিষ্য ঘৃতের। তার সঙ্গে ফুলকপির ডাল্‌না, চাট্‌নী, সন্দেশ ইত্যাদি—মেসোমশাই যা যা বলেছিলেন। মাসীমা হেমাঙ্গিনী দেবী পরিবেশন করলেন আপন হাতে।

দেখলাম অম্লান বাড়রী খাচ্ছে অম্লান বদনে, আর খুশী করছে মাসীমাকে। খাবো না খাবো না করে ভাস্কর যা খাচ্ছে তাকেও কম বলা চলে না। দোটানায় পড়েছেন মিস্ বিপাশা বনার্জী। দেখে মনে হচ্ছে

তিনি খেতে পারেন প্রচুর কিন্তু সন্দেহ করছেন প্রচুর খেতে পারাটা হয় তো 'কাল্‌চার'-এর লক্ষণ নয়। মুশকিলেই পড়েছেন তিনি, কিন্তু তাঁর দু'পাশে বসেছেন দুই মুশকিলআসান—অম্লান বাড়রী আর ভাস্কর ভট্‌চার্যি। দুইজনেই ব্যস্ত পাছে মিস্ বিপাশা বেশী খেতে পেরেও কম খান। ভাস্কর বলছে আস্তে আস্তে বিপাশাকে, "আপনি কিছু খাচ্ছেন না মিস্ বনার্জী। আর দু'খানা গরম লুচি অন্ততঃ নিন। ফুলকপির ডাল্‌নাটাও হয়েছে চমৎকার।" অম্লান বাড়রী হেঁকে বলছে, "ও মাসীমা, দেখুন আপনার এই বোনঝিটি স্রেফ্ কিছু খাচ্ছেন না! আপনি নিজে এঁকে না সাম্‌লালে আমাদের কর্ম নয়।"

হেমাঙ্গিনী মাসী নিজে বিপাশাকে খাওয়াবার ভার নিলেন। বিপদে পড়ার ভান করে মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মিস্ বিপাশা।

কিন্তু এলো না মহানন্দ। মহানন্দ এলো না। অম্লান কি সত্যিই বলেছিলো তাকে আসতে? হয়তো বলেছিলো। অথবা হয় তো বলেনি। হয় তো মহানন্দ আসে নি ভাস্কর সভাপতি হবে বলে। অথবা হয় তো ৺প্রজ্ঞার কথা মনে করে বিপাশা-প্রধান বৈঠকে আসতে রাজী হয়নি তার প্রাণ। যে কারণেই হোক্, মহানন্দ আসেনি, আমার কাছে এইটেই বড় কথা।

লম্বা সবুজ গাড়ী এসে দাঁড়ালো অনাথবাবুর বাড়ীর দরজায়। সবুজ আবরণের তলায় তার হৃদ্‌যন্ত্রের থর থর কম্পন থেমে গেল। এ গাড়ী চেনেন অনাথবাবু। বললেন, "রায়বাহাদুর ফিরলেন বুঝি শিলং থেকে।" বলে' এগিয়ে গিয়ে প্রতীক্ষায় দাঁড়ালেন। সঙ্গে আমিও গেলাম।

গাড়ী থেকে নেমে এলেন দামী ধুতি-পাঞ্জাবি শৌখীন নাগ্‌রা-পরা প্রবীণ ভদ্রলোক। সুদর্শন চেহারায় পরিণত বয়সের পরিচয় আছে, বার্ধক্যের

ছাপ নেই। দেখে বোঝা যায় নিজেকে প্রচুর তোয়াজে রাখবার মতো অর্থ প্রাচুর্য তাঁর আছে, দুনিয়ার ঝড়-ঝাপ্টার ছোঁয়া লাগতে দেন না গায়ে।

অপরিচিত আমাকে দেখে একটু যেন থমকে থেমে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। তাঁকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে অনাথবাবু বললেন, "একে আপনি আগে দেখেননি রায়বাহাদুর, এ হলো ধনপতি। আমার সহধর্মিণীকে মাসী বলে' ডাকে। ঘরের ছেলে বলেই ওকে মনে করি। আর ধনপতি, ইনি হলেন—নামে নিশ্চয় চিনবে—রায়বাহাদুর নয়নাভিরাম বরুয়া। ডাকসাইটে প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। কলকাতা শহরে এঁর সতেরো-খানা বাড়ী।"

"আঠারোখানা।" বললেন রায়বাহাদুর।

"আঠারোখানা।" আপন ভুল শুধরে নিয়ে বললেন অনাথবাবু। "অথচ এঁর ব্যবহারে, এঁর কথাবার্ত্তায়, এঁর হাবভাবে তোমার তা মনেই হবে না ধনপতি। এমনি অমায়িক, নিরহঙ্কার, মাটির মানুষ—"

রায়বাহাদুর বললেন, "অমন করে' বলে' আমায় লজ্জা দেবেন না অনাথবাবু।"

"যাঁর যে গৌরব ন্যায্য পাওনা, তা তো তাঁকে দিতেই হবে রায়-বাহাদুর।" বললেন অনাথবাবু।

"তাই বুঝি কথায় বলে, 'গিভ্ দি ডেভিল্ হিজ ডিউ।' হাঃ হাঃ হাঃ।..." নিজের রসিকতায় নিজেই একটু হেসে নিলেন রায়বাহাদুর। হেসে একবার তাকালেন আমার দিকে।

"এ বয়সে ও কি অপূর্ব, কি সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠব। সত্যিই নয়না-ভিরাম।" অনাথবাবু বলে' চল্লেন। "কি সুঠাম, কি সটান, কি সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতি। শরীর তো আমরাও রেখেছি, কই এমনটি তো পারি নি।"

রায়বাহাদুর বললেন, "শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। ঘি, মাখন, দুধ, ছানা, ডিম, মাছ, মুরগী, আপেল, নাশপাতি, পেস্তা-বাদাম এ সব বরাবর চালিয়ে এসেছি, শরীরটাকে কখনো রেহাই দিইনি, তাই

এখনো অনায়াসে সয়ে যাচ্ছে। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডাক্তার সান্যেল বলে, 'রায়বাহাদুর, আপনার তো কই ব্যামো ট্যামো কখনো হতে দেখি নে।' আমি বলি, 'ডাক্তার, ব্যামো হবার জন্যে তো তোমাকে পোষা নয়। ব্যামো না হবার জন্যেই পোষা।' মাসমাস মোটা মাসহারা দিই কিনা। হেঃ হেঃ হেঃ···!!!"

"আর কি স্নিগ্ধ ভাবগম্ভীর অথচ হাস্যোজ্জ্বল সৌম্য শান্ত চিত্তমুগ্ধকর মুখমণ্ডল!" বলতে লাগলেন অনাথবাবু। "প্রশস্ত প্রশান্ত ললাটে কোথাও এতটুকু ভাঁজের রেখা দেখতে পাবে না। দুচোখের দৃষ্টি গভীর, কিন্তু চোখ গভীরে ডোবে নি। তারুণ্যের চাপল্য নেই, কিন্তু তার পুরো লাবণ্য যেন সারা মুখ জুড়ে' টলমল করছে। তুলনা নেই, তুলনা নেই, এর তুলনা মেলে না ধনপতি। জানি নে আপনার মুখের যৌবন আপনি এমন অটুট রেখেছেন কোন্ গোপন কৌশলে রায়বাহাদুর!"

রায়বাহাদুর আবার খুশী হলেন, আবার মৃদু আনন্দের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, "এর ভেতর গোপনও কিছু নেই, কৌশলও কিছু নেই। যাকে বলে 'ওপন্ সিক্রেট'। ইংরিজীতে একটা কথা আছে তো—ফেস্ ইজ্ দি ইন্ডেক্স্ অফ্ দি মাইণ্ড? মুখ হচ্ছে মনের আয়না। মন বিকৃত হলেই মুখের বিকৃতি ঘটবে। তাই গুরুদেব বলেন, 'ওরে, মনের বিকার কখনো ঘটতে দিবি নে। দুঃখে শোকে ক্রোধে অভিভূত হবি নে, আত্মহারা হবি নে কোনো আনন্দে। দুঃখ এলে কেঁদে ভাসাবি নে, ভাববি অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। সুখ এলেও হেসে ভাসাস্ নে, ভাবিস্ এমন দিনও একদিন থাকবে না।' গুরুদেবের এই বাণী কখনো ভুলি নি, কখনো ভুলি নে অনাথ বাবু। মন খারাপ করে চেহারা খারাপ করি নে, শরীর খারাপ করিনে। মনের ভেতর কোনোরকম মন-খারাপের আগুন জ্বলতে দিলেই সে আগুনে পুড়ে চেহারা লোকসান হবে, আয়ুক্ষয় হবে। আর ঐ দুটোকেই তো বাঁচানো দরকার।"

অনাথবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, "অতি খাঁটি কথা বলেছেন রায়-বাহাদুর।"

"কিন্তু পরমব্রহ্মকে এইটে যেন কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারি নে।" বললেন রায়বাহাদুর নয়নাভিরাম বরুয়া, আমাকে চমকে দিয়ে।

আমার মুখ থেকে আচমকা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল, "পরম ব্রহ্ম ?"

আমার বিস্ময় দেখে কৌতুক অনুভব ক'রে অনাথবাবু বললেন, "রায় বাহাদুরের বড় ছেলে ডক্টর পরমব্রহ্ম বরুয়া, পি-এচ-ডি।"

"ডি-লিট, পি-এচ-ডি।" অনাথবাবুর ভুল শুধরে দিয়ে বললেন রায় বাহাদুর। "পতঞ্জলির দর্শনের ওপর থিসিস লিখে পি-এচ-ডি। পতঞ্জলির ওপর পরমব্রহ্মই তো আজকাল যাকে বলে গিয়ে 'অথরিটি'। আর রবি ঠাকুরের ওপর থিসিস লিখে ডি-লিট হয়েছে প্যারিস থেকে। পণ্ডিত, পণ্ডিত, ভয়ানক পণ্ডিত পরমব্রহ্ম। কিন্তু ঐ যে বলেছি সুখে দুঃখে, রাগে অনুরাগে বড্ড বেসামাল হয়ে পড়ে। চিত্ত-প্রশান্তি একেবারে নেই।"

একটু থেমে বোধ করি তাঁর মনে হলো একটা উদাহরণ দেওয়া দরকার। তাই বললেন, "একদিন কোথায় লেকচার দিতে গিয়ে তার সোনার পকেট ঘড়িটি খোয়া গেল। এসে মনের দুঃখে তার প্রায় নাওয়া খাওয়া বন্ধ। আমি বললুম, নিজের হারানোর ব্যথায় না কেঁদে ওটা যে পেয়েছে বা হাতিয়েছে তার আনন্দের কথা ভেবে হাসবার চেষ্টা করো পরমব্রহ্ম, প্রাণে শান্তি পাবে। আমার কথা সে কানেই তুললে না, ভাবলে এ আমার ভীমরতি। বুঝলে না যে সে পি-এচ-ডি, ডি-লিট, কিন্তু আমি পি-এচ-ডি, ডি-লিটের বাবা। হেঃ হেঃ হেঃ।" হেসে আমার দিকে একটু তাকালেন রায় বাহাদুর।

একটু অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। মনে হলো হয়তো আমার উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করছেন রায়বাহাদুর, প্রাণের বক্তব্য প্রাণ খুলে পেশ করতে পারছেন না অনাথবাবুর কাছে। কিন্তু অনাথবাবুর তরফ থেকে কোনো নির্দেশ বা ইঙ্গিত না পেয়ে চলে যাওয়াটাও উচিত মনে হচ্ছিল না। এদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা চলছে, রায় বাহাদুরকে এনে বসাচ্ছেনও না অনাথবাবু; সে কি ইচ্ছে করেই, না খেয়াল না করে' ?

আমার মনের কথার ছোঁয়াচ লেগেই কিনা জানি না, হঠাৎ এই ত্রুটিটুকু খেয়াল করলেন অনাথবাবু। যেন আকাশ থেকে পড়ে' বললেন, "এই ছাখো। এতক্ষণ যে দাঁড়িয়েই আছেন, সে কথা বেমালুম ভুলে' বসে আছি। ছি ছি ছি ছি ছি! কি কেলেঙ্কারি দেখুন দিকি, আসুন, বসুন এসে রায় বাহাত্নর। এ বাড়ী আপনার নিজের বাড়ীঘর বলেই মনে করবেন।"

"তাই করবার জন্যেই তো এসেছি অনাথবাবু।" বললেন রায়-বাহাত্নর। "এখন সবই বিন্ধ্যবাসিনীর ইচ্ছে। তাই তো শিলং থেকে ফিরে স্টেশন থেকে সোজা আপনার এখানেই চলে' এসেছি। এরোড্রোমে গাড়ী পাঠাবার জন্যে অবশ্য আগেই বাড়ীতে টেলি করে' দিয়েছিলুম।"

যেন অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন অনাথবাবু। বললেন, "বলেন কি রায় বাহাত্নর? বাড়ী না গিয়ে একেবারে সোজা আমার এখানে? তাহলে যাই চা-টা'র ব্যবস্থা—"

"ব্যস্ত হবেন না, ব্যস্ত হবেন না আপনি অনাথবাবু। সে পরে যথাসময়ে হতে পারবে।" বললেন রায়বাহাত্নর বরুয়া। "অমন হৈ হৈ তাড়া কিছু নেই। প্লেন থেকে এরোড্রোমের রেস্তোর্‌াঁয় টি-ব্রেকফাস্ট সারা হয়ে গেছে।"

অনাথবাবুর আমন্ত্রণে এসে আসন গ্রহণ করলেন রায়বাহাত্নর। করে' আবার করুণ নেত্রে আমার দিকে তাকালেন। দেখে মনে হলো শুধু চেহারা খারাপ হবার ভয়েই বিরক্তি ভুলে আছেন তিনি।

পাতানো মাসীমার সঙ্গে দেখা করবার অজুহাতে ভেতরে ঢুকে গিয়ে পাশের ঘরে চুপচাপ বসে পড়লাম, যেখান থেকে খোলা জানালার মধ্য দিয়ে রায় বাহাত্নর আর অনাথবাবুর কথা কান পেতে থাকলে সহজেই শুনতে পাওয়া যাবে। শুনতে পাওয়াও গেল।

"শিলং-এ বিন্ধ্যবাসিনীকে স্বপ্নে দেখেছিলুম অনাথবাবু। তাই চ'লে আসতে হলো প্লেনে উড়ে'।" বললেন রায় বাহাত্নর।

অনাথবাবু চমকিত কণ্ঠে বললেন, "আপনার সহধর্মিণীকে? যিনি বছর কুড়ি আগে স্বর্গীয়া হয়েছিলেন?"

রায় বাহাদুর বললেন, "কুড়ি বছর নয় অনাথবাবু। একুশ বছর তিন মাস। সেই থেকে এতদিন যে বুকের ভেতরটা কি হাহাকার করেছে তার জন্যে, তা ব'লে বোঝানো অসম্ভব। সে যে কি যন্ত্রণা, সে শুধু আমিই জানি। আপনার জানা সম্ভব নয়। ঐ যে কবি বলেছেন : কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে? বিন্ধ্যবাসিনী যখন চোখ বুজলে তখন মনে হলো পৃথিবী আমার চোখে অন্ধকার হয়ে গেল, আর বুঝি তুনিয়ায় আলো জ্বলবে না। পরমব্রহ্ম তখন বালকমাত্র। বিন্ধ্য চোখ বুজবার আগে তাকে আকুল হয়ে বলেছিলুম সে যেন আমাকেও তার সঙ্গে নিয়ে যায়। তখন বিন্ধ্য কি বললে জানেন?"

"কি বললেন তিনি?" অনাথবাবুর প্রশ্ন।

"তিনি বললেন তা হয় না, ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করে' তুলবার জন্যেই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে, তাদের পুরো অনাথ করে আমার মরা চলবে না। ভেবে দেখলুম ঠিকই বলেছে বিন্ধ্যবাসিনী। আপনি তো বিন্ধ্যবাসিনীকে কখনো দেখেন নি অনাথবাবু?"

"কখনোই দেখিনি, রায় বাহাত্বর।"

"দেখলে বুঝতেন সে কি ছিল, আর তাকে হারানো মানে কাকে হারানো। বিন্ধ্যবাসিনী চোখ বোঁজার পর আমার মুখের পানে তাকিয়ে সবাই একবাক্যে বললে রায় বাহাত্বরকে আর চেনাই যায় না।"

"সওয়া একুশ বছর আগে? তখন কি আপনি—"

"হ্যাঁ, ঠিক সেই বছরই আমি রায় বাহাত্বর হয়েছিলুম অনাথবাবু। বিন্ধ্যবাসিনী যেন আমায় রায় বাহাত্বর দেখে যাবার জন্যেই অপেক্ষা করেছিল। আমি রায় বাহাত্বর হবার পর ছ মাসও পুরলো না, তার আগেই আমায় একা ফেলে চলে' গেল। আমার বুকের ভেতর কি নিদারুণ সাহারার হাহাকার নিয়ে মা-হারা শিশুদের মানুষ করে তুলতে লাগলুম, কি ক'রে আপনাকে বোঝাবো অনাথবাবু? রায় বাহাত্বর খেতাবের বিনিময়ে যদি বিন্ধ্যবাসিনীকে ফিরে পাওয়া যেতো, সে খেতাব ত্যাগ করা আমার

পক্ষে তখন বোধহয় অসম্ভব হতো না।" অসামান্য পত্নীপ্রেমের সুর ঝরে' পড়লো রায় বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে।

"যাবার আগে বিন্ধ্যবাসিনী ব্যাকুলকণ্ঠে জানিয়ে গেল তার সে বিদায় শেষ বিদায় নয়। আবার সে আমারই হবে।" বললেন রায় বাহাদুর। "তারপর চারিদিক থেকে কত অনুরোধ, কত অনুনয়, কত উপদেশ, কত পরামর্শ—বিয়ে করো, বিয়ে করো, আবার বিয়ে করো। নিজের মুখপানে না চাও, অন্ততঃ ছেলেমেয়েগুলোর মুখ চেয়ে আবার বিয়ে করো। ঘটকের দল বললে, 'আপনার লক্ষ্মীহীন শূন্যপুরীর পানে তাকালে বুকটা যে হাহাকার ক'রে ওঠে রায় বাহাদুর।' কিন্তু যে হৃদয়ে আমার বিন্ধ্যবাসিনী, সে হৃদয়ে আর কোনো নারীর ঠাঁই হওয়া সম্ভব ছিল না অনাথ-বাবু। আপনাকে আজ আর বলতে বাধা দেখি নে, আমাদের তখনকার দিনে আজকালকার মতো রোমান্টিক কোর্টশিপের তেমন সুযোগ ছিল না বটে, কিন্তু তবু পূর্বরাগ একটু আমাদের হয়েছিল।"

পুলকে ফেটে পড়ার ছন্দে অনাথবাবু বলে' উঠলেন, "বলেন কি রায় বাহাদুর? পূর্বরাগ?"

"পূর্বরাগ।" বললেন রায়বাহাদুর, ঈষৎ গর্বভরা সুরে। "বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবার আগে বাড়ীর মেয়েরা একবার গিয়ে দেখে এলেন বিন্ধ্যবাসিনীকে। দেখে একবাক্যে মুগ্ধ—অমন মেয়ে হয় না। বিন্ধ্য-বাসিনীর পিতামহ ছিলেন যেমন ডাকসাইটে দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার, তেমনি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বেদ বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবত—এসব তো একেবারে কণ্ঠস্থ। অথচ গোঁড়ামি একেবারে নেই। তিনি বললেন পাত্র নিজেও এসে পাত্রীকে দেখে যাক, পাত্রীও দেখুক পাত্রকে। আমিও লাজুক, আজকালকার ছোকরাদের মতো আপ-টু-ডেট্ হই নি তো। তবু ভাবী দাদাশ্বশুরের জেদ। যেতে হলো। দাদুর হুকুমে হারমোনিয়াম বাজিয়ে —তখন হারমোনিয়ামের নতুন চলতি হয়েছে—লাজ-লাজ গলায় গান শোনালে বিন্ধ্যবাসিনী: শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো! ঐ গানখানা বড্ড চালু ছিল। মেয়েরা বিয়ের বয়েসে পা দিলেই ঐ গানখানা শিখে

রাখতো—দেখতে এলে গেয়ে শোনাবে বলে'। ছাঁদনাতলায় শুভদৃষ্টি হবার আগেই আমাদের আগাম শুভদৃষ্টি হয়ে গেল। প্রথম দর্শনেই প্রেম। আহা, কি গানই সেদিন গাইলে বিন্ধ্যবাসিনী। হারমোনিয়াম বেকায়দায় বাজছে সরমে কাঁপা হাতে, লজ্জায় কাঁপছে গলা, ভুল হয়ে যাচ্ছে গানের কথাগুলো। কিন্তু সে গানে কী যে ছিল প্রাণের দরদ! তার ঝংকার এখনো আমার প্রাণের বীণায় বাজছে ঃ শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো।"

থামলেন একটু রায় বাহাদুর। একটু কি যেন ভেবে অনাথবাবু বললেন, "প্রথম দর্শনেই বলুন, আর হাজার দর্শনেই বলুন, প্রেম ট্রেম আমি বুঝি নে রায় বাহাদুর।"

রায় বাহাদুর বুঝি বা ক্ষুব্ধ হলেন একটু। কিন্তু মনের ভারসাম্য না-হারাবার সাধনা তাঁর, ক্ষোভ সামলে নিয়ে বললেন, "প্রেম তো বোঝার জিনিস নয় অনাথবাবু, অনুভব করবার জিনিস। এর সত্যিকারের উপলব্ধি হয় ব্যথার মধ্য দিয়ে। প্রেম পরশমণি লোহাকে সোনা করে' দেয়, এ আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি।"

রায় বাহাদুরের বিলম্বিত লয়ে আমারই মতো বিড়ম্বিত বোধ করেই বোধহয় অনাথবাবু ইঙ্গিতপূর্ণ স্বরে দ্রুতবেগে বললেন, "তারপর? তারপর, রায় বাহাদুর? আপনার শিলং-এর স্বপ্নের কথাটা বলুন।"

"তাতেই আসছি অনাথবাবু।" রায় বাহাদুর বললেন। "তার আগে গোড়ার কথাগুলো বলে' না নিলে তো হবে না। বিন্ধ্যবাসিনীর একুশ বছর পুরো হয়েছে, তখন আমাদের প্রথম দেখা হলো।"

"একুশ ?????···!!!!" বললেন অনাথবাবু।

"একুশ। তখনকার হিসেবে বয়সটা একটু হয় তো বেশী।" বললেন রায় বাহাদুর। "[illegible] পিতামহ'র ছিলো ধনুর্ভঙ্গ পণ, হীরের টুকরো ছেলে না পেলে নাতনীর বিয়ে দেবেন না। কিন্তু একুশ বছর হলে হবে কি, সে যে তখনো কি সরলা, কি লজ্জাবতী, কি আন্‌সোফিস্‌টিকেড্‌!! মনে হলে ছু চোখ আজো জলে ভরে' উঠতে চায়। থাক সে পুরোনো কথা।

শিলং পাহাড়ের বুকে একখানা বাড়ী কিনে একেবারে পাকা ব্যবস্থা ক'রে এলুম। খাসা বাড়ী। অমিট্ রায় আর লাবণ্য-র গাড়ীতে গাড়ীতে যেখানটায় টক্কর লেগেছিল, সে জায়গাটাও বাড়ীর ছাত থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। রবিঠাকুর নাকি ও জায়গাটা নিজের চোখে দেখেই 'শেষের কবিতা' লিখেছিলেন।"

"কিন্তু শিলং-এ বাড়ী কিনলেন কেন রায়বাহাদুর?" শুধালেন অনাথবাবু। "কলকাতায় আপনার—"

"আর ভালো লাগছে না। আর ভালো লাগবে না অনাথবাবু।" বললেন রায় বাহাদুর। "দূরে সরে যেতে চাই ছেলেমেয়েদের কর্তৃত্ব থেকে, আত্মীয়-স্বজনের আলোচনার আওতা থেকে, যেখানে এক ডাকে রায় বাহাদুর বলে' কেউ আমায় চিনবে না। নিজের জীবন একটু নিজের প্রাণের খুশীমতো বাঁচতে চাই। চেনার আওতার ভেতর প্রাণকে উপোসী রেখে দিনগত পাপক্ষয় আর সইছে না অনাথবাবু। শিলং-এ থাকবে আমার আপন এলাকা, সেখানে পরমব্রহ্মেরও কোনো সর্দারি চলবে না। তাছাড়া আমার শিলং-এর বাড়ীর কথা আমি আর কাউকেই বলি নি। সে আমার গোপন কথা, শুধু আপনিই জানলেন।"

"শুধু আমি? শুধু আমি, রায় বাহাদুর?" অভিভূত কণ্ঠে বললেন অনাথবাবু।

"শুধু আপনি, অনাথবাবু।" বললেন রায় বাহাদুর। "এখন আর বলতে বাধা দেখি নে, আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক আমার আলাদা। যেদিন ধূর্জটি ধারা প্রথম আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে সেদিনও বুঝতে পারি নি। সেদিন শুধু আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলুম, আপনি অ্যাসট্রলজি জানেন বলে। মনে পড়ে অনাথবাবু?"

"মনে পড়ে।"

"আমাকে মনোবিশ্লেষণ করেছিল ধূর্জটি। কিন্তু ওতে কি হবে ছাই? আমার দরকার অ্যাসট্রলজি, ভাগ্য-গণনা। তখন ধূর্জটি দিলে আপনার সঙ্গে আলাপ করে'। আপনি অ্যাসট্রলজি তচ্‌নচ্‌ করে' যা

বললেন তা আমার অন্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে গেল। আপনি বললেন, বিন্ধ্যবাসিনী আবার জন্ম নিয়েছে, রয়েছে আমারি প্রতীক্ষায়। কিন্তু কোথায়? সে প্রশ্নের জবাব দিলে না আপনার অ্যাসট্রলজি; তারপর—" আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো রায় বাহাদুরের।

"তারপর? তারপর, রায় বাহাদুর?"

"তারপর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সেই সম্মিলিত বিচিত্র অনুষ্ঠান। কি অপরূপ প্রাচ্য নৃত্য-ভঙ্গিমা দেখলুম প্রজ্ঞাপারমিতার, কি অনির্বচনীয় তার মধুঝরা কণ্ঠের রবিঠাকুরী গান! দেখলুম আপনি চেয়ে আছেন কন্যা-গর্বিত স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিতে। আর আমি? আমি তখন পাথুরে মূর্তির মতো স্থির—জানি নে জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি। তেমনি স্বর্গীয় হাসি, তেমনি অতুলনীয় চোখের চাওয়া, তেমনি মিঠে কণ্ঠস্বর, তেমনি মোহময়ী চলার ছন্দ, তেমনি আগুল্‌ফলম্বিত কেশদাম! আর কি অপূর্ব তার সেই অতুলনীয় কণ্ঠের সুললিত গান: 'যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে?' সে তো গান নয় অনাথবাবু, সে তার অন্তর হতে স্বতঃ উৎসারিত অমৃত-নির্ঝর। প্রাণের ব্যাকুল প্রশ্ন গান হয়ে বেরিয়ে আসছে তার। সে আমায় চিনেছিল কিনা জানি নে, আমি তাকে তখনি চিনে নিলুম। একুশ বছর আগে চলে গিয়েছিল যে বিন্ধ্যবাসিনী, আবার ধরার বুকে ফিরে আসতে সে বেশী দেরী করে নি। বুঝলুম আমার সন্ধানের শেষ হলো।"

"কিন্তু রায় রাহাদুর—" প্রায় আর্তকণ্ঠে বলতে গেলেন অনাথবাবু; সে বাধা মানলেন না রায় বাহাদুর। বললেন, "আমার কথা শেষ করতে দিন অনাথবাবু। এ স্রোত অনেক দ্বিধা অনেক সংকোচ পার হয়ে এসেছে, একবার এর গতি থেমে গেলে হয় তো আর এগোতে পারবে না। যদি তারে নাই চিনি গো! একুশ বছর পুরো করে' তারপর আমায় চিনেছিল বিন্ধ্যবাসিনী। হিস্ট্রি রিপীট্‌স্ ইট্‌সেল্‌ফ্। তাই ভাবলুম এবারেও একুশ বছর পুরো হোক, তার আগে অধৈর্য হয়ে তীরের কাছে এসে নৌকো ডোবানোটা কিছু নয়। সময়মতো সামনে এলে সে আমায় চিনবেই।

তাই তো বাকী ক'টি দিনের জন্যে চলে গেলুম শিলং পাহাড়ে। সেখানে অনেকদিন পর এই সেদিন স্বপ্নে দেখলুম আমার একুশ বছর তিনমাস আগে হারিয়ে যাওয়া জীবন-সঙ্গিনী বিন্ধ্যবাসিনীকে। মুখে তার বিরহের বেদনা নয়, আসন্ন পুনর্মিলনের হাসি। দেখলুম সে মুখ যেন আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে কোন মায়ামন্ত্রে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। শেষে দেখি সে মুখ—"

"সে মুখ—?"

"প্রজ্ঞাপারমিতার।"

"প্রজ্ঞাপারমিতার ????"

"হ্যাঁ অনাথবাবু, প্রজ্ঞাপারমিতার। আপনার কন্যা প্রজ্ঞাপারমিতার। বিন্ধ্যবাসিনী আবার এসেছে। কাল তো একুশ বছর পুরেছে প্রজ্ঞা-পারমিতার। আজ সে আমায় চিনতে পারবে। একবার তাকে ডাকুন অনাথবাবু।"

"কিন্তু সে আসবে না রায় বাহাদুর। হাজার ডাকলেও আর আসবে না প্রজ্ঞাপারমিতা।"

"একটিবার, শুধু একটিবার অনাথবাবু। একবার শুধু সে সামনে এসে দাঁড়াক, চেয়ে দেখুক আমার মুখের পানে। আমি কোনো দাবী করবো না, কোনো অনুরোধ করবো না। শুধু এইটুকুই জেনে যাবো সে আমায় চিনতে পেরেছে কিনা।"

কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে যেন প্রাণপণে সামলে নিলেন রায় বাহাদুর।

প্রাণপণে উচ্ছ্বাস চেপে অনাথবাবু বললেন, "আপনাকে এতক্ষণ ধরে একটি কথাই বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছি রায় বাহাদুর, প্রজ্ঞা আর নেই। মা আমার আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চ'লে গেছে।"

"প্রজ্ঞাপারমিতা নেই? চলে গেছে প্রজ্ঞাপারমিতা?" রায় বাহাদুর যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না।

"আর ক'টা দিন আগে এলেই তাকে শেষ দেখা দেখতে পেতেন রায় বাহাদুর।" করুণ কণ্ঠে বললেন অনাথবাবু। "মাত্র ক'দিনের জ্বরে হঠাৎ সে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।"

নিয়তির নির্মম খামখেয়ালে মর্মাহত হয়েই যেন পরম ধৈর্যে হৃদয় বেঁধে ধীর গম্ভীর বেদনা-গুপ্ত কণ্ঠে রায় বাহাদুর বললেন, "ছেলেমেয়েরা জানলে না এতদিন পর তারা আবার নতুন করে মাতৃহারা হলো। হয় তো সে আমায় চিনেছিল, কিন্তু আপনি এসে চেনাতে চায়নি নিজেকে। আমি এগিয়ে গিয়ে চেনা দিইনি চিনে নিইনি বলেই হয় তো অভিমান করে' চলে' গেল বিন্ধ্যবাসিনী। হয়তো সে আবার ওপারে গিয়ে আমারই পথ চেয়ে বসে রইল।"

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। তারপর কান্না-চাপা কণ্ঠে রায় বাহাদুর বললেন, "উঃ! এ অসহ্য। এ অসহ্য। আপনি ধৈর্য ধারণ করছেন কি করে অনাথবাবু?"

"ধৈর্য তো আমি ধারণ করছি না রায় বাহাদুর। ধৈর্যই আমাকে ধারণ করে' আছে। এ তো চেঁচিয়ে কাঁদবার মতো ছোট ব্যথা নয়, এ হলো নীরবে বুকের ভেতরটা কুরে কুরে ঝাঁঝরা করে দেওয়া মহা-বেদনা। প্রজ্ঞাপারমিতা! মা আমার! এ জিনিস যার গেল, শুধু সেই বুঝলে কি জিনিস তার গেল। তাই তো ঈশ্বরকে বলি—হে ঈশ্বর, যদি এমন করে ছিনিয়েই নেবে তবে দিয়েছিলে কেন? আর যদি দিয়েই ছিলে, তবে কেন এমন করে' ছিনিয়ে নিলে?"

"নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর ভগবান।" বললেন রায় বাহাদুর। "আর তার চেয়ে মূর্খ—মূর্খ—মূর্খ আমি। আমারি মূর্খতায় অভিমান করে সে চলে গেল।"

বিদায় নিয়ে চলে' গেলেন রায় বাহাদুর, ভগ্নহৃদয়-ভরা হাহাকার নিয়ে। একটু পরেই তাঁর গাড়ীতে স্টার্ট দেবার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল।

বেরিয়ে এলাম পাশের ঘরের আড়াল থেকে। অনাথবাবু বললেন,

"বুড়ো বয়সে ভীমরতির কথা শুনেছো তো ধনপতি ? তার একটি জলজ্যান্ত নমুনা চোখে দেখলে, কানে শুনলে। সাইকো-অ্যানালিস্ট ধূর্জটিই ওঁকে এনে আমার কাছে ভিড়িয়ে দিয়েছিল আমি জ্যোতিষ বিদ্যার জাহাজ, এই পরিচয় দিয়ে। আমিও শাঁসালো মক্কেল দেখে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে গেছি। ওঁর তিথি নক্ষত্রের ওরই খুশীমতো হিসেব করে ওঁরই মর্জিমাফিক কথা শুনিয়ে গেছি। বলেছি, বিন্ধ্যবাসিনী অনেকদিন হলো নতুন জন্ম নিয়ে তাঁরই সঙ্গে আবার মিলবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে দিন গুণছে—এইসব ছাইপাঁশ।"

"কিন্তু তাতে আপনার কি লাভ হয়েছে অনাথবাবু ?"

"হয়েছে বই কি ? লাভের গন্ধ না পেলে অনাথ চৌধুরী কোনো কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমার অ্যাসট্রলজির মিঠে বুলি শুনে শুনে যখন তখন অর্থ ঢেলেছেন রায় বাহাদুর, ভারত মার্কা মধু আর মঙ্গলচণ্ডী মাদুলির কারবারে সে টাকা বেশ কাজে লেগেছে। কিন্তু রায় বাহাদুরের ভীমরতির যে এ হেন পরিণতি হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি ধনপতি।"

ডাকলেন ডাক্তার ব্যোমকেশ বর্ধন (হোমিও)। সাড়া দিলেম রাস্তা থেকে। ডাক্তার বর্ধন বললেন, "ভেতরে আসুন ধনপতিবাবু।" গেলেম ভেতরে। বললেম, "কেন বলুন তো ?"

"আগে বসুন তো গ্যাঁট হয়ে। তারপর বলছি।" বললেন ডাক্তার বর্ধন। "অনাথের ওখানে আপনার এত যাতায়াত কেন বলুন তো ? কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, কিন্তু অ্যাদ্দিন কিছুই বলি নি। আপনার ভালোর জন্যেই বলছি, অনাথ লোক সুবিধের নয়। রামঘুঘু। তাছাড়া প্রজ্ঞাপারমিতা বেঁচে থাকতে তো আপনাকে দেখা যায় নি। প্রজ্ঞাও চলে

গেল, আর আপনিও ঘন ঘন ওর বাপের বাড়ী—ওকি, তুমি এখনো হাত গুটিয়ে বসে আছো যে হে ত্রিলোচন? দাও দাও, চট করে কাজটা সেরে দিয়ে নগদ পাওনা নিয়ে যাও।”

ত্রিলোচন বললে, “দামটা যে আপনি রফা করছেন না ডাক্তারবাবু। দু' আনার কমে মজুরী পোষায় না। অথচ আপনি বললেন এক আনা।’

“তুমি যে দুপুরে ডাকাতি করতে চাইছ হে ত্রিলোচন।” বললেন ডাক্তার বর্ধন। “৩৫-এর পাঁচ কেটে ছয় করে দেবে, কি এমন মেহনত তোমার? এক আনা কিছু অন্যায় বলি নি আমি। কি বলেন ধনপতিবাবু?”

ডাক্তার বর্ধনের দরজার বাইরে দেওয়ালের গায়ে আঁটা কাঠের কালো নামফলকে লেখা আছে সাদা হরফে ঃ

ডাক্তার ব্যোমকেশ বর্ধন (হোমিও)
—৩৫ বছরের অভিজ্ঞ—
নূতন ও পুরাতন সর্বপ্রকার রোগে
পারদর্শী।
রোগী দেখিবার সময় (বিনা দর্শনীতে)
প্রাতে—৭টা হইতে সাড়ে দশটা
সন্ধ্যায়—৫টা হইতে সাড়ে আটটা

আজ ডাক্তার বর্ধনের অভিজ্ঞতার বয়স এক বছর বেড়েছে, তাই ৩৫ বদলে ৩৬ করে দিতে হবে।

ত্রিলোচন বললে, “আপনি আমার তল্লাটে যে কাউকে খুশী জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, বলবে ত্রিলোচন মিস্ত্রী তুলি ধরলেই দু' আনা, তার কমে তুলি ছোঁয় না।”

ডাক্তার বর্ধন বললেন, “একদিনের কাজ নয় হে ত্রিলোচন, তুমি

আমায় বাঁধা খদ্দের পেলে। কথা দিচ্ছি ফি বছর তোমাকে দিয়েই—তোমার গুরুর দিব্বি করে বলছি—”

বাঁধা খদ্দের পাওয়ার লোভেও দর কমাতে রাজী নয় ত্রিলোচন। অবশেষে অনেক কষাকষির পর মাঝামাঝি ছ' পয়সায় রফা হলো। ৫ কে মাথা কেটে ৬ করে দিয়ে ৩৬ বছরের অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথের পকেটের দেড় আনা পয়সা আপন ট্যাঁকে গুঁজে চলে গেল ত্রিলোচন মিস্ত্রী।

“হ্যাঁ, যা বলছিলুম।” বললেন ডাক্তার বর্ধন। “প্রজ্ঞা চলে যাওয়ার পর থেকেই আপনাকে এ পাড়ায় নতুন দেখছি। অনাথের পাল্লায় পড়েছেন কি করে জানি নে। তাই ভাবলুম একটু সাবধান করে দিই ডেকে। কিছু খসিয়েছে টসিয়েছে নাকি ?”

বললেম, “আজ্ঞে না। তেমন চেষ্টা তো কখনো করেন নি।”

ডাক্তার বললেন, “করে নি, করতে কতক্ষণ ? অথবা হয়তো টের পেয়েছে খসাবার কিছু নেই। তা হোক ধনপতিবাবু, তবু বলি আপনাকে ওর মত দুর্জনসঙ্গ বিষবৎ পরিহার করে চলবেন। প্রজ্ঞা মেয়েটাকে জলজ্যান্ত চোখের সামনে মেরে ফেললে।”

“নিজের মেয়েকে মেরে ফেললে ?”

“চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটিয়ে মেয়েটার অকাল-মৃত্যু ঘটালে বই কি। দুনিয়ার চোখে ধূলি দিতে পারে অনাথ, কিন্তু এই ছত্রিশ বছরের অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চোখ দুটিকে সে ফাঁকি দেবে কি করে ?”

“কিন্তু তিনি···”

“কিন্তু টিন্তু নয় ধনপতিবাবু, এ আমার জানা। আমায় একবার ডাকে নি পর্যন্ত অনাথ। তবু মেয়েটার অসুখের খবর পেয়ে নিজে থেকেই দেখতে গেলুম। হাজার হোক, পাড়ায় রয়েছি অভিজ্ঞ ডাক্তার—আমার একটা দায়িত্ব আছে। বললুম, কিছু ভেবো না অনাথ, ছেড়ে দাও স্রেফ আমার হাতে। দু'দিনে সব ঠিক করে দেবো। কিন্তু দিলে না অনাথ। দু'দিনে সেরে উঠবে শুনেই শিউরে উঠলে। বললে, না না, দরকার নেই। আনালে অ্যালোপ্যাথ মৃগেন মাইতিকে। হাতুড়ে মৃগেন। গোটা

অ্যালোপ্যাথিটাই হাতুড়েপনা ছাড়া আর কি ? মেয়েটাকে কি সব কড়া কড়া মিক্‌স্‌চার খাওয়ালে, কি সব ইন্‌জেক্‌শান্ ফুঁড়লে, মৃগেনই জানে। মেয়েটা মারা গেল। যে মেরে ফেললে, সেই আবার দিলে ডেথ সার্টিফিকেট।"

"আপনি যে বড় ভয়ানক কথা কইছেন ডাক্তার বর্ধন।"

"ভয়ানক ব্যাপারের কথা ভয়ানক তো একটু হবেই ধনপতিবাবু। মোলায়েম করে বলতে গেলে যে মিছে কথা বলা হবে।" বললেন ডাক্তার বর্ধন।

"কিন্তু নিজের মেয়েকে এই পৃথিবীর বুক থেকে চিকিৎসা-বিভ্রাটের ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে ফেলে অনাথ চৌধুরীর লাভটা কি হলো ?"

"অমন বাপ অমন মেয়েকে চোখের সামনে সইতে পারবে কেন ?" বললেন ডাক্তার বর্ধন। "লক্ষ্মীর প্রতিমা মেয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা ছিলো অনাথ চৌধুরীর চক্ষুশূল ; সবাই বলতো, ছি ছি, অমন মেয়ের অমন বাপ। সে কথা যেতো অনাথের কানে। আর কানের ভিতর দিয়ে গিয়ে তার মরমে জ্বালা ধরিয়ে দিত। তাই এ আপদটিকে সরিয়ে দিলে চিরদিনের তরে চোখের সামনে থেকে। বাকী রইল ওর একমাত্র ছেলে বোধিসত্ত্ব—ডানপিটে, বখাটে, এঁচোড়ে পাকা ছোকরা। শয়তানীতে বাপকে ছেলেমানুষ বানিয়ে দেবে ছোকরা। ঐ ছেলেকেই অনাথ যা একটু ভালোবাসে বাপকা বেটা বলে। ছোঁড়ার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ?"

বললেম, "আজ্ঞে না।"

ডাক্তার বর্ধন বললেন, "শয়তানী বুদ্ধিতে অনেক বুড়ো মানুষের বাবা। ওর কাছ থেকে সর্বদা সাবধান থাকবেন ; কেউটে সাপের বাপে বাচ্চায় তফাত নেই ধনপতিবাবু।"

ভদ্রলোক ডাক্তারী করেন হোমিওপ্যাথিক, কিন্তু কথার মাত্রা তাঁর অ্যালোপ্যাথিক। বললেন, "এই জন্যেই আপনাকে ডেকেছি। আপনি এ পাড়ায় নতুন এসেছেন, এ পাড়ার হালচাল এখনো জানেন না। আর আপনার চোখ থেকেই মালুম হচ্ছে চট্ করে মানুষ চেনার ধাত আপনার

নয়। হুঁশিয়ার না হলে শেষে পস্তাবেন। তার চাইতে বরং আগেই হুঁশিয়ার হন।"

বললেম, "ভালোই হলো। আপনার কাছ থেকে কিছু খবর জানা যাবে। প্রজ্ঞাপারমিতাকে আপনি কতদিন থেকে চেনেন?"

"আমি যখন থেকে চিনি তখন প্রজ্ঞা ভালো করে ফ্রক পরাও ধরে নি। হেঃ হেঃ হেঃ।" মহেন-জো-দড়ো আর হারাপ্পার সভ্যতা সম্পর্কে অভিভাষণ দিতে দিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক যেমন করে হয়তো হাসেন, তেম্নি কায়দায় হাসলেন ডাক্তার বর্ধন। আর বললেন, "অনাথ তখন সবেমাত্র এ পাড়ায় এলো। এসে মেলা নেই মেশা নেই, নিজেকে যেন নিজেই একঘরে করে রাখতে চায় এমনি ভাব। তারপর বোধিসত্ত্বের জন্ম হলো এ পাড়ায়। অনাথ তখন থেকেই মধুর কারবারী। সস্তা ঝোলা গুড়ের সঙ্গে খানিকটা মধুর নির্যাস মিশিয়ে বাজারে চালায় মধু বলে। তলে তলে আরো অনেক কিছু করে—দরকার হলে ওর অনেক হাঁড়ি হাটের মাঝখানে ভাঙতে পারি। কিন্তু কি হবে ভেঙে? ওর গণ্ডারের চামড়ার কিছু হবে না। ওর সহধর্মিণীটি ভারি গোবেচারা মানুষ, নামে সংঘমিত্রা হলে কি হবে? বেচারার মনে মনে পুরো ইচ্ছে ছিলো হোমিওপ্যাথি করে আমিই প্রজ্ঞাকে ভালো করে তুলি; কিন্তু অনাথের ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে পর্যন্ত পারলে না বেচারা। অনাথ আনালে মৃগেন মাইতিকে, আর চোখের সামনে মেরে ফেললে মেয়েটাকে।"

আমি বললেম, "মৃগেন মাইতির তা শুনেছি খুব পসার এ পাড়ায়।"

ডাক্তার বর্ধন বললেন, "এ পাড়ার সবেধন নীলমণি অ্যালোপ্যাথ যে। আর নেম-প্লেটে নামের পেছনে একগাদা ডিগ্রী সাজিয়ে রেখেছে। আরে বাপু, ডিগ্রী ধুয়ে কি জল খাবি? কত বছরের অভিজ্ঞতা সেইটে লেখ নেমপ্লেটে, তবে বুঝি বুকের পাটা।"

ছত্রিশ বছরের অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ বুক ফুলিয়ে বত্রিশ ইঞ্চি করলেন।

"অপরের কথা আর কি বলবো ধনপতিবাবু, আমার মেয়েজামাই

ছেলেপুলে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকে, কিন্তু অসুখ বিসুখে আমার কাছে না এসে ঐ মৃগেনের কাছেই যায়।” মনোতুঃখে বললেন ডাক্তার বর্ধন। “আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে। তা যাক্, মৃগেন ডাক্তার আমার ছেলের বয়সী, স্নেহের পাত্র। পসার করছে করুক। কিন্তু লোক আজকাল এলোপাথাড়ি অ্যালোপ্যাথির মোহে পড়ে হোমিওপ্যাথিকে পিঠ দেখাতে শুরু করেছে, প্রাণটা এই ভেবেই মাঝে মাঝে কেঁদে কেঁদে ওঠে। অথচ হোমিওপ্যাথি ভেলকি দেখিয়ে দিতে পারে, যা অ্যালোপ্যাথির বাবারও অসাধ্য। সেই জন্যেই মিশ্র হোমিওপ্যাথির গবেষণা করছি।”

শুধালেম, “সেটা কি জিনিস ?

ডাক্তার বর্ধন বললেন, “রাগ-সংগীতে মিশ্র রাগ যেমন। ধরুন বেহাগে আর খাম্বাজে মিশিয়ে হচ্ছে বেহাগ-খাম্বাজ, বসন্ত আর বাহার মিলে বসন্ত-বাহার ; সিন্ধু আর ভৈরবীতে মিশিয়ে সিন্ধু-ভৈরবী। তেমনি মিশ্র হোমিওপ্যাথিতে অ্যাকোনাইট আর ব্রায়োনিয়া মিশিয়ে অ্যাকো-ব্রায়োনিয়া, ইপিকাক পাল্‌সেটিলা মিশিয়ে ইপি-পাল্‌সেটিলা, নাক্‌স্‌ভমিকা বেলেডোনা মিশিয়ে নাক্‌স্‌-বেলেডোনা। শুধু তুটো কেন, এক সঙ্গে তিনটে চারটে বা তার বেশীও মেশানো যেতে পারে। মিশ্র হোমিওপ্যাথির অসীম সম্ভাবনা। একথা মহাত্মা হ্যানিম্যান ভেবে যেতে পারেন নি। কেন্ট, হেরিং, ফ্যারিংটন, ন্যাশ—এরা সব হোমিওপ্যাথির এক একজন দিক্‌পাল—এদের মাথায়ও এই অসীম সম্ভাবনার কথাটা উদয় হয়নি। এ তত্ত্ব বুড়ো বাঙ্গালী ডাক্তার ব্যোমবেশ বর্ধন যখন প্রথম প্রচার করবে, তখন তুনিয়ার চিকিৎসা জগতে একটা সাড়া লেগে যাবে দেখবেন।”

“লাগিয়ে দিচ্ছেন না কেন ডাক্তার বর্ধন ?”

“রিসার্চ এখনো করছি যে ধনপতিবাবু।” বললেন ডাক্তার বর্ধন। “আজকাল রুগীদের আর হ্যানিম্যানী হোমিওপ্যাথি করছি নে, মিশ্র হোমিওপ্যাথিক দিয়ে দিয়ে দেখছি, আর ফল টুকে টুকে রাখছি নোট খাতায়। এই খাতা একদিন মিশ্র হোমিওপ্যাথির মহাভারত হবে দেখবেন, যাকে বলে মেটিরিয়া মেডিকা। কিন্তু সেদিন আমি হয়তো আর ইহজগতে

থাকবো না ধনপতিবাবু।" বলে করুণ চোখে তাকালেন আমার দিকে।

"ইহজগতে নাই বা থাকলেন ডাক্তার বর্ধন।" বললেম আমি। "কিন্তু জগতে থাকবেন নিশ্চয়। জগতের কোনো শেষ নেই, তাই তার সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারে না কেউ। প্রজ্ঞাপারমিতা আর ইহজগতে নেই। কিন্তু তাই বলে সে কি ফুরিয়ে গেছে?"

ডাক্তার বর্ধন বললেন, "আজও ইহজগতেই প্রজ্ঞা থাকতো, যদি এক মাত্রা, শুধু একমাত্রা দুশো শক্তির মিশ্র ডাল্‌কামারা-রাস্‌টক্‌স্ তাকে খাইয়ে দিতে পারতুম। ওষুধের বাক্‌সো আমার সঙ্গেই ছিলো। খুলে একসঙ্গে মেশাতে যাচ্ছিলেম ডাল্‌কামরা আর রাস্‌টক্‌স্ টু হানড্রেড। কিন্তু দিলে না, দিলে না ঐ শয়তান অনাথ। একরকম অপমান করেই তাড়িয়ে দিলে আমাকে। শুধু গলাধাক্কা দিতে বাকী রাখলে। বাধ্য হয়ে ব্যর্থ হয়ে বেরিয়ে এলুম। অনাথ ডাকলে মৃগেন মাইতিকে। তখনি জানি মেয়েটার ইহলীলা ফুরিয়ে এলো। শয়তান অনাথ মেয়েটাকে বাঁচতে দিলে না। অথচ অমন মেয়ে আমার থাকলে—উঃ।"

আমি বললেম, "জেনে শুনে আপনি তাকে মেরে ফেলতে দিলেন? একবার চেষ্টা করলেন না বাঁচাবার?"

"করি নি?" বললেন ডাক্তার বর্ধন। "শুনুন তাহলে বলি দুঃখের কথা। এ পাড়ার অনেক হোমরা-চোমরা মাতব্বরকে বললুম—মেয়েটাকে অনাথ মেরে ফেলছে, অবিলম্বে একটা বিহিত না করলে মেয়েটা বাঁচবে না। সবাই আমাকে হেসে, রাগ করে আর বিরক্তি দেখিয়ে উড়িয়ে দিলে। মেয়েটাকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা তো করলেই না, উলটে তলে তলে আমার রুগীকে ভাগিয়ে ভাগিয়ে ঐ মৃগেন ডাক্তারের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে। প্রচার করে দিলে আমার কাছে যেন কেউ ওষুধ নিতে না আসে। তাই তো এখানে ভিড় দেখতে পাচ্ছেন না ধনপতিবাবু। তা নইলে এ সময় রুগী দেখার বাইরে অন্য কোনো কথা কইবার ফুরসতই পেতুম না। হ্যাঁ। আমার আরো কি সন্দেহ হয় জানেন? যদি দু' কান না করেন তো বলি।"

আমি বললুম, "বলুন"।

ডাক্তার বর্ধন বললেন, "মৃগেন ডাক্তারের ওষুধও প্রজ্ঞাকে ঠিক মতো খাওয়ায়নি অনাথ। মৃগেনকে ইন্‌জেক্‌শানও ঠিকমতো দিতে দেয়নি। নইলে অত তাড়াতাড়ি বারোটা বাজাবার ছেলে নয় মৃগেন। রুগীকে ভুগিয়ে ভুগিয়ে জীইয়ে রেখে ভিজিট আর ইন্‌জেক্‌শানের মজুরী আদায় করে করে চলাই ওর ব্যবসা, আমি ওকে হাড়ে হাড়ে জানি কিনা! অসুখে হয়তো মেয়েটার হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিলো, মানে যাকে বলে 'হার্ট উইক'। আর এমনিতেই একটু সেন্টিমেণ্টাল ছিলো মেয়েটা, সেটা জানতোও অনাথ। অসুস্থ মেয়েটাকে হঠাৎ সেন্টিমেণ্টে ঘা দিয়ে হার্টফেল করিয়েছে, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। দুঃখ হয় 'প্রজ্ঞার মা সংঘমিত্রার জন্যে। এত বড় শয়তান স্বামীর এমন আশ্চর্য সতী-সাধ্বী স্ত্রী বড় একটা দেখা যায় না ধনপতিবাবু।"

আমি বললেম, "যতো শয়তানই হোক না কেন ডাক্তার বর্ধন, এটা বিশ্বাস করে নিতে কিছুতেই মন রাজী হয় না যে কোনো বাপ তার নিজের মেয়েকে এমন করে—"

"শুনুন তাহলে। আমি জানতে পেরেছি অনাথের নিজের মেয়ে নয় প্রজ্ঞাপারমিতা। না বলে আর পারলুম না ধনপতিবাবু"। বললেন ডাক্তার বর্ধন।

আমি বিস্ময়ে অধীর হয়ে বললেম, "বলেন কি? তাহলে সংঘমিত্রা দেবী—"

"প্রজ্ঞার আপন মা নন।" জটিল রহস্যের জট-ছাড়ানো হাসি হেসে বললেন ডাক্তার বর্ধন।

আমি আরো বিস্মিত, আরো হতবাক্ হয়ে বললেম, "অ্যাঁঃ !!!"

"আরো আছে ধনপতিবাবু।" বললেন ডাক্তার বর্ধন। "ব্যাপারটা আরো মর্মভেদী। সবটুকু শুনলে আপনি না কেঁদে পারবেন না।"

শুনে কাঁদবার জন্যে মনটা আকুল হয়ে উঠলো। বললেম, "সবটুকু বলুন ডাক্তার বর্ধন।"

"তাহলে রাস্তার দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিন ধনপতিবাবু। হঠাৎ কেউ এসে শুনে ফেলতে পারে। ব্যাপারটা যেন ছ'কান না হয় দেখবেন। সংঘমিত্রার কানেও যেন না যায়। উনি জানেন না যে প্রজ্ঞার আসল মা উনি নন।"

শুনে আবার বললেম, "অ্যাঃ !!!...!!!"

"প্রজ্ঞাপারমিতার জন্ম হয়েছিলো এই শহরের এক ভালো নার্সিং হোমে।" বললেন ডাঃ ব্যোমকেশ বর্ধন। "নামটি না-ই শুনলেন নার্সিং হোমটির। সেই নার্সিং হোমেই, প্রায় একই সময়ে, যোগাযোগটা একবার দেখুন, অনাথের সহধর্মিণী সংঘমিত্রা দেবীরও একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ছেলে না মেয়ে না জানলেও চলবে, কেন না শিশুটি পৃথিবীর আলো দেখবার ছ' মিনিট না যেতেই চিরদিনের জন্যে অন্ধকার দেখলে। সন্তানকে জন্ম দিতেই সংঘমিত্রা দেবী অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অনেকটা সময় ছিলেন অজ্ঞান হয়ে। যমে মানুষে টানাটানি ; শেষটায় অবশ্য যমই হেরে গিয়েছিলো, তা তো জানেনই। এ দিকে হয়েছে কি, সেই যে আরেকটি শিশু মেয়ে, পরে যার নাম হয়েছিলো প্রজ্ঞাপারমিতা, তার মা হঠাৎ হার্টফেল করে সরে পড়লেন মেয়েটিকে, মানে ভাবী প্রজ্ঞাকে, রেখে। স্বামীর অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ শুনে সেই আঘাতেই তিনি হার্টফেল করলেন। অমন সুন্দরী লক্ষ্মীশ্রীওয়ালী মহিলা বড় একটা দেখা যায় না। সাধে কি আর প্রজ্ঞা—"

"কে তার স্বামী ? অপঘাত মৃত্যুই বা তাঁর হলো কি করে ?"

"অমন সুস্থ সবল সতেজ সপ্রতিভ সুপুরুষও বড় একটা দেখা যায় না ধনপতিবাবু। এই শহরেরই এক প্রথম শ্রেণীর হোটেলে তিনি সস্ত্রীক এসে উঠেছিলেন। হোটেলটির নাম না-ই বা শুনলেন। স্ত্রীকে নিজেই এনে নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিয়েছিলেন, হোমের সেরা কেবিনে। আগাম দিয়েছিলেন যথেষ্ট টাকা নার্সিং হোমকে, সেরা ব্যবস্থার জন্যে। নার্সিং হোমের সঙ্গে কথা ছিলো সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন হোটেলে তাঁকে ফোন করে জানানো হয়। জানানো হয়েছিলো খুব ভোরবেলা। ফোন পেয়েই ট্যাক্সী করে ছুটে এলেন ভদ্রলোক। নার্সিং হোমের প্রায় কাছাকাছি

এসে এক বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়লেন ছিটকে, ট্রাকের চাকার তলায় এমনভাবে থেঁতলে মারা গেলেন তৎক্ষণাৎ, যে আর চেনা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সতী-সাধ্বী স্ত্রীর কানে কি করে খবর পৌঁছে গেল জানিনে, কিন্তু গেল। আর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও গেলেন। বাকী পড়ে রইল ভাবী প্রজ্ঞা। আর এমনি সময় গিয়ে হাজির অনাথ। ধূর্ত ধড়িবাজ অনাথ চট্ করে মতলব ভেবে নিয়ে কি সব কাণ্ডকারখানা করলে, ফলে শিশু বদল হয়ে গেল। অনাথ-সংঘমিত্রার মরা সন্তান চলে গেল সেই সগু বিধবা স্বর্গীয়া মহিলার কোলে, আর তাঁর জ্যান্ত শিশুকন্যাটি চলে এলো তখনো-অজ্ঞান সংঘমিত্রার কোলে। এত যে কাণ্ড হয়ে গেল সংঘমিত্রা তার কিছুই জানেন না। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখেন তাঁর পাশে ফুটফুটে এক সুন্দরী শিশুকন্যা। তক্ষুনি মেয়ের নাম দিলেন প্রজ্ঞাপারমিতা। আগেই বোধ হয় ভেবে রেখেছিলেন মেয়ে হলে এই নাম দেবেন।”

“কিন্তু প্রজ্ঞার আসল মা বাবা ?”

“ওরা তো দু’জনেই চলে গেলেন স্বর্গে। ওঁদের আত্মীয়-স্বজনের কোনো সন্ধানই মিললো না। দুর্ঘটনায় ভদ্রলোকের এমন অবস্থা হয়েছিলো যে দেখে সনাক্ত করা নিকট আত্মীয়দের পক্ষেও সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে জানা গেল এঁরা দু’জন এসেছিলেন বাইরে থেকে—এ শহরের বাসিন্দা নন। হোটেলের খাতায় যে নাম লিখিয়েছিলেন তা থেকে তাঁদের সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া সম্ভব হলো না। তাঁদের আসল পরিচয় গুপ্তই থেকে গেল।”

বললেম, “এ যে চট্ করে বিশ্বাস করা শক্ত, ডাক্তার বর্ধন।”

“চট্ না করেও হয়তো বিশ্বাস করা সোজা নয় ধনপতিবাবু। সেই জন্যেই গোপনে বললুম আপনাকে। কিন্তু খবরদার। কাহিনীটি দু’ কান করবেন না যেন। সংঘমিত্রার কানে গেলে বেচারা ডবল করে শোক পাবেন।”

ভাবলেম, এ কি সত্য ? তবে কি এই জন্যেই শেষ পর্যন্ত প্রজ্ঞাপারমিতাকে সইতে পারছিলেন না তার জাল (?) পিতা অনাথ রায় চৌধুরী ?

বললেম, "আপনি এত খবর কি করে পেলেন ডাক্তার বর্ধন ?"

"অতি বিশ্বস্তসূত্রে ধনপতিবাবু।" বললেন ডাক্তার বর্ধন। "সে সূত্রকে অবিশ্বাস করতে পারতুম লক্ষণগুলো না মিললে। কিন্তু লক্ষণগুলো সব মিলে মিলে যাচ্ছে কিনা! তা যাক, ভেবে আর কি হবে ? যে যাবার সে তো চলেই গেল। অনাথকে এ নিয়ে কিছু বলতে যাবেন না—সব কিছু সোজা অস্বীকার করে বসবে। আর এসব কথা নিয়ে অপর কারুর সঙ্গে আলোচনা করাও উচিত হবে না। হাজার হোক একটা প্রাইভেট ব্যাপার তো ? ওকি, উঠছেন না কি এখনই ?"

আমি বললেম, "উঠছি, ডাক্তার বর্ধন। প্রজ্ঞাপারমিতার অকাল-প্রয়াণের রহস্য নিয়ে মাথাটা বড় ঘেমে উঠেছিলো। সেই রহস্যের অন্ধকারে আপনি সমাধানের আলোকপাত করলেন।"

"সুতরাং অনাথ থেকে হুঁশিয়ার থাকবেন। আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।" বললেন ডাক্তার বর্ধন। "তবে যাতায়াতটা হঠাৎ বন্ধ করে দেবেন না। তাহলে অনাথ সন্দেহ করবে। যাওয়া এখন থেকেই একটু একটু করে কমাতে থাকুন, তারপর আর একেবারেই যাবেন না। আর আমার এখানে আপনার জন্যে দ্বার অবারিত রইল। যখন খুশী এসে বসবেন। নমস্কার।"

আজ বিকেল বেলা ভাবছিলুম কাঠের উঁচু সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে। ওপারে শহরতলী, এপারে শহর, এ দুই তটের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে রেল-লাইনের শুক্‌নো তটিনী ; তারি ওপর কাঠের সেতুতে দু'পা রেখে দাঁড়িয়ে আমি। সেতু বেয়ে শহরের দিকে নামলেই শহর-সীমান্তবর্তী রেল-স্টেশন আর স্টেশন রোড। এই রোডের ওপর নতুন স্টেশন-মাস্টারের 'কোয়ার্টার' এই সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে দেখলেও বেশী দূরে নয়। ত্রৈলোক্য তপাদার রেলের পুরাতন

চাকুরে, এই স্টেশনে নতুন এসেছেন মাস্টার হয়ে। অনেক বদ্‌লির পর এই স্টেশনই তাঁর শেষ বদ্‌লি, এখানে স্টেশন মাস্টারির মেয়াদ ফুরোলেই শুরু হবে তাঁর চাকরি থেকে বানপ্রস্থ।

সেই বানপ্রস্থে দূরে প্রস্থান করবার বাসনা নেই তপাদারের, তাই তাঁর বর্তমান 'কোয়ার্টার'এর মুখোমুখি রেল-লাইনের ও-পারে শহরতলীর সীমান্তে যে ছোট্ট দোতলা বাড়ীখানা, সস্তায় পেয়ে সেইটে কিনে রেখেছেন; চাকরির শেষ মেয়াদের অন্তে শুধু রেল-লাইন পেরিয়ে সীমান্ত বদল করতে হবে তাঁকে, যদি না তার আগে অন্য কোনো সীমান্ত পেরিয়ে চলে যেতে হয়।

অনেক চেষ্টা করেছি ত্রৈলোক্য তপাদারকে ত্রৈলোক্য তপাদার না ভেবে আর কিছু ভাবতে। ওঁকে কল্পনা করেছি হরেন ভট্টচার্য্যি বলে, কখনো ভেবে নিয়েছি উনি সুবিমল দাশগুপ্ত, কখনো দীনেশ চাকলাদার, কখনো বা পুলকেশ রায়চৌধুরী। মনে মনে আরো অসংখ্য নাম দিয়ে দেখেছি ওঁকে, সেকেলে একেলে নানান ধরণের। কিন্তু না, মানায় না, মানায় না তাঁকে অন্য কোনো নামে। তাঁকে আগাগোড়া ঘিরে কেমন যেন একটা ত্রৈলোক্য ত্রৈলোক্য ভাব, তাঁর সব কিছু জুড়ে এক অনির্বচনীয় তপাদারত্ব। ত্রৈলোক্য তপাদারের ত্রৈলোক্য তপাদার না হয়ে যেন উপায় ছিল না। এ বিধান অনায়াসেই সহজ ভাবে মেনে নিয়েছেন তিনি, বিদ্রোহ করেন নি, নালিশও রাখেননি মনে। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে যেমন নিয়েছিলো মোটা সুরে গান গেয়ে স্বদেশী যুগের স্বদেশী ভাইরা, তেমনি বাপের দেওয়া মোটা নাম নির্দ্বিধায় মাথায় তুলে নিয়েছেন ত্রৈলোক্য তপাদার। পিতৃদেব নেই, তাঁর দেওয়া নাম নিয়ে বেঁচে এখনো স্টেশন-মাস্টারি করছেন ত্রৈলোক্য তপাদার।

নামটা বড়লোকের বৈঠকখানার শো-কেসে সাজানো রেক্সিনে বাঁধাই দামী গ্রন্থাবলীর মতো—ব্যবহার বড় একটা হয় না। স্টেশনের কুলী, পয়েন্টসম্যানরা বলে মাস্টর বাবু, আর অন্য সবাই বলে মাস্টার মশাই। তিনি ত্রৈলোক্য তপাদার না হয়ে ভজহরি সামন্ত বা আটকড়ি

মালাকার হলেও তাই বলতো। স্টেশন-মাস্টারির কাছে নামের মুড়ি-মিছরির সমান দর।

আমি তাঁকে বলিনে মাস্টার মশাই; ত্রৈলোক্যবাবু থেকে শুরু করে এখন বলি ত্রৈলোক্যদা। ঐ নামে ডেকে জয় করেছি তাঁর হৃদয়। স্বামীজীর "আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ"-এর মতো। আর কেউ তাঁকে ডাকে না তাঁর নামে, ডাকেনি অনেকদিন—শুধু আমি ডাকি; এই একক বিশেষত্বের বোঁটায় ফুটে উঠেছে বিশেষ বন্ধুত্বের ফুল। তাঁর ভেতরকার আধ-ঘুমন্ত ত্রৈলোক্যত্ব আমার ডাকের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠেছে। অনেক দিনের চাকরি-জীবন জুড়ে তিনি নিজেকে ভেবে এসেছেন অতিকায় রেল-গাড়ী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম চাকা। অনেকদিন পর চাকরি-জীবনের প্রায় সীমান্তে এসে আমার আহ্বানের সুরে তাঁর মনে হয়েছে তিনি চাকা নন, ত্রৈলোক্য তপাদার।

আমার কাছে তাঁর হৃদয় তাই অবারিতদ্বার। সেই খোলা দুয়ার দিয়ে সোজা দেখা দিয়েছে তাঁর অন্তরের অন্দর-মহল। বাইরের দুনিয়ার স্টেশন-মাস্টার আমার কাছে ধরা দেবার আনন্দেই ধরা দিয়েছেন ত্রৈলোক্য তপাদার রূপে। তা নইলে কেমন করে জানতেম তাঁর জীবনের কান্না-হাসির কাহিনী? স্টেশনের কুলী থেকে শুরু করে সহকারী স্টেশন-মাস্টার—সবাই জানে তাঁর স্ত্রী নিঃসন্তানা, চিররুগ্না, প্রায় শয্যাশায়িনী, তবু সবাই দেখে ত্রৈলোক্য তপাদার চিরহাস্যমুখ। সেই হাসিমুখের আড়ালে লুকানো ব্যথার দীর্ঘশ্বাস তারা কেউ কেউ দেখে মনের চোখ দিয়ে, কিন্তু সেই ব্যথার আড়ালে লুকানো আনন্দের আলোটুকু তারা কেউ দেখতে পায় না।

ভেবেছিলেম, অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও তপাদার-পত্নীকে আমার একবার দেখে আসা উচিত। কিন্তু তারপর মনে হলো, একবারও দেখতে না গেলেই আরো বেশী ভদ্রতা করা হবে, বন্ধুত্বের সুযোগে হৃদয়বানত্ব দেখাতে গিয়ে ভদ্রলোককে বিব্রত করবার অধিকার আমার নেই। জেনে-ছিলেম, অনেকদিন থেকে ভদ্রমহিলার যে কোনো মুহূর্তে হৃদয়ের স্পন্দন চিরতরে থেমে যেতে পারে অথচ থেমে যাচ্ছে না; দেহের দুঃখের সঙ্গে

মনের দুঃখ মিলে ঘটিয়েছে মেজাজের তীক্ষ্ণতা আর ব্যবহারের রুক্ষতা; অতিথিকে ঠিক নারায়ণ বলে তিনি না-ও ভাবতে পারেন। নাম-জানা আর নাম-না-জানা অনেক ব্যাধির মন্দির তাঁর রুগ্ন দেহ, নাম-জানা আর নাম-না-জানা অনেক দাওয়াই এ মন্দিরে অনেক ব্যর্থ অর্ঘ্য দিয়েছে। রেল কোম্পানী থেকে পাওয়া ত্রৈলোক্য তপাদারের অনেক অর্থ গেছে এই অর্ঘ্যের পেছনে। বর্তমানে শ্রীমতী তপাদার বিভিন্ন কবচ আর মাদুলীর ভারে আপাদমস্তক ভারাক্রান্তা।

দূর-সম্পর্কীয়া এক বিধবা পিসী থাকেন তপাদারের কাছে ; তপাদার-পত্নীর এবং সেই সঙ্গে তপাদারের দুর্বহ জীবনকে সুবহ করে রাখবার সাধনায় যথাসম্ভব সাফল্য লাভ করেছেন তিনি। যথাসময়ে তিনি বিধবা না হলে তপাদার-দম্পতির কী যে অসুবিধে হতো ভাবতে পারি নে।

রেল কোম্পানীর 'ডিউটি'-তে তপাদার মশাই যেমন অদ্ভুত রকম গোছালো, ডিউটি-বহির্ভূত কথাবার্তায় তেমনি আশ্চর্য রকম অগোছালো। গুছিয়ে বলা কথা শুনে হাঁফিয়ে-ওঠা কানে না-গুছিয়ে বলা কথার কী যে যাদু, বুঝেছি তা মুক্ত-হৃদয়-দুয়ার ত্রৈলোক্য তপাদারের কাছে। এই কাঠের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে, কখনো বা জনবিরল প্লাটফরমে পায়চারির সঙ্গে সঙ্গে আর ফাঁকে ফাঁকে, তাঁর অতীতের অনেক টুকরো-টুকরো ছবি এঁকেছেন ভোঁতা তুলি দিয়ে ঝাপসা রঙ বুলিয়ে। অনেক ফাঁক থেকে গেছে ; বলিনি তাঁকে সে ফাঁক ভরিয়ে দিতে। হয়তো ভরাতেও পারতেন না তিনি।

তাঁরও জীবনে হয়েছিলো ঋতুরাজের আবির্ভাব, সবুজ হৃদয়ে লেগেছিলো অবুঝ বসন্তের দোলা। সেই দোলার ঝাপসা স্মৃতি আজো নিঃশেষ হয়ে যায় নি। ঢং ঢং করে যখন ঘণ্টা পড়ে স্টেশনে, পয়েণ্টস্ম্যান লাইনের ধারে সিগন্যাল নিচু করে দূরের গাড়ীকে জানায় স্টেশনের আবাহন, হুস্-হুস্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রেলগাড়ী এসে দাঁড়ায় প্ল্যাট্ফরম ঘেঁষে, তখন মাঝে মাঝে এই বর্তমান কল-কোলাহলের আসরে এসে উঁকি দিয়ে যায় সুদূর অতীতের সেই বাসন্তী স্মৃতি ; বিলিতী বাদ্যির মাঝখানে হঠাৎ যেন বাঁশের বাঁশীর মেঠো সুর। কিন্তু সে সুর টেকে না দু'-চার

মুহূর্তের বেশী, তাতল সৈকতে এক ফোঁটা শিশিরের মতো চট্ করে উবে যায়।

জীবনে যখন বসন্ত এলো (তখনো এঁর নাম ছিল ত্রৈলোক্য তপাদার !!!) তখন একদিন কুমারী উষাকে তিনি প্রথম দেখলেন চিড়িয়াখানায়। দেখালেন উষার বাবা অপরেশবাবু, তপাদারের বড় মামার বিপত্নীক বড় বন্ধু। তপাদারের বাবা স্বর্গীয় হয়েছেন, মা-ও তখন ইহলোকে নেই, বড় মামাই অভিভাবকীয় ভাবনা ভাবতেন ভাগ্নে ত্রৈলোক্যর জন্যে। যৌবন বড় বিষময় কাল, কথাটি পড়েছিলেন অনেক পুঁথিতে, আর হয়ত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেও উপলব্ধি করেছিলেন। এই বিষময় কালে উপনীত তাঁর একমাত্র ভাগ্নে যদি পদস্খলন করে বসে, তাহলে স্বর্গীয়া বোনের কাছে মুখ দেখাবেন কি করে? তাই যথাসময়ে হুঁশিয়ার হয়ে সন্ধান শুরু করলেন বিষস্য বিষমৌষধির। সন্ধান পেতে দেরি হলো না; প্রাণের বন্ধু অপরেশবাবুও তখন উষার জন্যে অনিরুদ্ধর সন্ধানে ছিলেন। দুই বন্ধু হয়ে গেলেন দুই হবু-বেয়াই। কথা-বিনিময় হতেও দেরি হলো না। বড় মামা দেখেছিলেন উষাকে। অপরেশবাবু দেখেছিলেন ত্রৈলোক্যকে। এদিকে ভাগ্নে-দায়, ওদিকে কন্যা-দায়।

ভাগ্নের সামনে পঞ্জিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বড় মামা গুরুজনী ঢঙের রসিকতা করে বললেন, "ভাগ্নে-বৌ আনবার ব্যবস্থা পাকা করে এলুম রে তিলু। এবার শুভদিন দেখা হচ্ছে। খাসা মেয়েটি। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ!"

ত্রৈলোক্য অবাক্ ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালো মামার মুখের পানে। মামা ভাবলেন, লজ্জা পেয়েছে লাজুক ভাগ্নে। তা একটু পাবে বই কি, আর পাওয়াই ভালো। বেহায়াপনাটা কিছু নয়। লজ্জা যেমন মেয়েদের ভূষণ, লাজুকতা তেমনি বিয়ের বয়সে ছেলেদের ভূষণ। এ না থাকলে তো সে ছেলেকে বলতে হবে বখাটে, অকাল-কুষ্মাণ্ড।

বললেন, "আমার বন্ধু অপরেশের একমাত্র মেয়ে—উষা। নামটি যেমন মিঠে, মেয়েটিও তেমনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। কোষ্ঠীতে লিখেছে, যে ঘরে সে বৌ হয়ে আসবে সে ঘরে একেবারে—"

ও দিকে ত্রৈলোক্যর বড়মামাতো বড়দা ভোম্বল ডাম্বেল নিয়ে কসরত করছিল। সে বাপের কথা শুনে বললে, "রেখে দাও বাবা তোমার কোষ্ঠী।"

কোষ্ঠীর ওপর আর বাপের পছন্দের ওপর আগুন-চটা ভোম্বল। বাপের পছন্দে নিজে না দেখে বিয়ে করে অবধি পস্তাচ্ছে। বৌয়ের কোষ্ঠী ফলেছে কি না খোঁজ করেনি, তার নিজের কোষ্ঠীর ফল দেখে দুনিয়ার সমস্ত কোষ্ঠীওয়ালাদের মাথা ডাম্বেল মেরে ফাটাতে ইচ্ছে হয়েছে তার। বৌ পুরোনো হয়ে সয়ে গেছে, তার ওপর আর রাগ নেই ভোম্বলের; কিন্তু অনুরাগও জাগাতে পারছে না প্রাণে। তাই বাপের ওপর রাগটা যায় নি এখনো; পাছে যায়, এই ভয়ে চেষ্টা করে জীইয়ে রাখে। তা ছাড়া তখন চাকরি করছে ভোম্বল, পাকা চাকরি; বাপকে আর বেকার দিনের মতো পরোয়া করবার দরকার নেই।

মামার পছন্দে বৌদি যেমন এসেছে বৌ-ও পাছে তেমনি আসে, এই ভয়ে ত্রৈলোক্যের রঙীন মন ভয়ে-ভাবনায় কালো হয়ে উঠলো।

ডাম্বেল-বিশারদ ভোম্বল বললে, "তোমার দেখায় তোমার পছন্দে চলবে না বাবা। যার বৌ হবে সে নিজের চোখে দেখে আসুক। পরের চোখে ঝাল খাওয়া কিছু নয়। এ বাবা হিঁদুর বিয়ে, এমন নয় যে পছন্দ না হলে বদলানো বা বাতিল চলবে।"

মামা বললেন, "এ মেয়ে না-পছন্দের নয়, না-ই বা হলো ডানা-কাটা পরী। তা ছাড়া রেলে অপরেশের ধরবার লোক আছে, জামাই হলে তিলুকে রেলের চাকরিতে বসিয়ে দিতে পারবে।"

ভোম্বল নাছোড়বান্দা। নিজে সে ঠেকে শিখেছে, পিসতুতো ছোটো ভায়ের বেলা তেমনটি হতে দেবে না। "যাকে নিয়ে সারা জীবন ঘর করবে, তাকে নিজের চোখে নিজের দায়িত্বে আগে দেখে নিক তিলু।" বললে ভোম্বল জোর গলায়।

"কিন্তু ওঁরা যে বড় গোঁড়া সনাতনপন্থী, ভোম্বল!" বড় মামা বললেন। "বিয়ের আগে ছেলে মেয়েকে দেখবে এ রীতি ওদের চোদ্দ

পুরুষে নেই। ওদের আত্মীয়-স্বজন সবাই মারমুখো হয়ে উঠবে। অসম্ভব! ওদের বাড়ীতে বিয়ের আগে তিলুর যাওয়া হতেই পারে না।”

ভোম্বল বললে, “বেশ। মেয়ের বাবাকে বলো মেয়েকে অন্য কোথাও দেখাবার বন্দোবস্ত করুন। বলো না কেন, কালই মেয়েকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় আসুন। কোন্‌খানটায় কখন ওঁরা থাকবেন জেনে এসো। সেই অনুসারে তিলুও যাবে চিড়িয়াখানায়। জানোয়ার দেখার ছলে মেয়েকে দেখে আসবে।”

মামা অগত্যা বললেন, “তা বেশ। মেয়ে কিন্তু বড্ড লাজুক; অপরেশকে না হয় বলে দেবো, মেয়েকে যেন আগে কিছু জানতে না দেয়।”

অপরেশের সঙ্গে ঠিক করে এলেন বড় মামা। পরদিন বিকেলের দিকে নির্ধারিত জায়গা আর সময় মতো চিড়িয়াখানায় চলে গেল ত্রৈলোক্য। বক্ষে নিয়ে গেল দুরু-দুরু আশা আর গুরু-গুরু আশঙ্কা, চক্ষে নিয়ে গেল কৌতূহলী তৃষ্ণা। লাজুক ভাগ্নে লজ্জা পাবে বলে সঙ্গে এলেন না মামা— আসতে দিলেও না ভোম্বল। মামা জেনে এসে বলে দিয়েছিলেন কি বেশে আসবে উষা চিড়িয়াখানায়, চিনতে যেন কোনো মতেই ভুল না হয় ত্রৈলোক্যর। চিড়িয়াখানায় ঢুকে জায়গা মতো গিয়ে ত্রৈলোক্য দেখতে পেলো ওরা দু'জন আগেই এসে উপস্থিত, ছদ্ম জানোয়ার-দর্শন-মশগুল, মাঝে মাঝেই প্রতীক্ষাব পশ্চাদ্‌দৃষ্টি। অপরেশবাবুকে আগেই ঝাপসা চেনে ত্রৈলোক্য; তার সঙ্গের মেয়েটিই নিশ্চয় তাঁর মেয়ে উষা। পরনে তার নীল শাড়ী, পায়ে লাল চামড়ার অনভ্যস্ত স্যাণ্ডেল, মাথার পেছনে খোঁপায় অনভ্যস্ত ফুলসজ্জা। ত্রৈলোক্যকে আসতে দেখেই মেয়েকে জানোয়ার দেখতে রেখে অপরেশবাবু অনতিদূরে গিয়ে বসে রইলেন সবুজ ঘাসের ওপর। বসে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকবার ভান করে আড়-চোখের দৃষ্টির তীর ছুঁড়তে লাগলেন মেয়ের দিকে আর ভাবী জামাতার দিকে।

দূরাগত অপরেশ-দৃষ্টি-বাণের অলক্ষ্য খোঁচা অনুভব করে একটু

সলজ্জ অস্বস্তি বোধ করছিলো ত্রৈলোক্য। কিন্তু না, লজ্জা করে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। এ হলো গিয়ে জীবন-মরণ সমস্যা। ঐ যে পাতলা মেয়েটি খাঁচার আড়ালের জানোয়ার দেখছে, ওটিকেই তার ঘাড়ে চাপাবার ব্যবস্থা পাকা করে এসেছেন মামা এক রকম। ঘাড় পেতে নেবার আগে বোঝাটিকে শেষ দেখার এই সুযোগ হারালে আর মিলবে না। পাকা ব্যবস্থা কাঁচিয়ে দেবার দরকার হলে এখনো বড়দা ভোম্বলের শরণ নেওয়া যায়, আর গোঁয়ার ভোম্বলকে মামা রীতিমতো ভয়ও করেন। আস্তে আস্তে ঐ খাঁচার জানোয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আশঙ্কার আগাছা এড়িয়ে আশার শীষ উঁকি দিতে লাগলো। ছেলের বেলায় যে ভুল করেছিলেন মামা, ভাগ্নের বেলায় হয়তো সে ভুল করেন নি। দেখাই যাক না নিজের চোখে। উষা নামটি তো খাসা, ভোম্বল-বৌদির সিদ্ধেশ্বরী নামের মতো নয়। উষার পেছনে আছে রেলের চাকরি, ওটা পেলে সারা জীবনের জন্যে একটা হিল্লে হয়ে যাবে, মামার অন্ন ধ্বংসাতে হবে না আর। না দেখেই আট আনা প্রেমে পড়ে গেল ত্রৈলোক্য। রোমান্টিক গল্পের মতো রঙীন পরিস্থিতি। মেয়েটির অদূরে দাঁড়িয়ে জানোয়ার দেখার ছলে তারই ফাঁকে ফাঁকে সে দেখবে মেয়েটিকে ; মেয়েটি জানবে না সেই তার ভাবী জীবন-দেবতা। রোমান্টিক, রোমান্টিক, চরম রোমান্টিক !

কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে এক মুহূর্তেই বিতৃষ্ণার্ত হয়ে গেল ত্রৈলোক্য। কোনো মেয়ে বেঁচে থাকতে এমন শ্রীহীনা হতে পারে, এ তার ধারণার দশ মাইলের ভেতরও ছিল না। আপন মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়েও কিছু সুবিধে হলো না। উষা নামটাই একটা প্রচণ্ড ধাপ্পা। দাঁড়িয়ে যে আছে তাতে নেই এক ফোঁটা লালিত্য, পুতুল-নাচের পুতুল যেন সুতোয় ঝুলছে, সুতোর ছাড়া পেলেই যেন লুটিয়ে পড়ে যাবে মাটিতে। মেয়েটি একবার তাকালো ত্রৈলোক্যের দিকে, যেন আনমনা চোখের দৃষ্টি বুলোচ্ছে কোনো জানোয়ারের ওপর। অথচ যেন পুতুলের চোখ, প্রাণের স্পন্দন নেই সে চোখে। যৌবন-রঙীন স্বপ্ন এক সেকেণ্ডে ধোঁয়া হয়ে গেল। ভোম্বলদা'র শরণ নিয়ে রেহাই পাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, ভাবলে ত্রৈলোক্য। সঙ্গে

সঙ্গে কয়েকখানা রেলগাড়ী চলে গেল ত্রৈলোক্যর মনের চোখের সম্মুখ দিয়ে হু-হু করে। রেলের চাকরি মিলবে উষার বাবার জামাই হলে। আর তা না হলে পেছনে রুষ্ট মামা, সামনে নিষ্করুণ চাকরির বাজার—যেখানে দন্তস্ফুট করার মতো যোগ্যতা নেই ত্রৈলোক্যর দাঁতে। ভোম্বলের ডাম্বেল সেখানে কোনো সুরাহা করে দিতে পারবে না। চাকরি-স্বপ্নের ধমক খেয়ে যৌবন-স্বপ্ন একটু দমে গেল। আরেক বার তাকিয়ে তত খারাপ মনে হলো না উষাকে। ত্রৈলোক্য দোষ দিলে নিজের চোখকে, আগে থেকেই বিরূপ ভাব জমিয়ে নিয়ে এসেছে এই অভিযোগ করে। তারপর ভাবলে, বিয়ের আগে মেয়েরা অমন একটু বিশ্রী থাকেই, বিয়ের পর একটু একটু করে সুশ্রী হতে থাকে। ভোম্বল-বৌদিরই তো বিয়ের পর চেহারা অনেক খুলেছে, আগে তো তার দিকে চাওয়াই যেতো না। তা ছাড়া না-ই বা হলেম পুরোপুরি গণেশ ঠাকুর, এমন কিছু কার্তিকটিও নই—ভাবলে ত্রৈলোক্য—আমিই বা নন্দন কাননের অপ্সরা আশা করবো কোন্ লজ্জায় ?

আবার যেন তাকালো মেয়েটি ত্রৈলোক্যর পানে। এবার সোজা-সুজি নয়, ঈষৎ আড়চোখে। ক্ষণিকের এই আড়-দৃষ্টিতে যেন তার কুমারী-হৃদয়ের অনন্ত ব্যাকুলতা চমক দিয়ে গেল। কেমন একটা আধ-আগ্রহী আধ-সলজ্জ ভাব, যেন একটা হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার পুলক-মেশানো ভয়। ঐ একটি চকিত চাহনির চমকে সারা দেহ-মনে শিহরণ জেগে উঠলো ত্রৈলোক্যর। বদলে গেল তার চোখের সুর। মনে হলো ঐ উষা বহু দিন ব্যর্থ খোঁজা খুঁজে খুঁজে হয়ে উঠেছিলো ম্রিয়মাণা, রূপহীনা ; বহু প্রতীক্ষার পর তার তৃষিত আঁখির সম্মুখে পেয়েছে তার হৃদয়-দেবতাকে, এবারে বিকশিত হয়ে উঠবে তার সুপ্ত রূপের মঞ্জরী। হৃদয়ের আনন্দ দেয় বাইরের যে রূপ, লাবণ্যের সেই তো সোনার কাঠি।

নিশ্চয় জানে, নিশ্চয় জানে মেয়েটা, সব ব্যাপার নিশ্চয় সে টের পেয়েছে, নিশ্চিত ভাবলে তরুণ ত্রৈলোক্য। মেয়ে জাতটাই বড় চালাক, একটু আভাস, একটু ইঙ্গিত—ব্যস্, অমনি সব-কিছু বুঝে নেয়। হয়তো

তাকে বলা হয়েছে সোজা, অথবা আভাসে, আজকের এই চিড়িয়াখানা দর্শনের নিহিত উদ্দেশ্য ; অথবা হয়তো হয়নি। বাপের সহসা এই চিড়িয়াখানা-প্রীতির পেছনে আরো কিছু আছে, উষার কাছে এ কথা তবু নিশ্চয় মেঘ-বিরল আকাশের মতো পরিষ্কার। পাঁচ ইন্দ্রিয় ছাড়াও ছ নম্বর একটা ইন্দ্রিয় থাকে মেয়েদের, সে হচ্ছে রহস্যভেদের জন্যে বিধাতার বিশেষ দান।

উষা তাকে দেখেছে, চিনেছে, মুগ্ধ হয়েছে, আর তার চরণে হৃদয় সমর্পণ করে ফেলেছে, এ বিষয়ে ত্রৈলোক্যের মনে আর এক ফোটা সংশয় রইলো না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে উষার জীবন-দেবতা ভেবে ফেললে ত্রৈলোক্য তপাদার। উষার হাতে বরমাল্য থাকলে তক্ষুনি সে গলা বাড়িয়ে দিত।

কিন্তু বরমাল্য ছিল না উষার হাতে, আর সেই ক্ষণে জানোয়ার দেখতে তারই পাশে এসে দাঁড়ালো একটি তরুণী—স্বাস্থ্যোচ্ছলা, সুগঠিত-দেহা, ঋজু-দীর্ঘাঙ্গী, ঈষৎ-গৌরী। রেড়ির তেলের মৃদু ছিঁচকাঁদুনির পাশে যেন চোখ-ধাঁধানো ডে-লাইটের উচ্চহাসি মাখানো আলো ; কষ্টিপাথরের পাশে গিনি-সোনা ; মন্থরার পাশে উর্মিলা ; গর্গনের পাশে হেলেন। বেণী যে বয়সে খোঁপায় পরিণত হয়, সেই বয়স মেয়েটির ; আর এ বয়সে পা দিয়ে মেয়েরা চকোলেট খাওয়াকে ছেলেমানুষি ভাবতে শুরু করে। কিন্তু মেয়েটি জানোয়ার দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে নিয়ে নিয়ে যা খাচ্ছিল তা চকোলেট বলেই মনে হলো ত্রৈলোক্যর। মুগ্ধ হয়ে গেল ত্রৈলোক্য, মেয়েটির সেই আশ্চর্য চকোলেট খাওয়া দেখে। অদ্ভুত! অদ্ভুত! এক হাতেই পরম অবলীলায় কাগজের খোসা ছাড়িয়ে ফেলে তার অন্তরের জিনিসটা ধীরে ধীরে মুখে পুরে দিচ্ছে, অথচ সেদিকে তাকাচ্ছে না একটি বার। চোখের চূড়ান্ত অসহযোগ, তবু চকোলেট পৌঁছতে ভুল হচ্ছে না এতটুকু! আর কী সে সুললিত চকোলেট-চর্বণ-ভঙ্গিমা! ত্রৈলোক্য আবার মুগ্ধ হলো। রূপহীনা ছিল যে উষা, এই মেয়েটি এসে নীরব তুলনার ধাক্কায় তাকে এক নিমেষে অসহ্য কুৎসিত বানিয়ে দিলে ত্রৈলোক্যর

যৌবন-স্বপ্ন-মাখা চোখে। রক্তে দোলা লাগলো তার শিরায় শিরায়, ছলে উঠলো চিত্ত। মেয়েটি যেমন সহসা এসেছিলো তেমনি সহসা চলে গেল, ঝলসে রেখে গেল ত্রৈলোক্যের তরুণ ছুটি চোখ আর একটি মন। মনে মনে চীৎকার করে বললে ত্রৈলোক্য, "হে ক্ষণিকা, একবার, শুধু একবার ক্ষণিকের তরে ফিরে তাকাও।" কিন্তু একবারও ফিরে তাকালো না মেয়েটি। এখানে যখন ছিলো তখনও দেখেছে শুধু জানোয়ারকে, ত্রৈলোক্যকে দেখেনি তাকিয়ে।

ত্রৈলোক্যও ধীরে ধীরে পা চালালো উষাকে পিছনে রেখে। মনটা নরম হয়েছিলো, ঐ মেয়েটি এসে শক্ত সিমেন্টে বাঁধিয়ে দিয়ে গেছে, এক ফোঁটা ঘাসের চিহ্ন নেই সে মনের বুকে, যাতে উষা এসে দন্তস্ফুট করবে।

আবার আরেকটি সহসা-র উদয়। ত্রৈলোক্য শুনলে, "বাবা ত্রৈলোক্য!" তাকালে পিছনে। দেখলে, চিনলে, উষার বাবা অপরেশ।

অপরেশবাবু বললেন, "বাবা ত্রৈলোক্য! তুমি আমার প্রাণের বন্ধুর আপন ভাগ্নে। আমার বড় স্নেহের পাত্র। আমি হলেম তোমার গুরুজন-স্থানীয়। তাই বলি বাবা, বাইরের রূপটাই সব নয় মানুষের, এইটে যেন কখনো ভুলো না।"

এ আক্রমণ অপ্রত্যাশিত। রাত ছুপুরের শেয়ার মার্কেটের মতো নীরব রইলো ত্রৈলোক্য। এড়াতে চাইছে, কিন্তু ভদ্রতার না-লেখা আইন বাঁচিয়ে এড়িয়ে যাবার রাস্তা পাচ্ছে না।

আবার বললেন অপরেশ, "উষা আমার নিজের মেয়ে, জানি আমার মুখে কথাটা ভালো শোনাবে না, তবু বলি—ভগবান ওর ভেতর কী মাধুর্যই যে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন, ভেবে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনে। তুমি আমার আপনার জন বাবা—বন্ধুর ভাগ্নে—তোমায় বলতে বাধা নেই, ওর ভেতরটা যে কি নির্মল, কি নিষ্পাপ, কি মধুর, কি সরল, তা তুমি বাইরে থেকে ধারণাও করতে পারবে না।"

অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো ত্রৈলোক্য। ভয় হলো, মেয়েটি হঠাৎ কখন এদিকেই এসে পড়ে।

অপরেশবাবু তার মনের দোলা টের পেয়ে বললেন, "উষা এখন এদিকে আসবে না বাবা, তেমন মেয়েই নয়। তা ছাড়া আমি বলেও দিয়েছি আমি ডেকে না নেওয়া পর্যন্ত ঐখানেই জানোয়ার দেখতে থাকবে। মেয়ে আমার মেয়ে তো নয়, যেন ক্যাসাবিয়াংকা। হেঃ হেঃ হেঃ।" ত্রৈলোক্যর মনে হলো বড় মামার হাসির কায়দা নকল করছেন উষার বাবা।

"মেয়েদের বাইরের রূপ, সে যে বড় ঠুনকো বাবা।" বললেন অপরেশবাবু। "আজ যে রূপের রাণী, কাল সে রূপের ভিখারিণী। চোরপুকুরের তিনকড়ি চাটুয্যের মেয়ে ছিল ডাকসাইটে সুন্দরী, মেয়ের রূপের গরবে মাটিতে পা পড়ে না তিনকড়ির। হলো মায়ের কৃপা। মেয়ে প্রাণে বাঁচলে বটে, কিন্তু সারা মুখ-জুড়ে কালো গভীর বসন্তের ছাপের তলায় রূপ গেল চিরকালের তরে তলিয়ে। ...অনন্ত পাকড়াশীর নাম শুনেছো কি না জানি নে; তার মেয়ে সাবিত্রী পাকড়াশী চোখ-ধাঁধানো রূপের জৌলুষে এক ডাকসাইটে বড়লোকের বাগদত্তা পুত্রবধূ হয়ে গেল। বাগদানের দিন তিনেক বাদে হলো ম্যালিগন্যান্ট টাইফয়েড। ভোগালে একুশ দিন, যাবার আগে সারা মাথায় টাক ফেলে দিয়ে চলে গেল। বড়-লোকের ছেলেটি বিলেত ভেগে গেল। গিয়ে মেম না কি বিয়ে করলে, তারপর ছেড়ে দাও মেমসায়েব কেঁদে বাঁচি বলে বিবাহ-বিচ্ছেদ করালে—নগদ অনেকগুলো টাকা আক্কেল সেলামী দিয়ে। সাবিত্রী পাকড়াশী শুনেছি আজো সারা মাথায় কালো রুমাল জড়িয়ে রাখে।...এ ছাড়া হাজার রকম দুর্ঘটনা তো আছেই। তাই বলি, বাইরের রূপের ভরসা কতটুকু? কিন্তু ভেতরের রূপের কোনো মার নেই—মায়ের দয়া বলো, ম্যালেরিয়া-টাইফয়েড-নিউমোনিয়া বলো, দুর্ঘটনা বলো, কিছুই কিছু করতে পারবে না।"

ত্রৈলোক্য বললে "কিন্তু—"

"তারপর ধরো, মেয়েদের বাইরের রূপ ক'দিন? তোমার কাছে বলতে নেই, দু'চারটি ছেলে-পুলে হতে না হতেই চেহারার সাগরে ডুবুরি নামালেও রূপের খোঁজ মেলে না। বাইরের রূপ আসল ভাঙিয়ে খেতে খেতে ফুরিয়ে যায়। ভেতরের রূপ বেড়ে চলে চক্রবৃদ্ধি সুদে।"

অপরেশবাবুকে যেন বলার নেশায় পেয়েছে ; বলে চলেছেন অনর্গল।

"ট্রয় পুড়ে ছারখার হয়ে গেল হেলেনের জন্যে।" বলতে লাগলেন তিনি। "অন্তরের রূপ ছিলো না তার, ছিলো শুধু বাইরের রূপ। এই বাইরের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন মেনিলাস্। হায় রে! সেই হেলেন—তোমায় বলতে নেই—প্যারিসের সঙ্গে পালিয়ে গেল! তাই থেকেই হুলুস্থুল কাণ্ড! মেনিলাস কি তখন আফসোস করে একবারও বলেনি—'হায়, সুন্দরী বিয়ে না করে কেন সাদাসিধে দেখে বিয়ে করলুম না?…' তারপর ধরো, সুন্দরী মেয়েদের দেমাক। তোমাকে গ্রাহ্যই করবে না ; হাজার তাঁবেদারি করেও মন পাবে না, ভক্তি শ্রদ্ধা তো দূরের কথা। আমার মেজো শালার ভায়রাকে তার সুন্দরী বৌ কড়ে আঙুলের ডগায় ঘুরিয়ে মারছে কলুর বলদের মতো। বেচারা এক ফোঁটা শান্তি পাচ্ছে না। এ আমার মেজো শালার নিজের মুখে শোনা।"

ত্রৈলোক্যর অমনি মনে পড়ে গেল, একটু আগে দেখা সেই চোখ-ধাঁধানো মেয়েটির কথা। এমন কিছু সুন্দরী হয়তো সে নয়, শুধু উষার পাশেই দাঁড়িয়েছিলো বলেই হঠাৎ অতটা চমক লাগাতে পেরেছিল। তবু কী দেমাক! ত্রৈলোক্যর দিকে একবার হেলা ভরেও চোখ ফেরায়নি সে, যেন তার কাছে জানোয়ারের চাইতেও ঢের বেশী তুচ্ছ ত্রৈলোক্য! সেই অপমানের খোঁচার ক্ষতে যেন অপরেশবাবুর কথার নুণ লেগে জ্বালা ধরে উঠলো। কিন্তু উষা তাকে অপমান দূরে থাক, অসম্মানও করেনি, প্রাণের সারা আবেগ উজাড় করে চেয়েছিলো তার পানে।

"উষা আমার মা-মরা মেয়ে বাবা ত্রৈলোক্য!" বললেন অপরেশ বাবু। বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে এলো তাঁর। "বড় অল্প বয়সে মা আমার মাতৃহারা হয়েছে।"

মনের বড় নরম জায়গাটিতে ব্যথার পরশ লাগলো ত্রৈলোক্যর। অল্প বয়সে সে-ও মাতৃহারা। মা'র চেহারাও ভালো করে মনে নেই তাঁর। এক নিমেষে জানোয়ার-দর্শন-নিমগ্না উষার ওপর সহানুভূতি

একাত্মতা জেগে উঠলো তার প্রাণে। চোখ দুটি উঠলো ছলছল করে।

"ওকে মার অভাব ভুলিয়ে রাখবার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি বাবা ত্রৈলোক্য!" বলতে লাগলেন অপরেশবাবু। "মা-বাপ দুয়ের ভালবাসা আমি একা বেসেছি। এ-ও তোমাকে আমি বলবো ত্রৈলোক্য, আমি ও মেয়ের ভেতরেই পেয়েছি আমার মাকে। এই বুড়ো ছেলেটাকে মেয়ে আমার কি যত্নই যে করে, সে তোমাকে আর কি বলবো। তাই ওকে একদিন বলেছিলুম, তুই যেদিন স্বামীর ঘর করতে চলে যাবি মা, জানিনে সেদিন তোর এই বুড়ো ছেলের কি অবস্থা হবে। শুনে মেয়ে আমার কি বললে জানো বাবা?"

"কি বললে?" ত্রৈলোক্যের আনমনা আকস্মিক প্রশ্ন।

"বললে, আমি চিরকাল তোমারই কাছে থাকবো বাবা, যাবো না স্বামীর ঘরে। আমি বললেম, দূর পাগলি, তা কি হয়? মেয়েদের সবার সেরা আপন হলো স্বামী। তোকে তোর স্বামীর পায়ে সঁপে দিয়ে তবে আমার নিশ্চিন্দি, তা নইলে স্বর্গে থেকে তোর মা-ও শান্তি পাবেন না। তোমায় বলতে নেই, ওর মা যে কি সতীলক্ষ্মী ছিলেন তা তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না বাবা। বাইরের রূপ ভগবান তাকে দেননি, কিন্তু অন্তরের রূপে সে আমার সারা জীবন সুধায় ভরে দিয়ে গেছে। আমাদের অফিসের বড়বাবুর স্ত্রীর ছিলো সুন্দরী বলে নাম। বড়বাবু বলতেন, 'তোমায় বলতে নেই অপরেশ, তোমার বৌঠান্ আমার হাড়-মাস তেলে-ভাজা করে ছাড়ছে। স্ত্রীভাগ্যটা তোমার মতন হলে সুখী হতে পারতুম।' এমনি মায়ের মেয়ে আমার ঊষা। আমার ঊষা মাকে তো আমি যার-তার হাতে দিতে পারি নে বাবা! পাত্রটি এমন চাই যার চরিত্র হবে মহৎ, উদার; রুচি হবে মার্জিত; হৃদয় হবে কোমল, নির্মল; বিনয় হবে যার অলংকার, অথচ অভাব থাকবে না আত্মমর্যাদা-বোধের; আর সবার ওপর থাকবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যে জীবনে একটা বড় চাকরি করে যাবো। চেহারায়, চাল-চলনে তার থাকবে একটা সুশ্রী শালীনতা, যা দেখবামাত্রই মুগ্ধ না

হয়ে থাকা যাবে না। যার গলায় উষার বরমাল্য শোভা পেলে ওর মা স্বর্গ থেকে দেখে আনন্দাশ্রু বিসর্জন না করে পারবে না। এমন পাত্রের জন্য—তোমায় বলতে নেই ত্রৈলোক্য—বিশ্বভুবন খুঁজে বেড়াতেও আমার কোনো আপত্তি ছিলো না। কিন্তু তার দরকার হলো না। যা চেয়েছিলাম তা হাতের কাছে পেয়ে গেলাম। এখন জানি নে বিধাতার কি ইচ্ছা। জানি নে আমার মা-মরা মেয়েটা এমন ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে কি না।"

বলে একটা মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অপরেশবাবু। সে দীর্ঘশ্বাস ভেদ করে গেল ত্রৈলোক্য তপাদারের তরুণ মর্মকে। মনে হলো, যেন কোনো করুণ রাগিণীর সকরুণ আবেদনে তার অন্তরাত্মা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাকালে সে উষার দিকে। সে তখনো জানোয়ার দেখছে, দেখা যাচ্ছে না তার মুখ। ত্রৈলোক্য ভাবলে তার নিজের কথা। তার ভেতরে এত যোগ্যতা মাথা গুঁজে লুকিয়ে বসে আছে এ তো তার জানা ছিলো না।

এতখানি মর্যাদা কেউ তাকে কোনো দিন দেয়নি। চায়ে ডোবানো বিস্কুটের মতো ভিজে নরম হয়ে উঠলো ত্রৈলোক্যের মন।

অপরেশবাবু বললেন, "একটা কথা তোমায় বলিনি ত্রৈলোক্য—বলা হয় তো ভালোও দেখায় না—মেয়ে আমার গৌরবর্ণ পায়নি বটে, কিন্তু দরদী মন দিয়ে একবার তার মুখখানির দিকে তাকিয়ে দেখেছো বাবা?"

ত্রৈলোক্য একটু লজ্জিত হয়ে বললে, "আজ্ঞে না, তেমন মন দিয়ে দেখিনি।" সত্যিই দেখেনি তেমন মন দিয়ে, একবার চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই চেহারার ধাক্কা খেয়ে ঘুরে গিয়েছিলো চোখ।

অপরেশবাবু বললেন, "একবার যদি অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে ওর মুখের পানে তাকিয়ে দেখ ত্রৈলোক্য, তাহলে বুঝতে পারবে ভগবান ওকে গৌরবরণ দেননি, কিন্তু কি দিয়েছেন। এ তো আর ঢেঁকি নয় বাবা, যে অনুরোধে গিলবে। তবু অনুরোধ করি, যাও তুমি একবারটি আমার মা-মরা অভাগী মেয়েটার মুখের পানে ভালো করে তাকিয়ে দেখে এসো। উষা জানোয়ার দেখছে, তুমিও যেন জানোয়ার দেখছো। ওকে আমি এখনো

কিছু জানাইনি বাবা। দ্বিধা-সংকোচ কিচ্ছু কোরো না তুমি। আমি এই গাছের আড়ালে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছি।"

গাছের আড়াল হলেন অপরেশবাবু। আবার চলে গেল সেখানে ত্রৈলোক্য, যেখানে তখনো জানোয়ার দেখছে উষা। দাঁড়ালো জানোয়ার দেখবার ছল করে, উষার মুখের দিকে তাকাতেই ছলছল করে উঠলো ছুটি চোখ। আশ্চর্য! অদ্ভুত! আগের বার তো উষার এ মুখ দেখেনি ত্রৈলোক্য! এবার উষার মুখে রঙ ধরিয়েছে পশ্চিমাকাশের গোধূলি আলো; সূর্য ডুবি-ডুবি করছে অস্তাচলে, ভাবছে যাবার আগে একবার রাঙিয়ে দিয়ে যাই। তা, রাঙিয়ে দিলে বই কি! উষার গোধূলি-রাঙা মুখ দেখে রঙীন হয়ে উঠলো ত্রৈলোক্যের মন। কে বলে রূপ নেই উষার? মুগ্ধ হয়ে গেল ত্রৈলোক্য। মনের আড়ালে শুনতে পেলে আগামী রেলগাড়ীর আওয়াজ।

তারপর জীবন-সাগরের নতুন তরঙ্গে এক ভেলায় চড়ে ভেসে পড়লো ত্রৈলোক্য আর উষা। রেলের চাকরিও হলো অপরেশ-জামাতার। তার পর এ-স্টেশন সে-স্টেশন বহু ঘুরে অবশেষে তাঁর জীবনের অন্তিম স্টেশনে এসেছেন সস্ত্রীক ত্রৈলোক্য তপাদার। এই সুদীর্ঘ কালের ভেতর একটানা ছুটি দিনও ভালো যায়নি উষা দেবীর।

"চিড়িয়াখানার সেই গোধূলির তারিখ আমার জীবনের ক্যালেণ্ডারে আজো লাল তারিখ হয়ে আছে।" বলেন স্টেশন-মাস্টার ত্রৈলোক্য তপাদার। জানিনে 'লাল' বলতে উনি 'কালো' বোঝাতে চান কি না।

কাঠের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে-ফিরে মনে পড়ছিলো এই সব কথা, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঢঙে, টুকরো টুকরো করে তপাদারের মুখে শোনা আর মনের নোট-বইতে টুকে রাখা।

"কি ভাবছো ধনপতি ভায়া?" পিঠে মৃদু চাপড় খেয়ে শুনতে পেলুম। প্রশ্নকর্তা স্টেশন-মাস্টার ত্রৈলোক্য তপাদার।

বললুম, "ত্রৈলোক্যদা যে! বৌদি কেমন আছেন?" এক ফোঁটা আগ্রহ ছিল না জানবার। তবু।

"একটু দড়ি-ছেঁড়া হাওয়া খেতে বেরিয়েছি ধনপতি।" বললে ত্রৈলোক্যদা। "ছ'দিন বাদে যখন পেন্‌শন জোর করেই ঘাড়ে চাপবে তখনকার জন্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছি, একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে। নইলে একবারে হঠাৎ পুরো বিশ্রাম সইবে না, হাঁফিয়ে মারা যাবো।"

বিদায়ের ঘণ্টা ঢঙ্‌ঢঙিয়ে উঠলো স্টেশনে। কান-কাঁদানো বাঁশি বাজিয়ে প্ল্যাটফরম্ ছেড়ে ট্রেণ চলে গেল আমাদের তলা দিয়ে। সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে দেখা গেল কিছুক্ষণ। আমারই সঙ্গে দাঁড়িয়ে স্টেশনের সর্বাধিনায়ক ত্রৈলোক্য তপাদার—খুশী মত ট্রেণ আটকে রাখতে বা ছেড়ে দিতে পারেন যিনি। কিন্তু খেয়াল-খুশীতে ট্রেণ আটকাননি ছাড়েননি কখনো। ডিউটিতে যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ পান থেকে এক ফোঁটা চুন খসান না। চুলচেরা হিসেব।

"এই সেতুর তলা দিয়ে কত ট্রেণ এসেছে, কত ট্রেণ গেছে।" বললেন ত্রৈলোক্যদা। "আরো কত ট্রেণ আসবে-যাবে। আমরা যখন আর থাকবো না তখনো—"

"তখন এই রেল-লাইনও থাকবে কি না কে জানে ত্রৈলোক্যদা? ও নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো।"

"মাথা যে আপনি ঘেমে ওঠে হে ধনপতি!" হেসে বললেন ত্রৈলোক্য তপাদার। "মালগাড়ী স্বর্গে গেলেও মাল টানে! স্টেশন-মাস্টারী মগজের ভেতর যে হরদম ট্রেণ ছুটছে। কুইনিন্ খেলে যেমন মাথা ভোঁ-ভোঁ করে, এও তেমনি। এইটে আস্তে আস্তে ছাড়াবার চেষ্টা করছি ধনপতি। কিন্তু পারছি নে, আর পারছি নে বলে দুঃখও নেই। বিধাতার ইচ্ছেও নয় যে পারি। তাই তো ঐ বাড়ীখানা আমায় কিনিয়েছেন।"

স্টেশনের উল্টো দিকে শহরতলীর সীমান্তে রেল-লাইনের ধারে ছোট্ট বাড়ীখানা। ঐ বাড়ীর ছাত থেকে আর খোলা জানালা থেকে ট্রেণের

যাত্রীদের চেহারা প্রায় স্পষ্ট করে চেনা যায় ; ট্রেণের চলার আওয়াজ মৃদু সাড়া জাগায় বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে।

বাড়ীটি ভাড়া দিয়েছেন জানি, খোঁজ করিনি কাকে দিয়েছেন। জাহাজের ব্যাপারীর আদার খবরে দরকার কি ? এইটুকু শুধু জেনেছি, যাঁরা ভাড়া নিয়েছেন তাঁরা তিনটি প্রাণী—স্বামী, স্ত্রী আর একটি মাত্র মেয়ে। বাড়ীর আট আনাই তাঁদের পক্ষে প্রচুর: বাকী আট আনায় যখন খুশী তখন এসে থাকতে পারেন পিসী সহ সস্ত্রীক বাড়ীওয়ালা ত্রৈলোক্য তপাদার।

"রেলের চাকরি দেখতে দেখতে অনেকদিন হয়ে গেল ধনপতি!" বললেন স্টেশন-মাস্টার। "চাকরি-রসে মশগুল হয়ে তখন টেরই পাইনি দিন-রাত কোথা দিয়ে যাচ্ছে! দিন নেই, রাত নেই, সময় নেই, অসময় নেই খেটে গেছি। কি মনে হয়েছে জানো ? মনে হয়েছে আমি কাজ থেকে একটু ছুটি নিলে, কাজে এক ফোঁটা ঢিল দিলে তামাম দেশের রেল-ব্যবস্থা বান্‌চাল হয়ে যাবে। তাই টাইমের ওপর ওভারটাইম খেটেছি। জীবন ভুলে রেলের কাজেই মেতে থেকেছি। তোমার বৌদির কথাও ভাবতে বড়ো একটা সময় পাইনি। এখন ভাবলেও অদ্ভুত লাগে ধনপতি।"

বললেম, "অদ্ভুত যাকে ভাবছেন ত্রৈলোক্যদা, তাই তো স্বাভাবিক।"

ত্রৈলোক্যদা বললেন, "কাজ থেকে যখন শেষ ছুটি নেবো ধনপতি, তখনো রেলগাড়ী এমনি চলবে, ত্রৈলোক্য তপাদার নেই বলে বন্ধ থাকবে না। চলো না একটু শহরতলীর রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে গল্প করা যাক। আজ যেন হঠাৎ গল্পের নেশা জেগেছে প্রাণে।"

এই নেশাটি বরাবরই আমার সব চেয়ে বেশী পছন্দ।

বললেম, "চলুন ত্রৈলোক্যদা।" কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেম রেল-লাইনের ওপারে শহরতলীর পয়লা রাস্তায়।

নেমেই ত্রৈলোক্য তপাদার বললেন, "তুমি যে আজ এমনি সময়ে ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলে ধনপতি, এ যেন বিধাতারই অনুরোধে। বেড়াতে বেরিয়েছি, বিধাতাই সঙ্গী জুটিয়ে দিলেন তোমাকে। একা

বেড়াতে প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠতো। গোটা জীবনটাই তো প্রায় একা কাটাতে হলো ধনপতি।" বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস-মার্কা হাসি হাসলেন তিনি। হায় রে জীবনের সেই গোধূলি লগ্ন। হায় রে তার লম্বা জের। পশ্চিমাকাশে গোধূলি রঙের দিকে তাকিয়ে এই দুটি 'হায় রে' পাশাপাশি মনে পড়লো।

একটু যেতেই ত্রৈলোক্য তপাদারের কেনা বাড়ীটার দোতলা থেকে বাইরে উঁকি মেরে এক শ্যামবর্ণ মোটা ভদ্রলোক বললেন, "মাস্টার-মশাই যে। আসুন এক পেয়ালা চা খেয়ে যান। আরে আরে, ধনপতিবাবু না? আসুন আসুন, আপনিও খেয়ে যান এক পেয়ালা।"

ত্রৈলোক্য তপাদারের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি হানতেই তিনি প্রায় কানে কানে বললেন, "বিশ্বম্ভর রায়, শর্বরী রায়ের বাবা। আমার ভাড়াটে। খাসা লোক।"

আবার বিশ্বম্ভরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে গেল একদিন তাঁকে লেকের ধারে বেড়ানে-ওয়ালা বৃদ্ধদের দলে বেড়াতে দেখেছিলেম বটে; তখন মাথায় ছিলো গান্ধী টুপি, এখন আছে শুধু টাক। আজ মাথায় টুপি নেই বলেই হয়তো চট্ করে চিনতে পারিনি। আশ্চর্য! কত সহজেই না মানুষকে না-চেনা যায়!

বললেম, "চলুন না ত্রৈলোক্যদা, উনি যখন এত করে বলছেন। চা খাওয়াও হবে, সেই সঙ্গে আপনার বাড়ীটাও দেখা হবে। যার বাহির দেখেছি তার ভেতরও দেখবো।"

ধাপ্পা, ধাপ্পা, স্রেফ ধাপ্পা। আগ্রহ আমার চায়ের জন্যও নয়, বাড়ীর ভেতরটা দেখবার জন্যেও নয়। আমি চাইছিলেম ৺প্রজ্ঞাপারমিতার সহ-পাঠিনী শর্বরী রায়কে দেখতে। জলবসন্ত-রোগশয্যায় একদা প্রজ্ঞাপারমিতার শুশ্রূষা-ধন্যা হয়েছিলো যে শর্বরী, ইংরাজীর অধ্যাপক শান্তনু সেনের রাত জেগে আপন হাতে তৈরী করা নোট (৺প্রজ্ঞাপারমিতার জন্যে—শুধুই ৺প্রজ্ঞাপারমিতার জন্যে) নিজে এক লাইনও না পড়ে যে শর্বরীকে দিয়ে দিয়েছিলো ৺প্রজ্ঞাপারমিতা। রূপহীনতায় অপরূপা সেই মেঘবর্ণা শর্বরী রায়।

"চলো।" বললেন স্টেশন-মাস্টার ত্রৈলোক্য তপাদার। চললাম। নিজেই নেমে এসে দুয়ার খুলে দিলেন বিশ্বম্ভর রায়। গান্ধী-টুপিহীন টেকো মাথা। প্রথমে যে তাঁকে চিনতে পারিনি সেটা টের পেয়েছিলেন, কিন্তু সেজন্য কোনো অনুযোগের আভাস মাত্র নেই তাঁর মৃদু অভ্যর্থনা-মুখর হাসিতে। বললেন, "চলুন একেবারে ছাতে চলে যাই।"

ত্রৈলোক্য তপাদার বললেন, "চলুন।" তাঁর নিজের বাড়ীতে আজ ভাড়াটের অতিথি তিনি।

দোতলা থেকে ছাতে উঠবার সিঁড়ির পয়লা ধাপে পা ফেলে বিশ্বম্ভর বাবু হেঁকে বললেন, "ছাতে তিন পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিস তো মা শর্বরী, চাঁপার মাকে দিয়ে।"

নেপথ্যে শর্বরীর সুকণ্ঠ শোনা গেল "দেবো বাবা!" ছোট্ট দু'টি কথা, অতি সহজ তার ভাবার্থ: ছাতে সে তিন পেয়ালা চা পাঠাবে চাঁপার মাকে দিয়ে। অথচ কী অদ্ভুত তার ব্যঞ্জনা, কি আশ্চর্য তার সুরের রেশ! যেন পাকা হাতে তৈরী তান্‌পুরোর নিখুঁত করে সুরে-বাঁধা জুড়ির তার দু'টিতে জোড়া ঝংকার। ছাতে উঠেও কানের পাশে গুঞ্জন করে বেড়াতে লাগলো।

চা পাঠাবে শর্বরী, চাঁপার মা'র হাতে। আমার এইটে বড়ো ভালো লাগে—এই যে বাড়ীর ঝি-কে ঝি-নামে বা ডাক-নামে না ডেকে তার সন্তানের মা বলে ডেকে তার মাতৃত্বকে মর্যাদা দেওয়া। এ যেন বলা "ওগো, তুমি যে বাসন মাজো, ঘর ঝাঁট দাও, ফরমাশ খাটো, দরকার হলে ছাতে চা পর্যন্ত দিয়ে যাও, এগুলো বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে তুমি মা।"

কিন্তু একটু পরে একটা ট্রে'র ওপর সাজিয়ে তিন পেয়ালা চা আর তিন প্লেট নারকেলের সন্দেশ নিয়ে যে এলো তাকে মা বলে মনে হলো না। ত্রৈলোক্যবাবু স্নেহ-ছল-ছল স্বরে বললেন, "তুমি নিজেই নিয়ে এলে মা?"

ভালোই হলো। শর্বরীকেই দেখতে চেয়েছিলেম, চাঁপার মাকে নয়।

শর্বরী বললে, "হ্যাঁ কাকাবাবু। চাঁপার মা'কে তাড়াতাড়ি ছেড়ে

দিলুম, চাঁপার কি একটা যেন ব্রত আছে। তা ছাড়া, চা খেয়ে আপনাদের যত আনন্দ, চা খাইয়ে আমাদের আনন্দ তার চেয়ে ঢের বেশী কাকাবাবু!"

ত্রৈলোক্যবাবু স্টেশন-মাস্টারী ভুলে হেসে বললেন, "আনন্দ কি ফিতে বা দাঁড়ি-পাল্লা দিয়ে মাপা যায় রে পাগলী? তবে, এইটে বলতে পারি যে, চা খেয়ে আনন্দ দিতে ত্রৈলোক্য তপাদার কখনো গররাজি নয়, বিশেষ করে সঙ্গে যদি এ-রকম উপাদেয় পদার্থ থাকে।"

বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "শর্বরীর নিজের হাতের তৈরী।" তার পর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "এ জিনিস বড় ভালবাসত প্রজ্ঞাপারমিতা। এই তো সেদিনও এসে কত খুশী হয়ে খেয়ে গেছে শর্বরীর সঙ্গে। হায় রে! প্রজ্ঞাপারমিতা আজ কোথায়?"

ছাতের ওপর বিছানো মাদুর চেপে বসেছি তখন আমরা তিন জন, আর আমাদের সামনে চায়ের পেয়ালা আর প্লেট নিপুণ হাতে সাজিয়ে দিয়েছে শর্বরী রায়। তার কালো করুণ মুখ আরও করুণ হয়ে উঠলো ৺প্রজ্ঞাপারমিতার কথা মনে পড়ে যাওয়ায়। বোধ করি উদগত অশ্রু গোপন করতেই কি একটা কাজের অস্ফুট অজুহাতে বিদায় নিয়ে নীচে নেমে গেল শর্বরী—মুখ-জোড়া তার বসন্তের দাগ। মুখের দাগের মতো তার মনের দাগও বুঝি কোনো দিন মিলাবে না।

"শর্বরীর জল-বসন্তে কি সেবাটাই করেছিল প্রজ্ঞা! ভাবতেও পারা যায় না।" বললেন বিশ্বম্ভর বাবু। "তখন আমরা এ বাড়ীতে ছিলুম না, তাই দেখতে পাননি ত্রৈলোক্যবাবু। আমায় অশেষ ঋণী করে রেখে মেয়েটা অকালে পরপারে চলে গেল।"

ত্রৈলোক্যবাবু বললেন, "কার যে কখন কাল, আর কার কখন অকাল, তা তো আর আমাদের মতো ক্ষুদ্র জীবের বুঝবার কথা নয় বিশ্বম্ভর বাবু! ছুনিয়াটাকে এমন গোলক-ধাঁধা বানিয়ে রেখেছেন ভগবান, যে যত ভাবা যায় ততই হাবা হয়ে যেতে হয়। তাই তো আজকাল আর ভাবি নে, দেখে যাই, শুধু দেখেই যাই।"

আমি বললেম, "প্রজ্ঞা দেবীকে দেখবার সুযোগ আমার হয় নি

বিশ্বম্ভরবাবু, কিন্তু ওঁর কথা অল্প দিনের ভেতরই অনেক শুনেছি, আর শুনে মুগ্ধ হয়েছি।"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "দেখলে যা হতেন ধনপতিবাবু, মুগ্ধ তার কাছে ছেলেমানুষ।" তাকালেম ত্রৈলোক্য তপাদারের দিকে। মানে, "বলেন কি ত্রৈলোক্যবাবু?"

"'মুগ্ধ' বলে সে ভাব বোঝানো আর গোটা চৌবাচ্চার জল এই পেয়ালায় ভরা একই কথা।" বললেন অ-স্টেশন মাস্টারী ভাষায় ত্রৈলোক্য তপাদার। "ওকে দেখেছি আপনার এই বাড়ীতে—আমার বাড়ীতেও বলতে পারেন—ওর জীবনের শেষ প্রান্তে। তখন কেমন করে জানবো এমন হঠাৎ সে চলে যাবে? জানিনে সে নিজে জেনেছিলো কি না; যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। বিশ্বম্ভরবাবু ঠিক বলেছেন ধনপতি! দেখলে যা হতে, মুগ্ধ তার কাছে নাবালক।"

"তাই শর্বরী দেবীর সঙ্গে ভালো করে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিলো।" বললেম বিশ্বম্ভর বাবুকে। ওঁর মুখে অনেক কিছু শুনতে পেতেম।"

গোপন কথা বলবার ভঙ্গীতে মুখ এগিয়ে এনে বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "আলাপ করবার মতো অবস্থা নয় এখন শর্বরীর। ওর মনের ভেতর এখন প্রবল দ্বন্দ্ব চলেছে। বাপের হৃদয় দিয়ে ওর হৃদয়ের সেই প্রচণ্ড ঝড়ের আওয়াজ আমি শুনতে পেয়েছি। অথচ বাইরে সে শান্ত, গম্ভীর। এই তো আপনাদের সামনে নিজের হাতে এসে সে চা দিয়ে গেল। ওর অন্তরের ঝড়ের খবর আভাসেও টের পেলেন কি?"

আমি বিস্মিত হয়ে বললেম, "কই, না তো!"

ত্রৈলোক্য তপাদার শুধালেন, "কেন ওর হৃদয়ে এই ঝড়?"

"কাউকে বলবেন না যেন।" ব'লে বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "শিল্পী কিশোর চৌধুরীর নাম শুনেছেন তো?"

শুনেছেন, স্টেশন-মাস্টার ত্রৈলোক্য তপাদার পর্যন্ত শুনেছেন কিশোর চৌধুরীর নাম, দেখেছেন তাঁকে, কথাও কয়েছেন তাঁর সঙ্গে। স্টেশন থেকে

ঢিল ছুঁড়ে ফেলা যায় তাঁর বাড়ীর প্রাঙ্গনে, যার দক্ষিণে তাঁর স্টুডিয়ো। স্টেশনের কর্মিবৃন্দ গত বছর থেকে স্টেশনের পশ্চিমের মাঠে সামিয়ানা দিয়ে আকাশকে আড়াল করে বাণী-বন্দনা স্থুরু করেছেন; বন্দনা কমিটির সভাপতি (পদাধিকার বলে) স্টেশনমাস্টার ত্রৈলোক্য তপাদার। বাণী-বিগ্রহের পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন কিশোর চৌধুরী। অনুরোধে ঢেঁকি গেলেননি, আগ্রহের মর্যাদা দিয়েছেন হৃদয় ঢেলে। দেশ-বিদেশের খ্যাতিতে আকণ্ঠ ডুবে আছেন বলে তুচ্ছ স্টেশনের পুজো-কমিটির অন্তরের আহ্বানকে তুচ্ছ করেননি তিনি। সেই সূত্রে কিশোর চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ত্রৈলোক্য তপাদারের।

অদ্ভুত শিল্পী এই কিশোর চৌধুরী—বয়স অল্প, কিন্তু প্রতিভার সীমা নেই। আর্ট কলেজ থেকে প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাশ করে বেরিয়েছে; শোনা গেছে, কলেজের শিক্ষকরাই বলেন, কিশোরকে যত শিখিয়েছেন তার চেয়ে কিশোরের কাছে তাঁরা শিখেছেন বেশী। ডিগ্রী পেয়েছে সে, কিন্তু ডিগ্রীর ছাপ পড়েনি তার ছবিতে; প্রত্যেকটি ছবিতে জ্বলজ্বল করছে তার প্রতিভার দীপ্ত স্বাক্ষর। ছবি-প্রদর্শনীতে কিশোরের ছবি গেলে ম্লান হয়ে যায় অন্য শিল্পীর ছবি।

ছবির ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি নেই যাদের, অর্থাৎ উন্নাসিকতার ভাষায় ছবির যারা কিচ্ছু বোঝে না, তারাও যে কিশোর চৌধুরীর ছবি দেখে মুগ্ধ, চোখ সহজে ফেরাতে পারে না; ছবির যাঁরা অনেক কিছু বোঝেন, সেই সব ছবি-ব্যাকরণ-বিশারদ পণ্ডিতরাও সেই ছবি দেখে ব্যাকরণসম্মত পণ্ডিতী বাহবা না দিয়ে পারেন না। চিত্র-শিল্পের জগতে বাঘ-ছাগলকে একসঙ্গে এক ঘাটের জল খাইয়েছে শিল্পী কিশোর চৌধুরী!

কিশোরের ছবি প্রদর্শন করে ধন্য হয়েছে কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লণ্ডন, প্যারিস, লুভার, রোম, নিউইয়র্ক, বার্লিন, কোপেনহেগেনের বহু চিত্র-প্রদর্শনী। কিন্তু কিশোরের অতৃপ্ত হৃদয় আজও হাহাকার করছে, আজ পর্যন্ত একটিও ভালো ছবি শিল্পজগৎকে সে উপহার দিতে পারলে না ভেবে।

কিশোর চৌধুরীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বছরে অনেকগুলো মোটা চেক জমা হয়; সেগুলো আসে রাজা-মহারাজা-নবাব-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে, তার আঁকা ছবির বিনিময়ে। বেচবার জন্যে তত লালায়িত নয় কিশোর, কিনবার জন্যে যত লালায়িত এঁরা। কিশোর চৌধুরীর আঁকা ছবি মোটা দামে কিনে বাড়ীতে রাখাটা 'কালচারওয়ালা' অভিজাত বড়লোক মহলে প্রায় আবশ্যিক ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে।

সোজা কথায় অর্থ, যশ আর সম্মান যেন পাল্লা ধরে পায় লুটোতে চাইছে কিশোর চৌধুরীর, কিন্তু কিশোর চৌধুরীর সেদিকে নেই এক ফোঁটা খেয়াল বা আগ্রহ।

বললেম, "কিশোর চৌধুরীর নাম যে না শুনেছে সে না শুনলেও কিছু যাবে-আসবে না বিশ্বম্ভর বাবু।"

বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "এই কিশোর চৌধুরীর সঙ্গেই শর্বরীর বিয়ে সেমি ফাইন্যাল পাকা হয়ে আছে। ফাইন্যাল পাকা হয়ে যায় শর্বরী মত দিলে।"

"অ্যাঃ!" বলে অবাক হয়ে রইলেম আমি। কিন্তু এক টুকুরো মেঘ দেখলেম না ত্রৈলোক্য তপাদারের মুখের আকাশে। তিনি যেন জানেন এইটেই পরম স্বাভাবিক, আর জানেন মত দেবে শীগ্‌গিরই শর্বরী, ভাববার কিছু নেই। একটি পরম নিশ্চিন্ত চুমুক দিলেন চায়ের পেয়ালায়।

মনে পড়ে গেল ত্রৈলোক্য তপাদারের জীবনের সেই গোধূলি লগ্নের কথা। হয়তো তেমনি কোনো লগ্ন এসেছিলো রূপের পূজারী রূপবান কিশোর চৌধুরীর জীবনে, আর লগ্নের আলোয় ঢেকে গিয়েছিলো শর্বরী রায়ের কালো মুখের কালিমা আর বিগত বসন্তের পিছে-রেখে-যাওয়া পদচিহ্ন।

"আমার এ বিয়েতে পুরো মত আছে। নেই কোনো দ্বিধা, শঙ্কা বা সংকোচ। প্রথম যখন কিশোর আমায় বললে, তখন এই তিনটেই ছিলো বটে, কিন্তু এখন আর নেই।" বললেন বিশ্বম্ভর বাবু। "আমি ষোলো আনা বিশ্বাস করি এ বিয়ে হলে কিশোর সুখী হবে। আর সেইটেই তো

বড়ো কথা ; তা নইলে আমার মেয়েটার সারা বাকী জীবনটা যে দুঃখে ভরে উঠবে।"

আমি বললেম, "কিন্তু—"

বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "হ্যাঁ, 'কিন্তু' যে একটা আপনার মনে জাগবে, তা আমি জানতুম ধনপতি বাবু! সেটাই জেগেছে শর্বরীর মনেও। আর সেই জন্যেই ওর মনের ভেতরে চলছে দুরন্ত সাইক্লোন। ক্লান্ত হয়ে আসুক সে সাইক্লোন, কমে আসুক তার দাপট, তখন বোঝাতে চেষ্টা করবো শর্বরীকে। এখন ও বুঝতে পারবে না, বোঝাতে গেলেই না-বোঝার বোঝা আরো ভারী হয়ে উঠবে তার। আশ্চর্য রূপ আছে কিশোর চৌধুরীর, রূপোরও কিছু কমতি নেই, সারা ভুবন জুড়ে তার ছবির জয়-জয়কার! ওর গলায় বরণমালা দেবার জন্যে অনেক সুন্দরী বড়লোকের মেয়ে হাত বাড়িয়েই আছে। বলবো কি আপনাকে, ধনপতি বাবু, এগিয়ে আসা অমন অনেক মালা সে সবিনয় দৃঢ়তায় প্রত্যাখ্যান করেছে। শর্বরী ভাবছে, সে কেন আসবে পাণি-প্রার্থনা করতে তার মতো কালো মেয়ের, যার রূপ নেই, নেই কোনো প্রতিভা, আর যার বাপের সম্বল এক রোগা পেন্‌শ্যন্ আর একটা ছোট্ট জীবনবীমা? শর্বরী ভাবছে হয় তার মাথা খারাপ হয়েছে, না হয় এ তার নির্মম ঠাট্টা। তাই কিশোর যত এগোচ্ছে, শর্বরী ততই পিছিয়ে যাচ্ছে, মত দিতে পারছে না। হাতের সামনে তার এগিয়ে এসেছে অমৃত ফল, এমন আশাতীত অবিশ্বাস্য ভাবে যে, হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে ভরসা পাচ্ছে না শর্বরী। তার ভয়, হাত বাড়াতে গেলেই অমৃত ফলটা তাকে উপহাস করে' পিছে সরে যাবে, থেকে যাবে শুধু হাতবাড়ানোর কাঙালপনা।"

দম ফুরিয়ে গিয়ে হাঁফাতে লাগলেন বিশ্বম্ভর বাবু।

আমি বললেম, "শর্বরী দেবীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল কোথায় কিশোর চৌধুরীর?"

বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "কিশোর চৌধুরীর ছবির প্রদর্শনীতে। দেখতে গিয়েছিলো প্রজ্ঞাপারমিতা, শর্বরীকে নিয়ে। সহপাঠিনীদের ভেতর শর্বরীকেই প্রজ্ঞা ভালোবাসতো সবার চাইতে বেশী।"

"সেখানে শর্বরীকে দেখে মুগ্ধ হলো কিশোর ?"

"শর্বরীকে দেখে নয়, প্রজ্ঞাপারমিতাকে দেখে।" বললেন বিশ্বম্ভর বাবু। "সেটা কিছু আশ্চর্য নয়—বুঝতে পারতেন যদি প্রজ্ঞাকে একটি বারও দেখতেন আপনি। প্রজ্ঞাপারমিতার স্বপ্নে ছেয়ে গেল তার মন। কিন্তু চলে গেছে প্রজ্ঞা, হারিয়ে গেছে কোন্ অসীমায়। হারিয়ে যাওয়া প্রজ্ঞার স্বপ্ন সে দেখছে শর্বরীতে, যে ছিলো প্রজ্ঞার প্রিয়তমা সখী। প্রজ্ঞাকে দেখে যে রং ধরেছিলো চোখে, আপন চোখের সেই রং শর্বরীর ওপর ফেলে শর্বরীকে দেখেছে কিশোর চৌধুরী। আর দেখে মুগ্ধ হয়েছে। শিল্পীর চোখই আলাদা কি না! আমাদের চোখে যার রূপের বালাই নেই, শিল্পীর চোখে সেই রূপ অপরূপ হয়ে ধরা দেয়। এতে আমি আগে যদি বা সন্দেহ করতুম, কিশোরের মুখে সব শোনার পর এখন আর করিনে।"

ছাত্র যেন বিশ্বম্ভর বাবু, পড়া মুখস্থ বলে ফেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মাস্টারের কাছে। তবু খানিকটা ভয় থেকে গেছে, মাস্টার মশাই জেরা করলেই হয়তো ঠেকে যাবেন।

জেরা করতে মন চাইলো না। রূপের ভক্ত শিল্পী কিশোর চৌধুরী অপরূপার রূপহীনা সখীর বাপকে শ্বশুর বানাবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে, আর সেই ক্ষ্যাপামি সময়ের ধোপে টিকবে, এই ভেবে তাঁর মনের কুঞ্জে আনন্দের কোকিল গান গেয়ে ওঠে তো উঠুক, আমার কি দরকার তার গান থামিয়ে? ছেলেমানুষ, নিতান্তই ছেলেমানুষ বিশ্বম্ভর বাবু, বলে উঠলো আমার মন। আশ্চর্য হবার নেই, জীবনের শেষের সীমান্তে এসে এই তো তাঁর দ্বিতীয় শৈশব।

কিন্তু ছাতের আসরের শেষে নামবার পথে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিশ্বম্ভর বাবু বললেন, "এই ঘরে পদার্পণ করুন, একখানা জিনিসের মতো জিনিস দেখাবো। জুতো বাইরে রেখে আসবেন দয়া করে; এটা আমার শোবার ঘর কি না!"

ঘরে ঢুকে বিজলী বাতির বোতাম টিপে দিলেন তিনি। অন্ধকারে এলো আলো। ঢুকে গেলেম ভেতরে। দেখালেন, দেয়ালের হুক থেকে

ঝুলছে ফ্রেমে-বাঁধানো একটি মেয়ের ছবি। মেয়েটি শর্বরী রায়। একটু আগে ছাতে চা দিয়েছিলেন যিনি, বিশ্বম্ভর-কন্যা হুবহু সেই শর্বরী। একেবারে হুবহু বলে মনে হয়, ভুল হবার যো নেই। ছবির ব্যাকরণ বুঝিনে, কিন্তু এ ছবি দেখে চোখ ফেরাতে মন চট করে রাজী হলো না। অথচ এ সেই শর্বরীরই ছবি, যাকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিতে আপত্তি হয়নি।

ত্রৈলোক্য তপাদার বললেন, "ফোটো থেকে এনলার্জ করালেন বুঝি? খাসা হয়েছে।"

জব্দ করা খুশীর হাসি হাসলেন বিশ্বম্ভর বাবু। বললেন, "ফোটো থেকে এনলার্জ কি মশাই? স্রেফ মন থেকে হাতে আঁকা। মডেলের মতো সামনে বসিয়েও নয়। অদ্ভুত! অদ্ভুত! এমন ছবিও যে হতে পারে এ আমি কোনো দিন ভাবতে পারিনি। কিশোর চৌধুরীর মুখের কথায় আমি আগে বিশ্বাস করিনি। ওর হাতে-আঁকা এই ছবি পেয়ে এখন আর অবিশ্বাস করিনে। যার ছবি মনে গাঁথা হয়ে না যায় তার ছবি এমন নিখুঁত করে মন থেকে আঁকা তো সম্ভব নয় ধনপতি বাবু। আচ্ছা, চলুন এবারে। মেয়েটা টের পেলে আবার বড় লজ্জা পাবে।" বলে চট করে বোতাম টিপে নিবিয়ে দিলেন ঘরের বাতি।

বিদায় নিয়ে পথে নামলেম আমি আর ত্রৈলোক্য তপাদার। কেমন যেন মাথা ঘুলিয়ে গেল বিশ্বম্ভর রায়ের মুখে কিশোর-শর্বরী প্রসঙ্গ শুনে। কিশোর চৌধুরীর নিজের মুখে না শোনা পর্যন্ত মনের দোলা শান্ত হবে না।

আমাকে কিন্তু ভূতে পাওয়ার মতো পেয়েছে ঐ শর্বরীর ছবি, অথবা ছবির শর্বরী। চোখের সামনে এখনো জ্বলজ্বল করছে। রূপ তো নেই শর্বরীর, কিন্তু তবু ওর হুবহু ছবি অমন অপরূপ হলো কি করে? ঐটেই কি কিশোর চৌধুরীর তুলির যাদু? না কি এ ছবি রঙীন হয়ে উঠেছে তার আপন হৃদয়-মাধুরীর রঙে, যা সকল বিশ্লেষণের বাইরে?. সত্যিই কি কিশোর চৌধুরী শর্বরীর প্রেমে পড়েছে? প্রেমে পড়ে এঁকেছে ছবি, না ছবি এঁকে পড়েছে প্রেমে?

"নারকেলের সন্দেশটা শর্বরী ভালোই তৈরী করে হে ধনপতি।"

বললেন ত্রৈলোক্য তপাদার। "আরো দু'চারটে খাবার ইচ্ছে ছিলো। বুঝলে কি না? ও কি? হঠাৎ অত কি ভাবতে শুরু করলে বলো তো?"

"ভাবছি বিশ্বম্ভরবাবু যা বললেন তার ক' আনা বাদ দেবো, ক' আনা রাখবো।"

"কষে তার চুলচেরা হিসেব দিতে পারবো না ধনপতি, কিন্তু বিশ্বম্ভরবাবুর মনে ভেজাল নেই, এইটে তোমার বুকে হাত রেখে বলতে পারি। আর আমারও বিশ্বাস, বিশ্বম্ভরবাবুর ভুল হয়নি। প্রজ্ঞাপারমিতা এসেছিলো শর্বরীর জীবনে পরশমণির মতো; সেই পরশমণির পরশ পেয়ে সোনা হয়ে উঠেছে শর্বরী। শর্বরীর ভেতরে শিল্পী কিশোর চৌধুরী দেখেছে সেই সোনার দীপ্তি। আর সেই পরশমণিকেও কিশোর দেখেছিলো—ভাগ্যবান বলবো কিশোরকে। আমিও ভাগ্যবান, ধনপতি। এই বাড়ীতে দেখেছি তাকে। শর্বরীর কাছে অনেক এসেছে প্রজ্ঞা। কি ভালোই সে বাসতো শর্বরীকে! শুনেছি তার কথা, মুগ্ধ হয়েছি তার হাসিতে। আমার সারা জীবনের চোখ ক'দিনের ভেতর সে বদলে দিয়ে গেল। সত্যিই সে রাঙিয়ে দিয়ে গেল যাবার আগে। তুলনা নেই, তুলনা হতে পারে না প্রজ্ঞাপারমিতার। অস্ত গেছে সে, এই ভেবে অসহায় দুঃখে মন কেঁদে মরে। সূর্যের মতো চোখ-ঝলসানো নয়, চাঁদের মতো নয় মিন্‌মিনে। তাই শুধু বলি আহা, অস্ত গেছে প্রজ্ঞাপারমিতা, আর কোন দিন তার উদয় দেখতে পাবো না।"

৺প্রজ্ঞার পুনরুদয়-সম্ভাবনাহীনতার বেদনায় একটা ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ত্রৈলোক্য তপাদারের স্টেশন-মাস্টারী বুক থেকে।

"তাহলে শোনো ধনপতি। আমার জীবনের ব্যথা-আনন্দের কথা তোমায় খুলেই বলি।" বললেন ত্রৈলোক্য তপাদার। "চাকরি-জীবনে প্রচুর সুনাম পেয়েছি, ইনামও পেয়েছি। আমার মতো মুখ্‌খু কোনো দিন স্টেশন-মাস্টার হবে, এ কথা কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কিন্তু হয়েছি। চিড়িয়াখানায় সেই গোধূলির আলো কি খেলা খেললে আমার জীবনে—আমার গোটা বিবাহিত জীবনটাই হয়ে গেল একটানা হাসপাতাল।

তাতে একটি মাত্র রোগিণী, চিরশয্যাশায়িনী, একটি দিনের তরেও যার রোগের কামাই নেই, আজ এটা, কাল সেটা লেগেই আছে। মামা বলতেন, যৌবন বড় বিষময় কাল। দেখলুম আমার জীবনে সেটা হুবহু সত্য। আমার জীবনে পুরো যৌবনটা বিষময় হয়েই রইলো—যৌবনের বাসন্তী রূপটুকু থেকে গেল অপরিচয়ের আড়ালেই। মন উঠতো হাহাকার করে, আমার সে আর্তনাদ জীবন-দেবতা শুনতেন কি না জানিনে। জীবন যত বিষিয়ে উঠতে লাগলো ততই কাজের ভেতর নিজেকে মিশিয়ে দিতে লাগলুম। টাইম-ওভারটাইম নেই। কাজ, কাজ, কাজ, শুধু কাজ করে যাচ্ছি। ছুটির কল্পনাও সইতে পারিনে। সহকর্মীরা কেউ বললে পাগল, কেউ বললে বোকা, আর কেউ বললে ঘুঘু লোক। কেউ বুঝলে না আমি দিন-রাত নিজের থেকে পালিয়ে ফিরছি কাজের ভিড়ে লুকিয়ে পড়ে। সে যে কি করুণ দুর্বিসহ জীবন, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না ধনপতি।"

বললেম, "থাক ত্রৈলোক্যদা'। যে দুঃখ অতীত হয়ে গেছে তাকে ফের বর্তমানে টেনে এনে অনর্থক—"

ত্রৈলোক্য তপাদার বললেন, "অনর্থক নয় ধনপতি! গোড়ার গল্প সবটুকু না শুনলে আগার গল্পটুকু তো ঠিক বুঝতে পারবে না ভাই। তাছাড়া অতীতের পানে তাকিয়ে এখন আর দুঃখ পাইনে, চোখ যে আমার বদলে দিয়ে গেছে প্রজ্ঞাপারমিতা। নিজের অগোচরে যে আলো সে দিয়ে গেছে, সেই আলোয় নতুন করে দেখতে পেয়েছি অতীতকে, নতুন করে দেখছি আমার বর্তমানকে। দুঃখ আমার একেবারে হাল্‌কা করে দিয়ে গেছে সে।"

"প্রথম অনুশোচনার ঝাপটা যখন এলো" পুরাতন কাহিনী আবার শুরু করলেন ত্রৈলোক্য তপাদার, "তখন দেখলুম নিজেকে আর বরাতকে ছাড়া কাউকে দূষতে পারিনে। মামার কথায় নির্ভর করে নয়, নিজের চোখে দেখেই বিয়ে করেছি। মামা বলেছিলেন বটে—যদিও হয়তো ভোম্বলদার ভয়ে, অথবা ভোম্বলদাকে শোনাবার জন্যই—'মত দেবার আগে আবার ভালো করে ভেবে ছাখ্ তিলু'। আমার মন তখন অন্য রঙে রঙীন।

একটি মা-হারা কুমারী আমার পায়ে প্রাণ-মন লুটিয়ে দিয়েছে, আমি তাকে গ্রহণ করে ধন্য করছি, এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমি বলেছিলেম, ভাববার কিছু নেই, এ বিয়ে আমি করবোই। ভেবেছিলুম আমার মহত্বে মুগ্ধ হয়ে দেবতার মতো স্বামী পেয়েছে বলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে উষা। কিন্তু দেখলুম সে আমার পরম বোকামি, চরম ভুল। চাকরি-জীবন যেদিন থেকে শুরু হলো, সেদিন থেকে উষার অন্তরের চেহারাটা একটু একটু করে প্রকাশ পেতে লাগলো। দেখলুম কৃতজ্ঞ আমার কাছে সে নয়, আমার কৃতজ্ঞতাই সে আশা করে, দাবী করে। সে ভাবে আমি যে তাকে পেয়ে ধন্য হয়েছি সে আমার আপন যোগ্যতায় নয়, তার পিতার স্নেহ-দুর্বলতায়। যোগ্যতর পাত্র পাবার প্রচুর নিশ্চিত সম্ভাবনা দু'পায়ে হেলায় ঠেলে ফেলে অপরেশ বাবু তাঁর জামাতা-পদে অভিষিক্ত করেছিলেন আমাকে, শুধু আমি তাঁর প্রিয় বন্ধুর ভাগ্নে বলে। নরম ভেবে পরম নিশ্চিন্ত মনে যাকে গ্রহণ করেছিলুম, দেখা গেল সে দস্তুরমতো গরম, সরমের আভাস মাত্র তাতে নেই। শুধু এই মাত্রই নয়। সময়ে অসময়ে, প্রকারে প্রকারান্তরে আমাকে এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিত তোমার বৌদি যে, ওর বাবারই দয়ায় আমার রেলের চাকরি, যে চাকরি না পেলে দোরে-দোরে ভিখ মেগে বেড়াতে হতো আমাকে। কথাটা সত্যি, আর সেই জন্যেই আরো বেশী করে বিঁধতো আমাকে। আমাকে অপমান করবার জন্যেই এই কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে সে আমাকে বার বার শোনাতো। আত্মগ্লানিতে এক-একবার মনে হতো শ্বশুরের তদ্‌বিরে পাওয়া চাকরিটাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু তা করি নি কেন জানো ধনপতি ?"

"কেন ত্রৈলোক্যদা ?"

"কারণ, জানতুম ও চাকরি গেলে চাকরি আর আমার জুটবে না। তাই মাথার লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলতে পারিনি। মন আমার দিনের পর দিন বেশী থেকে আরো বেশী বিষিয়ে উঠতে লাগলো তোমার বৌদির ওপর, আর ততই আমি তাকে এড়িয়ে থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলুম। আর

ততই ওর স্বভাব, ওর মেজাজ হয়ে উঠতে লাগলো আরো অসহ্য। এমনি করেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমার যে কি করে কেটেছে তা শুধু আমিই জানি ধনপতি! পৃথিবীতে নারী বলেও যে এমন একটা জাত আছে, যে জাত পুরুষের জীবনে এনে দেয় মাধুর্যের পরশ, সে কথা ভুলে থাকবার কি মর্মান্তিক প্রয়াস!"

আপন জীবনের গভীর ব্যথার কাহিনী বলায় বোধ করি আছে গভীরতর আনন্দ, আর সেই আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিলেন ত্রৈলোক্য তপাদার। এ জোয়ার এখন থেকেই রুখে না দিলে এ কাহিনী রাত তুপুরের আগে শেষ হবে না বলে মনে হলো।

বললেম, "ব্যথার কাহিনী থাক ত্রৈলোক্যদা। ও আমি সইতে পারি নে। প্রজ্ঞাপারমিতার আলোয় নতুন করে কি দেখছেন সেইটে বলুন।"

"এত দিন উষাকে শুধু ঘৃণাই করে এসেছিলুম, রাগই করে এসেছিলুম তার ওপর—আমার জীবনটাকে সে তিক্ত মরুভূমি করে দিয়েছে বলে।" বললেন ত্রৈলোক্য তপাদার। "আমাকে সে দেয়নি ভালোবাসা, দেয়নি শ্রদ্ধা, দেয়নি আনন্দ। দিয়েছে শুধু ঘৃণা, অমর্যাদা, অবহেলা, তুঃখ। তাই প্রতি মুহূর্তে কামনা করেছি তার মৃত্যু হোক্, মরে সে আমায় মুক্তি দিয়ে যাক্। মনে পড়ে এই সেদিনও এই কামনাই করেছি। তারপর এলো প্রজ্ঞাপারমিতা। একদিন চলে গেল শর্বরীর সঙ্গে, কোথায় জানো?"

"কোথায় ত্রৈলোক্যদা?"

"আমার কোয়ার্টারে হে, কোথায় আবার?" বললেন ত্রৈলোক্য তপাদার। "তোমার বৌদিকে দেখতে। একেবারে আমার ধারণার বাইরে। দূর থেকে দেখে ভয় পেয়ে ছুটে গেলুম আমি, কোনো একটা অজুহাত বানিয়ে বাধা দেবো বলে। নইলে কে জানে, কি বলে অপমান করে প্রজ্ঞাকে তাড়াবে তোমার বৌদি? কিন্তু আমি গিয়ে পৌঁছুবার আগেই তোমার বৌদির ঘরে ঢুকে গেছে প্রজ্ঞা আর শর্বরী। ভয়ে ভয়ে

ঢুকে দেখি, ওদের গল্প জমে হয়ে উঠেছে অন্তরঙ্গ। যে উষা গোটা দুনিয়ার ওপর ক্ষ্যাপা, চেনা-অচেনা কোনো মানুষকে কাছে সইতে পারে না, সে প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে হেসে কথা কইছে তার উষাদি হয়ে। এর আগে কখনো তাকে চোখে দেখেনি প্রজ্ঞা, কিন্তু উষাদি বলে ডাকার সুরটুকুতে অনেক দিনের অন্তরঙ্গতার সুরভি মাখা। প্রজ্ঞার মুখের উষাদি ডাক শুনে আমি জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলুম, উষা নামটা কি অদ্ভুত মধুর, আর উষা বুঝলে দিদি ডাকের মাধুর্য! বাইরে তাকিয়ে দেখি গোধূলির রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে বাইরের দুনিয়া। আবার সেই গোধূলি লগ্ন, আর এই লগ্নেও বদলে গেল আমার জীবনের ধারা।"

"আপনার জীবনের ক্যালেণ্ডারে দু'নম্বর লাল তারিখ?"

"ঠিক তাই। উষা আর প্রজ্ঞাকে দেখলুম পাশাপাশি—জীবন্ত মৃত্যু আর অমর যৌবন। সীমাহীন নিরাশার পাশে অনন্ত আশার আলো। আমার অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠলো চিরবঞ্চিতা উষার কথা ভেবে—জীবনে এই প্রথম। মনে হলো, আজ এই গোধূলি লগ্নে স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টারে যে বয়স এসেছে প্রজ্ঞাপারমিতার জীবনে, অতীতের সেই গোধূলি লগ্নে চিড়িয়াখানায় উষার বয়স তার চাইতে বেশী দূরে ছিলো না। কিন্তু কোথায় সেই উষা, আর কোথায় এই প্রজ্ঞাপারমিতা! প্রজ্ঞাপারমিতার দিকে তাকিয়ে মনে হলো কি অমূল্য সম্পদ থেকে আজীবন বঞ্চিত থেকে গেল উষা, ভাগ্যহীনা উষা, চিরবঞ্চিতা উষা! বঞ্চিত হতভাগ্য ভাবতুম নিজেকে, কিন্তু সে যে কত বড় বঞ্চিতা, কত বড় হতভাগিনী, এই দু'নম্বর গোধূলি লগ্নে আমায় নীরবে বুঝিয়ে দিয়ে গেল প্রজ্ঞাপারমিতা, আমার সারা অন্তরে একটা প্রচণ্ড ঝড় বইয়ে দিয়ে। শুনলে তুমি হয়তো হাসবে ধনপতি, জীবন ভরে যাকে ঘৃণা করে' যার মৃত্যু-কামনা করে এসেছি, জীবনের সায়াহ্নে এসে সেই চিরবঞ্চিতার জন্যে আমার প্রাণ কেঁদে উঠলো, যেন নতুন প্রিয়ার প্রেমে পড়লুম নতুন করে।"

না তাকিয়ে পারলেম না ত্রৈলোক্য তপাদারের মুখের দিকে। মনে হলো ও মুখে কে যেন রোমিও বা মজনুর মুখের ছাপ মেরে রেখে গেছে।

ত্রৈলোক্য তপাদার যেন আর ত্রৈলোক্যও নন, তপাদারও নন। তিনি প্রেমিক।

"বদ্‌লে গেছে, ভেতরে ভেতরে একেবারে বদ্‌লে গেছে ত্রৈলোক্য তপাদার।" বললেন ত্রৈলোক্য তপাদার। "কিন্তু বাইরে কাউকে জানতে দিইনি। তোমার বৌদিকেও নয় ধনপতি। বেচারা বরাবর আমার ঘৃণা, অনাদর, তাচ্ছিল্যই পেয়ে এসেছে, এখন হঠাৎ প্রেমের হাওয়া টের পেলে ওর দুর্বল হৃদযন্ত্রে সইবে না, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েই ও মারা যাবে। এই শেষ বয়সে তোমার বৌদি-বিয়োগ আমি সইতে পারবো না ধনপতি! হোক সে অপ্রিয়ংবদা, হোক সে ইনভ্যালিড, তবু সে আমার বেঁচে থাক।"

কিশোর চৌধুরী বললেন, "আমার স্টুডিও দেখতে চান ধনপতিবাবু? এখানে পাবেন শুধুই ব্যর্থতার ভূগোল, আর অসাফল্যের ইতিহাস।"

বললেম, "দুনিয়ার সেরা সেরা আর্ট এগজিবিশনে আপনার ছবি হৈ হৈ জাগিয়ে তুলেছে; এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা জুড়ে আপনার ছবির জয়গান; দুনিয়ার সেরা সেরা শিল্প-সমালোচক চীৎকার করে জাহির করছেন র‍্যাফেল, রেমব্রান্ট, মিকেলাঞ্জেলো, ভ্যান গগ্, মাতিসে, পিকাসো, দা ভিঞ্চি—এঁদের সকলের প্রতিভা এক সঙ্গে গুলে ফেললেও আপনার একক প্রতিভার কাছে ছেলেমানুষ—"

বুকফাটা হাহাকার বুকে লুকিয়ে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করে কিশোর চৌধুরী বললেন, "প্রতিভা, প্রতিভা, প্রতিভা! এই প্রতিভাই আমার জীবনের অভিশাপ ধনপতিবাবু। এই প্রতিভার নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ দুঃখ আমার কেউ বুঝতে চায় না।"

লম্বা চওড়া উঁচু ছাতওয়ালা হল-ঘরে কিশোর চৌধুরীর স্টুডিও। কিশোর চৌধুরী ছবি আঁকেন রঙীন তেল দিয়ে, রঙীন জল দিয়ে, কাঠকয়লা দিয়ে, রঙ বেরঙের খড়ি দিয়ে। তাছাড়া মূর্তি আর প্রতিমূর্তি গড়েন নরম মাটী দিয়ে আর শক্ত পাথর ক্ষোদাই করে'। সবটাতেই রাজা, অনায়াসে রাজা, কোনটিতেই জুড়ি নেই তার।

মোটা সিসওয়ালা একটা রাক্ষুসে পেন্সিল নিয়ে এক টুক্‌রো পুরু কাগজের বুকে এলোমেলো আঁকা-বাঁকা লাইন টেনে গেলেন কিশোর চৌধুরী, মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। কথা কইতে কইতে। তারপর কাগজটা দিলেন আমার হাতে এগিয়ে। দেখলেম হয়ে গেছে আমার ছবি। ছবি তো নয়, হাতে আঁকা ফোটোগ্রাফ! দেখতে দেখতে যাদুমন্ত্রে জেগে উঠেছে যেন!

আমি চমৎকৃত হয়ে বললেম, "অদ্ভুত! আশ্চর্য!"

"এই আশ্চর্যটাই আমার ট্রাজেডি।" বললেন কিশোর চৌধুরী। "অনেক সাধনা অনেক আয়াস করে অন্য শিল্পীরা যা পারে না, আমার হাতে তাই অনায়াসে হয়ে যায়। এ যে আমার কত বড় যন্ত্রণা, তা বুঝতেন ধনপতি বাবু, যদি আপনি কিশোর চৌধুরী হতেন।"

মনে পড়লো পশ্চিমী উপকথার রাজা মিডাসের কাহিনী। দেবতাকে খুশী করে তিনি বর চেয়ে নিলেন—যা তিনি ছোঁবেন তাই যেন সোনা হয়ে যায়। দেবতা বললেন 'তথাস্তু'। পরণের কাপড় জামা সোনা হয়ে গেল। চিঠি লিখতে গেলেন, চিঠির কাগজ, খাম, কলম, দোয়াত সব হয়ে গেল সোনা। আদর করতে গেলেন ছোট ছেলেকে, ছেলে হয়ে গেল সোনার পুতুল। খেতে বসে খাবারে হাত দিতেই থালা সুদ্ধ সমস্ত খাবার সোনা হয়ে গেল। রাণীকে ছুঁতে ভরসা পেলেন না, ছুঁলেই রাণী হয়ে যাবেন সোনার প্রতিমা। রাজা মিডাস তখন কেঁদে বললেন, 'হে দেবতা, তোমার এই সর্বনেশে বরে আমার আর দরকার নেই। এ তুমি ফিরিয়ে নাও'। দেবতা ফিরিয়ে নিলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন রাজা মিডাস।

কিন্তু কিশোর চৌধুরীর প্রতিভা ফিরিয়ে নিলেন না বিধাতা, তাই এই

ব্যাকুল আর্তনাদ অসহায় কিশোর চৌধুরীর। প্রতিভার নাগপাশে বন্দী অসহায় কিশোর চৌধুরী।

দেখতে লাগলাম স্টুডিওর ভেতর এদিকে ওদিকে ঘুরে ফিরে। অসংখ্য ছবি, অসংখ্য মাটির মূর্তি, অসংখ্য মূর্তি পাথরে ক্ষোদাই করা। কতক সম্পূর্ণ, কতক অসম্পূর্ণ। কিন্তু প্রত্যেকটিতে কিশোর চৌধুরীর প্রতিভার যাদু-পরশ।

"আমার চূড়ান্ত ব্যর্থতার সাক্ষী এরা।" বললেন কিশোর চৌধুরী ব্যথাভরা কণ্ঠে। "এরা আমার অনায়াসের ফল। এদের জন্যে বিনিদ্র রজনী জাগতে হয়নি। ঘামাতে হয়নি মাথা। প্রতিভার যাদু-নির্দেশে নির্ভুল চলেছে হাত, নিখুঁত হয়েছে রঙের মিশ্রণ আর বিন্যাস, রূপহীন মাটী রূপ পেয়েছে আমার হাতের নিখুঁত চালে, পাথরের স্তূপ থেকে বাড়তি পাথর নিপুণ হাতে অনায়াসে চেঁছে ফেলে পাথরের মূর্তি গড়ে তুলেছি। কিন্তু এতে নেই আমার তিলে তিলে গড়ে' তোলা সৃষ্টির আনন্দ, এ যেন আমার প্রতিভার কারখানায় মেশিনে তৈরী করা।"

আমার যে জন্যে প্রধানতঃ আসা সেইটে বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে দেখে বললাম, "প্রজ্ঞাপারমিতাকে আপনি প্রথম দেখেছিলেন কবে?"

কিশোর চৌধুরী বললেন, "তাঁকে শেষ দেখেছিলুম যেদিন ওরিয়েন্ট্যাল আর্ট একাডেমিতে আমার ছবির এগ্‌জিবিশন। ওঁর সঙ্গে ছিলেন ওঁর সহপাঠিনী প্রিয়বান্ধবী শর্বরী রায়। প্রজ্ঞাপারমিতা যখন এলেন, আমি তখন লেডি কর্মকারকে আমার ছবি দেখাতে ব্যস্ত। আমি এড়াতে চাই, উনি ছাড়েন না; শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে ছবি না দেখলে তাঁর মন ভরে না। লেডি কর্মকার কে জানেন তো?"

নিশ্চয় জানি। চারু শিল্পের নামজাদা পৃষ্ঠপোষিকা লেডি কর্মকারকে না চিনে থাকা সহজ নয়। ছবির প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে বা চড়া দামে ছবি কিনতে তাঁর জুড়ি মেলা শক্ত। শিল্প জগতের সবাই এ কথা জানেন। তাই ছবির প্রত্যেক প্রদর্শনীতে সাদর নিমন্ত্রণ তাঁর থাকেই, আর সারা বছর অনেকগুলো মোটা চেক তাঁকে কাটতে হয় ছবির মূল্য বাবদ।

কিশোর চৌধুরী বললেন, "নিজেকে মনোযোগের কেন্দ্র করে তুলতে পাকা শিল্পী লেডি কর্মকার। যে ছবির প্রদর্শনীতে যান, যতক্ষণ থাকেন সবাইকে জানিয়ে থাকেন যে তিনি আছেন। আসরে, বাসরে, জনসভায়, এগ্‌জিবিশনে যেখানে তাঁর উপস্থিতি সেখানে তিনি থাকবেন অদ্বিতীয়া, এই তাঁর ঐকান্তিক লক্ষ্য। কিন্তু প্রজ্ঞাপারমিতার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রদর্শনীর মনোযোগ-কেন্দ্র লেডি কর্মকার থেকে গিয়ে দাঁড়ালো প্রজ্ঞাপারমিতার পাশে, আর ঘুরে বেড়াতে লাগলো প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে। আবহাওয়াটাই যেন হঠাৎ বদলে গেছে স্পষ্ট অনুভব করা গেল, যেমন অনুভব করা যায় এয়ার কণ্ডিশন্ করা সিনেমা হল থেকে বাইরে এলে অথবা বাইরে থেকে সেই হলে ঢুক্‌লে। একটা গুঞ্জন উঠলো প্রজ্ঞাপারমিতা এসেছে; প্রজ্ঞাপারমিতা রায়চৌধুরী। অনেকগুলো মৃদুগুঞ্জন একসঙ্গে জড় হয়ে প্রায় কোলাহলে দাঁড়িয়ে গেল। চম্‌কে উঠলুম আমি। চম্‌কে উঠলেন লেডি কর্মকার। দেখলেম এক মুহূর্তে তিনি ছিট্‌কে বেরিয়ে গেছেন সকলের নজরের বাইরে; সবগুলো চোখের দৃষ্টি মন সুদ্ধ গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রজ্ঞাপারমিতাকে ঘিরে। প্রজ্ঞাপারমিতা দেখছে আমার ছবি। আর প্রজ্ঞাপারমিতাকে দেখছে সবাই। পিছে পড়ে গেল আমার ছবি, পিছে পড়ে গেলেন লেডি কর্মকার। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতাটা পড়েছেন কি ধনপতিবাবু? 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী'?"

বললেম, "পড়েছি। কেন বলুন তো?"

কিশোর চৌধুরী বললেন, "আমার মনে হলো কবিগুরুর সেই মানস-কন্যাকে ছবিতে রূপ দিতে হলে নিখুঁত মডেল এই প্রজ্ঞাপারমিতা। মানুষ কিশোর চৌধুরী প্রজ্ঞাপারমিতাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল, এক দেহে এত রূপ সে আগে কখনো দেখেনি, কল্পনাও করেনি। হয়তো লেডি কর্মকার তাকে ডেকেছিলেন কয়েকবার, কিন্তু তার মুগ্ধ কানের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছোয়নি সে ডাক। শেষটায় শিল্পী কিশোর চৌধুরীর যখন হুঁশ হলো তখন সে দেখলে লেডি কর্মকার নেই। যে ছবি প্রদর্শনীতে তিনি আর প্রথমা নন সেখানে আর অবস্থান করেন না লেডি কর্মকার। অন্য সকলের অমনো-

যোগ যদি বা সইতে পারতেন, আমার ছবির প্রদর্শনীতে তাঁর প্রতি আমার এই অমনোযোগের অসম্মান তিনি সইতে পারেন নি। মনে বড় ব্যথা পেলুম ধনপতিবাবু। অবহেলার দুঃখ আমি দিতে চাইনি লেডি কর্মকারকে, কিন্তু আমার অজানিতেই তিনি দুঃখ পেয়ে চলে গেলেন।"

আমি বললেম, "তারপর প্রজ্ঞাপারমিতা?"

"প্রজ্ঞাপারমিতা ঘুরে ঘুরে আমার প্রত্যেকটি ছবি মন দিয়ে দেখতে লাগলো।" বললেন কিশোর চৌধুরী। "তাকে যে কেউ খেয়াল করছে সে খেয়ালটুকুও যেন তার নেই। আকুল হইয়া বনে বনে ফিরি কস্তুরী মৃগ সম, আপন গন্ধে মম। রবিঠাকুরের সেই কবিতাটা জানেন তো? প্রজ্ঞাপারমিতা কস্তুরী মৃগ'র ঠিক উলটো, আপন গন্ধের কোনো খবরই রাখে না সে। ছবি দেখা শেষ করে চলে গেল প্রজ্ঞাপারমিতা আর তার প্রিয় বান্ধবী শর্বরী, যার নাম জেনেছিলুম প্রজ্ঞাপারমিতার মুখের ডাক শুনে। মনে হলো আমার ছবি আঁকা এতদিনে সার্থকতার খানিক ছোঁয়াচ পেয়েছে, এগজিবিশনের সবগুলো ছবি প্রজ্ঞাপারমিতার আর শর্বরীর দৃষ্টি-ধন্য হয়েছে। এই ছবিদের একটিকেও বিক্রি করা হবে না, জানিয়ে দিলুম প্রদর্শনীর সেক্রেটারীকে। সেক্রেটারী বললেন, সে কি? কাঁঠালিয়ার রাজকুমার, ইক্‌বালপুরের নবাব বাহাদুর, গজাননরাম জয়পুরিয়া, স্যার ফ্রেডারিক গ্রীণগ্রাস, নীলগোলার মহারাজ, এবং আরো কয়েকজন যে দশখানা ছবি 'বুক' করে গেছেন চড়া দামে। আমি বললুম, তাদের চিঠি লিখে জানিয়ে দিন এবারে একটি ছবিও আমি বিক্রি করবো না, ওঁরা যেন সেজন্য আমায় ক্ষমা করেন। সেক্রেটারী কিন্তু কিন্তু করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর সব 'কিন্তু'কেই বাতিল করে দিলুম আমি। শর্বরী রায় মুগ্ধ চোখে যে সব ছবি দেখে গেছে সে ছবি বিক্রি করা অসম্ভব।"

"শর্বরী রায়? না প্রজ্ঞাপারমিতা?"

"শর্বরী রায়।" বললেন কিশোর চৌধুরী। "মানুষ কিশোর চৌধুরী মুগ্ধ হয়েছিলো অসাধারণ প্রজ্ঞাপারমিতাকে দেখে। শিল্পী কিশোর চৌধুরীর কাছে সাধারণ মেয়ে শর্বরী হয়ে উঠলো আরো অসাধারণ। কালো মেয়ে

শর্বরী, মুখে জলবসন্তের কলঙ্ক লেখা আছে। কুশ্রী নয় শর্বরী; কিন্তু আকর্ষণ করবার মতো রূপ তাকে দেননি বিধাতা, বোধ করি সেই জন্যেই একটা বিষণ্ণ করুণ সুর তার চোখেমুখে আঁকা। মুগ্ধ হয়ে ভাবলুম এই তো আমার সত্যিকারের মডেল। প্রজ্ঞাপারমিতাকে নিখুঁত রূপ দিয়েছেন ভগবান, শিল্পীর জন্যে কিছুই বাকী রাখেন নি। কিন্তু শর্বরীকে তিনি দেন নি রূপ, শিল্পীর জন্যে রেখেছেন অনেক বাকী, শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন করে সৃষ্টি করে নেবে শর্বরীকে, নতুন রূপ দিয়ে। সেই তো শিল্পীর সার্থকতা। সুন্দরী প্রজ্ঞাপারমিতা আমার চোখে প্রথম চমক লাগিয়েছিল, কিন্তু সেই চমকের ঘোর কেটে যেতেই আমার শিল্পী হৃদয়কে মুগ্ধ, আচ্ছন্ন করে ফেললে ঐ শর্বরী রায়। নানা ছলে তাকিয়ে দেখে ওর মুখের ছবি আমি মনের বুকে এঁকে নিলুম। কেউ তা লক্ষ্য করলে না ধনপতিবাবু, কেন না সবারি লক্ষ্য ছিলো অপরূপা প্রজ্ঞাপারমিতা, কেউ ভাবতেই পারেনি শিল্পী কিশোর চৌধুরীর একান্ত লক্ষ্য অপরূপা শর্বরী রায়—কালো মেয়ে, মুখে যার বিগত জলবসন্তের স্মৃতিচিহ্ন।"

শুধালেম, "তারপর?"

কিশোর চৌধুরী বললেন, "তারপর ছবি দেখা শেষ করে চলে গেল প্রজ্ঞাপারমিতা আর শর্বরী, অথবা শর্বরী আর প্রজ্ঞাপারমিতা। সন্ধ্যার দেরি ছিলো না, এগজিবিশনের সবগুলো আলো জ্বলে উঠলো। কিন্তু আমার মনে হলো এগজিবিশনে আর আলো নেই।"

"শর্বরীর ছবি আপনি এঁকেছিলেন কিশোরবাবু?"

"এঁকেছিলুম ধনপতিবাবু। মানে, না এঁকে পারিনি। মনকে এমনি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো শর্বরী। আপন মনের মাধুরী আপনা থেকেই মিশে গেল। প্রজ্ঞাপারমিতার বান্ধবী শর্বরী রায়ের ঠিকানা সংগ্রহ কঠিন হলো না। ছবিখানা আমি উপহার পাঠিয়ে দিলাম তারি উদ্দেশ্যে তার বাবা বিশ্বম্ভর রায়ের কাছে। ভদ্রলোকের নামটা ভালো নয়, কিন্তু তিনি শর্বরীর বাবা। ছবি পেয়ে তিনি এসেছিলেন আমার এই স্টুডিওতে; তাঁর কাছে ভিক্ষা চেয়েছি শর্বরীকে, আমার জীবনসঙ্গিনীরূপে।"

আমি বললেম, "প্রজ্ঞাপারমিতা চলে গেছে জীবন নদীর ওপারে। আর কোনোদিন ফিরবে না। কিন্তু ভাবি সে যদি না চলে যেতো এমন অকালে, যদি আজীবন সে থাকতো আপনার পাশে প্রেরণার উৎস হয়ে।"

"প্রজ্ঞাপারমিতা পাশে থাকবার জন্মে আসেনি, ধনপতিবাবু।" হেসে বললেন কিশোর চৌধুরী। "স্বপ্ন হয়েই সে এসেছিলো, চলে গিয়েও স্বপ্ন হয়েই জেগে রইলো। সেই স্বপ্ন স্মৃতি হয়ে জেগে থাকবে শর্বরীর সঙ্গে। প্রজ্ঞাপারমিতাকে সৃষ্টি করে তুলতে বিধাতা আমার জন্মে কিছু বাকী রাখেননি। শর্বরীকে আমি প্রতিদিন নব নব রূপে সৃষ্টি করে তুলবো, বিধাতা তাই শর্বরীর রূপের ভাণ্ডার অপূর্ণ করেই পাঠিয়েছেন। শিল্পীর সুদূর স্বপ্ন প্রজ্ঞাপারমিতা, শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী শর্বরী রায়।"

তাঁর কণ্ঠের স্বর আর চোখের আলো থেকে মনে হলো এ তাঁর সাময়িক খেয়ালের কথা নয়। এ তাঁর জীবন্ত বিশ্বাসের কথা, এই তাঁর জীবনদর্শন। কিন্তু কেমন করে জানবো আমার এই মনে হওয়ার কতটুকু ঠিক আর কতটুকু ভুল?

যদি সত্যিই শর্বরী জীবনসঙ্গিনী হয় কিশোর চৌধুরীর, বহু সুন্দরী ধনী-দুহিতার প্রেম যে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে, তবে হয় তো চিরদিনই কিশোর ভালোবাসবে শর্বরীকে। কিন্তু সে কি শর্বরীর জন্যে? না, অনির্বচনীয়া ৺প্রজ্ঞাপারমিতার অপরূপ স্মৃতির ব্যথাভরা মাধুর্য তাঁর প্রিয়তমা বান্ধবী শর্বরীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে?

তুমি চলে গেছ ৺প্রজ্ঞাপারমিতা, কিন্তু তোমার স্বপ্ন রেখে গেছ কিশোরের অন্তরের গহনে। আপন জীবনে শর্বরীকে চাইছে কিশোর, হয়তো তারই মাঝে হারিয়ে যাওয়া তোমাকে পাবে বলে।

কিশোর চৌধুরীর স্টুডিওতে ঘুরে দেখতে দেখতে এই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমার মনে পড়তে লাগলো।

*

"আমার গোটা বাড়ীটাই আর্ট গ্যালারি।" বললেন লেডি কর্মকার। "অনেকে দেখতে চান, কিন্তু অনেককেই দেখতে দিই না। যে সব অমূল্য ছবি এনে বাড়ী সাজিয়েছি, যাকে তাকে দেখতে দিয়ে তাদের অমর্যাদা করতে চাই নে। আপনার কথা আলাদা; কিশোর নিজে আমায় ফোন্ করে বলেছে। আর কিশোর যাকে তাকে স্থপারিশ করে না। আস্থন আপনাকে ঘুরে ঘুরে দেখাই।"

লেডি কর্মকারের চুলে পাক ধরেছে কিন্তু মনের মাঠে এখনো কাঁচা সবুজ ঘাস। বারান্দা থেকে ঘরে, ঘর থেকে অন্য বারান্দায়, সেখান থেকে অন্য ঘরে, এমনি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন তাঁর কেনা ছবি, প্রচুর ব্যাখ্যা করে করে।

ঘুরে ঘুরে ঘরে আর বারান্দায় দেখলেম অনেক ছবি অনেক রঙের, অনেক ঢঙের। কিশোর চৌধুরীর ছবি তাঁর নিজের স্টুডিয়োতে আর তাঁর একক এগজিবিশনে অনেক দেখেছি। কর্মকার প্যালেসেও দেখলেম। এখানে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন কিশোর চৌধুরীর ছবির।

বললেম, "কিশোর চৌধুরীকে আপনি স্নেহ করেন জানি, আর তাঁর প্রতিভাকে আমি পরম শ্রদ্ধা করি। রঙ তুলি ওঁর হাতে যেন কথা কয়। হাত যেন যাত্থ জানে, এমনি দ্রুত অনায়াসে অবলীলাক্রমে ছবি আঁকতে দেখেছি তাঁকে। একদিনের মোটে আলাপ, কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি, লেডি কর্মকার।"

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ দেখি লেডি কর্মকারের ত্থটি চোখ ছলছল হয়ে উঠেছে। কণ্ঠস্বর তাঁর কারুণ্যে ভরে উঠলো।

"কিন্তু যে মুগ্ধ হলে আর বেঁচে থাকলে আজ কিশোর চৌধুরীর জীবনের ইতিহাস হতো অন্যরকম, সে আজ বেঁচে নেই।" বললেন লেডি কর্মকার। "আহা সে আজ বেঁচে নেই!"

সে বেঁচে নেই বলেই কিশোরের জীবনের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারল না—এ দুঃখের কাঁটা বিঁধে ব্যথিত হয়েছে লেডি কর্মকারের হৃদয়।

শুধালেম, "কে সে?"

লেডি কর্মকার বললেন, "আপনি হয়তো তাকে চিনবেন না ধনপতিবাবু। মেয়েটির নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। জানি নে কেন সে এমন অকালে ঝরে গেল। দুঃখ সে শুধু কিশোরকেই দিয়ে যায় নি, আমাকেও দিয়ে গেছে। আমার অতীতের আমি-কে আমি পেয়েছিলেম প্রজ্ঞাপারমিতার মধ্যে। আশ্চর্য মেয়ে! তুলনা হয় না তার। কিশোর চৌধুরীকে যে মুগ্ধ করেছে, শুধু মুগ্ধ নয়, আচ্ছন্ন করে রেখে গেছে, সে মেয়ে যে কত অসামান্য তা তো আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না, ধনপতিবাবু।"

"তবু কিছু বলুন লেডি কর্মকার।" জানালেম আবেদন। "কৌতূহলের জোয়ার জেগেছে মনের দুই কূল ছাপিয়ে।"

"সে এক ছবিব এগজিবিশন, কিশোর চৌধুরীর।" বলতে লাগলেন লেডি কর্মকার, স্মৃতি-ছল-ছল চোখে। "কিশোবের অনেক অসাধারণ নতুন ছবির সাধারণ প্রদর্শনী। কিশোর নিজে আমায় সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ সব যেন কেমন থম্‌কে গেল। চেয়ে দেখি এসেছে প্রজ্ঞাপারমিতা। চিনলুম তাকে—ওদের কলেজের একটা অনুষ্ঠানে আগেই দেখেছিলুম, কিন্তু এত কাছাকাছি এত ভালো করে নয়। সবার দৃষ্টি ছুটে গেল প্রজ্ঞাপারমিতার দিকে। গেল কিশোরেরও, আমারও। আমার মনে পড়ে গেল ফেলে আসা সেই দিনটির কথা, যেদিন এক এগজিবিশনে এমনি করেই আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল স্যার কর্মকারের—অবশ্য তখন তিনি স্যার ছিলেন না। আমি প্রজ্ঞার ভেতরে দেখলেম সেই নিজেকে, আর কিশোরের মধ্যে দেখলেম সেই স্যার কর্মকারকে। ওদের ভবিষ্যতের কল্পনায় আমার মন খুশী হয়ে উঠলো; ভাবলুম স্যার কর্মকারের মতোই ভাগ্যবান হবে কিশোর। আমি থাকলে পাছে আমায় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় কিশোরের, তাই অলক্ষ্যে বেরিয়ে চলে এলাম।"

"তারপর?"

"তারপর এগজিবিশনের পরে আমার এখানে ছুটে এলো কিশোর।" বললেন লেডি কর্মকার। "কখন চলে এসেছি টের পায় নি, তাই চাইতে এসেছে ক্ষমা, এসেছে হৃদয় শান্ত করতে। প্রজ্ঞাপারমিতায় ছেয়ে গেছে তার মন। শিল্পী কিশোর চৌধুরী এতদিন যার আকুল প্রতীক্ষায় ছিলো, সে-ই এসেছে প্রজ্ঞাপারমিতা হয়ে। তুলি দিয়ে অনেক রূপ সৃষ্টি করেছে কিশোর ; তার সেই সব সৃষ্টিকে অভিনন্দন দিয়েছে দেশ-বিদেশ। কিন্তু প্রজ্ঞাপারমিতাকে দেখার পর কিশোরের মনে হলো তার এতদিনের সমস্ত রূপ-সৃষ্টি যেন ব্যর্থ, ম্লান, বেসুর হয়ে গেছে। আমি বললুম, কিশোর একটা অনুরোধ রাখো আমার। প্রজ্ঞাপারমিতার একটি তৈল-চিত্র আঁকো তুমি। পৃথিবীর সে এক অতুলনীয় সম্পদ হয়ে থাকবে।' আমার সে অনুরোধ তারি প্রাণের একান্ত কামনার প্রতিধ্বনি। শিশুর মতো উৎসাহে আকুল হয়ে উঠলো কিশোর। বললে, 'কিন্তু সে কি রাজী হবে বসতে ?' বললুম, 'সে ভার আমার।' শুনে কিশোরের মুখে আনন্দের যে কি আলো খেলে গেল, তা বলে আপনাকে বোঝাতে পারবো না। স্মৃতিধর শিল্পী কিশোর চৌধুরী, স্মৃতি থেকে নিখুঁত চেহারা আঁকা তার পক্ষে শক্ত নয় ; কিন্তু প্রজ্ঞাপারমিতা তো শুধু চেহারা নয়, চেহারার চেয়ে অনেক বড়ো। ঈশ্বর তাঁকে আপন মাধুর্যের ভাণ্ডার উজাড় করে এত দিয়েছেন যে শিল্পী কিশোরের ভয়, মন থেকে আঁকতে গিয়ে ছবিতে পাছে আসলকে খাটো করে ফেলে।"

তারপর, বললেন লেডি কর্মকার, তিনি নিজে কলেজে গিয়ে একদিন প্রজ্ঞাপারমিতাকে নিয়ে এলেন কর্মকার প্যালেসে, ছবির গ্যালারি দেখাবার জন্যে। এলো সে এমনি সহজভাবে, যেন কোন সহপাঠিনী বান্ধবীর বাড়ীতে যাচ্ছে। কর্মকার প্যালেসের সম্রাজ্ঞীর ব্যক্তিগত আমন্ত্রণের সামনে ধন্য বোধ করে শিহরিত হচ্ছে না, আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাধিত করছে এমন দম্ভও নেই। সঙ্গে নিয়ে এলো সহপাঠিনী শর্বরীকে। অদ্ভুত ভালোবাসতো শর্বরীকে প্রজ্ঞাপারমিতা—বোধ করি ওর অন্তরের রূপটি ছিলো বড় মধুর। শর্বরীও বোধ করি প্রজ্ঞার সহজ সান্নিধ্যে ভুলে যেতো বাইরের রূপ তার

নেই। কর্মকার প্যালেসের সবগুলো ছবি মুগ্ধ চোখে দেখলে প্রজ্ঞাপারমিতা, সঙ্গে শর্বরী। ছবিগুলো এত সার্থক আর কোনোদিন হয় নি, মনে হলো লেডি কর্মকারের। তারপর কথাটা পাড়লেন ধীরে ধীরে—প্রজ্ঞাপারমিতার ছবির কথা; আঁকবে কিশোর চৌধুরী। একটু ভেবে রাজী হলো প্রজ্ঞাপারমিতা, কিন্তু ছবি হবে তার একার নয়, একসঙ্গে থাকবে দুই সখী—প্রজ্ঞাপারমিতা আর শর্বরী।

"কিন্তু সে ছবি আর আঁকা হলো না ধনপতিবাবু। তার আগেই প্রজ্ঞাপারমিতা চিরদিনের জন্যে চলে গেল।" আর্তনাদের সুর শোনা গেল লেডি কর্মকারের কণ্ঠে।

৺প্রজ্ঞাপারমিতার ভেতরে লেডি কর্মকার পেয়েছিলেন তাঁর অনেকদিন আগের পিছে ফেলে আসা নিজেকে; জীবনে নতুন করে জেগেছিলো পুরানো বসন্তের স্মৃতি। কোথায় চলে গেল, হায়, কোথায় চলে গেল সেই প্রজ্ঞাপারমিতা?

মিস্ বিপাশা বনার্জীর সঙ্গে এই সেদিন মাত্র মুখ চেনা, উদয়ন কৃষ্টিকেন্দ্রের উদ্বোধন সন্ধ্যায়। মন চেনা হয়নি। আমার গা ঘেঁষেই গাড়ী থামিয়ে বল্লেন, "উঠে আসুন। চিনতে পারছেন নিশ্চয়?"

স্থান—গড়ের মাঠের ধার, কাল—বিকেল বেলা।

ঝক্‌ঝকে নতুন ছোট্ট দুজন-বৈঠকী 'টু সীটার' গাড়ী, চালন-চক্রটি কুমারী বিপাশার ডান হাতে; বাঁ দিকের আসনটি শূন্য।

উঠে বললাম, "আপনাকে চিনেছি। গাড়ীখানা অচেনা।" গাড়ীকে মৃদু গতি দিয়ে বিপাশা বল্‌লেন, "গাড়ীখানা ভাস্করের, পেট্রোলও তারই।" দুদিনেই ভাস্করের বাবু-ত্ব খসিয়েছেন মিস্ বনার্জী। বড় লোকের কাপ্তান ছেলে ভাস্কর ভট্টচার্যির সঙ্গে তাঁর পরিচয় এই সেদিন মাত্র।

"ভাস্করের নতুন কেনা গাড়ী। ট্রায়াল দিচ্ছি আমি।" যোগ দিলেন বিপাশা।

"কিন্তু ভাস্করবাবু—"

"সঙ্গে নেই কেন? এই তো?" বল্‌লেন বিপাশা, একগাদা অন্ধকারে হঠাৎ এক ফোঁটা জোনাকি চমকের মতো হেসে। "সঙ্গে রাখিনি বলে। বয় ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে ঘুরেছি অনেক। আজ একা ঘোরার রোমান্স জেগেছে মনে।"

"তাহলে আমায় তুল্‌লেন কেন?"

"আপনি তো আমার বালক বন্ধু নন, আমার কাছে আপনি শুধু বন্ধু।"

গাড়ী ধীরে, অতি ধীরে এগোচ্ছে রেড রোডের ধূসর বুকের ওপর দিয়ে। বললাম, "কোথায় চলেছেন?

মিস্ বনার্জী বললেন, "বলুন কোন্ দিকে যাওয়া যায়, হোটেল, রেস্তোরাঁ, কাফে, ক্লাব, পার্টি বা সিনেমা বাদ দিয়ে। প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে, একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাই।"

মিস্ বনার্জীর দু'গালে লাল রঙ ছোপানো, অধরে লাল রঙের পুরু প্রলেপ; দুহাতের দশ নখে কৃত্রিম লালিমা, দু'চোখে সুর্মার সযত্ন কালিমা। এই তিন লাল এক কালো যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে আজ এই বিকেলবেলার কুমারী বিপাশার কাছে।

আমি বললাম, "চলুন তবে স্ট্র্যাণ্ড রোডে, আউট্‌রাম ঘাটের ধারে। ওদিকের ফাঁকা হাওয়ায় বেড়ালে তৃপ্তি পাবেন।"

"চলুন," বলে ঐ দিকেই গাড়ী চালনা করলেন মিস্ বিপাশা বনার্জী ধীরগতিতে। বলতে লাগলেন, "আপনাকে এমনভাবে পেয়ে যাবো আশা করিনি, একেবারে আন্‌এক্‌স্‌পেক্‌টেড আপনি। আশা করি আপনার কোনো তাড়া নেই?"

"আপনার আশা নির্ভুল।"

গাড়ী এসে দাঁড়ালো আউট্‌রাম ঘাটের পূবদিকের স্ট্রাণ্ড রোডের

ওপর। মিস্ বনার্জী বললেন, "আপনার বোধকরি বিকেলের চা খাওয়া হয়নি? চলুন আউট্রাম ঘাটের ভেতর রেস্তোরাঁয় চা খাওয়াই আপনাকে।"

বললাম, "চা আমি বাড়ীর বাইরে কখনো খাইনে মিস্ বনার্জী। আমার জন্যে ভাববেন না। আমি গড়ের মাঠে চিনে বাদাম খেয়েছি। আপনি বরং—"

"থাক তাহলে।" বললেন মিস্ বনার্জী। "পথের ধারে পায়চারি করতে করতে গল্প করা যাক। মনটাকে একটু হাল্‌কা করতে চাই।"

দুজনে গাড়ী থেকে নেমে পথে দাঁড়ালাম। গাড়ীর তালা বন্ধ করে চাবিটা আপন হাতের ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতরে ফেলে দিলেন বিপাশা বনার্জী। তারপর শুরু হলো আমাদের পাশাপাশি পায়চারি। প্রাণের কথা শোনাবেন বলেই ডেকে এনেছেন মিস্ বিপাশা বনার্জী, সেটা তাঁর প্রথম ডাকের সুর শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম। ঘরের দেয়ালের বাইরে যতোই থাক চুনকাম বা 'ডিসটেম্পার'-এর লীলা-বৈচিত্র্য, অন্তরে তার ইঁটের কাঠামো। তেমনি অন্তরের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে অনুভব কর্‌লাম মিস্ বিপাশা বনার্জীর বাইরের সকল প্রলেপ, বিচিত্র ন্যাকামি আর চূড়ান্ত কাপ্তান নাচানো অভিনয়ের আড়ালে রয়েছে সেই চিরন্তনী নারী; সেই নারী আজ একটু রোজকার ভিড়ের বাইরের নিরালায় হাঁফ ছাড়তে চাইছে। আর যার কাছে হাঁফ ছাড়বে, দৈবযোগে সে-ই হলেম আমি। বললাম, "মন হালকা করবার পক্ষে এ জায়গাটি চমৎকার বিপাশাদেবী—মানে, মিস্ বনার্জী।"

"না না, আজ আর মিস্ বনার্জী নয়। বিপাশাই বলুন।" বল্‌লেন মিস্ বনার্জী।

"কিন্তু আপনি কি ভুল করেন নি বিপাশাদেবী?" শুধালেম আমি। "এ সময়ে বরং যদি কোনো বান্ধবীকে—"

"বান্ধবীর কাছে শুধু ভান করা চলে, প্রাণ খোলা চলে না।" বল্‌লেন মিস্ বনার্জী। "মেয়েদের সবার সেরা বন্ধু পুরুষ, মেয়ে নয়।

"একি বল্‌ছেন আপনি ?"

"মেয়ে হলে বুঝ্‌তেন এ কত বড় সত্য।" বললেন মিস্ বনার্জী। "অন্য সমাজের কথা জানিনে, কিন্তু আমাদের সোসাইটির মেয়েরা এ-ওর কাছে মন খুলি নে, ভানের আড়ালে ঢেকে রাখি। এ আমাদের ওপন্ সিক্রেট ; এ আমরা সবাই করি, তাই এ নিয়ে কেউ দুঃখ করিনে, নালিশ ও জানাইনে।"

আমি বললেম, "এই তো সভ্যতার লক্ষণ। অসভ্য মানুষের দেহের আর মনের আবরণ ছিলো অল্প, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নানা কায়দায় দেহ আর মন ঢাকতে শিখলে।"

মিস্ বনার্জী বললেন, "একটা প্রশ্ন করি। আপনি কি লেখেন ?"

বললাম, "দিনপঞ্জী লিখি রোজ রাতে। সারাদিন সংগ্রহ করি তার খোরাক।"

"এ দিনপঞ্জী প্রকাশিত হবে নিশ্চয় ?"

"আমার এ তো প্রকাশের জন্যে লেখা নয় বিপাশাদেবী, লেখার জন্যেই লেখা।" বললেম আমি। "হয়তো কেউ অথবা কেউ কেউ এ থেকে লেখার খোরাক সংগ্রহ করবেন। হয়ত আমার দিনপঞ্জীর লেখা থেকেই তৈরী হবে বাস্তব উপন্যাস বা উপন্যাসমালা। কিন্তু তা নিয়ে এখনি মাথা আমার না-ই-বা ঘামলো বিপাশাদেবী।"

মিস্ বনার্জী বললেন, "উদয়ন কৃষ্টি কেন্দ্রের বৈঠকে আমার নজর সেদিন তাহলে আপনার সম্বন্ধে একেবারে ভুল করেনি। আমার মন বলছিলো আপনি নীরবে চোখে দেখে আর কানে শুনে মনের নোট বইতে যা টুকে রাখছেন, তাই বাছাই করে সাদা কালোয় পাকা করে লিখে রাখবেন। তখনি মনে মনে ভেবে রেখেছিলুম আপনাকেই একান্তে শোনাবো আমার কথা। আমার কথা শুধু আমার একারই নয়, আমাদের অনেকের কথা। আজ দৈবাৎ সুযোগ মিলে গেল।"

আমি বললাম, "যা কিছু বলবেন বিপাশাদেবী, তাই আমার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ হবার ভয় আছে, এইটে ভুলবেন না।"

"সেই ভরসাতেই আপনাকে শোনাতে চাই আমার কথা।" বললেন মিস্ বনার্জী।

আমি বললাম, "কিন্তু আপনার বালক বন্ধুদের কেউ আমার সঙ্গে এখানে আপনাকে বেড়াতে দেখলে কি ভাববেন বলুন তো? ধরুন এই গাড়ীখানার মালিক ভাস্কর ভট্চার্যিই যদি—"

"জেলাস্ হবে না।" বল্লেন মিস্ বিপাশা বনার্জী। "আপনাকে কেউ কাপ্তান বলে ভুল করবে না। বড় জোর ভাববে সোসাইটি-গার্ল মিস্ বনার্জীর এ এক আন্‌সোশ্যাল খামখেয়াল, নির্দোষ রিক্রিয়েশান। কিন্তু আমার কোন বন্ধু বা বান্ধবীর আজ এদিকে দেখা দেবার সম্ভাবনা নেই। টি পার্টি, কক্‌টেল পার্টি, ডিনার, নাচ আজ অনেকগুলো আছে; তারা সবাই ব্যস্ত থাকবে ও দিকে। জানি আমায় আজ 'মিস্' করবে অনেকে। আপনি হয়তো ভাবছেন নিজের দর বাড়াবার জন্যে এ আমার চালাকী, কিন্তু বিশ্বাস করুন তা নয়, সত্যিই আজ আমি বড় শ্রান্ত, একটু বিশ্রাম চাই ঐ হাঁফিয়ে-তোলা আবহাওয়া থেকে।"

তাকালাম তাঁর বব্‌ চুল থেকে হাই হিল পর্যন্ত। উগ্র যৌবন আছে তাঁর দেহ জুড়ে—কিন্তু যৌবনের প্রথম সবুজ অবুঝ ভাবনাহীন জোয়ার নয়, এ জোয়ারের তরঙ্গে মিশে রয়েছে আগামী ভাঁটার ভাবনা। এ যৌবন যেন তাই বলতে ভুলে গেছে "যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?" যৌবনের রঙ্‌ বুঝি ফিকে হলো, এই ভয়ে ঠোঁটে, গালে, নখে লালের বাহার লাগিয়েছেন মিস্ বনার্জী। কিন্তু যৌবনের যে রঙ ভেতর থেকে বাইরে আলো দেখায়, তার তুলনায় বাইরের এই কারখানায় তৈরী রঙের পোঁচ যে বড় খেলো, মিস্ বনার্জী। স্বাভাবিক মুখশ্রীকে বিশ্রী করে তোলার এই রঙ্‌-বুলানো প্রয়াস কেন?

দেহসৌষ্ঠব আছে মিস্ বনার্জীর, চালু ভাষায় বলা যায় ফিগার ভালো। এবং সেই ভালোত্বটুকুকে আরো ভালো করে দেখাবার কৌশলে কুশলী শিল্পী মিস্ বনার্জী; চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে জানেন আনমনামির ভান করে'। সুরমা কাজল দিয়ে উদাস ভাব আঁকা দুটি

চোখে ভ্রূভঙ্গের অভিনয়ে পাকা অভিনেত্রী মিস্ বনার্জী ; দৃষ্টিতে আশ্চর্য চমৎকার 'সোফিস্টিকেটেড' সারল্য। কিন্তু দিন-স্রোত বয়ে চলেছে হু হু করে অনিবার্য গতিতে, টেনে রাখবার উপায় নেই।

শুধালেম, "বয়স আপনার কত হলো বিপাশা দেবী ?" মিস্ বনার্জী চমকিত না হবার জন্যে গোড়া থেকে প্রস্তুত। হেসে বললেন, "বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। আপন বয়স কভু নাহি কহে নারী।"

বললাম, "বেশতো, বিশেষণেই বলুন।"

একটু কি যেন ভেবে মিস্ বনার্জী বল্লেন, "না, বিশেষণেও বলতে চাই নে। আপনাকে বলতে যদিও তেমন কোনো বাধা বোধ করিনে, তবু নারী ধর্মটা না-ই বা ভাঙলুম। কিন্তু এ জীবনধারায় হয়রান হয়ে উঠেছি ধনপতিবাবু।"

"কোন্ জীবন ?" শুধালেম। "এই যে রঙ মেখে সং সেজে থাকা ? কক্‌টেল পার্টিতে গেলাস হাতে করে অকারণ অর্থহীন হাসি হাসা ? চিবিয়ে চিবিয়ে মাপা মাপা কথা বলা ? ছোঁড়া বুড়ো নির্বিশেষে কাপ্তানদের সঙ্গে দ্রুতবেগে ফ্লার্ট করা, আর নাইট্ ক্লাবে নাচা ?"

"এই জীবন।" শ্রান্ত ম্লান কণ্ঠে কক্‌টেল-সোসাইটি বহির্ভূত স্বরে জবাব দিলেন মিস্ বনার্জী।

"হৃদয় মুক্ত করবার জন্যেই আপনাকে সঙ্গে এনেছি ধনপতিবাবু।" বলতে লাগলেন মিস্ বনার্জী। "তাই এ ভান করব না আপনার কাছে যে আমি বড় সুখী। ট্রাজেডি সাগরের তীরে উঠবো বলে প্রাণপণে সাঁতার কাটছি, তীর তবু থেকে যাচ্ছে দূরেই।"

"তীরে উঠে নীড় বাঁধবেন জীবন সাথী নিয়ে, এই তো ?"

মিস্ বনার্জী বললেন "এই। নারী-হৃদয়ের যা মামুলী কামনা। সোজা কথায় বিয়ে করে ঘরণী হওয়া। একজন আমায় ভালোও বেসেছিলো, বিয়ে করতে চেয়েছিলো। আপনি বোধ করি মনে মনে হাসছেন, ধনপতিবাবু ?"

"না। ছেলেটি দেখতে শুনতে কেমন ছিলো ?"

"প্রিন্‌স্‌ চার্‌মিং না হলেও, বেশ সুশ্রীই বলা চলতো তাকে।"

"তবে বিয়ে করলেন না কেন?"

"মাইনে সে পেতো মোটে সাড়ে তিন' শো। আমি হেসে বললুম, "ওতে আমার শাড়ী আর সিনেমার খরচাই কুলোতে পারবে না দিগন্ত।"

"ছেলেটির নাম ছিল দিগন্ত?"

"ছিল না। আমি এখন দিলুম। ওর বাবা মার দেওয়া নাম আলাদা।" বললেন মিস্‌ বনার্জী। "দিগন্ত এখন অন্য চাকরি পেয়েছে। মাইনে এখন সাড়ে সাত শো। আমায় পাবে না শুনে তখন ওর জীবন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এখন সে কথা তার মনেও আছে বলে মনে হয় না। দেখা হয়েছিলো দু'দিন, কিন্তু কথা বলেনি, চিনতেও পারেনি।"

"হয় তো কথা বলেনি চিনতে পেরেছিলো বলেই।" বললাম আমি।

"হয় তো তাই।" বললেন মিস্‌ বনার্জী।

"বিশ্বাস করুন, আমি ছড়াইনি" বলতে লাগলেন বিপাশা বনার্জী, "তবু এ খবরটা এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিলো যে প্রেম নিবেদন করেছে দিগন্ত, আর প্রত্যাখ্যান করেছে বিপাশা—হাত বাড়িয়েছে বামন, আর হেলায় হেসেছে চাঁদ। চারদিকে উঠলো চাপা হাসির ঝড়; সে ঝড় সইতে পারলে না দিগন্ত, পালিয়ে গেল।"

"তারপর?"

"আমার পাণি-প্রার্থনা দিগন্তেই শেষ হয়ে গেল না।" বললেন বিপাশা। "জীবনসঙ্গিনী রূপে আমাকে একান্ত ভাবে কামনা করলে শতদ্রু সেন আর সব্যসাচী সান্যাল। এ নাম দুটিও বানিয়ে বলছি ধনপতিবাবু। তাদের আসল নাম লুকিয়ে রাখছি তাদের লজ্জা বাঁচাবার জন্যে নয়, আমারি লজ্জা বাঁচাবার জন্যে। আমার দুরন্ত রূপ আর পুরন্ত যৌবনের যুগল আগুনে আমার পাণিপ্রার্থী সেই প্রেমিক যুগলের হৃদয় পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমি হেলায় হেসে অনায়াসে তাদের দূরে ঠেলে দিলাম।"

ব'লে একটু হাসলেন বিপাশা বনার্জী। শুকনো হাসি, শুকনো

চোখ ; তবু সে হাসি যে কত বড়ো কান্না সে কথা অনায়াসে বুঝে নিলেন অন্তর্যামী, আর বুঝে নিলেম আমি।

আবার শুধালেম, "তারপর ?"

"নগরীর নটী চলে অভিসারে, যৌবন-মদে মত্তা। পড়েছেন তো কবিগুরুর সেই অপূর্ব কবিতাখানা, বাসবদত্তার ওপর ?" বললেন বিপাশা। "আমিও তখন বাসবদত্তার মত, যৌবন-মদে মত্তা। কিন্তু আমার তখন অভিসার নয়, অভিযান—অনেক মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযান। পুরোদস্তুর নিজেকে ভাসিয়ে দিলুম উঁচু সমাজের স্রোতে, যাকে বলে হাই সোসাইটি। যোগ দিতে লাগলুম ৫৫৫ ক্লাবের নৈশ আসরে, নৈশ বাসরে, ককটেল আর বল নাচের পার্টিতে।"

"বল নাচও জানতেন আপনি ?"

"নাচতে নয় শুধু, নাচাতেও।" বললেন বিপাশা বনার্জী। "মাদাম অ্যালেনের নাচের স্কুলে ছাত্র আর ছাত্রীদের ভেতর আমিই ছিলুম সেরা। বড় বড় নাচের পার্টিতে আমার সঙ্গে নাচবার জন্যে শৌখীন কাপ্তানদের ভেতর কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো বললে ভাববেন না বাড়াবাড়ি করছি। কিন্তু যাদের নাচিয়েছি বলে ভেবেছি, আসলে তারাই আমায় নাচিয়ে মনে মনে হেসেছে কিনা সে প্রশ্নটাই আজ মনে বড় হয়ে জাগছে ধনপতিবাবু। তাদের যে টাকায় ছিনিমিনি খেলেছি সে টাকা তাদের কাছে তুচ্ছ, কিন্তু তার বিনিময়ে তারা পান করেছে আমার জীবন-বসন্তের উগ্র সুরা, পেয়েছে আমার সাহচর্যের আনন্দ, বিলিতী নাচের বাজনার তালে তালে সহকার শাখার গায়ে মাধবীলতার মতো জড়িয়ে নৃত্য-দোলায় তাদের সঙ্গে দুলতে হয়েছে আমাকে, সে তো তুচ্ছ নয়! এই কাপ্তানদের কাছে দাম আছে শুধু ঝাঁঝালো যৌবনের, এই নেশায় বুঁদ হবার জন্যে নৈশ বাসরে এরা আড্ডা জমায়। এজন্যে তাদের আলাদা বাজেট।"

আমি বললাম, "এমন কথা শুনছি সোসাইটি গার্ল মিস বনার্জীর মুখে, এ যে কানে শুনেও বিশ্বাস হতে চাইছে না বিপাশা দেবী।"

"চাইবে না জানি বলেই তো এমন নিঃসংকোচে আপনাকে বলতে

পারছি ধনপতি বাবু।" বললেন মিস্ বিপাশা বনার্জী। "জানি আমার এ সব কথা যদি আপনি জয়ঢাক বাজিয়ে দেশসুদ্ধ রটিয়ে বেড়ান তাহলে সবাই আপনাকে হেসে উড়িয়ে দেবে, কেউ কেউ বলবে মিথ্যেবাদী। সোসাইটি গার্ল বিপাশা বনার্জী তার প্রাণের কথা এমন করে অকপটে আপনাকে একান্তে ডেকে শুনিয়েছে, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"বিশ্বাস করাবার প্রয়োজনও আমার নেই বিপাশা দেবী।" বললেম আমি। "শুধু আছে যতটুকু শোনাবেন ততটুকু শুনবার আগ্রহ, আর ততোধিক জানবার কৌতূহল। মানুষের কৌতূহল কোনো দিন মেটে না, তা তো আপনি জানেন।"

"একটি ছেলেকে বড়ো ভালো লেগেছিলো। বোধ হয় তাকে ভালোই বেসেছিলাম, ধনপতিবাবু।" বললেন বিপাশা বনার্জী, দুচোখে তাঁর স্বপ্নের কাজল বুলানো। "আশ্চর্য স্মার্ট, আশ্চর্য ব্রাইট্—চোখ ধাঁধাঁনো। তাকে নির্ভুল ইশারায় ইঙ্গিতে, খানিকটা মুখের ভাষায়, বুঝিয়ে দিলাম হৃদয় তাকে দিয়েছি, সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে চাই তারি পায়ে—কেয়ার করি নে কি বলবে আমাদের হাই-ব্রাউ সোসাইটি। কিন্তু আমার সর্বস্ব তার দরকার হলো না ধনপতিবাবু। শুধু আমার নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়েই সে উধাও হয়ে গেল। এ টাকা বাবা গচ্ছিত রেখেছিলেন আমার কাছে, আমার অ্যাকাউন্টে ব্যাংকে জমা করে। ভালোবাসার চোরাবালিতে আকণ্ঠ ডুবে বাবাকে না জানিয়েই সেই পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিলুম জলধি জোয়ারদারের হাতে, জলধিরই একান্ত গোপন অনুরোধে। সেই যে টাকা নিয়ে গেল, আর ফিরে এলো না জলধি জোয়ারদার। কোনোদিন ফিরে আসবে বলে আশাও করিনে।"

"ঐ পাঁচ হাজার টাকার কথা আপনার বাবা জানেন?" শুধালেম আমি।

"এখনো জানেন না।" বললেন বিপাশা বনার্জী। "বাবা ভাবছেন ও টাকা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সুদে বাড়ছে।"

হৃদয় খোয়া গিয়েছিলো বিপাশা দেবীর; সে হৃদয় হয়তো ফিরে

এসেছে। কিন্তু যে পাঁচ হাজার টাকা খোয়া গেছে, তা আর ফিরবে না।

"হয় তো এ ধাক্কা আমার পাওনাই ছিল।" নিজে থেকেই বললেন মিস্ বিপাশা। "কিন্তু এর পর থেকে আর কোন পুরুষকেই বিশ্বাস করতে পারতুম না। এও বুঝতে লাগলুম যে আমি প্রেম নিবেদন করলেও তাকে ফাঁপা ফ্লার্টিং ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাববে না কেউ। বললে হয় তো আপনি হাসবেন, কিন্তু এ যেন কথামালার সেই রাখাল বালকের গল্প। সত্যি সত্যি যখন পালে বাঘ পড়লো তখন ডাক শুনেও জব্দ হবার ভয়েই কেউ এলো না এগিয়ে, সবাই ভাবলে ফাঁকিবাজ রাখালের এও আরেক ফাঁকি।"

"আপনার পালে কি বাঘ সত্যিই পড়েছে, বিপাশা দেবী?" শুধালেম আমি, যদিও উপমাটা হয়তো খুব জুতসই হলো না।

আমার উপমার ভাষাতেই আমাকে জবাব দিয়ে বিপাশা বললেন, "পালে এবার সত্যিই বাঘ পড়েছে ধনপতিবাবু। কিন্তু এখন চীৎকার করে কাঁদলেও কেউ কান দেবে না—কেউ বিশ্বাস করবে না—সবাই ভাববে সে কান্না আমার ভান, আমার অভিনয়। হৃদয় লুটিয়ে দিতে গেলে ভাববে ও শুধু আমার ফ্লার্টিং, আমার ফাঁকি মাত্র। এতদিনের ফ্লার্ট বিপাশার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে, এ কেউ বিশ্বাস করবে না। কান্নার আবেদন হবে যতো বেশী গভীর, আবেদন জানাবো যার কাছে সে ভাববে আমার অভিনয় তত নিখুঁত। কি ভাবছেন ধনপতিবাবু?"

কথা শুনতে শুনতে একটু উদাস একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম, দৃষ্টি এড়ায়নি বিপাশার। আমি বললাম, "ও কিছু নয়, এমনি।"

"কি রকম বে-আক্কেল আমি দেখেছেন?" বললেন বিপাশা। "সেই থেকে একটানা শুধু আমার কথাই বলে বলে হয়রান করে তুলেছি আপনাকে। কিন্তু আমার কথা শোনাবো বলেই তো আপনাকে টেনে এনেছি। ভগবানই আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

আমি বললাম, "ভগবানকে আর আউটরাম ঘাটে টেনে আনবেন না বিপাশা দেবী। তাছাড়া, ওঁকে আমি ঠিক বুঝেও উঠতে পারিনে।"

"কিন্তু এই ক'দিন ধরে ঘুরে ফিরে ওঁর কথাই মনে এসে পড়ছে ধনপতিবাবু।" বললেন বিপাশা বনার্জী। "যেদিন থেকে জানলুম বাবার শেষ পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে ঠাঁট বজায় রাখা আর পথে দাঁড়ানোর মাঝখানে, আমার সেই পাঁচ হাজার টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্বল রয়েছে বলে ভ্রান্ত আশা করছেন বাবা, যে-কোনদিন যে-কোন মুহূর্তে চেয়ে বসে আমাকে বিষম বেকায়দায় ফেলতে পারেন, সেই দিন থেকেই ভগবানের কথা ভাবতে শুরু করেছি। শেষের সম্বল পুরো পাঁচ হাজার টাকা আমায় ফাঁকি দিয়ে নিয়ে ভেগে গেছে জলধি জোয়ারদার, এ লজ্জা বাবার কাছে আমি কেমন করে স্বীকার করবো ধনপতিবাবু? না না, অসম্ভব, তা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।"

আমি একটু ভেবে বল্‌লাম, "আপনার বাবা চাইবার আগেই যদি পাঁচ হাজার টাকা আপনি আপনার অ্যাকাউণ্টে জমা করে দেন, তাহলেই তো তাঁর কাছে ধরা পড়বার আর ভয় থাকে না বিপাশা দেবী। আপনার এমন কোনো অ্যাডমায়ারাব বা কাপ্তান বন্ধু কি নেই যিনি পাঁচ হাজার টাকা আপনাকে দিতে পারেন?"

অম্লমধুর করুণ হাসি হেসে বিপাশা দেবী বললেন, "দিতে পারে শুধু নয়, দিয়েছে। যা চেয়েছি তার বেশী দিয়েছে। এই দেখুন।" ভ্যানিটিব্যাগ থেকে এক টুক্‌রো কাগজ বার করে দেখালেন তিনি, পথের ধারে একটি দীপস্তম্ভের তলায় দাঁড়িয়ে। দেখলেম সেটা স্টেট্ ব্যাংকের কারেণ্ট অ্যাকাউণ্টের একখানা চেক, তলায় ভাস্কর ভট্টাচার্যির স্বাক্ষর, টাকার অঙ্ক সাড়ে পাঁচ হাজার।

"তামাশা ছলে চেয়েছিলেম পাঁচ হাজার।" বললেন বিপাশা দেবী। "কেন দরকার কিছুই জানতে চাইলে না ভাস্কর। চেক্ বই বার করে সঙ্গে সঙ্গে খস খস করে' লিখে দিলে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার চেক।"

"তা হলে তো অতি সহজেই পেয়ে গেছেন টাকা। এইবার জমা করে দিলেই তো হয়।"

"সহজে পেয়েছি বলেই তো সহজে জমা করে দিতে পারিনে ধনপতিবাবু।" বললেন বিপাশা বনার্জী। "যা চেয়েছিলেম তার বেশী দিয়েছে সে, বিনিময়ে কিছুই দাবী করেনি। কিন্তু বিনিময়ে আমি যা দিতে চাই সে কি নেবে ধনপতিবাবু?"

শুধালেম, "কি আপনি দিতে চান তাকে?"

"আমার সব। রবি ঠাকুরের ভাষায় কালস্রোতে যা ভেসে যায়—জীবন-যৌবন-ধন মান। নিজেকেই আমি যে চিরদিন সঁপে দিতে চাই ধনপতিবাবু। সে কি নেবে? যদি নেয় তো তার বিনিময়ে সাড়ে পাঁচ হাজার কেন, আরো অনেক আমি বিনা দ্বিধায় নিতে পারি তার কাছ থেকে। কিন্তু আমায় গ্রহণ যদি সে না করে, তাহলে কোন্ মুখে, কিসের দাবীতে তার এ টাকা গ্রহণ করবো আমি? এ টাকা তাকে ফিরিয়ে দেবো ধনপতিবাবু, এ টাকা ভাস্করকে আমি ফিরিয়েই দেবো।"

অর্থাৎ তাঁকে গ্রহণ করে যদি গৃহিণী বানায় ভাস্কর, তবেই শুধু তিনি এ টাকা আপন ব্যাংকে জমা করে নিতে পারেন, অন্যথায় এ চেকখানা ভাস্করকে ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকবে না, তাতে বরাতে যা থাকে থাকুক বিপাশা বনার্জীর।

এতদিন নারী স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উঁচিয়ে বালকবন্ধুদের নাচিয়ে এসেছেন ফুল থেকে ফুলান্তরে ওড়া প্রজাপতির মতো ধরা পড়া এড়িয়ে। এখন জোয়ারের আলো কমে কমে ঘনিয়ে এসেছে ভাঁটার ছায়া; ধরা দেবার জন্যে পাগলিনী বিপাশা বনার্জী, কিন্তু ধরা নিতে চাইছে না কেউ।

"বলুন এখন আমি কি করবো, ধনপতিবাবু।" শুধালেন মিস্ বিপাশা বনার্জী।

বললাম, "চেকটা কালই আপনার অ্যাকাউণ্টে জমা করে' দিন। ভাস্কর ভট্টচার্যির চেক ডিজঅনার্ড হবে না।"

"কিন্তু আমি ডিজঅনার্ড হবো ধনপতিবাবু। এ টাকার চেক ভাস্কর

যে আমি বলেই আমাকে দিয়েছে তা নয়, এ টাকা সে অন্য যে কোন মেয়ে চাইলেও চোখ বুজে বিনা দ্বিধায় দিত, এমন কি আমাদের লগ্না লাহাকেও, যাকে ছেলেরা প্রাণপণে এড়িয়ে চলে। আমি নেবো ভাস্করের কাছে শুধু তাই, যা মহাবিশ্বের অন্য কোনো নারী পাবে না তার কাছে। আমি হতে চাই ভাস্করের জীবনে অনন্যা, অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী, অদ্বিতীয়া।" আমি মনে মনে বললাম, "৺প্রজ্ঞাপারমিতা যদি ভাস্করের জীবনে প্রথমা হয়ে থাকে, তাহলে তোমার দ্বিতীয়া না হয়ে উপায় কি বিপাশা?"

মুখে বললাম, "তাই হয় তো আপনি হয়েছেন বিপাশা দেবী।"

বিপাশা বনার্জী বললেন, "হয়েছি ভেবে যতো আশা, হইনি ভেবে আশংকাও যে ততখানিই করি ধনপতিবাবু। কিন্তু সংশয়ের দোলায় আর তো দুলবার সময় নেই। দুএক দিনের ভেতর এস্পার কি ওস্পার যাহোক একটা জেনে নিতে হবে। কিন্তু এসব কথা ভাস্করকে আপনি যেন কিছু বলবেন না।"

"আমার মুখ থেকে একটি কথাও বেরোবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" বললাম আমি।

মিস্ বিপাশা বনার্জী হঠাৎ একটু উষ্ণ হয়ে কেন উঠলেন জানি না। বললেন, "আপনাকে কোথায় নামিয়ে দিতে হবে ধনপতিবাবু?"

বললাম, "এসপ্ল্যানেডে নামিয়ে দিলেই হবে।"

"বেশ, উঠুন গাড়ীতে।"

উঠলাম। আমায় এসপ্ল্যানেডে নামিয়ে দিয়ে মিস্ বিপাশা বললেন, "আপনি যদি বলতেই চান ভাস্করকে, শুধু এইটুকু বলতে পারেন যে—"

"কিছু ভাববেন না বিপাশা দেবী। আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোবে না, গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

শুনে' গাড়ী চালিয়ে চলে গেলেন মিস্ বিপাশা বনার্জী। চালাবার ভঙ্গীতে ফুটে উঠল বিরক্তি।

★

আজ নিরালা স্তব্ধ দুপুরে গোপনে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে এসে অনেক কথা বলে গেছেন ডাক্তার মৃগেন মাইতি। বিলেত-ফেরত, এ পাড়ার সেরা পসারওয়ালা ডাক্তার।

"প্রজ্ঞাপারমিতাকে ওপারে পাঠিয়েছি এই ফাউনটেন পেন দিয়ে।" বলে গেছেন তিনি, পকেটে আটকানো কালো ঝর্ণাকলম দেখিয়ে।

যেদিন প্রথম এলেম এ পাড়ায়, তার মাত্র কয়েকদিন আগে এ দুনিয়ার ওপারে রওয়ানা করিয়ে দিয়েছেন প্রজ্ঞাকে ডাক্তার মৃগেন মাইতি; প্রজ্ঞার শেষ চিকিৎসা তিনিই করেছিলেন। যাকে হারিয়ে পাড়া বিষণ্ণ, আমার দুটি অভাগা নয়নে সে চিরদিনের জন্যেই না-দেখা হয়ে রইল।

মৃগেন মাইতি যখন ডাক্তারী পড়তেন এ দেশে, তখন তাঁর সারা মন জুড়ে ছিল চোখ-ধাঁধানো ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার স্বপ্ন। যেমন করে হোক বিদেশে গিয়ে উঁচু ডিগ্রির মালা পরতে হবে গলায়। বিলেত-ফেরত বড় ডাক্তার হয়ে এসে এদেশে পসার করতে হবে। গরীব বাবার গরীব ছেলে, তাঁকে পাঁচজনের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে, মোটা টাকা রোজগার করে' বাড়াতে হবে পরিবারের মর্যাদা।

সুপুরুষ ছিলেন মৃগেন মাইতি কিন্তু নিজের সুপৌরুষের দিকে নজর দেবার মতো ফুরসত বা মেজাজ ছিলো না তাঁর।

টি-বি-ওয়ালা বুকে নাকি ব্রংকাইটিস্ সুবিধে করতে পারে না, তেমনি ভবিষ্যতের নেশার ঝোঁকে বর্তমানের রোমান্স ধামাচাপা পড়েছিলো মৃগেন মাইতির মনে।

এ দেশের শেষ ডাক্তারী পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম হলেন মৃগেন মাইতি। নামজাদা মস্ত অ্যাটর্নী এগিয়ে এলেন শ্বশুর হবেন বলে। তিনি বললেন, "ঘুরে এসো ইংল্যাণ্ড, ঘুরে এসো কন্‌টিনেন্ট, ঘুরে এসো

আমেরিকা। নিয়ে এসো সেরা সেরা ডাক্তারী ডিগ্রী ; যত টাকা লাগে লাগবে, আমি রয়েছি কি করতে? হয়ে এসো একটা ডাক্তারের মতো ডাক্তার। উজ্জ্বল হোক দেশমাতৃকার মুখমণ্ডল।"

মৃগেনের বাবাকে বললেন, "জুয়েল, জুয়েল, একটি হীরের টুকরো আপনার ছেলে। রত্নগর্ভা ছিলেন আপনার সহধর্মিণী। আমি তো মেয়েকে বলি, ওরে অনেক তপস্যার ফলে এমন স্বামী পেতে চলেছিস।"

মৃগেনের মা স্বর্গীয়া হয়েছিলেন অনেকদিন আগে। নইলে কি হতো বলা যায় না। মৃগেনের প্রায়-গরীব বাবা বড়লোক বেয়াই পাবার সম্ভাবনায় আনন্দে গলে জল হয়ে গেলেন।

সেই অ্যাটর্নীর একমাত্র কন্যা মমতা মণ্ডল মমতা মাইতি হয়ে গেল, আর অ্যাটর্নী শ্বশুরের টাকায় বিলেত চলে গেলেন মৃগেন মাইতি, বিলিতী উঁচু উঁচু ডাক্তারী ডিগ্রী আহরণ করে আনতে। মমতার বাবার আয় বিরাট হলেও মমতার আয়তন, ওজন, রং ইত্যাদি বিবেচনা করে সুপুরুষ মৃগেনের ভূতপূর্ব সহপাঠী এবং অসহপাঠী অনেক তরুণ অবাক হলো মৃগেনের কাণ্ড দেখে। কেউ কেউ সন্দেহ করলে চোখে কম বা ভুল দেখছে মৃগেন। কেউ ভাবলে শ্বশুরের টাকায় নিজের কাজটি হাসিল হয়ে গেলে যথাসময়ে ভোল পাল্‌টে যা করবার করবে মৃগেন মাইতি। মমতা মাইতির চিরজীবন-সঙ্গী হয়ে সে থাকবে এ কথা ভাবাই যায় না, এই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবলে সবাই।

ঠিক এমনি সন্দেহ যে অ্যাটর্নীও করেননি তাও নয়। একমাত্র-জামাতাকে যখন উঁচু ডাক্তারী পড়তে বিলেত পাঠালেন, ঠিক সেই সঙ্গে একমাত্র পুত্র মানবকেও পাঠালেন ব্যারিস্টারী পড়তে।

বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারী পড়ার চাইতে মানবের বড় কাজ হলো ভগ্নীপতিকে পাহারা দেওয়া। কোনো বিলিতী সুন্দরীর খপ্পরে না পড়ে' যায় মৃগেন। ছোকরার চেহারা, চালচল্‌তি ইত্যাদি সুন্দরী মেমসাহেবদের হৃদয়ে দোলা লাগাবার জন্যেই যেন অর্ডার দিয়ে তৈরি। ভগ্নীর একান্ত

সম্পত্তি বেদখল হয়ে না যায়, হুঁশিয়ার হয়ে সেদিকে নজর রাখতে রাখতে ব্যারিস্টারী পাশ করা হয়ে উঠলো না মানব মণ্ডলের।

. দেশে ফিরে এলেন ডাক্তার মৃগেন মাইতি প্রচুর সাফল্য আর একগাদা উঁচু ডাক্তারী ডিগ্রী নিয়ে। সঙ্গে মানব মণ্ডল, ব্যারিস্টারী ফেল। কোনো মেমসাহেব সঙ্গে নিয়ে আসেননি মৃগেন মাইতি। অ্যাটর্নী খুশী, মমতা মাইতি খুশী। দু'জনেই গোপনে কৃতজ্ঞ মানব মণ্ডলের প্রতি। মানবই তো সামলে আর আগলে রেখেছে মৃগেনকে, নিজের ব্যারিস্টারী পড়া বরবাদ করে। অ্যাটর্নী ভাবলেন, 'ধন্য ছেলে!' আর মমতা মাইতি (ভূতপূর্বা মণ্ডল) ভাবলে 'ধন্য ভাই!'

স্বাগত অভিনন্দন পেলেন মৃগেন মাইতি তাঁর ধনী শ্বশুরের কাছে, আর মমতা মাইতির কাছে। মমতার আনন্দোচ্ছ্বাস দেখে মনে হতে পারতো স্বামীর পুরোপুরি বিদেশিনী-বিহীন প্রত্যাবর্তন যেন তার আশার অতীত। বিলেত থেকে এক মেমসাহেব সতীন না এনে মমতাকে যেন ধন্য করে দিয়েছেন মৃগেন মাইতি। বড়লোক শ্বশুরের একমাত্র মেয়ের পাতিব্রত্যে বিব্রত হয়ে উঠলেন ডাক্তার মৃগেন। হয় তো রূপের একান্ত অভাব পতিভক্তির আতিশয্য দিয়ে পুষিয়ে দিতে চাইছে মমতা। ভেবে মমতার ওপর একটু মমতা হলো মৃগেনের। তবু মনে হতে লাগলো এই মেয়েকে বড়লোক শ্বশুরের লোভেও বাংলার অন্য কোনো ছেলে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। মনে হতে লাগলো বিলেত প্রবাসের প্রায়-বান্ধবী প্যামেলা, লিওনোরা, অ্যানিটা, জেন, ডোরার কথা। এদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার প্রচুর সুযোগ সম্ভাবনা আর ওদের তরফ থেকে প্রচুর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অন্তরঙ্গ হতে পারেননি মৃগেন মাইতি। বাধা দিয়েছে ব্যারিস্টারী-পড়ুয়া সম্বন্ধী মানব মণ্ডল শোভন ভাবে, অশোভন ভাবেও। অতি চতুর অ্যাটর্নী শ্বশুর টাকা পাঠাতেন মৃগেনের কাছে নয়, মানবের কাছে। মৃগেন-ঘোড়ার রূপালী লাগাম ছিল মানব-গাড়োয়ানের হাতে। একরোখা অভদ্র গোঁয়ার মানবের হাতের মুঠোয় তাই মৃগেন মাইতি তখন পেন্‌সন-নির্ভর বুড়োর মত অসহায়।

মনে মনে ক্ষেপে উঠলেও সে ক্ষ্যাপামিকে বাইরে রূপ দিতে ভরসা পাননি মৃগেন মাইতি। তিনি চিনে নিয়েছিলেন মানব-চরিত্র। মানবের লাগাম ছাড়িয়ে চললে সঙ্গে সঙ্গেই টাকার যোগান অম্লানবদনে বন্ধ করে দিতে পারে মানব মণ্ডল। কিন্তু ঠিকমতো (অর্থাৎ কোনো বিদেশিনীর সঙ্গে এতটুকু অন্তরঙ্গতা না করে এবং আহার, নিদ্রা, ভ্রমণ বিশ্রাম ইত্যাদি আবশ্যিক কর্তব্য সেরে বাকী সবটা সময় এবং উৎসাহ ডাক্তারী অধ্যয়নের কাজে লাগিয়ে) চললে প্রয়োজন মতো টাকা ঠিকই সে যোগাবে, কার্পণ্য করবে না সেদিকে।

বিলেত থেকে মৃগেন মাইতি নিয়ে ফিরলেন প্রচুর ডাক্তারী বিদ্যা, ডিগ্রী, অভিজ্ঞতা আর সুনাম—সঙ্গে ব্যারিস্টারী ফেল্ সম্বন্ধী মানব মণ্ডল। এরই অল্প দিন বাদে অসামান্য কুরূপ মানব মণ্ডলের জীবনে এলো সুরূপা জীবন-সঙ্গিনী, যার বাবারও ছিলো মৃগেন মাইতির বাবার মতো অর্থের স্বল্পতা। সবাই স্বীকার করলে—কেউ বা মুখে, কেউ বা মনে মনে—মণ্ডল অ্যাটর্নীর বরাত, পছন্দ আর যোগাড়, তিনটিই চমৎকার। যেমন এনেছেন জামাই, তেমনি এনেছেন পুত্রবধূ।

ব্যারিস্টারী ফেল্ মানব মণ্ডল খুশীতে ভরপুর; দুনিয়াটা আরো রঙীন হয়ে উঠলো তার চোখে। কিন্তু উঁচু ডিগ্রী, সুনাম আর সম্মান নিয়ে বিলেত-ফেরত মৃগেন মাইতির মনে ফুলের বাগান যেন শুকিয়ে গেল। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার দাম তাকে দিতে হয়েছে গোটা জীবনটাকেই বরবাদ করে, যোগ্যতা-অর্জনের লড়াইর শেষে ঠাণ্ডা মাথায় এই কথাটা তার মনে বার বার হুল ফোটাতে লাগলো।

"আপনার কাছে মন খুলতে কোনো দ্বিধা আমার নেই ধনপতিবাবু।" বললেন মৃগেন মাইতি। "জানি আপনার মুখ থেকে কথা অপর কানে উঠবে না। বিলেত থেকে ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার ডাক্তারী পসার জমে গেল ; জমিয়ে দিলেন আমার অ্যাটর্নী শ্বশুর।"

"কি করে ?"

"তাঁর সবগুলো মক্কেলের ঘর আমায় ধরিয়ে দিয়ে।" বললেন মৃগেন

মাইতি। "শ্বশুরমশায়ের মক্কেলগুলো সবাই রীতিমতো শাঁসালো, তা তো আপনার অজানা নেই নিশ্চয়। সুতরাং আমায় আর পসার খুঁজে নিতে হলো না, পসারই আমায় খুঁজে নিলে। তাছাড়া আমার বিরাট ডিস্‌পেনসারীটাও আমার শ্বশুরই করে দিয়েছেন। বিলেতে যখন ছিলুম তখন আমার সম্বন্ধে লেখা, আর আমার লেখা, ফোটো সমেত এ দেশের দৈনিকে, সাপ্তাহিকে আর মাসিকে দেদার বেরিয়েছে। তাও আমার শ্বশুর মশায়েরই ব্যবস্থাপনায়। এদেশে ফিরে আসবার আগেই আমি এদেশে বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলাম। ডাক্তারী পসার যেন তৈরী হয়েই ছিল আমার জন্যে। এত কম বয়সে এমন জমাট পসার খুব কম ডাক্তারের জীবনেই সম্ভব হয়েছে। এ জন্যে আমি ঋণী শ্বশুরমশায়ের কাছে, এ আপনি জেনে রাখবেন। কিন্তু এ না হয়ে তিনি বরং যদি সুশ্রী মেয়ের বাবা হতেন তাহলে আমি অনেক বেশী সুখী হতুম ধনপতিবাবু। এ পসার না হয় নাই আমার হতো।" অশ্রু-গদগদ কণ্ঠ ডাক্তার মৃগেন মাইতির।

আমি বললাম, "বললেন না, কি করে ফাউন্‌টেন পেন দিয়ে ওপারে পাঠিয়েছেন প্রজ্ঞাপারমিতাকে?"

ডাক্তার মাইতি বললেন, "সব বলছি ধনপতিবাবু। শুরু থেকে না বললে শেষটুকু তো ভালো বুঝবেন না। প্রজ্ঞাপারমিতাকে প্রথম দেখেছিলুম একটি মেয়েকে চিকিৎসা করতে গিয়ে। মেয়েটির নাম শর্বরী রায়।"

"কালো? মুখে বসন্তের দাগ?"

"দাগ তখনো পড়েনি ধনপতিবাবু।" বললেন ডাক্তার মাইতি। "কিন্তু দাগ পড়লো আমার মনে। কষ্টিপাথরে সোনার দাগের মতো। বিলেতে ডোরা, লিওনোরা, ডরোথি, ম্যাবেলকে দেখে মোহিত হয়েছিলুম; প্রজ্ঞাকে দেখে মুগ্ধ হলুম। আপনি তো দেখেন নি তাঁকে। দুর্ভাগ্য আপনার। কিংবা হয়তো ভালোই করেছেন না দেখে। দেখলে আর এ জীবনে ভুলতে পারতেন না। দিনে রাতে, নিদ্রায় জাগরণে, যখন তখন মনে পড়ে সেই দেখার স্মৃতি আপনাকে কাঁদাত।"

একটা দীর্ঘশ্বাস। বোঝা গেল ডাক্তার মাইতির হৃদয় ভেতরে ভেতরে কেঁদে কেঁদে উঠছে।

"সেই প্রথম দেখার পর একাধিক বার দেখেছি প্রজ্ঞাপারমিতাকে।" বললেন ডাক্তার মাইতি। "যতবার দেখেছি, মুগ্ধতার মাত্রা ততই বেড়ে গেছে। ওর বাড়ীটি আমার কাছে তীর্থ হয়ে উঠলো, কিন্তু সে তীর্থের দুয়ার রুখে দাঁড়িয়ে প্রজ্ঞার রুক্ষ দাড়িওয়ালা বাবা।"

ডাক্তার মৃগেন মাইতির জীবনের সেরা ট্র্যাজেডি শুরু হলো তখন। প্রজ্ঞা যদি এলো তাঁর জীবনে, অ্যাটর্নী-দুহিতা তাঁর জীবনে জড়িয়ে পড়বার আগে কেন এলো না? ভাগ্যদেবতার এ কি নির্মম খামখেয়ালি? ডাক্তার মৃগেনের সারা মন জুড়ে প্রজ্ঞাপারমিতা, অথচ সারা জীবন জুড়ে মমতা মাইতি!

যদি না থাকতো মমতা মাইতি? তাহলে তার আসনে বসানো যেতো না কি প্রজ্ঞাপারমিতাকে? কল্পনা-ঘোড়ার মুখে লাগাম নেই। মৃগেন মাইতি ভাবলেন তাঁর আর প্রজ্ঞার মাঝখানে একমাত্র দুর্লংঘ্য ব্যবধান মমতা মাইতি। কিন্তু যদি মমতা মাইতি সরে যায় তাঁর জীবন থেকে? যদি তাকে সরানো যায়? যদি তাকে দেওয়া যায় সরিয়ে? যদি তাকে···! যদি··· ! যদি··· !···!···! !···যদি···!!···! ! !

ঝোড়ো হাওয়ার তাড়া খাওয়া সমুদ্রে দোদুল জাহাজের কেবিনে দেয়াল-ঘড়ির পেন্‌ডুলামের মতো হয়রানি দোল খেতে লাগলো ডাক্তার মৃগেন মাইতির মন। ওদিকে প্রজ্ঞাপারমিতা, এদিকে মমতা। আলো আর অন্ধকার। সে আলোর নাগাল পাওয়া যায় না অন্ধকার থেকে হাত বাড়িয়ে।

শহরে কয়েকখানা বাড়ীর মালিক অ্যাটর্নী সাহেব। একখানি বাড়ী তিনি লিখে দিয়েছিলেন একমাত্র মেয়ে মমতার নামে। মমতার নামে টাকা রেখে দিয়েছিলেন দুটো বড় ব্যাংকে এক লাখ করে; চেক্ কেটে ইচ্ছে মতো টাকা তুলতে পারে মমতা, কিন্তু তোলে না। অনেক ভালো ভালো কোম্পানীর মোটা অঙ্কের শেয়ার কেনা আছে মমতার নামে। সেগুলো

বছর বছর মোটা ডিভিডেণ্ড আনে। মানে, মৃগেন মাইতির চাইতে মমতা মাইতির সঙ্গতির জোর ঢের বেশী। মৃগেন মাইতি ঠোঁট কামড়ে মনে মনে শ্বশুরকে আর শ্বশুরের একমাত্র মেয়েকে শাসিয়ে ভাবলেন, "আচ্ছা।"

মৃগেনের মনের শাসানির হল্‌কা এসে লাগল মমতার মনের হাল্‌কা পরদায়। বাপের ওপর হলো অভিমান, নিজের প্রতি ধিক্কার। রবি ঠাকুরের ভাষায় 'উজাড় করে লও হে আমার যা কিছু সম্বল' গাইলে না বটে, কিন্তু নিজের সমস্ত সম্বল স্বামীর পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে যেন স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে মমতা! মানে, নিজের ব্যাংকের টাকা, বাড়ী, শেয়ার সব কিছু পুরোপুরি লিখে দিলে ডাক্তার মৃগেন মাইতির নামে। সুতরাং মমতার স্থাবর আর জঙ্গম সব রকম সম্পত্তি হাতে এসে গেল মৃগেন মাইতির।

মমতা বললে, "স্বামী সম্পদ আছে যে মেয়ের, তার আবার আলাদা সম্পত্তি কেন? আমার সব সম্পত্তি তাই সঁপে দিলুম আমার সম্পদের পায়ে।"

টের পেয়ে প্রায় হন্তদন্ত হয়ে মমতার অ্যাটর্নী বাবা বললেন, "একি করেছিস্ মা? নিজেকে কি এমনি করে একেবারে—"

মমতা বললে, "ঠিকই করেছি বাবা। এগুলো দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আমাকে স্বামীর আড়ালে আটকে রেখেছিল। দেয়াল ভেঙ্গে লুটিয়ে দিলাম স্বামীর পায়ের তলায়। পেলাম স্বামীকে।"

অ্যাটর্নী শুধু বললেন, "কিন্তু যদি—যদি—যদি—?" মুখ ফুটে মেয়েকে বলতে পারলেন না যদি কি।

মমতা বললে, "স্বামীই যে মেয়েমানুষের সর্বস্ব, এ আমি মা'র কাছে শিখেছি বাবা। আমি যে মা'রই মেয়ে।"

এই পর্যন্ত বলে মৃগেন মাইতি আমায় বললেন, "কিন্তু দেখতে বাপের মতো হয়েই তো আমার জীবনটাকে ট্র্যাজেডি করে দিলে মমতা। মনে হলো বাপের ওপর রাগ করেই মমতা অমন আদর্শ সতী হয়েছিলো। বাপের গায়ের রং আর চেহারা পেয়ে তার মনেও বয়ে চলেছিলো মহাকাম্নার বন্যা।"

অ্যাটর্নী ভাবলেন, "মৃগেন বিলিতী মেমসাহেব নিয়ে ফেরেনি বলেই অমনি পতি-সোহাগে গলে গেলি মমতা ? ওরই হাতে তুলে দিলি তোর ওকে হাতে রাখার একমাত্র অস্ত্র ? এবার কোনো অথবা কোনো কোনো প্রেমিকার পেছনে যদি সে ছোটে তোকে পিছে ফেলে, তো আটকাবি তাকে কি দিয়ে রে পাগলী ?" আর চটে উঠলেন তাঁর একেলে মেয়ের মাথায় অমন সেকেলে মগজ কি করে ঠাঁই পেলো তাই ভেবে।

প্রথম খুশীর চোটে ডাক্তার মৃগেন মাইতি ভাবলেন মমতা মাইতির বাইরে যত কুরূপই থাক না কেন, মনটা ভারী রূপালী। আর মনের রূপই তো আসল রূপ। কিন্তু খুশীর প্রথম চোট সামলে নিয়েই চটে উঠলেন, মমতার ওপর হারালেন মমতা। মনে ভাবলেন স্বামীকে হাত করবার এ শুধু মোক্ষম চালাকি মমতার ; আপন রূপের দেউলিয়াপনা সে ঢাকছে পৈতৃক রূপোর ঝল্‌কানি দিয়ে। এ যেন চাঁদির জুতো মারছে মমতা মাইতি ! ক্রুদ্ধ মৃগেন মাইতি রুদ্ধ আক্রোশে ঠোঁট কামড়ে বললেন, 'আচ্ছা !' আর কল্পনার চোখে দেখতে পেলেন মমতার কালো মেঘের পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে প্রজ্ঞাপারমিতার সোনালী চাঁদ।

হঠাৎ অসুখে পড়লো মমতা মাইতি। ওষুধ দিলেন ডাক্তার মৃগেন। বাড়লো অসুখ। ডাক্তার মৃগেন কায়দা করে হয়তো দিলেন এমন মিশ্র দাওয়াই (যাকে বলে মিক্‌স্‌চার), যাতে দ্রব্যগুণ ঠিক থাকলেও মাত্রার কারসাজিতে না সারিয়ে বাড়িয়ে তুলবে উপসর্গ, পতিদেবতার চরণে উৎসর্গ করা প্রাণ ক্রমে দেহ ছেড়ে পালাবে মমতার। এ মৃত্যু আসলে যে রোগে মৃত্যু নয়, সে কথা কেউ বুঝবে না। পুলিশও করবে না সন্দেহ। বড় জোর ভুল চিকিৎসা বা চিকিৎসা-বিভ্রাট বলে কেউ কেউ ভাববে। তা ভাবুক। তবু এ ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়ে যাক মমতা প্রাচীর, সরে যাক মৃগেন আর প্রজ্ঞাপারমিতার মাঝখান থেকে। তারপর প্রজ্ঞাপারমিতা। সারাজীবন জুড়ে থাকবে শুধু প্রজ্ঞাপারমিতা ! মমতার কথা তখন মনেও থাকবে না হয়তো ; অন্ততঃ মনে না রাখলেও চলবে।

বেড়ে বেড়ে দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠলো মমতার ব্যামো। যাকে মমতার

আলাপ বলে প্রথম দিকে মনে করেছিলেন মৃগেনের শ্বশুর, বুঝতে দেরী হলো না সে তার আলাপ নয়, প্রলাপ। যাকে ইংরেজদের ভাষায় বলে 'ডেলিরিয়াম'। জামাই বিখ্যাত পাকা ডাক্তার ভেবে পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন অ্যাটর্নী, এবার পরম চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কঠিন ব্যামোকে যে ডাক্তার সোজা করে দিতে পাকা ওস্তাদ, তারি হাতে মেয়ের সোজা ব্যামো কঠিন হয়ে উঠছে কেন? তবে কি?…তবে কি?…??…তবে কি…???

আর লক্ষ্য করলে সম্বন্ধী মানব মণ্ডল। মৃগেনের নামে নিজের সমস্ত কিছু লেখাপড়া করে দিয়ে ঠিক তারপরই মমতার এই বাড়াবাড়ি ব্যামোর রহস্যটা কি? মমতা যদি চলে যায় চির রহস্যের দেশে, তাহলে মণ্ডলবাড়ীর এতগুলো টাকা আর সম্পত্তি বেহাত হয়ে থাকবে মণ্ডলবাড়ীর টাকায় বিলেত-ফেরত পরের ছেলে মৃগেন মাইতির কবলে? না না না, এ হতে দিতে পারে না মানব মণ্ডল। "নিজের স্ত্রীর ওপর ডাক্তারী বিদ্যা আর ফলিও না মৃগেন। ডাক দাও তোমার কোনো মাস্‌তুতো ভাইকে।" মৃগেন মাইতিকে বললেন মানব মণ্ডল।

কিন্তু না, অন্য কোনো ডাক্তারকে ডাকলেন না ডাক্তার মৃগেন মাইতি। সম্বন্ধীর বাঁকা কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের যত রকম মানে করা যায় করে' নীরবে ভ্রূকুটি করলেন, সিকি সেকেণ্ডের বিদ্যুৎ চমকের মতো। মনে পড়ে গেল রবিঠাকুরের কবিতার টুকরো—

'আপনি গড়ি তোলে বিপদ জাল,
আপনি কাটি দেয় তাহা।'

আপন হাতে পাকিয়ে তোলা জট ছাড়াতে লাগলেন প্রাণপণে ডাক্তার মৃগেন মাইতি। টের পেয়ে গেছে সম্বন্ধী, এইবার মমতাকে বাঁচিয়ে তুলতে না পারলে জান বাঁচলেও মান বাঁচবে না মৃগেনের। আর যাই সইতে পারুন, সম্বন্ধীর কাছে মাথা হেঁট হওয়া সইবে না।

মমতার প্রলাপ শুনে ডাক্তার মৃগেনের বুঝতে বাকী রইল না এ হলো গিয়ে আসলে মমতার বিলাপ, মর্মের একেবারে গহন থেকে বেরিয়ে আসছে প্রলাপের ছদ্ম পোশাক প'রে। মমতা আর বাঁচতে চায় না। সে সন্দেহ

করেছে স্বামী (মানে মৃগেন) তাকে বাঁচাতে চায় না। সন্দেহ করেছে স্বামীর সুখের রাস্তায় সে কাঁটার মতো খচ খচ করছে ; তাই সে চিরতরে বিদায় নিয়ে চলে যেতে চায় স্বামীর পথ কাঁটাহীন করে। পতিভক্তিতে সতী সাবিত্রী বেহুলাকে ছেলেমানুষ বানিয়ে দেবে বড়লোক অ্যাটর্নীর মেয়ে মমতা। রবি ঠাকুরের ভাষায় মৃগেন ডাক্তার ভাবলেন :

'মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে—
এমনি করিয়াছ ফন্দী ?'

মরিয়া হয়ে চিকিৎসা করে মমতা মাইতিকে সারিয়ে তুললেন ডাক্তার মৃগেন মাইতি। রাতের পর রাত জাগলেন, দিনের পর দিন। সবাই ধন্য ধন্য করলে, বললে এমন পত্নীব্রত স্বামী দেখা যায় না। মুগ্ধ হলো মমতা মাইতিও। আর মুগ্ধ হওয়ার কিছুদিন বাদেই করলে অন্নপথ্য।

সেরে উঠেই একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেল মমতা। স্বামীর জন্যে যে মরতে চেয়েছিলো, সে এইবারে পণ করলে যেমন করেই হোক স্বামীর জন্যে বেঁচে থাকবে।

"ভাগ্য-দেবতা অলক্ষ্যে মৃত্যু হেসেছিলেন কিনা জানি নে, কিন্তু মমতা অন্নপথ্য করার সঙ্গে সঙ্গেই শয্যাশায়িনী হলো প্রজ্ঞাপারমিতা।" বললেন এর পর ডাক্তার মৃগেন মাইতি। "বন্ধ হয়ে গেল তার বাইরে বেরোনো। অসহ হয়ে উঠলো আমার দুটি ব্যাকুল চোখের হাহাকার। বোষ্টমের মুখে একবার পাঁঠা পড়লে যেমন জোর নেশা ধরিয়ে দেয়, ব্যামো তেমনি হু হু করে জোর ধরলে প্রজ্ঞাপারমিতার। এমনি সময় হঠাৎ একদিন—বললে আপনি বিশ্বাস করবেন ধনপতিবাবু ?"

বললেম, "বলুন। করব।" জানতাম বিশ্বাস করব না বললে ডাক্তারের কাহিনী আর এগোবে না।

"এলেন গোপনে প্রজ্ঞাপারমিতার মা।" বললেন ডাক্তার মৃগেন মাইতি, মুখ বাড়িয়ে নীচু গলায় কানে কানে বলার ভঙ্গীতে। "বললেন বাঁচাতেই হবে তাঁর মেয়েকে। মেয়ের বাবা ডাক্তারের ভিজিটে একটি

আধলা খরচা করবেন না ; মেয়ের মা তাই ভিজিট দেবেন তাঁর গায়ের অলংকার দিয়ে। তখন—"

"বিনা দর্শনীতেই চিকিৎসার ভার নিলেন আপনি।"

"চমৎকার ধরেছেন। পয়সা নেবো না জেনেও তবু অনাথবাবুকে খুশী হতে দেখলুম না। শুধু একবার আস্তে আস্তে বললেন, 'যে থাকবার সে থেকেই যায় ডাক্তার। যে যাবার, তাকে ডাক্তারের বাবাও ধরে রাখতে পারে না।' শুনলুম আমি। শুনলেন না প্রজ্ঞার মা। শুনলে না প্রজ্ঞাপারমিতা। ধন্যবাদ বিধাতাকে। মনে হলো কত জনমের ধন—"

"কাব্য বাদ দিয়ে মোদ্দা কথাটা বলুন ডাক্তার মাইতি।"

"হিপনোটিজম্ কাকে বলে জানেন ধনপতিবাবু? সম্মোহন-বিদ্যা? কি যাদু ছিলো রোগশয্যাশায়িনী প্রজ্ঞাপারমিতার দু'চোখের চাহনিতে আর মুখের হাসির আভাসে! আমি আত্মহারা হয়ে প্রেস্‌ক্রিপশ্যন্ লিখতে লাগলুম—এই কলম দিয়ে। বিশ্বাস করুন, এই সেই কলম। প্রজ্ঞার দৃষ্টির রহস্য আজো বুঝতে পারিনি ধনপতিবাবু। সেকি বেঁচে উঠতে চেয়েছিলো? না তার প্রাণের সমস্ত কামনা ঢেলে দিয়েছিলো ওপারে চলে যাওয়ার পথে? আর সেই কামনার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলো আমার ডাক্তারী মগজকে? অথবা অনাথবাবু, মানে প্রজ্ঞার বাবা কি ডাক্তারী বিদ্যেকে নস্যি প্রমাণ করে দেবার জন্যে···? কিন্তু সেকথা থাক ধনপতিবাবু। আমার নিজের মনেই আজ সংশয় জাগছে, আমি কি সত্যিই চেয়েছিলাম প্রজ্ঞাকে বাঁচিয়ে তুলতে? অথবা—অথবা—"

ডাক্তার মাইতির সারা মুখমণ্ডল জুড়ে অসহ্য ব্যথার আভাস দেখে ব্যথা বোধ করে বললাম, "ফুল ঝরে গেলে বোঁটায় তো আর ফেরে না ডাক্তার। অকারণ ভাবা কেন তবে?"

"মনে ভাব তো কারণ-অকারণ লাভ-লোকসান হিসেব করে আসে না ধনপতিবাবু।" বললেন ডাক্তার মাইতি। "প্রজ্ঞাপারমিতা চলে যাওয়ার পর নিজের ওপর সন্দেহে ভরপুর হয়ে আছি। হয় তো মমতা মাইতির জীবন-রথের চাকায় বাঁধা আমার এই অসহায় চোখ দুটির সামনে

প্রজ্ঞাপারমিতার বহ্নিজ্বালা জ্বালিয়ে রাখতে চায়নি আমার প্রাণ ; হয় তো তাই আমার কলমের ডগা দিয়ে বেরিয়েছিল এমন প্রেস্‌ক্রিপশ্যন্‌ যা প্রজ্ঞাকে এপারে টেনে না এনে এগিয়ে দিয়েছে ওপারের পথে। অথচ আমি ছাড়া এ সন্দেহ কেউ করবে না ধনপতিবাবু। কেউ জানবে না প্রজ্ঞাকে ওপারে পাঠিয়েছে আমার ফাউনটেনপেন।"

ছুটো চোখ বুঝি তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছিল হঠাৎ। কাহিনী শেষ করে ডাক্তার মাইতি কখন কোন্‌ পথে চলে গেলেন ঠাহর করতে পারলাম না। মনে হলো ছুর্বল মুহূর্তে প্রাণের গোপন কথা বলে ফেলে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেছেন তিনি।

মধুচন্দ্রিকা যাপন করবে বলে ভাস্কর ভট্‌চার্যি চলে গেছে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে। সঙ্গে গেছে বিপাশা, বনার্জী থেকে ভট্‌চার্যি হয়ে।

"আই অ্যাম নেভার লেস অ্যালোন ছান হোয়েন অ্যালোন।" বললেন ও. পি. বনার্জী, বার-অ্যাট-ল। "নিজেকে নিজে সঙ্গ দিতে জানি, তাই একা থেকে কখনো একা বোধ করিনে।"

একটু থেমে বললেন, "তা ছাড়া বাড়ীতে আমি তো একাও নই। বাবুর্চি, খানসামা, চাকর—এরা তো সবাই রয়েছে। নেই শুধু বিপাশা, সে এখন হনিমুনে সুইটজারল্যাণ্ডে। আই কুড নেভার এক্‌স্‌পেক্‌ট এ বেটার সন্‌-ইন্‌-ল ছান্‌ ভাস্কর। বাই দি ওয়ে, ভাস্করকে আপনি দেখেছেন তো? আলাপ হয়েছে কখনো কি?"

"হয়েছে একটু।"

"হাউ ডু ইউ অ্যাপ্রুভ অভ মাই চয়েস? মানে সোজা বাংলায় জামাইটি কেমন বাছাই করে নিয়েছি? ডোণ্ট ইউ থিংক দে উইল লিভ হ্যাপিলি এভার আফটার?" পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে পর পর একটানা তিনটি

প্রশ্ন করলেন ব্যারিস্টার বনার্জী ; একটি বাংলা প্রশ্ন দু'পাশে দু'টি ইংরিজি প্রশ্ন দিয়ে স্যাণ্ডউইচ করা।

তারপর বললেন, "আজ যদি মেরী, আই মীন্ মীরা বেঁচে থাকতো! ওর সর্বশেষ সাধ ছিল ওর মেয়েও যেন ওরই মতো স্বামী ভাগ্য পায়। সেই মেয়ে সুইট্জারল্যাণ্ড গেল মধুচন্দ্রিকায়, দেখে গেল না বেচারা! হয়তো সে জানতেও পারেনি স্বামী হয়ে আমি তাকে কেবল ছলনাই করেছি। কথাগুলো হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে কি?"

"অন্তত কৌতূহল জাগাচ্ছে।"

বনার্জী সাহেব বললেন, "কুড ইউ স্পেয়ার হাফ অ্যান্ আওয়ার টু লিস্ন্ টু মাই স্টোরি? শুনুন তবে কাহিনী।"

কাহিনী সুরু করলেন ও. পি. বনার্জী।

অনেক বছর আগের লণ্ডন। তারই পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে টেম্স্ নদী। এই নদীর ধারে এক সন্ধ্যায় ভ্রাম্যমান একজন বাঙালী তরুণ। নাম তার ওম্প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইংরিজি কায়দায় ও. পি. ব্যানার্জী ; ইংরিজিতর কায়দায় ও. পি. বনার্জী। ওম্প্রকাশ পড়ছে ব্যারিস্টারি ; ব্যারিস্টার হবার আর মাস ছয়েক বাকী, তাই মহা ভাবনায় ভাবান্বিত ওম্প্রকাশ। বিপত্নীক বাবার একমাত্র সন্তান ওম্প্রকাশ।

দেশে (মানে কলকাতা শহরে) থাকতে হুগলী খালের ধারে বেড়াতে বেড়াতে—কখনো বা না বেড়াতে বেড়াতেও—ওম্প্রকাশ দেখতো টেম্স্ নদীর স্বপ্ন। সে ভাবতো বিলেতেই তার জন্মাবার কথা ছিলো, হঠাৎ কোনো ভুলে বাংলাদেশে, তথা ভারতে, জন্ম হয়ে গেছে তার। বিধাতার এই ভুলটুকু যথাসম্ভব শুধরে নেবার জন্যে সে এ দেশে পড়াশুনো করলে বিদেশী কায়দায় বিদেশী পরিচালিত শিক্ষায়তনে।

এখানকার পড়া শেষ করে বিলেত চলে গেল ওম্প্রকাশ। গিয়ে পড়তে লাগলো ব্যারিস্টারি। থাকতে লাগলো এক বিধবা মেম-সাহেবের বাড়ীতে ভাড়াটে অতিথি বা 'পেয়িং গেস্ট' হয়ে। বিলেতে এসে ওম্প্রকাশের বিলেত দেশটাকে আরো বেশী ভালো লাগলো। সে ভাবলে বাকী জীবনটা

এখানেই কাটিয়ে দেবে। সংক্ষেপে এই হলো আগের কথা। এইবারে ফের আসা যাক টেম্‌স্ নদীর ধারে, যেখানে ওম্‌প্রকাশ সন্ধ্যাবেলা বেড়াচ্ছে ব্যারিস্টারি ডিগ্রী পাবার মাস ছয়েক আগে। দূরে দেখা যাচ্ছে ভিক্‌টোরিয়া টাওয়ার, টাওয়ার ব্রীজ, ওয়াটারলু ব্রীজ। কুমার ও. পি. ব্যানার্জীর পাশে কুমারী মেরী ফারকুহারসন্। মেরীর নামের আর চেহারার লাবণ্যের সঙ্গে তার একান্ত লাবণ্যহীন শ্রুতিদুঃখকর পদবীটা নিতান্তই বেমানান, এই নির্মম সত্যটা থেকে থেকে খোঁচা দিচ্ছে ওম্‌প্রকাশের মনে। ওম্‌প্রকাশ ভাবছিলো মিস্ মেরী ফারকুহারসনের চাইতে মিসেস মেরী ব্যানার্জী কতো বেশী ভালো শোনায়। কিন্তু রাজী হবে কি মেরী? রাজী করাতে হবে, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে। মেয়েদের মন চট করে পাওয়ার জিনিস তো নয়; আর চট করে যে মেয়ের মন পাওয়া যায়, সে মেয়ের মনের দামই বা কতটুকু?

মেরী সম্প্রতি এসেছে ম্যানচেস্টার থেকে, তার সম্প্রতি বিধবা এবং সন্থ নববিবাহিতা মাকে আর সন্থ-বিপিতাকে ছেড়ে। শ্রীমতী ফারকুহারসন সম্প্রতি হয়েছেন শ্রীমতী ম্যাকম্যাহন, কিন্তু মেরী তার নতুন বাবার পদবী নিয়ে কুমারী মেরী ম্যাকম্যাহন হতে চায়নি, তাই মাকে ছেড়ে চলে এসেছে মাসীর কাছে। মাসী মানে শ্রীমতী অ্যানডারসন—অ্যানজেলা অ্যানডারসন—ওম্‌প্রকাশের গৃহকর্ত্রী, ল্যাণ্ডলেডি।

একই ছাতের তলায় থেকে দু' জনের আলাপ অন্তরঙ্গ হতে দেরী হলো না। চায়ের টেবিলে, খাবার টেবিলে তাদের সঙ্গে নানা আলোচনায় সাগ্রহে যোগ দিতেন গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী অ্যানডারসন। তা ছাড়াও হতো কথাবার্ত্তা, যেন অনেকদিনের পরিচয়। ক্রমে মেরীর মতো ওম্‌প্রকাশও শ্রীমতী অ্যানডারসনকে ডাকতে লাগলো অ্যানজেলা মাসী ব'লে।

মেরী আর ওম্‌প্রকাশ বেড়াচ্ছিলো টেম্‌স্ নদীর ধারে, ঘুরে ফিরে সেই কথাতেই আবার আসা গেল। একা মেরীর সঙ্গে এভাবে বেড়ানো ওমের এই সর্বপ্রথম; অসাধারণ আনন্দে তার মন ভরে উঠেছিলো কানায় কানায়।

"কি সুন্দর এই টেম্‌স্ নদী।" ব'লে ওম্‌প্রকাশ উচ্ছ্বসিত হবার

উদ্যোগ করতেই মেরী বললে, "কিন্তু ভারতের গঙ্গা-যমুনা, কাবেরী-কৃষ্ণা, গোদাবরী-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে এই টিম্‌টিমে টেম্‌সের কি তুলনা চলে ব্যান?" (উচ্চারণ-কাঠিন্য এড়াবার জন্যেই ব্যানার্জী থেকে 'আর্জি' খসানো।)

টেম্‌স্ নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে কথাবার্তার ভেতর দিয়ে ওম্‌প্রকাশ টের পেলো ভারত সম্বন্ধে অনেক পড়ে শুনে মেরী ভারত সম্বন্ধে তার চেয়ে অনেক বেশী জানে, আর মেরী টের পেলো ওম্‌প্রকাশ জানে ইংলণ্ড সম্বন্ধে তার চাইতে অনেক বেশী।

মেরী বললে, "তোমার সঙ্গে আমায় ভারতে নিয়ে চলো, ব্যান। তোমার সঙ্গেই সেখানে জীবন কাটিয়ে দেবো।"

"একি সত্যি তোমার মনের কথা মেরী?"

"শুধু মনের নয় ব্যান, একেবারে প্রাণের কথা।"

"তাহলে তাই হবে মেরী। আকাশের ঐ সবগুলো তারা সাক্ষী রইলো। তুমি ভারতে আমার পাশে থাকলে ভারতই হবে আমার স্বর্গ।" মেরী ফারকুহারসনের চোখের পানে তাকিয়ে তাতে যে আলোর উচ্ছ্বাস দেখতে পেলো ওম্‌প্রকাশ, কুমারীর চোখে সে আলোর একটিমাত্র মানে হয়।

কাহিনী এই পর্যন্ত বলে ব্যারিস্টার সাহেব শুধালেন, "একঘেয়ে বিরক্তিকর বোধ হচ্ছে?"

আমি বললাম, "চমৎকার জমে আসছে। বলুন তারপর।"

ও. পি. ব্যানার্জী বার-অ্যাট-ল বললেন, "আমার ব্যারিস্টারি পরীক্ষার মাসখানেকও বাকী নেই, এমন সময় লণ্ডনে এলো রিচার্ড অ্যালেন তার ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের দল নিয়ে, আরভিং থিয়েটারে কয়েক রাত অভিনয় করবে বলে। এসে দেখা করলে মেরীর সঙ্গে, ডাকলে তাকে মেরী নামে, মিস্ ফারকুহারসন বলে নয়। রিচার্ড অ্যালেনকে মেরী মিস্টার অ্যালেন বললে না, বললে ডিক্। পরিচয় করিয়ে দিলে, রিচার্ড অ্যালেন হচ্ছে মেরীর বিপিতার পিসতুতো ভায়ের ছেলে। ডিক আর মেরী, মেরী আর ডিক! মিস্টার অ্যালেন আর মিস্ ফারকুহারসন নয়! এতদিনের জমে ওঠা মিঠে অরকেস্ট্রার মাঝখানে হঠাৎ যেন একটা ছেদ পড়লো।..."

রিচার্ড অ্যালেন বললে, "অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতা মেরীর, জানলেন মিস্টার ব্যানার্জী? এমনি স্বাভাবিক, এমনি নিখুঁত এর অভিনয় যে, অভিনয়কে অভিনয় বলে একেবারেই বোঝা যায় না, মনে হয় সত্যি জিনিসটি দেখছি! কিন্তু অনেক সেধেও ওকে আমাদের দলে ভেড়াতে পারলুম না, শুধু একবার স্টেজে নেমে আসর মাত করে দিয়েই চিরদিনের জন্যে স্টেজ ছেড়ে দিলে। মঞ্চে অভিনয় ওর নাকি ভালো লাগে না, ধাতে সয় না।"

মেরী বললে, "মঞ্চে অভিনয় করতে ভালোবাসিনে ডিক্, ভালোবাসি ভালো অভিনয় দেখতে। সত্যি ব্যান, সত্যিকারের ভালো অভিনয় দেখলে আমি আপন ভুলে যাই। মনে হয় ঐ অভিনেতাকে বুঝি আমার অদেয় কিছুই নেই। আমি যদি তোমাদের প্রাচীন ভারতীয় কায়দায় স্বয়ম্বরা হতুম ব্যান, তাহলে সেরা অভিনেতার কণ্ঠ পেতো আমার বরমাল্য।"

থিয়েটারের তু'খানা টিকেট দিলে রিচার্ড অ্যালেন, পাশাপাশি বসে দেখবার জন্যে। দিতে চেয়েছিলো তিনখানা, কিন্তু থিয়েটার দেখতে যেতে চাননি শ্রীমতী অ্যানডারসন, অর্থাৎ অ্যান্জেলা মাসী। রিচার্ড চলে গেলে বলেছিলেন, "প্রবাদে বলে তু-জনে সঙ্গ, তিন-জনে ভিড়। আমি বুড়ী ভিড় বানাতে চাইনে। দিব্যি যাবে তোমরা তুটিতে···" ব'লে চোখ টিপে হেসেছিলেন ওম্প্রকাশের দিকে তাকিয়ে।

ওম্প্রকাশ আর মেরী নাটক দেখলে পাশাপাশি বসে। করুণ প্রেমের কাহিনী। নাটকের রচনা ভালো, প্রেমিকা নায়িকার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছিলেন তাঁর অভিনয় অনবদ্য। নায়কের ভূমিকার অভিনেতা ভদ্রলোক এই ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার কোম্পানীর মোটা অংশীদার মিস্টার গর্ডন। নায়কের ভূমিকায় যিনি নামতেন, তিনি হঠাৎ দল ছেড়ে যাওয়ায় তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন গর্ডন। মঞ্চের বাইরে যার সঙ্গে প্রেমের সুযোগ নেই, সেই অতুলনীয়ার সঙ্গে মঞ্চে প্রেমের অভিনয় করবার এমন সোনালী সুযোগ ছাড়লেন না তিনি। যবনিকা পতনের শেষে

যবনিকার অন্তরালে রাগে দুঃখে ফেটে পড়লেন নায়িকার ভূমিকাভিনেত্রী মিস্ টেম্পেস্ট, বলতে লাগলেন এমন 'কাঠের তৈরী' নায়কের সঙ্গে তিনি আর কখনো মঞ্চে দেখা দেবেন না।

অথচ আর তিনদিন পরই এ নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় বিজ্ঞাপিত হয়ে রয়েছে।

তাদের চমকে দিলে ওম্প্রকাশ। বললে, "যদি অনুমতি পাই, আমি নামবো এ নাটকে নায়কের ভূমিকায়। নাটকটি আমার পড়া আছে। অভিনয় বিদ্যেটাও এককালে বেশ রপ্ত ছিল, ওটা রক্তের সঙ্গে মিশে আছে, ভুলে যাইনি।"

বিস্মিতা হলো মেরী ফারকুহারসন। রিচার্ড অ্যালেন ইতস্ততঃ করে বললে, "কিন্তু·· "

ওম্প্রকাশ বললে, "আমার চেহারাটা বোধ হয় নায়ক হবার অযোগ্য নয়। আর অভিনয়ের পরীক্ষা হবে রিহার্শাল ঘরে। তোমাদের প্রাইমা ডোনা মিস্ টেম্পেস্টেরও বোধ হয় আপত্তি হবে না।"

মেরী বললে, "কি আশ্চর্য, ব্যান! আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি।"

ওম্প্রকাশ যে কি আশ্চর্য অভিনয় করতে পারে তা সত্যিই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেল রিহার্শালে। অদ্ভুত স্বচ্ছন্দ সাবলীল অভিনয় তার। জড়তা নেই, কুণ্ঠা নেই, নেই আত্মসচেতনতা, অভিনয়কে অভিনয় বলে বোঝাই যায় না। অ্যালেন খুশী হয়ে বলে উঠলো, "ব্রেভো ব্যানার্জী। ইউ আর এ প্যারাগন। তুলনা নেই তোমার।"

নায়িকা মিস্ টেম্পেস্ট উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো, "ইউ আর এ বর্ন্ অ্যাক্টর ব্যানার্জী, এ বর্ন্ লাভার।" ওম্প্রকাশের মনে হলো মিস্ টেম্পেস্টের দু'চোখ উঠেছে ছলছলিয়ে, কণ্ঠস্বর উঠেছে আবেগে কম্পিত হয়ে। ওদিকে ঝাপসা মেঘ ছেয়ে আসছে মেরীর দুটি চোখের আকাশে।

অল্প রিহার্শালে আর স্মারকের নেপথ্য সহায়তায় ওম্প্রকাশ আর্ভিং থিয়েটারের মঞ্চে যে অভিনয় করলে, লণ্ডনের সব থিয়েটারী সমালোচকরা

একবাক্যে বললে এমন চমৎকার স্বাভাবিক প্রেমের অভিনয় লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে শীগগির দেখা যায়নি।

এরপর কেমন্ যেন বদলে গেল মেরী। বাইরের ব্যবহার আগেকারই মতো, কিন্তু তার সঙ্গে যেন মিশে নেই অন্তরের সুরটুকু। কোথায় যেন বিরাট একটা ফাঁক, সেটা শুধু অনুভব করা যায়, আঙ্গুল দিয়ে সোজা দেখিয়ে দেওয়া যায় না। সব কথা ছাপিয়ে মেরীর ছোট্ট একটি কথা জেগে রইল ও. পি. ব্যানার্জীর মনে, "এত ভালো প্রেমের অভিনয় তুমি করতে পারো তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি ব্যান।"

'অভিনয়' কথাটার ওপর জোর দিয়েছিল মেরী।

যথাসময়ে হয়ে গেল ব্যারিস্টারি পরীক্ষা, ওম্‌প্রকাশ হলো ব্যারিস্টার। বাবার চিঠি এলো ভারত থেকে—যেমন আশা করেছিলো ও. পি.—"এবারে ফিরে এসো ওম্‌প্রকাশ।" সঙ্গে সঙ্গিনী হতে রাজী হলো না মেরী। বললে, "আমার স্বপ্নের ভারত আমার স্বপ্নেই জেগে থাক ব্যান, কাজ কি ভারতে গিয়ে আমার সে মধুর স্বপ্ন ভেঙ্গে ফেলে?"

ওম্‌প্রকাশ বললে "তোমায় না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে মেরী।"

"কিছু হবে না ব্যান! এ তোমার অভিনয় মাত্র। হয়তো তুমি নিজেও বুঝতে পারছো না, কিন্তু আমি জানি এ তোমার অভিনয়।"

ওম্‌প্রকাশের উচ্ছ্বাস যত বেশী ব্যাকুল হয়ে উঠলো, ততই বেশী করে মেরীর মনে হতে লাগলো ব্যানার্জীর এ শুধু নিখুঁত অভিনয় মাত্র—আশ্চর্য অভিনেতা ওম্‌প্রকাশ ব্যানার্জী! সমস্ত অনুনয়, সমস্ত বিনয়, সব কিছু ব্যর্থ হলো। ওম্‌প্রকাশ নিখুঁত অভিনেতা, এই কথাটা ভূতে পাওয়ার মতো চেপে রইলো মেরী ফারকুহারসনের মনে।

মেরীর মন পেয়েও হারিয়ে বিলেত বিস্বাদ হয়ে উঠলো ও. পি. ব্যানার্জীর কাছে। মেরী-বিহীন একাই ফিরে এলেন তিনি ভারতে, ভাঙা হৃদয় আর আস্ত ব্যারিস্টারী ডিগ্রী নিয়ে। মিস্ টেম্‌পেস্টকে তার হৃদয়ের রাণী মেরী ফারকুহারসন কল্পনা করে নিয়ে মঞ্চের ওপর প্রাণ ঢেলে প্রেমের

অভিনয় করেছিলেন তিনি, টেম্‌পেস্টকে মেরী ভেবে নিয়েছিলেন বলেই তার প্রেমের অভিব্যক্তি অমন জীবন্ত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু সেই জীবন্ত অভিনয়ই তার কাল হলো।

কাহিনী শেষ করে ব্যারিস্টার বনার্জী সাহেব বললেন, "চলে আসবার সময় আমায় জাহাজে তুলে দিতে এসেছিলো মেরী ফারকুহারসন আর সেই রিচার্ড অ্যালেন। মেরীর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। শেষ বিদায়ের বেলা তার চোখে যে দু'ফোঁটা অশ্রুর আভাস দেখেছিলাম, সে আমি আজো ভুলতে পারিনি। মেরী সত্যি আমায় সারা হৃদয় দিয়ে ভালো-বেসেছিলো, ধনপতিবাবু। ওর চোখে স্পষ্ট দেখেছিলাম ভালোবাসার আলো।"

ভাবলাম একবার বলি, "হয়তো সেও তার অভিনয়, নিখুঁত অভিনয়।" কিন্তু ব্যারিস্টারের চোখের দিকে তাকিয়ে ওকথা বলতে পারলাম না।

"বিলেত থেকে ফিরে এলুম ব্যারিস্টারী পাশ করে," বললেন ও. পি. বনার্জী, বার-অ্যাট-ল, "কিন্তু সঙ্গে এলো না মেরী আমার জীবন-সঙ্গিনী হতে। আমার প্রেমের অভিব্যক্তিকে অভিনয় বলে' ভুল করে সে আমায় অবিশ্বাস করে দূরে সরে গেল। দেশে ফিরে এসে মনে হতে লাগলো বৃথাই হলো ব্যারিস্টারী পাশ, যদি পাশে না রইলো মেরী।"

"মেরীকে যে কত ভালোবেসেছিলুম সেটা ভারতে ফিরে যেন আরো গভীরভাবে বুঝতে লাগলুম।" বলতে লাগলেন ব্যারিস্টার বনার্জী সাহেব। "প্রবাদে বলে চিত্ত জখম হলে তার সেরা দাওয়াই হচ্ছে সময়ের মলম। কিন্তু সময় যত গত হতে লাগলো, মেরীকে হারানোর ব্যথা আমার চিত্ত জুড়ে তত বেশী জোরালো হয়ে উঠতে লাগলো। বাবা বললেন—ব্যারিস্টারী সুরু করো। করলুম। কিন্তু বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলুম দু'দিন বাদে। কার

জন্যে করবো ব্যারিস্টারী? তা ছাড়া বাবার ব্যাংকের পুঁজি আর স্থাবর সম্পত্তি যা ছিলো তাতে সারা জীবন ব্রীফলেস ব্যারিস্টারী করা চলতো যদি না…”

মেরী-হীনতার ব্যথা ভুলবার জন্যে নিজের মনটাকে নানাদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন বনার্জী সাহেব। হলেন বিভিন্ন ক্লাবের মেম্বার। খেলতে লাগলেন টেনিস, গল্‌ফ, ব্যাডমিণ্টন, ব্রীজ। সুইমিং কস্ট্যুম পরে' কাটতে লাগলেন সাঁতার। কিন্তু বৃথা, বৃথা, বৃথা। মেরীকে ভুলে যাবার প্রাণপণ প্রয়াস বার বার ব্যর্থ হয়ে যেতে লাগলো।

এ হেন সময় মারা গেলেন বনার্জী সাহেবের বাবা। মৃত্যু এলো তাঁর জীবনে হঠাৎ; তিনি আশা করেছিলেন আরো কিছুদিন বাঁচবেন। যাবার সময় বলে গেলেন, “আমি দেখে যেতে পারলুম না, কিন্তু এবার বিয়ে থা করে সংসারী হও ওম্‌প্রকাশ। নইলে·· ”

বাবার এই শেষ অনুরোধ রাখতেই হবে, পণ করলেন ওমপ্রকাশ। ভাবলেন মেরী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে উচিত শিক্ষাই দিয়েছে, এর পেছনে ছিলো বিধাতার ইঙ্গিত। বিজিত জাতির ছেলে হয়ে সে চেয়েছিলো বিজেতা জাতির মেয়েকে গৃহলক্ষ্মীর আসনে এনে বসাতে। এ আঘাত তাঁর পাওনা ছিলো, মেরী উপলক্ষ্য মাত্র। যে আসনে এসে বসতে রাজী হয়নি সেই বিদেশিনী মেয়ে, সে আসন ধন্য করুক এ দেশের কোনো কল্যাণী। কিন্তু কে সেই মেয়ে? কোথায় সেই মেয়ে? মেরীকে ভালোবেসে যে হৃদয় বিভোর হয়ে আছে, সে হৃদয়ের ভালোবাসা আকর্ষণ করবে, কোথায় মেরীর সেই ভারতীয়া প্রতিদ্বন্দ্বিনী? হৃদয় জুড়ে আছে শুধু মেরী—মেরী—মেরী—মিস্ মেরী ফার্‌কুহারসন!

কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিলেন ব্যারিস্টারের জন্যে উচ্চ বেতনে উপযুক্ত লেডী সেক্রেটারী চাই। অনেক দরখাস্ত থেকে বেছে আমন্ত্রণ পাঠালেন কুমারী মীরা মুখোটীকে। কুমারী মুখোটী এলেন দেখা দিতে। সাক্ষাৎ-কারের সুরুতেই একটু জড়তা বোধ করেছিলেন মিস্ মুখোটী, কিন্তু সে জড়তা অবিলম্বে অনায়াসেই কাটিয়ে দিলেন বনার্জী এমন সহজভাবে কথা

বলে, যেন তাঁদের পরিচয় অনেক দিনের। অল্প আলাপে অন্তরঙ্গ হবার এবং হওয়াবার ক্ষমতা অসাধারণ বনার্জী সাহেবের।

বিদেশিনী মেরীর যেন এদেশিনী সংস্করণ মীরা। মেরীর পেছনে ফারকুহারসনের মতো মীরার পেছনে মুখোটী। আর মেরী নামের সব চাইতে কাছাকাছি এদেশী নাম হচ্ছে মীরা। শুধালেন, "আইন বিষয়ে আপনার কিছু জ্ঞান আছে কি মিস্ মীরা?"

মীরা মুখোটী বললেন, "নেই।"

"স্প্লেন্ডিড!" বললেন ব্যারিস্টার বনার্জী।

বনার্জীর কণ্ঠস্বর এবং বাচনভঙ্গীর আন্তরিকতা লক্ষ্য না করলে মিস্ মুখোটীর হয়তো সন্দেহ হতো তিনি পরিহাস করছেন।

"আপনার হাতের লেখা দেখেছি আপনার আবেদন-পত্রে।" বললেন বনার্জী। "চমৎকার। ইংরেজিতে অনার্স গ্র্যাজুয়েট আপনি। স্প্লেন-ডিড। ইংরেজি ভাষা আর সাহিত্যের তুলনা নেই, মিস্ মীরা। আন্‌প্যারালেল্‌ড্। যেমন তুলনা নেই ইংল্যাণ্ডের—দি সুইটেস্ট কানট্রি ইন দি ওয়ার্লড্। জন্মসূত্রে যদি ভারতীয় না হতুম, তা হলে—"

"ইংল্যাণ্ডে জীবন কাটাতেন?"

"দ্যাট্‌স্ ইট্।" বললেন বনার্জী। "ইংল্যাণ্ডে জীবন কাটানো আমার হয়ে উঠলো না। সে অনেক কথা। কিন্তু এখানে—আমার বাড়ীতে অন্তত—ভুলে থাকতে চাই আই অ্যাম নট্ ইন্ ইংল্যাণ্ড। আপনি পারবেন আমায় ভুলিয়ে রাখতে, যদি আমার সেক্রেটারী হন?"

কথাগুলো হয়তো মাতালের প্রলাপের মত শোনালো। মিস্ মুখোটী বললেন, "তা আমি কি করে পারবো মিস্টার বনার্জী? তা ছাড়া নিজের দেশকে নিজের দেশ বলে ভাবতে আপনার দ্বিধা কেন?"

"আমার নিজের দেশ হচ্ছে ইংল্যাণ্ড, মিস্ মীরা। ভারতে আমি জন্মে ফেলেছি ভুল করে—পিওর অ্যাক্সিডেণ্ট অভ বার্থ। আপনি পারবেন, নিশ্চয় পারবেন, আর সেক্রেটারী হয়ে সেই হবে আপনার বড় কাজ।"

হাসলেন মীরা মুখোটী। বললেন, "চমৎকার কাজ বটে। পারিশ্রমিকের অঙ্কটা কি রকম ?"

"ধরুন মাসিক পাঁচশো টাকা। যথেষ্ট হবে কি ?"

"অন্তত অযথেষ্ট নয়। ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত ডিউটি ?"

"সেক্রেটারীর ডিউটি তো ঘড়ির কাঁটা হিসেব করে হয় না মিস্ মীরা। এনি টাইম্ ইজ ডিউটি টাইম্ ফর এ সেক্রেটারী।"

"তার মানে আপনার সেক্রেটারীকে আপনার এখানেই থাকতে হবে ? মাপ করবেন মিস্টার বনার্জী। ভুলে যাবেন না এটা ইংল্যাণ্ড নয়, ভারতবর্ষ। আর আমি ভারতীয়া।"

"এই দেখুন। যা ভুলে থাকতে চাই তাই আপনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, মিস্ মীরা।"

"আমি চলে যাচ্ছি মিস্টার বনার্জী। আমার আবেদন-পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে দিন বাজে কাগজের ঝুড়িতে। তারপর যত খুশী ভুলে থাকুন। নমস্কার।"

বিদায়-অভিবাদন জানিয়ে চলে যাচ্ছিলেন মিস্ মীরা মুখোটী। মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে বনার্জী লক্ষ্য করলেন মীরা মুখোটীর চলে যাওয়ার ভঙ্গীটি অনেকটা বিলেতের সেই মেরী ফারকুহারসনের মতো। তেমনি দৃপ্ত, তেমনি সাবলীল, তফাত শুধু শাড়ীতে গাউনে, স্যাণ্ডেলে হাই-হিলে, কালো খোঁপায় আর বব-করা সোনালী চুলে !

"শুনুন !" পিছু ডাকলেন বনার্জী। মিনতি আর আদেশের বিস্ময়কর সংমিশ্রণ সেই পিছু ডাকে। পিছু ফিরলেন মিস্ মীরা মুখোটী—বোঝা গেল না সেটা মিনতির টানে, না আদেশের টানে। বললেন, "বলুন।"

"তার আগে দয়া করে আপনি বসুন মিস্ মীরা। যা বলবো তা টেলিগ্রামের ভাষায় বলতে চাইনে।" ম্লান মিনতির হাসি খেলে গেল ব্যারিস্টার বনার্জীর চোখে। মীরা মুখোটী বসলেন। বসে আবার বললেন, "বলুন।" এই বলাতে ছিলো অনুমতি দেবার ভঙ্গী।

"আমি ব্যারিস্টার, কিন্তু সাংঘাতিক লোক নই, মিস্ মীরা।" বললেন

বনার্জী। "আমাকে আপনি অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারেন, আর তা যদি পারেন তো আমার সেক্রেটারী হিসেবে এই পৈতৃক প্রাসাদের এক মহলে আপনি নির্ভয়ে নিঃসংকোচে থাকতে পারবেন না কেন?"

"নির্ভয়ে হয়তো পারি, কিন্তু নিঃসঙ্কোচে পারিনে।" বললেন মিস্ মীরা মুখোটী। সঙ্কোচ কোথায় সেটা বুঝলেন বনার্জী—কুমারের গৃহে কুমারীর অবস্থান সমাজের চোখে শোভন হবে না। হয়তো কলঙ্ক রটবে—যাকে ইংরেজীতে বলে স্ক্যানডাল, আর যাকে ভয় করেন বাঙ্গালী মেয়ে মীরা মুখোটী।

কিন্তু মীরাকে তাঁর চাইই। চিরহারানো মেরীর এত কাছাকাছি আর কাকে পাবেন তিনি? এই মীরাই তাঁর শেষ আশা, একমাত্র আশা; এরি মধ্যে মেরীকে লাভ করতে হবে তাঁকে। মীরার মধ্যে মেরীকে কল্পনা করলেন ব্যারিস্টার বনার্জী।

"চরিত্র হারাবার সুযোগ আর সামর্থ্য দুই-ই ছিল।" বললেন বনার্জী। "এখনও আছে। তবু চরিত্র হারাইনি মিস্ মীরা। আমাকে যাঁরাই জানেন তাঁরাই জানেন আমার চরিত্রে দাগ লাগেনি। কিন্তু এমনি ছন্নছাড়ামির ধারা চালু থাকলে দাগ লাগতে কতক্ষণ?"

"বিজ্ঞাপনের পাতায় আবেদন আহ্বান করেছিলুম।" বলতে লাগলেন বনার্জী। "তারি জবাবে আবেদন পাঠিয়েছিলেন। সে আবেদন যখন পরমানন্দে গ্রাহ্য করলুম আপনি তা হেলায় প্রত্যাখ্যান করলেন। সেই প্রত্যাখ্যানের পর এবার আমার আবেদন পেশ করবার পালা, মিস্ মীরা। অনুমতি চাইতে গেলে পাছে না দেন, সেই ভয়ে অনুমতি না নিয়েই আবেদন পেশ করছি। ব্যারিস্টার ও. পি. বনার্জীর সেক্রেটারী হয়ে আসতে যদি না চান, তাহলে এ গৃহে গৃহলক্ষ্মী হয়ে আপনি আসতে পারেন না কি? লক্ষ্মীহীন এ শূন্য পুরী মিস্ মীরা, আপনি কি তাকে—"

গভীর আবেগের উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ করে ফেললেন অভিনেতা ব্যারিস্টার বনার্জী।

অসাধারণ সম্মোহনী যাদু ছিল বনার্জীর কণ্ঠে, আর সে বিষয়ে

অসাধারণ সচেতন ছিলেন বনার্জী। নিজের সম্মোহনী কণ্ঠস্বরের জাল বুনে চললেন মিস্ মীরা মুখোটীকে ঘিরে।

আরো বলতে লাগলেন, "মদ খায় অথচ ব্যারিস্টারী করে না এহেন লোক পথে-ঘাটে, কিন্তু ব্যারিস্টার অথচ মদ খায় না এমন লোক বিরল। আমি ব্যারিস্টার অথচ মদ খাইনে। গ্যালন গ্যালন মদ অনায়াসে চালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু এক ফোঁটাও স্পর্শ করিনে। এতবড় বাড়ী তচনচ করে ফেললেও এক ফোঁটা মদের সন্ধান পাবেন না। এ আপনি আমার বাট্‌লারকে শুধালেই জানতে পারবেন। জ্যাক্‌সন!"

মিস্ মুখোটী ভাবলেন 'বাট্‌লার' অর্থাৎ ভৃত্যকে ডাকা হচ্ছে বনার্জীর নির্মল চরিত্রের সাফাই সাক্ষ্য দিতে। অত্যন্ত সংকোচ বোধ করে বললেন, "জ্যাক্‌সনকে সাক্ষী মানবার দরকার নেই মিস্টার বনার্জী।"

ততক্ষণে জ্যাক্‌সন এসে দাঁড়িয়েছে সেলাম ঠুকে, বিলিতী বাট্‌লারের মতো পোশাক-পরা এদেশী ছোকরা। পিতৃদত্ত নাম জয়কিষণ।

বনার্জী টেলিগ্রাফের ভাষায় বললেন, "অরেঞ্জ—টু।" অনতিবিলম্বে দু' গ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ এলো রেফ্রিজারেটর থেকে। দুটি গ্লাসে দুটি নকল খড় বসানো, তাই দিয়ে একটু একটু করে রসিয়ে রসিয়ে 'সিপ' করে করে পান করা হবে বুক জুড়ানো অরেঞ্জ স্কোয়াশ। মিস্ মুখোটীর গ্লাস খালি না হওয়া পর্যন্ত হৃদয়ের খই মুখে ফোটাবার সুযোগ পাবেন ব্যারিস্টার বনার্জী।

ক্রমে যখন মিস্ মুখোটীর গ্লাসের অরেঞ্জ স্কোয়াশ শেষ হয়ে গেল (তার আগে অনেক মিঠে কথা আর মিছে কথা বলে ফেলেছেন বনার্জী) তখন বনার্জী বললেন, "বাবার উইল করে পিছে ফেলে যাওয়া বিরাট ঐশ্বর্য নিয়ে আমি একা একা হাঁফিয়ে উঠেছি, অসহ হয়ে উঠেছে জীবন। এই ঐশ্বর্যের একচ্ছত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে আপনি এসে আমার পাশে দাঁড়ান মীরা দেবী, আমি করজোড়ে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।"

ঐশ্বর্যের প্রলোভনে বোধ হয় মিস্ মুখোটীর আত্মমর্যাদা আহত হলো। তিনি বললেন, "ঐশ্বর্যের মোহ আমার নেই মিস্টার বনার্জী।

দারিদ্র্যকে ঘৃণা করি, কিন্তু ঐশ্বর্যকে ঘৃণা করি তার চাইতেও বেশী। ঐশ্বর্য অমানুষকে মানুষ করে না, কিন্তু মানুষকে অমানুষ বানাতে তার জুড়ি নেই।"

"এগ্‌জ্যাক্‌টলি সো।" বললেন বনার্জী। "আমিও ঠিক তাই ভেবে আসছি। পৈতৃক ঐশ্বর্যের বোঝা আমার ওপর অভিশাপ হয়ে চেপে আছে, এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রাণ আমার হাহাকার করছে। আমার এই মুক্তি অভিযানে সহ-অভিযাত্রিনী হয়ে আমার পাশে এসে কি দাঁড়াতে পারেন না মীরা দেবী?" অসহায় আবেদনের সুর ব্যারিস্টার বনার্জীর কণ্ঠে।

মিস্ মুখোটী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ব্যারিস্টার বনার্জীর পানে। হয়তো ভাবতে লাগলেন মদ না খেয়েও মানুষ মাতাল হতে পারে কিনা। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "ক্ষমা করবেন, আমার মনে হচ্ছে আপনি হয়তো আজ অসুস্থ, মিস্টার বনার্জী।"

বললাম, "এভাবে কাহিনী চললে একটি সপ্তকাণ্ড উপন্যাস হয়ে যাবে বনার্জী সাহেব। অতএব সোজা বলে দিন শেষ পর্যন্ত মীরা মুখোটীকে আপনি বিয়ে করলেন কিনা।"

"দ্যাট্‌স্ ইট্! শেষ পর্যন্ত মিস্ মীরা মুখোটীকে আমি বিয়ে করলুম।" কাহিনী সংক্ষিপ্ত করে বললেন ও. পি. বনার্জী বার-অ্যাট-ল। "এত সংক্ষেপে বোঝানো গেল না কত বেগ পেতে হয়েছিলো মীরাকে রাজী করাতে। বিলেতের মেরী ফারকুহারসনের মতো বাংলার মীরা মুখোটীও হয়তো ভেবেছিলেন আমি অভিনয় করছি। অবশ্য খানিকটা অভিনয় তো বটেই। কেন না সত্যিই তো মীরা মুখোটীকে আমি চাইনি। চেয়েছিলেম মেরীকে, কিন্তু তাকে পাইনি। আপনাদের দেশের ভক্তরা চায় ভগবানকে, ভগবানকে না পেয়ে পুজো করে তার মূর্তিকে, ঐ মূর্তির ভেতরেই নেয় ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা করে। আমিও তেমনি মীরাকে পেয়ে তাকে মেরী রূপে কল্পনা করতে লাগলুম। তারপর মীরাকে বললুম—মীরা নাম আর চলবে না, মীরা বদলে করতে হবে মেরী। মিসেস্ মীরা বনার্জী নয়—

মিসেস্ মেরী বনার্জী। পিতৃদত্ত নাম বদলাতে প্রথমটা একটু কেমন কেমন করছিল মীরা, কিন্তু শেষটায় হয়তো বুঝলে পিতৃদত্ত নামের চাইতে পতিদত্ত নামের দাবীর জোর কম নয়। তাই শেষ পর্যন্ত খুশী মনে—অন্তত খুশীর ভাব দেখিয়ে—মীরা হয়ে গেল মেরী। ভুলে গেলুম মীরার নাম, তাকে ডাকলে লাগলুম মেরী বলে। সে ভাবলে এ আমার এক খামখেয়াল। বুঝলে না ঐ মেরী নামের পেছনে রয়েছে লণ্ডনের মেরী ফারকুহারসন্।"

"হ্যাঁ, কি যেন বলছিলুম?" হঠাৎ শুধালেন ব্যারিস্টার ও. পি. বনার্জী, বেশ কিছুক্ষণ আনমনা নীরবতার পর।

"মীরা মুখোটীকে আপনি মিসেস বনার্জী বানালেন। আর তাঁকে কল্পনা করতে লাগলেন লণ্ডনের বান্ধবী মেরী ফারকুহারসন বলে।" বললেম আমি।

আমাকে একতরফা শ্রোতা বানিয়ে বনার্জী বলে চললেন মীরাকে-মেরী-করণ-সাধনার ইতিহাস। অনেক কথা বললেন তিনি, তাদের আড়ালের না-বলা অনেক কথা আভাসে জেনে নিলেম কতক মগজ দিয়ে কতক হৃদয় দিয়ে। অনেক কিছু ধরা পড়ল আমার মনের চোখে, বনার্জীর যা নজরে পড়েনি। তাঁর বলা কাহিনীর না-বলা ফাঁকগুলো ভরিয়ে নিয়ে আপন মনে রচনা করে নিলুম তাঁদের বিবাহিত জীবনের কাহিনী।

মীরা এসেছিলো বনার্জীর একাধারে সেক্রেটারী এবং জীবন-সঙ্গিনী হয়ে এই আশায় যে বনার্জীর বিলিতিয়ানা ক্রমে ক্রমে কমিয়ে এনে বাঙালীর ছেলেকে বাঙালীতে পরিণত করবে। বনার্জীর বিলিতিয়ানার এতটা প্রাবল্য আশা করতে পারেনি সে।

মীরার মন বিরক্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু তা সংগোপনে। প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করলে না মীরা। ভাবলে গোড়াতেই খামখেয়ালী স্বামীর খেয়ালে বাধা দিতে গেলে উলটো ফল হতে পারে, অতএব কিছুদিন সয়ে থাকা যাক; তারপরে স্বামীর এই খেয়ালের নদীতে জোয়ার ফুরিয়ে গিয়ে আসবে ভাঁটা, যা করবার তখনই করা যাবে।

তারপর একদিন মীরা আপন দেহে টের পেলো আগামী মাতৃত্বের

আগাম জানানী। খুশী হয়ে উঠলো মন, আর সঙ্গে সঙ্গেই ভরে উঠলো আশংকায়। যদি তার সন্তান পিতার বিলিতিয়ানার উত্তরাধিকারী হয়? জন্ম থেকেই তার সন্তান বিদেশী ভাবাপন্ন হবে এ কল্পনা অসহ্য হয়ে উঠলো মীরার। সন্তান-সম্ভবা মেয়েদের চিন্তাধারার প্রভাব পড়ে দেহস্থ সন্তানের মনের গঠনে, কি একখানা বইতে পড়েছিলো মীরা, তাই বনার্জী ভবনের বিলিতী আবহাওয়া আর বিলিতী পরিবেশ তার পরম উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠলো। এদের প্রভাব পড়ছে তার মনে, আবার তার মনের ছাপ পড়ে যাচ্ছে তার আসন্ন সন্তানের কাঁচা নরম মনে। ভাবী সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠলো মীরা। জেদ করে বিলিতিয়ানা বর্জন করে ধরলে উগ্র-হিন্দু বাঙালিয়ানা।

"এ সময়ে মেয়েদের রুচি-ভেদ, প্রকৃতি-ভেদ ইত্যাদি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় মিঃ বনার্জী।" ইংরেজিতে বললেন বহুবার বিলেত-ফেরত বহু-বিলিতী-ডিগ্রিওয়ালা বিখ্যাত ডাক্তার। "এখন যথাসম্ভব ওঁর পছন্দ মতো ওঁকে চলতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, যেন কোনো কারণে ওর মনে দুঃখ, ভয়, রাগ বা অন্য কোনো রকম অপ্রিয় ভাবের উদয় না হয়।"·········ইত্যাদি। বিলেত-ফেরত ডাক্তারের বিলিতী ভাষায় কথা বেদবাক্যের মতো মেনে নিলেন ব্যারিস্টার বনার্জী।

এলো সন্তান। ছেলে নয়, মেয়ে। বনার্জী চেয়েছিলেন পুত্র-সন্তান, তাকে সাহেব বানিয়ে তুলবেন এই আশায়; আর ঠিক এই আশংকা করেই কন্যা কামনা করেছিল মীরা। মীরার কামনাই পূর্ণ হলো, আশা ভঙ্গের আঘাত লাগলো ব্যারিস্টারের বুকে।

সাত তাড়াতাড়ি মেয়ের নামও রেখে দিলে মীরা। স্বামীকে কায়দা করে ইংরিজিতে বললে, "কথা দাও একটা কথা রাখবে।"

বাংলা-বিলাসিনী মীরার ইংরিজি আবদার শুনে হঠাৎ খুশী হয়ে উঠলেন বনার্জী, এর আড়ালে পাতা ফাঁদটুকু এলো না তাঁর সন্দেহের আওতায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিনা দ্বিধায় বিনা শর্তে কথা দিলেন কথা রাখবেন।

মীরা বললে, "মেয়ের নাম হোক বিপাশা। অনেক ভেবে এ নামটা রেখেছি।" বনার্জী সাহেব মনে মনে ক্ষেপে উঠলেন এ নাম শুনে। ভেবেছিলেন পুরো ইংরিজি নাম রাখবেন মেয়ের, তা নয় মীরা নাম ঠিক করলে অতি-ভারতীয় কায়দায়। কিন্তু ইংরেজ কথা দিয়ে ফেললে সে কথার আর নড়চড় করে না। সুতরাং মীরার দেওয়া নামটিকে মেনে নিতে হলো বনার্জী সাহেবকে, মেয়ের বিপাশা নামটাই কায়েম হয়ে গেল।

মীরার মধ্যে মেরীকে পাওয়ার সকল সাধনা ব্যর্থ বোধ করলেন বনার্জী। মেরীর সঙ্গে মীরার প্রভেদগুলো বড়ো হয়ে উঠলো তাঁর মনে, আর তারি সঙ্গে বড় হয়ে উঠলো মেরীকে না পাওয়ার বেদনা। "মেরী! মেরী! মেরী!"—বলে আর্তস্বরে ডেকে উঠলেন বনার্জী, মীরার দিক থেকে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে। সে ডাক শুনে চমকে উঠলো মীরা। যে সুরে মীরাকে মেরী বলে এতদিন ডেকে এসেছেন বনার্জী সাহেব, এ মেরী-র সুর তা থেকে আলাদা। আজকের মেরী ডাকে ঝরে পড়লো খাঁটি বেদনা, তারি সঙ্গে তুলনায় ধরা পড়ে গেল এতদিনের মেরী ডাকে ছিলো মেকী আবেদন। মীরার মনে হলো এ মেরী ডাকের লক্ষ্য সে কোনোদিনই নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। তবে এ ডাক কাকে লক্ষ্য করে? কাকে? কাকে? কাকে?

"আসল বিরোধ, বাধলো মেয়েকে নিয়ে!" বলতে লাগলেন মিস্টার বনার্জী। "মীরা চাইলে বিপাশাকে ভারতীয় আদর্শে গড়ে তুলতে। আমি তাকে সোজা বলে দিলুম, শি মাস্ট বি এভ্রি ইঞ্চ অ্যান্ ইংলিশ গার্ল। কিন্তু এ বিরোধ বেশীদিন টিকলো না ধনপতিবাবু।"

"মিটমাট হয়ে গেল?"

"একেবারে মিটে গেল। একদিন হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল মীরা।" বললেন বনার্জী। "মীরা চলে গেলে পর মনে হলো মীরাকে ছলনা করতে গিয়ে ক্রমে নিজেকেই ছলনা করেছিলুম নিজের অজানিতে। মীরাকে মেরী কল্পনা করে ভালোবাসার ভান করতে গিয়ে মীরাকেই ভালোবেসে ফেলেছিলুম, দেবতার পাওনা বিগ্রহকে দিতে দিতে ভক্ত যেমন ক্রমে ঐ

বিগ্রহকেই ভালোবেসে ফেলে। আমার ছলনা বুমের‍্যাং-এর মতো আমারি ওপর ফিরে এসে লাগ্‌লো।"

শুধালেম, "যাবার আগে শেষ কথা কিছু·····"

"তাই তো বলতে যাচ্ছি ধনপতিবাবু। আই ওয়াজ জাস্ট কামিং টু ত্যাট্। শেষ রওনা হয়ে যাবার আগে মীরা আমার হাত ধরে বললেঃ বিপাশাকে সঁপে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। যাবার আগে জানিয়ে যাই আমার শেষ কামনা, বিপাশাকে তুমি গড়ে তুলো—"

এই পর্যন্ত বলে চিরদিনের মতো নীরব হয়ে গেল মীরা, বলে গেল না বিপাশাকে বনার্জী গড়ে তুলবেন বনার্জীর ইচ্ছে মতো বিলিতী কায়দায়, না ভারতীয় কায়দায়। কিসে তৃপ্তি পাবে ৺মীরার আত্মা? সে কথা ঠিক করে জানবার কোনো উপায় নেই। হয় তো ভারতীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা মীরার মনে অটুট ছিলো শেষতক, অথবা হয় তো স্বামীর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক এই হয়েছিলো তার শেষ ইচ্ছা।

"তাই" বললেন বনার্জী, "বিপাশার গড়ে ওঠা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করলুম আমি। বিপাশার ওপর আমার কোনো রকম ইচ্ছে অনিচ্ছে, পছন্দ অপছন্দ না চাপিয়ে বিপাশাকে দিলুম পুরো স্বাধীনতা। ও চায় যেমন করে গড়ে উঠতে, তেমনি করে গড়ে উঠুক। আমার কর্তব্য হলো শুধু সব রকম সুযোগ ওর হাতের সামনে তুলে ধরা, তাই থেকে পছন্দমতো আপন খেয়াল খুশীতে বেছে নিক বিপাশা। মাকে হারালো অল্প বয়সে এইটে সে বুঝতে পেরেছিলো, কিন্তু আয়া, গভর্ণেস্, নৌকর-নৌকরাণীর ভিড়ে মা-হারানোর ট্র্যাজেডিকে সে ঠিক ট্র্যাজেডি বলে বুঝতে পারেনি। ক্রমে ভুল বাংলা আর শুদ্ধ ইংরিজি চমৎকার শিখতে লাগলো বিপাশা। তারপর পুরোদস্তুর সোসাইটি গার্ল হয়ে উঠে বেপরোয়া ঘোরাতে লাগলো অনেক সোসাইটি বয়কে নিজের আঙ্গুলের ডগায় আপন খেয়ালে। জনা কয়েক রীতিমতো পয়সাওয়ালা ঘরের ছোকরা বিপাশাকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেও উঠেছিলো, বিপাশা পাত্তা দেয়নি, আকাশের পাখী চায় নি খাঁচায় বন্দিনী হতে। তারপর বিপাশা যখন টের পেলো তার

বাপের ঐশ্বর্যের ভিত গেছে খসে, বাইরের ঠাটের আড়ালে সব ফাঁকা, বাড়ীখানা পর্যন্ত দেনায় বাঁধা, তখন বিপাশার পাণি প্রার্থনা করবার উমেদার আর নেই। বাজারেও কানাঘুষোয় জানাজানি হ'য়ে গেল সব কিছু ফুঁকে বসেছে ও. পি. বনার্জী, বার-অ্যাট্-ল, রেস্ খেলে।"

"সত্যিই সব রেস খেলে উড়িয়েছেন ?"

"শুধু রেসই খেলিনি ধনপতিবাবু। টাকা দিয়ে বেপরোয়া ছিনিমিনি খেলেছি। খেলা সুরু করেছিলুম মীরা থাকতেই, খেলায় আরো ক্ষেপে উঠলুম মীরা চলে যাবার পর থেকে। তাহলে খেলার গোড়া থেকেই বলি শুনুন।"

বলে গোড়া থেকেই সুরু করলেন বনার্জী সাহেব। মীরার দেহে বিপাশা তখনো আসে নি, আগমন বেশী দূরেও নয়, এমন সময় বিলেত থেকে ফিরে এলেন ভানু গুপ্ত।

তিনি এসে খবর দিলেন, বনার্জীর বিয়ের খবর পৌঁছেছে মেরী ফারকুহারসনের কানে। মেরী ভালোই আছে—এখনো কুমারী। রিচার্ড অ্যালেনকেই হয়তো বিয়ে করবে।

গুপ্ত লক্ষ্য করলেন মীরাকে মেরী বলে ডেকে মেরীকে বনার্জী কল্পনায় পেতে চাইছেন মীরার ভেতর ; মেরীকে ভোলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তেমনি মীরাকেও তিনি জানতে দিতে চান না মেরীর কথা, ভেঙে দিতে চান না মীরার স্বপ্নসুখ, মিথ্যার স্বর্গ, ফুলস্ প্যারাডাইজ্। মেরীর প্রেমে তখনো হৃদয় ভরা বনার্জীর, মেরী তাঁকে ভুললেও তিনি পারেননি মেরীকে ভুলতে। বনার্জীর ভয় হতে লাগলো, ভানুদা কখন মেরীর কথা মীরাকে বলে বসেন, মিনতি করে মানা করলেন ভানু গুপ্তকে —অস্ত্র তুলে দিলেন ভানু গুপ্তের হাতে, ভয় দেখাবার, 'ব্ল্যাক্‌মেইল্' করার অস্ত্র। প্রকারান্তরে মীরাকে মেরীর কথা বলে দেবার ভয় দেখিয়ে যখন তখন বনার্জীর ভারী পকেট মারতে সুরু করলেন ভানু গুপ্ত।

বনার্জীকে ঘোড়-দৌড়ে টাকা ওড়াবার নেশা ধরালেন ভানু গুপ্ত। বললেন, "জীবনে একটা নেশা চাই হে বনার্জী, যাতে একেবারে মশগুল

হয়ে ভুলে থাকতে পারো। নইলে মেরীর কথাই ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাবে যে।"

শুধু ঘোড়-দৌড় নয়, আরো নানা রকমের জুয়ায় ভানু গুপ্ত নামালেন বনার্জীকে। পরের পয়সায় ছিনিমিনি খেলে আর খেলিয়েই এই দুনিয়ার ভানু গুপ্তদের আনন্দ।

নেশা ধরাবার ক্ষমতা ভানু গুপ্তের অসামান্য। অসামান্য নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন ব্যারিস্টার বনার্জী। বিশেষ করে তাঁর মনে হতে লাগলো মিস্ মীরা মুখোটী মিসেস্ বনার্জী হবার আগে বলেছিলেন, "দারিদ্র্যের চাইতে ঐশ্বর্যকে ঘৃণা করি বেশী।" তা বেশ। তা হলে এই ঘৃণিত ঐশ্বর্যকে আর যত্ন করে পুষে রাখা কেন? হু হু করে বেরিয়ে যাক্ এর স্রোত, আর তারি তীরে দাঁড়িয়ে দেখা যাক তামাসা। ঐশ্বর্যের সিগারেট উড়ে যাক ধোঁয়া হয়ে—ধোঁয়া হওয়াতেই তো তার একান্ত সার্থকতা।

"তারপর চলে গেল মীরা।" বললেন বনার্জী। "ভানুদার সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি, জানিনে তিনি আজ কোথায়, জানিনে বেঁচে আছেন কি না। কাহিনীর জের টেনে আর দরকার নেই ধনপতিবাবু। মীরা চলে গেছে অনেক দিন হলো, আর তার মেয়ে—আমারো মেয়ে—বিপাশা সেদিন তার স্বামীর সঙ্গে হনিমুনে গেল সুইট্জারল্যাণ্ডে। এর পর করবে স্বামীর ঘর। তাদের জন্যে রইলো আমার শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ। এদিকে রইলাম আমি, আর মেরীর এই ফোটোখানা—আই থ্যাংক্ ভানুদা ফর্ ইট।"

অনেক বছর আগে লণ্ডনে তোলা ফোটোতে হাসছেন মিস্ মেরী ফারকুহারসন। মনে হলো সে হাসি যেন কোনো চেনা হাসির মতো। আশ্চর্য!

শুধালেম, "মেরী ফারকুহারসনের এর পরের খবর জানেন নাকি মিস্টার বনার্জী?"

"শুনেছিলুম আমার বিয়ের খবর পাবার কয়েক বছর পর লণ্ডনে এক ভারতীয় ভদ্রলোককেই নাকি বিয়ে করেছিলো মেরী। তারপর যখন মা হবার দিন এলো এগিয়ে, তখন ভারতীয় স্বামীকে নিয়ে নাকি ভারতেই চলে এসেছিলো, যেন তার ভারতীয় সন্তানের মা সে ভারতেই হতে পারে। তারপর কি হলো, তা আমি আজও জানিনে ধনপতিবাবু।"

মেরী ফারকুহারসনের ফোটোখানার দিকে তাকিয়ে ব্যারিস্টার ও. পি. বনার্জীর ছুটি চোখ ছলছলিয়ে উঠলো।

অনাথবাবু বললেন, "বোধিসত্ত্ব চলে গেল ধনপতি। এই দেখ চিঠি।"

বোধিসত্ত্ব লিখেছে, "মাতৃদেবী ও পিতৃদেবের শ্রীচরণেষু। ঘরে আর ভালো লাগিবে না, চলিলাম। আমার জন্য কখনো ভাবিও না।

—বোধিসত্ত্ব।"

বললাম, "গেল, আবার আসবে।"

" 'চলিলাম' লিখে রেখে গিয়ে ফিরে আসবার ছেলে বোধিসত্ত্ব নয়।" বললেন অনাথবাবু। "এ বাড়ীতে বোধিসত্ত্ব আর ফিরে আসবে না। জানতুম প্রজ্ঞা আমার থাকবার নয়। তাই যখন চিরবিদায়ের পথে চলে গেল, কন্যাহারা হবার দুঃখে কেঁদে ভাসালুম না। জানি তোমার মাসী যাবেন তাঁর গুরুর আশ্রমে। স্বামিত্বের অধিকারে তাঁকে দেবো না বাধা। করবো না দুঃখ। কিন্তু বোধিসত্ত্বর বেলায় অ্যাসট্রলজি আমায় ভুল বোঝালে, ফলিত জ্যোতিষ বিফল হয়ে গেল। আমায় একা ফেলে চলে যাবে বোধিসত্ত্ব, এ আমি ভাবতে পারিনি ধনপতি।"

প্রবোধ দেবো কি না এবং কি ভাষায়, ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ অনাথবাবু শুধালেন, "ফ্রয়েডের লেখা পড়েছো ধনপতি?"

বললাম, "কিছু কিছু। তেমন ডুবু ডুবু নয়, ভাসা ভাসা।"

"বোধিসত্ত্বের হয়েছিল যাকে ফ্রয়েড বলেছেন মাদার-ফিকসেশান, মাতৃকেন্দ্রিকতা।" বললেন অনাথবাবু। "মা, মা, মা। শুধু মা-ই ওর মন জুড়ে, বাপের ঠাঁই নেই সেথায়। এই বিদায় নেবার চিঠিটাই দেখ। গোড়াতেই মাতৃদেবী।"

"পিতৃদেবও লিখেছে।"

"পরে, নেহাত চক্ষুলজ্জার খাতিরে। চিঠিখানা টেবিলের ওপর পাথর-চাপা রেখে সে লুকিয়ে চলে গেল। ঠিকই লিখেছিল সেক্সপীয়র ঃ দেয়ার ইজ এ ডিভিনিটি ছাট শেপ্‌স্‌ আওয়ার এণ্ড্‌স্‌। খোদার ওপর খোদকারি চলে না। বিধাতার মতলবই হাসিল হলো। হেরে গেল অনাথ রায়চৌধুরী।"

বললাম, "আপনি বলেছিলেন সেন্টিমেন্টের শেকল কাটার সাধনাই মানুষ হবার সাধনা। আপনার আদর্শে সেই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে আপনার ছেলে ; এই তো আপনার জয় অনাথবাবু। সেন্টিমেন্ট নেই বলেই একবার দেখাও করে গেল না।"

একটু ভেবে অনাথবাবু বললেন, "অথবা হয়তো চক্ষুলজ্জার সেন্টিমেন্ট এড়াতে পারেনি বলেই দেখা করতে পারলে না। যাবার পথে ওঁকারানন্দকে বলে গেছে তোমার মাসীকে সঙ্গে করে নিরালাশ্রমে নিয়ে যেতে। একটু আগেই এসে ওঁকারানন্দ খবর দিয়ে গেল, কাল ভোরে সে ফিরে যাচ্ছে নিরালাশ্রমে। তোমার মাসী কাল চলে যাবে ওঁকারের সঙ্গে।"

"ওঁকারানন্দ কে, অনাথবাবু?"

"তোমার মাসিমার গুরুভাই। শ্রীমৎ নিরালানন্দ বাবাজীর প্রধান শিষ্য। বড়লোক অনঙ্গ চৌধুরীর অতিথি হয়েছে।"

"অনঙ্গ চৌধুরী মানে চৌধুরী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভুজঙ্গ চৌধুরীর বাবা? বৃদ্ধ শুনেছি কোটিপতি।"

"ছিলেন কোটিপতি। এখন কোটিপতিত্ব থেকে পেন্সন নিয়ে নিরালা বাবার মন্ত্রশিষ্য হয়েছেন। অনঙ্গ চৌধুরী এখন তোমার মাসীরও গুরুভাই,

ওঁকারানন্দেরও গুরুভাই। কাল ভোরে এলেই দেখতে পাবে। ভোর সাড়ে ন'টায় ট্রেন।"

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম কাল ভোরে আসবো।

"বোধিসত্ত্বের এই পলায়ন তোমার মাসীর কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। বুঝলে ধনপতি?" বললেন অনাথবাবু। "তাই দেখ গে, তিনি কেমন নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। এক ফোঁটা অশ্রুর আভাস নেই তাঁর চোখে। প্রজ্ঞা যখন চলে গেল অনন্ত ধামে, তখন বুকের ব্যথা চেপে রাখলুম বুকের গহনে, পিটলুম না কান্নার জয়ঢাক। লোকে বললে, লোকটা কি পাষণ্ড, কি পাষাণ! কিন্তু কেঁদে ভাসালেন তোমার মাসিমা। পাড়ার দশজনে সহানুভূতিওয়ালা বাহবার সুরে বললে, 'আহা'।"

কিছু বলা দরকার ভেবে বললাম, "সহানুভূতি দেখাবার সুযোগ পেলে মানুষ খুশী হয়, তাই ধৈর্য দেখে অধৈর্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মাসিমাকে আপনি কোথাও ভুল বুঝে বসে আছেন অনাথবাবু। হয়তো—"

অনাথবাবু ম্লান হাসি হেসে বললেন, "মাসীর ওকালতি আমার কাছে আর নাই বা করলে ধনপতি। বরং তোমার মাসীকে একটু নির্ভুল বুঝবার চেষ্টা করো গে।"

গেলাম সঙ্ঘমিত্রা দেবীর কাছে। অভিমান-ভরা ব্যথিত চোখে তিনি বললেন, "বোধিসত্ত্ব ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে গেল ধনপতি।"

বললাম, "মেসোমশায়ের কাছে শুনেছি মাসিমা। দেখেছি বোধি-সত্ত্বের চিঠিখানা।"

"যাবার আগে একবার মা বলে ডেকে গেল না বোধিসত্ত্ব।" কান্নার চাইতে করুণ কণ্ঠে বললেন সংঘমিত্রা মাসী। "মা ওর জীবনে কেউ নয়, কিছু নয়, বাপই সব। তবু যদি বাপের ভালোবাসা একটু পেতো। বোধিসত্ত্বর এ উধাও হওয়া তোমার মেসোমশায়েরই কারসাজি, ধনপতি। তুমি পুরুষ মানুষ বাছা, তোমার কাছে বলতে নেই—অদ্ভুত তোমাদের চরিত্র, দেবতাদেরও বোঝবার সাধ্যি নেই।"

কথার সুরে বোঝা গেল আবেগের উচ্ছ্বাস প্রাণপণে চেপে রেখেছেন

সংঘমিত্রা মাসী। একটু সামলে নিয়ে বললেন, "কান্না আমার ফুরিয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে চোখের জল। নইলে এখন কেঁদে ভাসিয়ে দিতাম। আজ আমার বুক ভেঙে খান খান হয়ে গেছে ধনপতি!"

আমি বললাম, "আপনি ভুল ধারণা নিয়ে অকারণ দুঃখ পাচ্ছেন মাসিমা। ওদিকে মেসোমশায় বলেন, বোধিসত্ত্ব আপনাকে—"

আমায় থামিয়ে দিয়ে মাসী বললেন, "থাক ধনপতি। কথায় কথা বাড়ালে অকারণ দুঃখ বাড়ে বই তো নয়। ও কথা থাক। বিধিলিপি কেউ খণ্ডাতে পারে না।"

শুধালেম, "আপনি কি কালই গুরুদেবের আশ্রমে চলে যাবেন মাসিমা?"

সংঘমিত্রা মাসী বললেন, "যাবো নয় ধনপতি। যেতে হবে। শ্রান্তি পেয়েছি এতদিন, এবারে শান্তি চাই। কিন্তু ভেবো না, আমি গিয়ে নিরালাশ্রমে আশ্রয় নেবো পরগাছার মতো। ভিক্ষার অন্ন গুরুর আশ্রমেও আমি হাত পেতে নিতে পারি নে, আমি যে প্রজ্ঞাপারমিতার মা। আশ্রমে থাকবো কোনো কাজের ভার নিয়ে। গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতায় কি জিনিস গড়ে উঠেছে গোলাপডাঙার বিরাট এলাকা জুড়ে, তা তুমি নিজের চোখে দেখে না এলে বুঝতে পারবে না ধনপতি। কাল ওঁকারই আমাকে নিয়ে যাবে, তাই তোমাকে আর কষ্ট দিতে হলো না। যদি কষ্ট না মনে করো, যাবে কাল আমাদের সঙ্গে?"

বললাম, "কষ্ট ঠিক মনে করি নে, কিন্তু এখন থাক মাসিমা। প্রথম দেখার আনন্দটা ভবিষ্যতের জন্যে জমা থাক, এখনই ফুরিয়ে ফেলতে চাই নে। অনঙ্গ চৌধুরী শুনলাম আপনার গুরুভাই। চেনেন নাকি তাঁকে?"

"চিনি বই কি বাছা। টাকার পাহাড়ের চূড়োয় বসে তিনি মাথা লুটিয়ে দিয়েছেন গুরুদেবের পায়ের তলায়। আগে কেমন ছিলেন জানি নে, কিন্তু গুরুদেবের আশ্রমের ছায়ায় এসে তিনি অমায়িক, মাটির মানুষ। শুনেছি চৌধুরী বাড়ীর পশ্চিম ধারে একেবারে ওপরতলায় তাঁর আলাদা মহল। সেইখানে একা থাকেন তিনি। কেউ গেলে ভারী খুশী হন।

কোনো বাধা নেই, সবারি জন্যে অবারিত দ্বার। আহা, কি স্নেহের চোখেই তিনি দেখেছিলেন প্রজ্ঞাকে।”

“তাহ'লে যাবো একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে?”

“যাবে বই কি বাবা। সম্ভব হয় তো আজই যেতে পারো। বড় আনন্দ পাবে।”

ঝি রামুর মা এসে খবর দিলে নারকেল কোরানো হয়ে গেছে, এইবার মা-ঠাকরুণের আসা দরকার।

“কাল তো তাড়াহুড়োয় সময় হয়ে উঠবে না বাছা, তাই আজই কিছু নারকেল নাড়ু তৈরী করিয়ে রেখে যাচ্ছি। তোমার মেসোমশাই বড্ড ভালোবাসেন।” ব'লে নারকেল নাড়ু তৈরী করতে চলে গেলেন সংঘমিত্রা মাসী।

ফিরে গেলাম অনাথবাবুর কাছে। তিনি বললেন, “মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব। কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।” গানখানা শুনেছো ধনপতি?”

বললাম, “শুনেছি।”

“আমার হয়েছে সেই অবস্থা।” বললেন অনাথবাবু। “মেঘে মেঘে বেলা হলো। ঘনিয়ে এলো চলে যাবার লগ্ন। এমনি সময় উধাও হয়ে গেল বোধিসত্ত্ব। জানি নে যাবার বেলায় কাকে দিয়ে যাবো আমার মধু-ভারতী।”

“মধু-ভারতী?”

“আমার ভারত মার্কা মধু-র কারখানা। মধু-ভারতীর ভারত মধু-র নাম কি তুমি শোনোনি ধনপতি?”

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বললাম, “ডাক্তার ব্যোমকেশ বর্ধন বলেছিলেন বটে সস্তা ঝোলাগুড়ের সঙ্গে মধু মিশিয়ে আপনি—

“ঝোলাগুড় নয় ধনপতি। ব্যোমকেশ বড্ড বাজে বকে। উঁচু দরের খাঁটি গুড় জ্বাল দিয়ে তারই বিশোধিত নির্যাস থেকে তৈরী আমার ভারত মধু, সাড়ে পনরো আনা নির্যাসে আধ আনা চাকের মধু ডাইলিউশন করে।”

চমকে উঠে বললাম, "ভেজাল ?"

অনাথবাবু বললেন, "এ ডাইলিউশনে মূল মধুর প্রাণশক্তি যে কতগুণ বেড়ে যায় তা তুমি জানো না ধনপতি। তোমার ঐ ব্যোমকেশ হোমিওপ্যাথকেই জিগ্যেস করে দেখো, দুশো শক্তির পাল্‌সেটিলায় কতটুকু পাল্‌সেটিলা থাকে আর কতখানি স্পিরিট অব ওয়াইন।"

নীরব রইলাম। শোনাবার চাইতে শুনবার আগ্রহ আমার বেশী।

"দীর্ঘ গবেষণা করে আবিষ্কার করেছি আমার এই গুড় বিশোধন পদ্ধতি, যাতে আমার ভারত মার্কা মধু বহুদিন পুরো গুণ নিয়ে অবিকৃত থাকে।" বলতে লাগলেন অনাথপিণ্ডদ। "ফলিত রসায়নের এ এক অনবদ্য অবদান। বোধিসত্ত্ব যদি আর না ফেরে, তাহলে আমার সঙ্গেই এ লোপ পাবে। এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না ধনপতি।"

আমি বললাম, "লোপ পাবে কেন অনাথবাবু? আর কাউকে কি দিয়ে যেতে পারেন না ?"

অনাথবাবু বললেন, "এ জিনিস পারি নে। টাকা যদি কিছু জমিয়ে থাকি, হয় তো দিয়ে যাবো।"

"কাকে অনাথবাবু ?"

"গোপন দান ক'রে। কেউ জানবে না কত টাকা, কোথায় কোথায় কি ভাবে দান ক'রে গেল অনাথপিণ্ডদ রায় চৌধুরী। প্রকাশ্য দান ক'রে নাম কেনার ভেতরে রোমান্স কোথায় হে? কতটুকু তার আয়ু? নাম দুদিনে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু বেনামের শেষ নেই। 'ফেইম মে কাম অ্যাণ্ড ফেইম মে গো, বাট অবলিভিঅন গোজ অন ফর এভার।' বাজে বকছি কি ধনপতি ?"

মাথা নাড়লাম।

"ঐ যে দূরে মস্ত বটগাছটা দেখছো," বললেন অনাথবাবু, "ওর শাখায় শাখায় অনেক পাখীর আশ্রয়। দুপুরের রোদে ওরই ছায়ায় অনেক মানুষ ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু গাছটার চারা বা বীজ যে ওখানে লাগিয়েছিল, কেউ জানে না তার নাম। এই না-জানা কোনদিন ফুরোবে না, ধনপতি।"

থামলেন একটু অনাথবাবু। কিসের আলোয় যেন জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে তাঁর চোখ, কি বেদনায় যেন উঠছে ছলছলিয়ে। হয় তো ভাবছেন, বোধি-সত্ত্ব হয়তো ফিরে আসবে। আবার হয়তো ভাবছেন বোধিসত্ত্ব হয় তো আর কোন দিন ফিরবে না।

বললাম, "বোধিসত্ত্বকে কি ফিরিয়ে আনা যায় না অনাথবাবু? এই ধরুন খবরের কাগজে—"

"বোধিসত্ত্ব ফিরে আয় ছেপে? কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে না বোধিসত্ত্ব।"

"কেন?"

"খবরের কাগজে তার বিশ্বাস নেই। সে বলে, আসল খবর কাগজে ছাপা হয় না, চাপা থেকে যায় ছাপা খবরের আড়ালে। তাছাড়া ফিরে আসবার জন্যে যে চলে যায় নি, ফিরে আসবার ডাক শুনলেই তো সে ফিরে আসবে না। আর—"

"আর—?"

"আমার কাছে যে কখনো মাথা নোয়ায়নি, তার কাছে আমিও মাথা নোয়াতে চাই নে।" বললেন অনাথবাবু। "না বলে যে চলে গেছে তাকে ফিরে আয় বলে সেধে হার মানতে চাই নে। সর্বত্র জয়মিচ্ছন্তি, পুত্রাৎ পরাজয়ম্—এ আমার জন্যে নয় ধনপতি। পুত্রের কাছেও পরাজিত হ'তে রাজী নয় অনাথপিণ্ডদ রায় চৌধুরী।"

"সাজাহানের তাজমহল দেখেছো ধনপতি?" শুধালেন অনঙ্গ চৌধুরী।
বললেম, "ছায়াও মাড়াইনি আগ্রার।"

অনঙ্গ চৌধুরী বললেন, "তুমি তাহলে বুঝবে না। কিন্তু সাজাহানের ব্যথা আমি বুঝি ধনপতি। বুড়ো সাজাহান ঔরংজেবের বন্দী কেল্লার

কামরায় বসে তাকিয়ে দেখতেন দূরের তাজমহল ; ভোরে, গোধূলিতে, চাঁদনী রাতে। আজো লোকে তাজমহল দেখে সাজাহানের কথা ভেবে কেঁদে ভাসায়। মমতাজ তলিয়ে গেছে সাজাহানের অনেক তলায়।"

লক্ষ্য করলেম অনঙ্গ চৌধুরীর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির লক্ষ্য সুদূর চৌধুরী-ম্যানশ্যানের বিরাট উচ্চ ঘড়িঘর। মস্ত ঘড়ির গোল সাদা বুকে কালের যাত্রার ধ্বনি দুখানা কালো কাঁটায় নীরবে অবিরাম ঘুরে ঘুরে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। বিখ্যাত চৌধুরী ম্যানশ্যানের আটতলা এলাহি অট্টালিকা নীরবে গম্ভীর অট্টহাসি হাসছে শহরের মাঝখানে।

প্রশস্ত রাজপথ থেকে এই ম্যানশ্যানে প্রবেশের সিংহদ্বার পেরিয়েই যে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ সেটি আগাগোড়া সিমেণ্টে বাঁধাই, এক ফোঁটা মাটির পরশ নেই সেই নিবিড় সিমেণ্টের বুকে। এককালে যেখানে হয়তো ছিলো সবুজ ঘাসের মাঠ, এখন সেখানে সবুজ সিমেণ্টের প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে আনাগোনা করে অনেক মোটর গাড়ী, দাঁড়িয়ে থাকে সারি সারি ভোরে, সন্ধ্যায়, দুপুরে, রাতে।

ফ্ল্যাটগুলো সব নম্বর করা—এক থেকে আড়াই শো, অতিকায় হোটেলের কামরা বা স্যুটের মতো। ব্যক্তিত্বহীন এক ছাঁচে ঢালা ফ্ল্যাট-গুলো—শুধু নম্বর আর অবস্থানের তফাত ছাড়া আর কোনো তফাত নেই ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে। যেমন তিপ্পান্ন তেমনি একশো আটাত্তর। চৌধুরী ম্যানশ্যানের ভেতরে বারান্দার পথে বেড়ালে মনে হবে এ যেন এক মস্ত আধুনিক জেলখানা, আর ফ্ল্যাটের নম্বরগুলো যেন এক একটা সেলের নম্বর। এ সব সেলের কয়েদীরা যেন জানেও না যে তারা সবাই কয়েদী।

মস্ত ম্যানশ্যানের মস্ত একতলায় "ড্রিংকোলা" কোম্পানীর মিঠে পানির কারখানা আর গুদাম প্রায় আধাআধি জায়গা জুড়ে আছে ; একতলায় বাকি অংশে ছোটো, সেজো, মেজো, বড় নানা সাইজের কারবারী আফিস। কারবারগুলো সব সাদা নয় ; কালো আছে অনেক, আর আছে ধূসর।

একতলায় সিংহদ্বারের পাশেই চৌধুরী ম্যানশ্যানের অফিস, তার ম্যানেজার মিস্টার বি. ডস্ (ভূতপূর্ব বলাই দাস)।

অফিসে তার আজ্ঞাধীনে আছে তুজন কেরানী, একজন টাইপিস্ট আর একজন তার সাধারণ সহকারী। এদের ওপর খবরদারী করে বলাই। তার দায়িত্ব সমস্ত ম্যানশ্যানের তদারক করা, ভাড়াটেদের ভাড়া আদায় করা, ভাড়াটেদের নালিশ শোনা আর মেটানো ইত্যাদি।

বৃদ্ধ অনঙ্গ চৌধুরীর দৃষ্টির পেছনে দৃষ্টি ছুটিয়ে বিরাট বিস্তীর্ণ চৌধুরী-ম্যানশ্যানের ঘড়িঘর এক লহমায় দেখেই ম্যানশ্যানের অন্তর-বাহিরের ছবি আমার মনের পর্দায় খেলে গেল। অনঙ্গ চৌধুরী বললেন, "কি ভাবছো ধনপতি ?"

বুঝলেম আমার মৃত্থ ভাবনার আওয়াজটুকুও তাঁর মরমী কানে পৌঁছে গেছে, অস্বীকার করে আর লাভ নেই। বললাম, "দেখছি আপনাদের ঐ এলাহি ম্যানশ্যান, আর ভাবছি ভাড়া বাবদ কি টাকাই না ফি মাসে পেয়ে যাচ্ছেন !"

অনঙ্গ চৌধুরী গড়গড়ার নলে একটা সুখটান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "তুমি বললে আমাদের ম্যানশ্যান। মানে ঐ ম্যানশ্যানের সঙ্গে আমাকেও জড়ালে। ভুল করলে ধনপতি। সব মালিকানা এখন ভুজঙ্গের হাতে।"

"কি করে, চৌধুরী মশাই ?"

"আমার সমস্ত ঐশ্বর্যের বোঝা আমি রীতিমতো দলিল করে ভুজঙ্গের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি। এই বুড়ো ঘাড়ে ঐ বোঝা আর সইলো না। ভুজঙ্গের ঘাড় শক্ত। ও পারবে। পেরেছে।"

একটু থেমে ফের সুরু করলেন অনঙ্গ চৌধুরী—"স্ত্রীবিয়োগ যখন আমার ঘটলো ধনপতি, তখন ভুজঙ্গ—আমার একমাত্র সন্তান—কলেজ থেকে বেরিয়েছে ; কারবারের গদিতে বসিয়েছি তাকে পৈতৃক ব্যবসা-সম্পত্তি পাকা করে বুঝে নেবার শিক্ষানবিশীতে। মনে হলো আমার সাজানো বাগান বুঝি শুকিয়ে গেছে।"

একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো অনঙ্গ চৌধুরীর সর্বাঙ্গে ব্যথার

কাঁপন জাগিয়ে। ধূম-নলে টান মেরে মুখ থেকে এক ঝাঁক তামাকী ধোঁয়া ছাড়লেন অনঙ্গ চৌধুরী।

"কি আশ্চর্য জানো ধনপতি?" বললেন তারপর। "এমনি নিরুদ্বেগে পরমানন্দে হাসিমুখে হৈমবতী ওপারে রওনা হয়ে গেল, যেন ফার্স্ট ক্লাস সেলুন রিজার্ভ করে হাওয়া বদলাতে চলেছে। বললে, এই যে গুরুদেব এসেছেন রওনা করে দিতে, আর ভাবনা কি? বলে দু'হাত জুড়ে প্রণাম করলে, যেন গুরুদেবকে দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। শোক সংবাদ জানিয়ে টেলিগ্রাম আর চিঠি পাঠিয়ে দিলাম হৈমবতীর গুরুদেব নিরালানন্দ বাবাজীর কাছে তাঁর গোলাপডাঙ্গার নিরালাশ্রমে। চিঠিতে খুলে লিখে দিলাম হৈমর অন্তিমকালে গুরু দর্শনের কথা। নিরালানন্দ বাবাজীর সান্ত্বনামাখা জবাব এলো ফেরত ডাকে। তোমায় বলতে কোনো বাধা নেই ধনপতি, হৈমবতী ছিলো মস্ত গরীব বৈষ্ণব পরিবারের মেয়ে। মা তাকে এনেছিলেন গৃহলক্ষ্মী করে, তার লক্ষ্মীশ্রী দেখে। বাবাকে বলেছিলেন এ মেয়ে যে ঘরে বৌ হবে সে ঘরে অচলা হয়ে থাকবেন মা লক্ষ্মী; বাবা বলেছিলেন, তা বেশ। তোমার কি হয়রানী লাগছে ধনপতি?"

বললেম, "এক ফোঁটাও নয়। আপনার কাছে এত শুনতে পাবো এও আশা করি নি।"

"তুমি আশা করো নি ধনপতি, কিন্তু অনেকেই আশংকা করে।" ঈষৎ ধোঁয়াটে কণ্ঠে বললেন অনঙ্গ চৌধুরী। "তাই আমার লম্বা কাহিনী শুনবার ভয়ে কেউ আমার কাছে ঘেঁষতে চায় না, এড়িয়ে চলে। যা বলছিলেম। এলো হৈমবতী গৃহলক্ষ্মী হয়ে। পণ করলেম দারিদ্র্যে ভুগে এসেছে যে হৈম, তাকে অতুল ঐশ্বর্যের চূড়োয় বসিয়ে রাখব। পৈতৃক ব্যবসা, পৈতৃক ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দুগুণ করে ফেললুম। কিন্তু এসব অনেক আগের কথা ধনপতি। হৈম যখন স্বর্গে চলে গেল তখন ঐশ্বর্যে আমার ঘেন্না ধরে গেল। গ্যালপিং থাইসিসের মতো দ্রুত-বাড়তি ঐশ্বর্য গ্যালপিং থাইসিসের মতোই উঠলো দুঃসহ হয়ে। মনে হলো যেন সংসারের বদ্ধ ঘরে বন্দী আমি, আর ঘরের ভেতর হু হু করে ঢুকছে ঐশ্বর্যের জল, দ্রুতবেগে উঁচু

হয়ে উঠছে, যেন আমায় শেষটায় বন্ধ করে দম আটকে মারবে। যখন বুঝলুম ভুজঙ্গ পুরোপুরি পাকাপোক্ত হয়েছে তখন—ঐ যে তোমায় আগেই বলেছি—বিষয় আশয় ব্যবসা সব কিছু পাকাপাকি ভাবে সঁপে দিলুম ভুজঙ্গেরই হাতে। ঠিক করলুম বানপ্রস্থ নিয়ে চলে যাবো নিরালা বাবার আশ্রমে, সেখানেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো। এমনি সময় স্বপ্নে কি দেখলুম জানো ধনপতি ?—তাজমহল। খোলা চোখে অনেক দেখেছিলুম, স্বপ্নে সেই প্রথম। শিহরণ জেগে উঠলো শিরায় শিরায়। বুঝলুম এ বিধাতারই প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত। সাজাহান তাঁর মমতাজের স্মৃতি রাখতে তৈরী করেছিলেন তাজমহল, হৈমর স্মৃতি তেমনি বিরাট ভাবে রক্ষা করার পবিত্র কর্তব্য আমাকে পালতেই হবে। ভুজঙ্গকে বলতেই ভুজঙ্গ বললে, তুমি একবার আদেশ করো তো মা'র স্মৃতি রাখার এলাহি ব্যবস্থা করে তাজমহলকে ছেলেমানুষ বানিয়ে দেবো। তিনদিনের ভেতর একেবারে প্ল্যান ছকে এঁকে এনে আমায় দেখিয়ে দিলে। ঐ প্ল্যান থেকেই ঐ মস্ত ম্যানশ্যান তৈরী হয়েছে ধনপতি।" বলে দূরে চৌধুরী ম্যানশ্যানের মস্ত ঘড়ি-ঘরের দিকে তাকালেন অনঙ্গ চৌধুরী।

"যেখানে ঐ অনেক জায়গা জুড়ে চৌধুরী ম্যানশ্যান দেখছো ধনপতি," বল্লেন অনঙ্গ চৌধুরী, "সেখানে ছিলো বিরাট চৌধুরী বস্তি। সে বস্তি পিতৃদেবই পত্তন করে গিয়েছিলেন, নাম মাত্র ভাড়ায় অনেক গরীব পরিবারের মাথা গোঁজবার ঠাঁই মেলাবার জন্যে। বিরাট জায়গা জুড়ে মেটে ঘর তুলে দিলেন, ভাড়া ধার্য করলেন নামমাত্র। তাও আদায়ের জন্যে কোনো কড়াকড়িই করতেন না, বলতেন ওরা আমাদের আশ্রিত, আর এ বস্তি আমি লাভের জন্য বসাই নি। বাবা স্বর্গে যাবার পর তাঁর উত্তরাধিকার আমার ওপর বর্তালো। আমাদের আদি নিবাস যে গাঁয়ে তারি পাশের গাঁয়ের এক ছোকরা, বলাই দাস, এসে ধরে বসলে চাকরী একটা দিতে হবে। বললেম, বেশ, বস্তি-সরকার হও তুমি ; বস্তির তদারক করবে আর ভাড়া আদায় করবে। বলাই বহাল হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল বস্তি সরকারিতে তার পেট ভরছে না, মনও ভরছে

না। সারা বস্তির ওপর সারাক্ষণ যেন খিটমিটিয়ে আছে। কিন্তু এসব ছোটো ব্যাপারে মাথা দেবার আমার সময় কোথায় তখন? তা ছাড়া হৈমকে মা বলে ডেকে সে তখন এমন করে তার স্নেহ কেড়ে নিয়েছে যে বুঝে নিয়েছিলুম তার ওপর কড়া হওয়া চলবে না। যাক, সে সব পুরোনো কথা। ভুজঙ্গ আমায় এক এলাহি প্ল্যান দেখালে হৈমবতী ম্যানশ্যানের। বিরাট উঁচু আটতলা ইমারত হবে, তাতে আড়াইশো ফ্ল্যাট, তা ছাড়াও নিচের তলায় গুদাম আর অফিস ঘর অনেকগুলো। সিমেন্ট বাঁধাই উঠোন হবে লম্বা চওড়া। ফ্ল্যাট, অফিসঘর আর গুদাম সব মোটা ভাড়া আনবে মাসে মাসে। পাকা ব্যবসা-বুদ্ধি ভুজঙ্গের। বললে, এমনি করে হৈমবতী ম্যানশ্যান হবে স্মৃতিচিহ্নকে স্মৃতিচিহ্ন, ব্যবসাকে ব্যবসা। তাজমহলটা তো স্রেফ অকেজো মাকাল ফল; অতটা জায়গা, অত বড় দালান, কারো কাজে লাগে না, একটি পয়সা ভাড়াও আনে না। কোথায় গড়ে তোলা হবে এই হৈমবতী ম্যানশ্যান, আমার নয়া তাজমহল? না, যে জায়গা জুড়ে বস্তি রয়েছে। মনে খটকা লাগলো আমার। বাবার আমল থেকে চলে আসছে যে বস্তি, সেটাকে উচ্ছিন্ন করে দেওয়া! এ যেন পারিবারিক একটা ঐতিহ্যকে শেকড় সুদ্ধু উপড়ে ফেলা! জানো তো রক্ষণশীল পরিবারে—"

বললেম, "আজ্ঞে তা জানি।"

"ভুজঙ্গ বললে, অনেকদিন ধরেই সে আমায় বলি বলি করেও বলতে সাহস করে নি, গোটা বস্তিটাই ভরে উঠেছে দুরন্ত পাপে আর বিশ্রী নোংরামিতে। চারদিকে শহরের ভদ্র বসতি, তার মাঝখানে দুষ্টক্ষতের মতো এই জঘন্য বস্তি চৌধুরী-বংশের মহালজ্জাস্কর কলঙ্ক। রীতিমতো একটা স্ক্যাণ্ডাল। বস্তির নোংরামি, কলঙ্ক আর স্ক্যাণ্ডালের একটা ফিরিস্তি দিলে ভুজঙ্গ—সব কথা বলতে পারলে না খোলাখুলি। অনেক কথাই বোঝালে আভাসে ইঙ্গিতে। কিন্তু বস্তি-সরকার বলাই দাসের বালাই ছিলো না চক্ষুলজ্জার, জিভেও লাগাম লাগাতে শেখেনি সে। অনর্গল বলে গেল বস্তির কতকগুলো বিধবা, সধবা আর অধবার কেচ্ছা; বস্তির বখাটে ছোঁড়াদের নোংরা কেলেংকারী; বস্তির

কতকগুলো মাতালের কীর্তিকলাপ; বস্তির বাসিন্দা কতকগুলো চোর জুয়াচোর পকেটমারের কথা, যারা এই বস্তির ছোঁড়াদের এই সব বিছে শিখিয়ে শিখিয়ে সমাজের ভাবী ফৌজদারী আসামীর দল ভারী করবার ব্যবস্থা করছে। সোজা কথায়, বীভৎস ছবি এঁকে গেল বলাই। সে ছবি চোখের সামনে কল্পনা করে শিউরে উঠলুম, ধনপতি। এখন মনে হচ্ছে তলিয়ে ভেবে দেখা উচিত ছিলো; বলাইর সব কথা বিশ্বাস করে নেওয়া ঠিক হয় নি। বস্তিতে অনেক গরীব ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারও আশ্রয় পেয়েছিলো। খাওয়া হয়ত তাদের দুবেলা জুটতো না, তবু মেটে ঘরের আড়ালে আব্রু বাঁচিয়ে তারা মাথা গুঁজে থাকতে পেতো। ছিল অনেক গরীব কেরানী, ইস্কুলের মাস্টার, ফেরিওয়ালা, মিস্ত্রি, আরো অনেকে, শুধু দারিদ্র্য ছাড়া যাদের আর কোনো অপরাধ ছিলো না। এই সব দরিদ্র-নারায়ণের কথা তখন স্মরণে আনি নি ধনপতি। আমি বলাইয়ের মুখের কথায় আঁকা ছবি দেখেই আতঙ্কিত হয়ে উঠলুম। চৌধুরী বংশের গৌরব ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে বস্তির দুষ্ট ক্ষত! তাহলে এর আশু সংস্কার প্রয়োজন তো বটেই। চারিদিকের সভ্য আবহাওয়া বস্তির অসভ্য আবহাওয়ায় দূষিত হচ্ছে, এর কলঙ্ক তো চৌধুরী বংশের ওপরই বর্তাবে। আমার সায় পেয়ে গেল ভুজঙ্গ, পেয়ে গেল বলাই। এরি জন্যে যেন এরা উৎকণ্ঠ হয়ে অপেক্ষা করেছিলো।"

খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ করে বলাই দাসের পক্ষে। বস্তির আমলে যে ছিলো সামান্য মাইনের তুচ্ছ বস্তি-সরকার বলাই দাস, এখন সে বিশাল চৌধুরী-ম্যানশ্যানের তত্ত্বাবধায়ক, চৌধুরী এস্টেটস্ লিমিটেডের মোটা মাইনের ম্যানেজার মিস্টার বি. ডস্। তখন বিড়ি টানতো, এখন খাঁটি রূপোর তৈরী ঝক্‌ঝকে সিগ্রেট কেস্ থেকে বাজারের সব চেয়ে দামী সিগ্রেট 'অফার' করে, আর পাশ্চাত্য কায়দায় ধোঁয়া উগ্‌ড়ানো কালো পাইপ চিবোবার ভান করে অস্পষ্ট কথাকে প্রাণপণে অস্পষ্টতর করে।

"তোমার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই ধনপতি" বললেন অনঙ্গ চৌধুরী, "ভাবের ঘরে চুরি করে মনকে তখন চোখ ঠেরেছিলুম। ঐশ্বর্যের

ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু যখন কল্পনায় দেখলুম হৈমর বিরাট স্মৃতিচিহ্ন আটতলা হৈমবতী ম্যানশ্যান, তখন অভিভূত হলুম। লোভ সংবরণ করতে পারলুম না, ভাবলুম এ আমার চাই-ই। বিবেক যে খোঁচা একটু দিলে না তা নয়। কিন্তু কোমর বেঁধে নাছোড়বান্দা হলে বিবেকের খোঁচাকে ব্যর্থ করা শক্ত নয় ধনপতি। তায় আবার নতুন তাজমহলের স্বপ্ন আমায় তখন পাগল করে রেখেছে। বস্তির ওপর আমার একটা নরম দুর্বলতা আছে জেনে এতদিন ওর দিকে হাত বাড়ায়নি ভুজঙ্গ, আমার সায় পেয়ে হু হু করে কাজে লেগে গেল। আমি চলে গেলুম নিরালা বাবার নিরালাশ্রমে। ভুজঙ্গের ওপর আদেশ রইল মাসিক হাজার টাকা প্রণামী পাঠাবে নিরালাশ্রমে নিয়মিত ভাবে; আর ম্যানশ্যান সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তারপর আমাকে জানাবে, তার আগে নয়। আমাকে আরেকটু তামাক দিয়ে যা ভগবান।”

ঈশ্বর থেকেই ঐশ্বর্য, কিন্তু এই ঐশ্বর্যই ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাই ঐশ্বর্যের এলাকা ছেড়ে ঈশ্বরের খোঁজে চলে গেলেন অনঙ্গ চৌধুরী, নিরালাশ্রমের নিরালা বাবার আশ্রয়ে। ঈশ্বর-মশ্‌গুল নিরালা বাবার আওতায় এতদিনের অর্থ-ঐশ্বর্যের রুদ্র তাণ্ডবের স্মৃতি বীভৎস বলে মনে হতে লাগলো; মনে হলো জীবনের এতগুলো বছর বৃথা হয়ে গেছে। আবাদ করলে ফলতো সোনা, কিন্তু আবাদের কথা মনেও আসেনি। মনে হলো জীবনের বাকী দিনগুলো—কতদিনই বা বাকী আছে?—কাটিয়ে দেবেন এই পুণ্য আশ্রমের ঐশ্বরিক আবহাওয়ায়। ভুজঙ্গকে লিখে দিলেন আশ্রমের মাসিক প্রণামীর বরাদ্দটা বাড়িয়ে দু'হাজার করে দিতে। দু'হাজার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দু'হাজার কিছু নয় ভুজঙ্গের কাছে।

নিরালাশ্রমের আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় সময়ের হিসেব ভুলে গেলেন অনঙ্গ চৌধুরী। হঠাৎ একদিন এসে বলাই দাস বললে, “কর্তাবাবু, নিয়ে যেতে এসেছি আপনাকে। হৈমবতী-ম্যানশ্যান আগাগোড়া কমপ্লিট। আড়াইশো ফ্ল্যাট, অফিসঘর, দোকানঘর, গুদাম সব আগাম ভাড়া হয়ে বসে

আছে। আপনি গিয়ে ওপনিং সেরিমোনিটা করে দিলে পর সাত দিনের ভেতর ম্যানশ্যান ভরে উঠে গমগম করবে। এলাহি ব্যাপার হয়েছে একখানা, ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে চারিদিকে। ছবি ছাপতে চেয়েছিলো কাগজে কাগজে। কিন্তু আপনি দ্বারোদ্‌ঘাটন না করা পর্যন্ত ছবি কোথাও ছাপতে দেওয়া হবে না কর্তাবাবু।"

নেচে ওঠে অনঙ্গ চৌধুরীর চিত্ত। সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁর তাজমহল।

গুরুদেবের আশীর্বাদ নিয়ে চললেন অনঙ্গ চৌধুরী। ঐশ্বর্য বিলাস ত্যাগ করেছেন তিনি; বলাইকে বললেন থার্ড ক্লাশে যাবেন। বলাই দাস ফার্ষ্ট ক্লাশ থেকে সুরু করে শেষ পর্যন্ত ইন্টার ক্লাশে রফা করতে বাধ্য হলো। ইন্টাশ ক্লাশে চললেন অনঙ্গ চৌধুরী।

"গাড়ী ছাড়বার আগেকার হুঁশিয়ারী ঘণ্টা পড়েছে" বললেন অনঙ্গ চৌধুরী, "এমন সময় আমাদের কামরার দরজা খুলে উঠলেন এক বর্ষিয়সী মহিলা, একটি কিশোর বালক, আর সব শেষে কে জানো ধনপতি?"

"আজ্ঞে না।"

"অসাধারণ একটি মেয়ে।" বললেন অনঙ্গ চৌধুরী। "দুই চোখে তার হাজার শুকতারার দীপ্তি। মুখের হাসি তার সদ্যফোটা গোলাপের মতো, সদ্য রোদে ঝলমল সবুজ ঘাসের বুকে শুভ্র শিশির বিন্দুর মতো; যেন তার ঐ এক মুহূর্তের হাসির আড়ালে অনন্ত যুগ মৌন মুগ্ধ হয়ে আছে। এ রূপ তো চোখ ধাঁধানো নয়, মন কাঁদানো, হৃদয় মুগ্ধ করা। সোনা তো নয়, এ যে পরশমণি! মেয়ে আমার হয় নি ধনপতি, কিন্তু অনেক কল্পনা করেছি মেয়ে আমার হলে সে কেমনটি হতো। আমার সকল কল্পনাকে হার মানিয়ে দিয়ে এই মেয়েটি এসে আমার ইন্টার ক্লাস কামরায় উঠলো। তাকে কন্যাস্থানীয়া করবার জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠলো। প্রাণের দায়ে আমায় আলাপ জমিয়ে নিতে হলো। মেয়েটিও চমৎকার আলাপী, নাম তার প্রজ্ঞাপারমিতা। ওর বাবা অনাথপিণ্ড রায় চৌধুরী, 'ভারত' মার্কা মধু যাঁর। সঙ্গের মহিলাটি প্রজ্ঞার মা সংঘমিত্রা দেবী, আর সঙ্গের ছেলেটি প্রজ্ঞার ছোট ভাই বোধিসত্ত্ব। মাকে নিয়ে

মামাবাড়ী থেকে ফিরবার পথে একবার নেমে নিরালাশ্রমে মাকে গুরুদর্শন করিয়ে এই গাড়ীতে ফিরে চলেছে প্রজ্ঞা।"

বিশ্রাম নেবার জন্যেই বোধ করি ধূমপান ছলে শূন্য দৃষ্টিতে অনির্দিষ্ট ভঙ্গীতে চোখ মেলে রইলেন অনঙ্গ চৌধুরী।

"তখ্খুনি সংকল্প করে ফেললুম লক্ষ্মীহীন চৌধুরী বাড়ীর গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করে নেবো এই প্রজ্ঞাপারমিতাকে।" ফের স্বরু করলেন অনঙ্গ চৌধুরী। "হৈমবতীর এই হবে যোগ্য পুত্রবধূ। স্বর্গ থেকে দেখে তৃপ্তির অশ্রু ঝরছে হৈমর চোখে, এ আমি যেন চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পেলুম। আমার পরিচয় আমাকে দিতে হলো না, দেবার জন্য ছটফট করছিলো বলাই, সেই দিলে। চৌধুরী পরিবারের ঐশ্বর্য সারা বাংলায় বিখ্যাত। পরিচয় শুনে ত্রস্তা হয়ে উঠলেন সংঘমিত্রা দেবী—কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলে না ঐ জগদ্ধাত্রী মেয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা। কেন করবে? দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য যে ওর দুটি পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে পারলে বেঁচে যায়। ঐশ্বর্যকে ও কেন কেয়ার করবে? আর ঐ যে ছোকরা বোধিসত্ত্ব, সে তখন জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে চলতি গাড়ীর তামাসা দেখছিল—ভ্রূক্ষেপ করলে কিনা বোঝা গেল না।"

সংঘমিত্রা দেবীর সংকোচের ঘোর কাটিয়ে দিলেন সহজেই অনঙ্গ চৌধুরী, "আমিও নিরালা বাবার চরণাশ্রিত, সম্পর্কে আপনার গুরুভাই" এই কথা বলে। আর প্রজ্ঞাপারমিতাকে বললেন, "তুমি মা আমার গুরু-ভগ্নীর মেয়ে। আবদার করতে পারি তোমার কাছে—সে হক্ আছে আমার।" আবদার করলেন হৈমবতী-ম্যানশ্যানের উদ্বোধন করবে প্রজ্ঞাপারমিতা তার কল্যাণ হস্ত দিয়ে। মনে মনে ভাবলেন সেই উদ্বোধনের পথ বেয়ে চৌধুরী ভবনে পদার্পণ করবে প্রজ্ঞাপারমিতা, চৌধুরী বংশের গৃহলক্ষ্মী হয়ে।

"কিন্তু রাজী হলো না প্রজ্ঞাপারমিতা।" ব্যথিত কণ্ঠে বললেন অনঙ্গ চৌধুরী। "কি বললে জানো মেয়েটা? বললে ম্যানশ্যান উচ্ছেদ করে ফের বস্তি বসিয়ে যদি তাড়িয়ে দেওয়া হতভাগ্যদের আবার

কোনদিন ডেকে এনে বসাতে পারি, তাহলে সেই নতুন বস্তির উদ্বোধনে সে হাসিমুখে আসবে, আবার সেই আশ্রয় ফিরে পাওয়া আশ্রয়-হারাদের হাসিমুখ দেখতে। ছোট হয়ে গেলাম মেয়েটার কাছে। মনে মনে বললাম তাই এসো। সেদিন সে দৃশ্য স্বর্গ থেকে দেখে হৈমও খুশী হবে। হৈমকে যদি চিনতে পেরে থাকি, তাহলে বস্তির ধ্বংসস্তূপে গড়ে তোলা এই ম্যানশ্যান তার আত্মাকে তৃপ্ত করে নি। উদ্বোধন আমাকে করতে হলো। শহরের গণ্যমান্য অনেক স্বনামধন্য আর প্রবলপ্রতাপান্বিত ব্যক্তি সে উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। খানাপিনার বিরাট উৎসব হয়েছিলো বিশাল ছাতে আর বিরাট প্রাঙ্গণে—রঙবেরঙের আলোয় ঝলমল আনন্দ কোলাহল সাড়া জাগিয়েছিল সারারাত জুড়ে অনেক দূর পর্যন্ত, চৌধুরী-গৌরব ঘোষণা করে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম উচ্ছিন্ন বস্তিবাসীদের কান্না। তারপর আমার আদেশে ম্যানশ্যনের আগে 'হৈমবতী' তুলে দিয়ে বসানো হলো 'চৌধুরী'। নাম ভেঙ্গে নতুন করাতে খরচা হলো কিছু, কিন্তু হৈমর পুণ্যস্মৃতি বহু-হৃদয়-চূর্ণকরা এই ম্যানশ্যান থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচলো। তারপর চারতলায় এই ঘরেই আশ্রয় নিলাম। এই ঘরেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলো হৈম, এখান থেকে সোজা দেখা যায় ঐ ম্যানশ্যান। ঐ ম্যানশ্যান যদ্দিন ওখানে খাড়া থাকবে তদ্দিন তৃপ্ত হবে না হৈম, তাই ওকে বিদায় না করে আমার ফেরা চলবে না নিরালাশ্রমে। কিন্তু হায়, ঔরংজেবের হাতে সাজাহানের মতো ভুজঙ্গের হাতে অনঙ্গ চৌধুরী অসহায়। চৌধুরী সাম্রাজ্যের সম্রাট ভুজঙ্গ, আর আমি তার অসহায় অক্ষম পিতা। 'ধ্বংস করো এ ম্যানশ্যান' এ আদেশ করতে ভরসা হলো না, ভয় হলো সে আদেশের মর্যাদা সে রাখবে না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আনার এই মানসিক দ্বন্দ্ব আমায় অধীর করে তুললো ধনপতি।"

"তারপর ?"

"একদিন মরিয়া হয়ে উঠলুম। মনে হলো প্রজ্ঞাপারমিতা যদি একবার আদেশ করে তাহলে সে আদেশ না-মানতে পারবে না ভুজঙ্গ।

তুমি অবাক হচ্ছো ধনপতি? কিন্তু তুমি তো দেখনি প্রজ্ঞাকে, দেখলে বুঝতে কি কল্যাণী যাদু ছিলো তার মধ্যে! চলে গেলাম প্রজ্ঞার ঠিকানায়, তাকে অনুরোধ করতে, তুমি এসে ভুজঙ্গকে শুধু একটিবার আদেশ করো মা, ভুজঙ্গ ভেঙ্গে ফেলুক এই ম্যানশ্যান, আবার ফিরে আসুক সেই বস্তি। কিন্তু গিয়ে কি জানলুম জানো ধনপতি? প্রজ্ঞাপারমিতা আর এপারে নেই। হৈমর কাছে সে রওনা হয়ে গেছে।"

তাকালাম দূরের চৌধুরী ম্যানশ্যানটির দিকে। বস্তি কি সত্যই গেছে? দিশি মাটির বস্তি গিয়ে বস্তি হয়েছে বিলিতী মাটির আর কংক্রিটের; একতলা বিদায় নিয়ে এসেছে আটতলা। ছিলো সেকেলে, মিটমিটে—হয়েছে মডার্ণ, খটখটে, ঝকঝকে। ছিলো অমার্জিত, অভব্য—হয়েছে মার্জিত, সভ্যভব্য। যেখানে ছিল টিমটিমে কেরোসিন কুপি, হারিকেন লণ্ঠন, রেড়ীর প্রদীপ, সেখানে এসেছে চোখ-ধাঁধানো বিজলী বাতি। বাতাস নেই তালপাতার পাখায়, ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে বিজলী পাখা গরম তাড়ায়, কোনো কোনো ফ্ল্যাট আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক কায়দায় শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু কোথায় সেই নরম মাটির ছোঁয়া, কোথায় সেই ঘাসের সবুজ? সেই প্রাণের দরদী পরশ কোথায় গেল? হৃদয়ের যে সংযোগ ছিলো বস্তির মেটে-ঘরে মেটে-ঘরে, নেই সে যোগ সিমেণ্ট কংক্রিটের ম্যানশ্যানের ফ্ল্যাটে ফ্লাটে। এই ফ্লাটে যখন মৃত্যুর পদক্ষেপ, পাশের ফ্ল্যাটে তখন পদক্ষেপ সঙ্গীত-মুখর ফক্‌স্ ট্রট্ নৃত্যের।

গেছে কি দুষ্ট ক্ষতের দুষ্টতা দূর হয়ে? দূর হয়ে গেছে বস্তির কলুষ কালিমা, গ্লানিময় আবহাওয়া? বস্তির ক্ষুদে দালালরা ছোট-খাট দাঁও মারতো, ম্যানশ্যানের টাই-পরা পাইকারী ব্রোকাররা ভেঙে চলেছে মক্কেলদের মাথায় মস্ত মস্ত কাঁঠাল। সস্তা দিশি মদ কয়েক ভাঁড় হয়তো চলতো বস্তিতে কোনো কোনো রাতে; ম্যানশ্যানের বহু ফ্ল্যাটে প্রতি রজনীতে ফাঁকা হয়ে যায় বহু বিলিতী মদের বোতল। বস্তির দুআনা দর্শনীর গণৎকার নেই চৌধুরী ম্যানশ্যানে। আছেন অন্যূন দশ টাকা দর্শনীর পামিস্ট অ্যাণ্ড

অ্যাসট্রলজার। বস্তির খুচরো পকেটমার নেই; ম্যানশ্যানে আছে তাদের বিরাট সংস্করণ, যারা দিনে দুপুরে পুকুর চুরি করে। বাইরের চেহারায় আর আয়তনে পুরাতন বস্তিকে অনেক পিছে ফেলে এসেছে এই ম্যানশ্যান, কিন্তু ভেতরের রূপে এও এক বিরাট বস্তি, এর দুষ্টক্ষত আরো গভীর, আরো ব্যাপক, আরো ভয়ংকর।

"বন্দী সাজাহান তাজমহলের দিকে তাকিয়ে কি ভাবতেন জানো ধনপতি?" বল্‌লেন অনঙ্গ চৌধুরী। "মমতাজের কথা নয়। তিনি ভাবতেন সেই নাম-না-জানা হাজার হাজার হতভাগ্য গরীবের কথা, সম্রাটের এই শখের তাজমহল গড়ে তুলতে তিলে তিলে যারা বুকের রক্ত দিয়েছিল। তাজমহলের দিকে তাকিয়ে তিনি শুনতেন তাদের অশরীরী আত্মার আর্তনাদ। আমিও তেমনি ঐ ম্যানশ্যানের দিকে তাকিয়ে বিতাড়িত হতভাগ্য বস্তিবাসীদের হাহাকার শুনতে পাই ধনপতি। বুকের ভেতর ঝড় ওঠে, তবু আমার এই তাজমহল ছেড়ে আমি পালাতে পারি নে। কি জানি কেন আমার মনে হয় প্রজ্ঞাপারমিতা আসবে, এসে আদেশ করবে ভুজঙ্গকে, ভেঙে ফেল ঐ ম্যানশ্যান। সেই বস্তিকে আবার আনো ফিরিয়ে। আমি জানি প্রজ্ঞার সে আদেশ অমান্য করবার সাধ্য হবে না ভুজঙ্গের। আমি সে দিনের আশায় এই ঘরের মাটি কামড়ে বসে থেকে দিন গুনছি ধনপতি।"

"একেবারে কাক ডাকতে না ডাকতেই চলে এসেছো বাবা, মাসীকে বিদায় দিতে?" হেসে বললেন সংঘমিত্রা দেবী।

বললাম, "দিতে নয় মাসিমা, নিতে এসেছি বিদায়। সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আপনার গুরুদেবের আশ্রমে; জানিনে তো আবার কবে দেখা হবে।"

"সে কি কথা বাবা?" বললেন সংঘমিত্রা, কণ্ঠে তাঁর ব্যথার সুর। "তুমি কি পণ করেছো একটি বারও যাবে না নিরালাশ্রমে? মাসীকে দেখতে যেতে ইচ্ছে না করে, অন্ততঃ গুরুদেবকে দর্শন করবার জন্যেও যেয়ো। পরমানন্দ পাবে, এ আমি নিশ্চিন্ত বলতে পারি। ওঁর কাছে গিয়ে কেউ তৃপ্তি না নিয়ে ফিরতে পেরেছে এমন তো জানিনে বাবা। দেশ-বিদেশের কত মানুষ গুরুদেবের কাছে এসে শান্তি পেয়ে যাচ্ছে। কত গরীব, কত বড়লোক, কত মুখ্যু, কত পণ্ডিত ; কত পুরুষ মানুষ, কত মেয়েমানুষ; কত কাঁচা, কত পাকা। সে কি আর অমনি বাছা?"

বলে আবার রান্নার দিকে মন দিলেন তিনি। তিনি রান্না করে যাচ্ছেন, যোগান দিচ্ছে রামুর মা।

বললাম, "সাড়ে ছ'টা এইমাত্র বাজলো। এরি ভেতর দেখছি আপনার রান্না প্রায় তৈরি মাসিমা। তাড়াতাড়ি খেয়ে রওনা হবেন বুঝি?"

হেসে সংঘমিত্রা মাসী বল্লেন, "রান্না আমার জন্যে নয় বাবা, তোমার মেসোমশায়ের জন্যে। আমার আজ সারাদিন উপোস, রাত্তিরে আশ্রমে প্রসাদ পাবো।" আর ফিরে আসবেন না, তাই স্বামীর জন্যে শেষ রান্না করে যাচ্ছেন সংঘমিত্রা দেবী।

শুধালেম, "মেসোমশাই কোথায়, মাসিমা?" পাতানো মাসীর স্বামীকে মেসো বলি নে, তবু আজ মাসীর বিদায় প্রাতে মাসীর কাছে মাসীর স্বামীকে মেসোমশাই বলে উল্লেখ না করে পারলুম না।

"ঘরে খবরের কাগজ পড়ছেন্।" বললেন মাসিমা। "রবিবারের কাগজ পড়তে উনি যে কী ভালবাসেন তা হয়তো তুমি জানো না ধনপতি।"

"সংসারের মায়ার বাঁধন কাটিয়ে আমায় মুক্তির পথে টেনে নিচ্ছেন গুরুদেব।" বলতে লাগলেন মাসী। "বড় জড়িয়ে ছিলাম ধনপতি। মনে হয়েছিলো যতো দুঃখ যতো ব্যথাই থাক সংসারে, তবু সংসারেই আছে অমৃত। প্রজ্ঞা যতদিন ছিল, পৃথিবীতে স্বর্গ ছিলো আমার। জীবনের বসন্ত ঋতুর মাঝখানেই চলে গেল প্রজ্ঞা, আমার বুক খালি করে দিয়ে। তখন বড়

কেঁদেছিলুম বাবা, কিন্তু এখন বুঝেছি প্রজ্ঞাকে ওপারে পাঠিয়ে দিয়ে আমার প্রথম বাঁধন কেটেছিলেন গুরুদেব।"

"তারপর?"

"তারপর কাল নিরুদ্দেশ হয়ে অজ্ঞাতবাসে চলে গেল বোধিসত্ত্ব। শুধু দু' ছত্র লিখে গেল 'চলে যাচ্ছি।' একবার শেষ দেখা করে মা বলে ডেকে যাওয়াও দরকার মনে করলে না! কাল সারাটা বুকের ভেতরে যে কি ঝড় বয়েছিলো আমার, তা অন্তর্যামী ছাড়া আর কাউকে আমি বোঝাতে পারবো না বাবা। আজ বুঝতে পেরেছি পাছে ওর টানে বাঁধা পড়ে যাই, তাই গুরুদেবই ওকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়ে আমার পথের দু' নম্বর বাধা সরিয়ে দিলেন।"

"কিন্তু সেটা কি উনি ভালো করলেন মাসিমা?" শুধালেম আমি। "শুনতে পাই বোধিসত্ত্বের বয়স আঠারোও হয়নি, যদিও ওর পালোয়ানী চেহারা দেখে নাকি বিশ বছর মনে হতে পারে। কোথায় কি ফ্যাসাদে ফেঁসে যাবে, কেমন দলের পাল্লায় পড়বে, কেমন জায়গায় পাবে আশ্রয়—"

"ওর জন্যে এখন আর ভাবি নে বাবা।" বললেন সংঘমিত্রা মাসী। "যিনি ঘর ছাড়িয়ে পথে নামিয়েছেন ওকে, ওর ভাবনা তিনিই ভাবছেন, তিনিই ওকে চোখে চোখে রাখছেন; ওঁর পায়ে বোধিসত্ত্বের ভার সঁপে দিয়েই আমি নিশ্চিন্ত। গুরুদেব! গুরুদেব!"

নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেছে বেপরোয়া বোধিসত্ত্ব, আর নিরালাশ্রমে বসে বসে গুরুদেব নিরালাবাবা প্রতি মুহূর্তে তার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রাখছেন, এ কথা ভেবে নিশ্চিন্ত সংঘমিত্রা মাসী।

"আরেকটি রক্ষাকবচ ঘুরছে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে।" বললেন তিনি। "যেখানেই যাক, যেখানেই থাক বোধিসত্ত্ব, এই রক্ষাকবচের প্রভাব সে কখনো এড়াতে পারবে না ধনপতি!"

"কি সে রক্ষাকবচ মাসিমা?"

"প্রজ্ঞাপারমিতা।"

"প্রজ্ঞাপারমিতা ?" বিস্ময়ের ঢেউ উপচে পড়লো আমার মনের পাত্র থেকে।

"প্রজ্ঞাপারমিতা।" বললেন সংঘমিত্রা মাসী। "প্রজ্ঞাপারমিতার আদর্শ, প্রজ্ঞাপারমিতার স্মৃতি। আমার ঠাঁই ছিলো না বোধিসত্ত্বর মনে, কিন্তু প্রজ্ঞা যে ওর কি ছিলো তা আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না বাবা।"

আমায় বোঝাতে না পেরে ব্যর্থতায় ছলছলিয়ে উঠলো মাসির ছুটি চোখ।

"ছুনিয়ার সেরা মাতৃভক্ত আর সেরা দিদি-ভক্তের মাতৃভক্তি আর দিদিভক্তি একসঙ্গে মেলালে যা হয়, বোধিসত্ত্বর হৃদয় তাই দিয়েছিলো প্রজ্ঞাপারমিতাকে। যতো কিছু আবদার ছিলো ওর দিদির কাছে। প্রজ্ঞাকে যেমন ভালো বাসতো, তেমনি কি যে ভয় করতো বোধিসত্ত্ব, তা তুমি জানো না ধনপতি। অনেক দিনের অনেক ঘটনা পরে একদিন তোমায় শোনাবো বাবা ; আজতো আর সময় হয়ে উঠবে না।"

বললুম, "শোনাবেন মাসিমা।"

মাসিমা বলতে লাগলেন, "প্রজ্ঞাপারমিতার সে ছোট ভাই, এইটে বোধিসত্ত্ব কখনো ভুলতে পারে না ; এই গর্বে তার বুক ভরা। প্রজ্ঞা বেঁচে থাকতে কোনো ছোটো কাজ করে প্রজ্ঞাকে সে ছোটো করে নি। প্রজ্ঞা আজ বেঁচে নেই ; কোনো ছোটো কাজ করে বোধিসত্ত্ব তার দিদির স্মৃতিকে ছোটো করবে না, বোধি সম্বন্ধে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ধনপতি। বিপথে কখনো যাবে না, কোনো ছোটো কাজ করবে না বোধিসত্ত্ব।"

তারপর মাছের ঝোল চাপিয়ে দিয়ে আগের কথার জের টেনে বললেন, "প্রজ্ঞা যে চলে গেছে তা বোধ করি এখনো সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারে না বোধিসত্ত্ব। আমিও কিছুতেই ভাবতে পারছি নে ধনপতি, যে আমার প্রজ্ঞা আর নেই। বার বার মনে হচ্ছে গুরুদেবের কাছে গিয়ে প্রজ্ঞাকে আমি ফিরে পাবো।"

পরম বিশ্বাসের সুর সংঘমিত্রা মাসীর কণ্ঠে। কড়ায় চাপানো মাছের

ঝোলে নিবদ্ধদৃষ্টি মাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে জুড়ে রয়েছে আশ্চর্য প্রশান্তি।

রান্না শেষ হয়ে গেল সংঘমিত্রা মাসীর। রামুর মাকে বললেন, "খাবার জিনিসগুলো সব জালের আলমারির ভেতর তুলে রাখ রামুর মা। আমি কর্তাকে একবার নাইতে যাবার তাগিদটা দিয়ে আসি। ঘণ্টা দেড়েকের কমে তো আর ওঁর নাওয়া হবে না।"

বলে চলে গেলেন কর্তার ঘরে।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো বাড়ীর দোরগোড়ায়। নেমে এলেন এক দীর্ঘকায় সুপুরুষ ভদ্রলোক, গৈরিক-রঙা কাপড় লুঙ্গীর মতো করে পরা, গায়ে গৈরিক চাদর আর মাথায় গৈরিক পাগড়ি। দেহ নাদুশ-নুদুশ নয়, বেশ পুরুষ্টু মজবুত। অনায়াসে কুস্তি বা জুজুৎসুর আসরে নেমে যেতে পারেন। মাসী পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বললাম, "আপনিই ওঁকারানন্দ ? নমস্কার।"

ওঁকারানন্দ বললেন "নমস্কার। বড় খুশী হলুম।" চেয়ে দেখি সত্যিই খুশীতে ভরে উঠেছে তাঁর সারা মুখ।

"ট্রেনে আর যাওয়া হলো না।" বললেন ওঁকারানন্দ। সংঘমিত্রা দেবী বললেন, "সে কি ? কেন ?"

"চৌধুরী মশাই বললেন ট্রেনে যাবার দরকার নেই। গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন ড্রাইভার সঙ্গে দিয়ে। এই গাড়ীই সোজা আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে। বললেন, "ঘণ্টা দুই আড়াইর ভেতরই পৌঁছে যাবো।"

অনাথবাবুর শেষ হলো খাওয়া। শেষ হলো মুখ ধোয়া। সংঘমিত্রা দেবীর আপন হাতে সাজা পান মুখে পুরে চিবোতে লাগলেন তিনি। বাইরে পরম প্রশান্ত ভাব, কিন্তু জানিনে কেন বার বার মনে হতে লাগলো তাই দিয়ে তিনি ভেতরের চরম অশান্ত ভাব ঢেকে রাখছেন। মনে হলো অনাথবাবুর মুখ থেকে শুধু একটিবার "যেয়ো না" শুনলে মাসীরও সমস্ত শপথ বানের জলে কাগজের নৌকোর মত ভেসে যাবে, গোলাপডাঙায় একা ফিরে যাবেন ওঁকারানন্দ।

"সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছো তো? রওনা হবার বোধ করি সময় হয়ে এলো।" বললেন অনাথবাবু।

"সব আর কি গুছিয়ে নেবো বল? যেটুকু নেবার তা গুছানো হয়ে গেছে।" বললেন মাসী।

প্রবেশ করলাম ৺প্রজ্ঞাপারমিতার ঘরে। ছবি জাগলো যেন অনাথবাবুর মনে। খোলা জানালার বাইরে অনেক দূরে মাথা দোলাচ্ছিল একটা সুপারি গাছ।

"ঐ যে সুপুরি গাছ শাখা দোলাচ্ছে দেখছো ধনপতি", বললেন অনাথবাবু, "এই ঘরে প্রজ্ঞাপারমিতা যখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল, তখনও এমনি করেই ও মাথা ঢুলিয়েছিল। আজও দোলাচ্ছে। কিন্তু আজ আর নেই প্রজ্ঞাপারমিতা।"

হঠাৎ যেন একটা দম্‌কা কান্না গুমরে উঠতে চাইল সংঘমিত্রার বুকের ভেতর। তিনি বলে উঠলেন, "গুরুদেব! গুরুদেব!"

"এমন দিনও আসবে ধনপতি, যেদিন ঐ সুপুরি গাছও থাকবে না।" বললেন অনাথবাবু।

ছোট্ট একটা গাঁটরি তুলে নিলেন সংঘমিত্রা। ওরি ভেতরে গুছিয়ে নিয়েছেন যা কিছু নেবার। নিচে নামার যাত্রা সুরু হলো।

"তোর বাবা-ঠাকুরকে তোর হাতে রেখে গেলুম রামুর মা। তুই তাঁকে দেখিস্, যত্ন করিস্।" বললেন সংঘমিত্রা মাসী। "না না, প্রণাম করিস্ নে, প্রণাম করিস্ নে রামুর মা। চলেছি সংসারের মায়া কাটিয়ে গুরুদেবের চরণে আশ্রয় পেতে, এখন আমায় আশীর্বাদ কর বাছা যেন গুরুর কৃপায় মুক্তি পেয়ে যাই।"

গাঁটরিটা গাড়ীতে তুলে দিতে বললেন মাসিমা। দিলাম তুলে। গলায় আঁচল জড়িয়ে অনাথবাবুকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন সংঘমিত্রা মাসী। অনাথবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাবার বেলায় তোমার একটু আশীর্বাদও কি পেয়ে যাবো না আমি?"

অনাথবাবুর মুখ হিমালয়ের মতো গম্ভীর। "আশীর্বাদে বুক ভরে

আছে” বললেন তিনি, “কিন্তু···কিন্তু তুমি যে আশীর্বাদের ভাষা কেড়ে নিয়েছো সংঘমিত্রা।”

“তাহলে সেই আশীর্বাদই আমায় করো তুমি, ভাষা দিয়ে যাকে বাঁধা যায় না।”

“তাই করছি সংঘমিত্রা।” বললেন অনাথবাবু। “চলেছো গুরুদেবের আশ্রয়ে, হয়তো এরি মধ্যে খুঁজে পেয়েছো তোমার শ্রেয়কে। হয়তো এই তোমার মহাকল্যাণের পথ। শুভ যাত্রার পথে বাধা মানতে নেই, পিছু তাকাতে নেই, সংঘমিত্রা। মানা শোনাতে নেই, মানা শুনতে নেই।”

ভয় হলো চোখ ফেটে জল ঝরে পড়বে অনাথবাবুর। আমার চাইতে যেন বেশী ভয় পেলেন অনাথবাবু নিজে। প্রায় চীৎকার করে বললেন, “যাও যাও, আর দেরি কোরো না সংঘমিত্রা। আর এক মুহূর্তও দেরি নয়! যাও।” যেন আর এক মুহূর্তও সইতে পারছেন না সংঘমিত্রা দেবীকে।

সংঘমিত্রা দেবী কাঠের পুতুলের মতো স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু সে এক মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই প্রাণপণে কান্না চাপতে চাপতে ছুটে গেলেন গাড়ীর দিকে। খোলা ছিলো গাড়ীর দরজা। ঢুকে পড়লেন সংঘমিত্রা মাসী। আর দেখা দিলেন না এদিকে, হয়তো দেখা দেবার মতো অবস্থাও তাঁর ছিল না।

গাড়ীতে উঠবার আগে অনাথবাবুকে বিদায় নমস্কার জানাবার জন্যেই বোধ করি একবার এদিকে তাকালেন ওঁকারানন্দ। কিন্তু তার আগেই কখন ভেতরে চলে গেছেন অনাথবাবু। বিদায় নমস্কারটা একা আমাকেই গ্রহণ করতে হলো।

পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ী। ভেতরে গিয়ে দেখি জানালার ধারে আরাম কেদারায় বসে অনাথবাবু নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে পা দোলাচ্ছেন। বললেন, “বসো ধনপতি। একটু বিচলিত হয়েছো মনে হচ্ছে।”

“মাসিমাকে এমনি করে চলে যেতে দিলেন, অথচ আপনার শুধু একটি মুখের কথায়—”

"ছোট প্রেম কাছে টানিয়া রাখে, বড় প্রেম দূরে সরাইয়া দেয়। এ তোমাদের শরৎ চাটুয্যেরি কথা ধনপতি।" বললেন অনাথবাবু। "তোমার মাসীর সেইদিন শেষ হয়ে গেছে সংসার পর্ব, যেদিন থেকে প্রজ্ঞা আর নেই। এখন নিরালাশ্রমে গুরু বটবৃক্ষের ছায়াতলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ স্থান; সেখানেই তাঁর শান্তি, সেখানেই সার্থকতা। জয় হোক নিরালা বাবার।"

শুধালেম, "সত্যিই কি নিরালা বাবার জয় কামনা করেন আপনি?"

"আমার কামনার সত্যিমিথ্যেতে কি যায় আসে ধনপতি? জয় তাঁর হয়েছে, আরো হবে। তোমার মাসীর এই যে চলে যাওয়া, এও তো নিরালা বাবারই জয়। হেরে গেলাম আমি। কিন্তু এ পরাজয়ই আমায় রেহাই দিয়ে বাঁচিয়েছে। প্রজ্ঞা চিরবিদায় নিয়ে গেছে, বোধিসত্ত্ব ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে গেল, গুরুর আশ্রমে বানপ্রস্থে চলে গেলেন তোমার মাসী। আমি এখন মুক্ত। এ মুক্তির যে কি আনন্দ তা তুমি বুঝবে না ধনপতি।" একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুকের ভেতর থেকে।

শুধালেম, "নিরালা বাবার আশ্রমই মাসিমার সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় এ কি আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন অনাথবাবু?"

"কায়মনোবাক্যে।" বললেন অনাথবাবু। "এক কালে রাগ ছিলো ঘৃণা ছিল, হিংসা ছিল নিরালা বাবার ওপর। সে ভুল আমার ভেঙে গেছে ধনপতি। এখন তাকে আমি কম্‌রেড, সতীর্থ বলে ভাবি। এ দেশের বারো আনা লোক চায় ঠকতে, ভুল বুঝতে। হাঁটুর ওপর কাপড় না তুললে এ দেশে মহাত্মা হওয়া যায় না। দশচক্রে ভগবান ভূত হয়েছিলেন, দশচক্রে নিরালা বাবা হয়ে উঠেছে ভগবানের অংশ অবতার। কিন্তু এই অংশ-অবতারী প্রভাবের সুযোগ নিয়ে অনেক কল্যাণ সে করছে ধনপতি, যে কল্যাণসাধন এই প্রভাবের অভাবে তার পক্ষে অসম্ভব হতো। কল্যাণ আমিও করছি ধনপতি, নেপথ্যের আড়াল থেকে। আড়ালই আমি ভালোবাসি, তাই মনে মনে বলি তোমাদের ঐ ইংরেজ কবি আলেকজাণ্ডার পোপের মতো: লেট মি লিভ্‌ আনসীন, আন্‌নোন্‌, আনল্যামেণ্টেড্‌ লেট

মি ভাই। নিজেকে আড়ালে গোপন রাখার কি যে রোমাঞ্চময় আনন্দ তা তুমি বুঝবে না ধনপতি।"

বললাম, "কে এই নিরালা বাবা? কি তার ইতিহাস? আপনি কিছু জানেন নাকি অনাথবাবু?"

"জানিনে ধনপতি।" বললেন অনাথবাবু। "ভগবানের অংশ অবতারের অতীত নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, শুধু মাথাই নোয়ায় তার পায়ের কাছে এসে অনেক ধনকুবের, অনেক গরীব, অনেক পণ্ডিত, অনেক মুখ্যু। সে কতটুকু ভগবান জানিনে; ভাগ্যবান সে, এটুকু জানি। সিদ্ধাই তার আছে কিনা জানিনে কিন্তু বাহাদুরী আছে। বাহবা দিই তাকে। শুনে অবাক হচ্ছো হয়তো, কিন্তু আমার এখন সেই মেজাজ যে মেজাজ বলায়ঃ গিভ্ দি ডেভিল হিজ ডিউ। শয়তানকেও তার পাওনা থেকে বঞ্চিত কোরো না।"

বললাম, "মাসিমা বলতেন—"

"মাসিমা, প্রজ্ঞা, বোধিসত্ত্ব—এদের কথা আর নয়, ধনপতি। জীবনের নতুন পথে আর চাইনে পুরোনো পথের পিছু ডাক। বাকী দিনগুলো একাই কাটিয়ে যাবো, তারপর একদিন চিরদিনের তরে ফুরিয়ে যাবো মৃত্যুর অতলে। মরণকে তোমার কেমন মনে হয় ধনপতি?"

বললাম, "মরণ মানেই তো অনন্ত না-থাকার সুরু। সারাজীবন থাকতে থাকতে থাকাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় বলেই ঐ না-থাকার কল্পনাটা অস্বস্তিকর বোধ হয়।"

"না-থাকতে না-থাকতে না-থাকাটাও তেমনি সয়ে যায় ধনপতি।" হেসে বললেন অনাথবাবু। শুধালেম, "আপনি নিশ্চয় ভগবান বিশ্বাস করেন?"

"ভগবান-তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাইনি ধনপতি, ঘামাতেও চাইনে। নিরালা বাবা হয়তো ঘামায়। অন্ধ, অন্ধ, অন্ধ। লোকটা অন্ধ হে ধনপতি। এক অন্ধ বহু অন্ধকে পথ দেখাবার ভান করছে। সামনে তার অনন্ত অন্ধকার, নিরালা বাবা সেই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে জীবনের অর্থ খুঁজে

খুঁজে। খুঁজে পাচ্ছে না। কেউ পায় না, সবাই শুধু খুঁজেই যায়। গোটা জীবনটাই একটা জিজ্ঞাসা, অনন্ত জিজ্ঞাসা।"

বললাম, "হেঁয়ালিতে কথা কইছেন আপনি। নিজেও আপনি হেঁয়ালি। আপনার আসল রূপটি তাই ধরতে পারিনে।"

"প্রত্যেক মানুষই হেঁয়ালি, ধনপতি। শুধু পরের কাছেই নয়, নিজের কাছেও। আর আসল রূপ বলে কিছু নেই, আছে শুধু অসংখ্য রূপ।" বললেন অনাথবাবু। "ছেলেবেলায় এক গাইয়ে ভিখারীর মুখে গান শুনেছিলুম। প্রথমে হরির ডজনখানেক আলাদা রূপের ফিরিস্তি দিয়ে তারপর শুধাচ্ছেঃ হরি কোন্‌টি তোমার আসল রূপ, শুধাই তোমারে। জবাব দেবার সাধ্য থাকলে হরি যা বলতেন তা তোমায় বলেছি ধনপতি। অন্ধের হাতী দেখার গল্প শুনে আমরা হাসি, কিন্তু আমাদের আসল রূপ দেখবার প্রয়াসও যে তেমনি হাস্যকর এইটে বুঝিনে।"

শুনে বোধ করি ভাবনার রঙে রঙীন হয়ে উঠলো আমার মুখমণ্ডল, তাই দেখে একটু হেসে অনাথবাবু বললেন, "একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি ধনপতি। তোমার হয়েছে—ধূর্জটির ভাষায় যদি বলি—প্রজ্ঞা-কম্‌প্লেক্‌স্‌। নানা মুখে ওর কথা শুনে, অনেকের চোখ দিয়ে ওকে দেখে তুমি প্রজ্ঞার একটা স্বরূপ খাড়া করে তুলতে চেয়েছো। বৃথা, বৃথা, বৃথা ধনপতি। স্বরূপ জিনিসটারই কোনো অস্তিত্ব নেই।"

আমি বললাম, "কিন্তু যারা তাকে কাছে পেয়েছে, কাছ থেকে দেখেছে—"

"কাছের দেখাটাই কি বড়ো ধনপতি?" বললেন অনাথবাবু। "আকাশে উঠলো রামধনু। অনেক উঁচুতে। অনেক নিচু থেকে তার সাতরঙা রূপ দেখে মুগ্ধ হলো চোখ। এরোপ্লেনে উড়ে রামধনুর নাগাল পেতে গেলে তার স্বরূপ পাবে তুমি? আকাশে উঠলো চাঁদ। তার সাদা-চোখে দেখা রূপটাই বড়, না দূরবীন চোখে দেখা রূপ? কত শক্তির লেন্সওয়ালা দূরবীনে? কিন্তু এলোমেলো বকেই যাচ্ছি আজ। আমার অনেক কথা ভুলে গেলেও হয়তো এই কথাগুলো তোমার মনে থাকবে।

এবারে আমি একটু একা থাকবো ধনপতি। যাবার পথে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেয়ো।”

দরজা ভেজিয়ে রেখে পথে বেরিয়ে পড়লাম অনাথবাবুকে একা থাকতে দিয়ে। “আমায় একটু একা থাকতে দাও” বলছেন অনাথবাবু। কণ্ঠে তাঁর অসীম অবসাদের সুর। অন্তরে অনুভব করছেন অসীম শূন্যতা। মানেননি ঈশ্বর; মানেননি ধর্ম; হৃদয়বৃত্তিকে পিষে এসেছেন কঠোর বুদ্ধিবৃত্তির স্টীম-রোলার চালিয়ে। তিলে তিলে নিজেকে বানিয়ে তুলেছেন শূন্যবাদের দার্শনিক। ফাঁকার ওপর ঘর বাঁধবার চেষ্টা করেছিলেন অনাথবাবু, তাই বুঝি আজ আকুল হয়ে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছেন, পাচ্ছেন না নির্ভর, পাচ্ছেন না কোনো আশ্রয়। মন তাঁর ব্যর্থ হাহাকার করে ভেসে বেড়াচ্ছে অনন্ত শূন্যে।

দূরে এক ভিখারী পথের ধারে বসে খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইছিলো। মনে হলো অনাথবাবুর রূপক ছবি এঁকেই সে যেন গাইছে—

“আহা, আস্‌মানে কোন্ রসিক পাখী
চায় বাঁধিতে ঘর!
(সে যে) ফাঁকি দিয়ে ফাঁকায় ওড়ে
পাখায় করে ভর।
অথই নীলের আরশিতে মুখ
দেখ্‌তে সে যে পায় না,
(তবু) শূন্যপানেই নয়ন হানে,
মাটির পানে চায় না!
ডাকে তরুর সবুজ শাখা
আয় চলে আয় গুটিয়ে পাখা,
আমার বুকে বাঁধ্‌রে বাসা,
ঐ যে আসে ঝড়······”

ঝড় এসেছে অনাথবাবুর আকাশে। শূন্যে উড়ে উড়ে অবসন্ন তাঁর পাখা। কিন্তু কোন্ তরুর শাখায় নেবেন তিনি আশ্রয়? কোথায় সেই তরু?

অম্লান বাড়ুরী আজ চলে গেল অনেক দূরে আর অনেক উঁচুতে। জানি নে কবে ফিরবে। জানি নে আর ফিরবে কি না।

"কোনো মেয়েকে কখনো ভালো বেসেছেন দাদা?" হঠাৎ একদিন গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেছিল অম্লান বাড়ুরী।

জবাব খুঁজছি মনে মনে, হঠাৎ অম্লান বললে, "থাক দাদা। জবাব শুনেই বা কি করব?"

তার পর অতীত-স্বপ্ন-ছলছল চোখে বললে, "বিশ বছর আগের কথা। পদ্মা পারের দেশ থেকে ফিরছি গঙ্গাতীরের দেশে। বয়স শৈশব পেরিয়েছে, মন পেরোয়নি। নারাণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ অনেকটা পথ। একঘেয়ে জল, জল, আর জল। সেই জলের বুকে ভাসছে স্টীমার। বুকের আগুনের জ্বালা তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে গোয়ালন্দের দিকে। বুকে তার চেয়ে বড়ো জ্বালা নিয়ে চলেছেন এক বিধবা ভদ্রমহিলা। সঙ্গে তার একমাত্র সন্তান, বছর সাতেকের মেয়ে। সে হলো আমার, আমি হলুম তার, খেলার সাথী। আমার মা হলেন ওর মা'র সহযাত্রিনী দিদি।

সদ্যবিধবা তিনি; চলেছেন অনাথা কন্যাকে নিয়ে মাসতুতো দাদার আশ্রয়ে। দাদাটির হৃদয় ভালো হলেও অবস্থা ভালো নয়; তবু অকূল পাথারে এখন তিনিই অনাথার একমাত্র আশ্রয়।

"জীবনবীমা করেননি ভদ্রমহিলার স্বামী।" বললে অম্লান বাড়ুরী। "মৃত্যুর মাস খানেক আগে বাড়ী থেকে তিনি এক রকম অপমান করেই তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এক জীবনবীমার দালালকে। ভদ্রলোক বীমাটি করে মারা গেলে ঐ বীমার টাকা তাঁর বিধবার আর অনাথা মেয়ের কত বড় সহায় হতো একবার ভেবে দেখুন তো দাদা! অমন অকূলে ভাসতে হতো না তাদের।"

আবার ছলছলিয়ে উঠলো জীবনবীমার দালাল অম্লান বাড়রীর ছু'টি চোখ। হয়তো মুহূর্তেকের জন্যে জ্বলজ্বল করেও উঠলো সেই স্বামীটির অদূরদর্শিতা আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথা ভেবে। বন্ধুর কাজ করতে গিয়েছিলেন জীবনবীমার দালাল, তাকে তিনি আপদ ভেবে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

"আমিও তখন পিতৃহারা। মেয়েটিও পিতৃহারা।" বলতে লাগলো অম্লান বাড়রী। "পিতৃহারা হওয়াটা জীবনে যে কত বড়ো ট্র্যাজেডি সেটা বুঝবার বয়স তখন আমার হয়েছে, কিন্তু ঐ মেয়েটির হয়নি। আমার সারা হৃদয় সমবেদনায় টনটন করে উঠলো। সেই সমবেদনা মাত্রা ছাড়িয়ে কখন অনেক উঁচুতে উঠে গেল নিজেই টের পেলুম না। ভুলে গেলুম সে আমার ক্ষণিকের সহযাত্রিনী, তার সঙ্গে পরিচয়ের পালা সদ্য স্থুরু, অচিরেই সারা হয়ে যাবে। মনে হলো এ পরিচয় যেন নতুন নয়; যেন এর স্থুরু নেই, শেষ নেই। গুরুদেবের কবিতার সঙ্গে ভালো পরিচয় থাকলে হয়তো মনে হতো: 'তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।' আপনি হাসছেন নাকি দাদা?"

"এ তো হাসির কথা নয়, অম্লানবাবু, যে হাসবো।"

আমার কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে অম্লান বলতে লাগলো, "প্রেম বুঝবার বয়স তখনো হয়নি, কিন্তু আমার মনে হয় আমার অজানিতেই মেয়েটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলুম। রূপ বিচার করবার বয়স নয় তখন, মনের অবস্থাও নয়। তার মুখের আদলটিও এতদিন পরে একেবারেই মনে নেই। তবু মনে হয় রূপের অভাব হয়তো ছিলো না মেয়েটির।"

"মেয়েটির নামও কি আপনার মনে নেই অম্লানবাবু?"

"নাম তার শুধাইনি দাদা। গোয়ালন্দের অনেক আগেই এক স্টীমার-স্টেশনে নেমে গেল মেয়েটি তার মা আর মামার সঙ্গে। তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। জানি নে তার নাম, ভুলে গেছি তার চেহারা, জানি নে সে কোথায়। তবু সে-ই আছে আমার সারা হৃদয় জুড়ে। জীবনে যখন এলো জীবিকা বেছে নেবার প্রশ্ন, আমি বেছে নিলুম

জীবনবীমার দালালী। মনে পড়লো আমার স্টীমারের সঙ্গিনীর বাবার কথা, যিনি জীবনবীমার দালালকে অপমান করে তাড়িয়ে কপর্দকহীন অসহায় করে ভাসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন স্ত্রী-কন্যাকে। তা সম্ভব হয়েছিলো ঐ দালালটির আনাড়িপনার জন্যে। সে হতে পারেনি যথেষ্ট পরিমাণে নাছোড়বান্দা। হতে পারেনি বীমা-দালালীর আর্টে পাকা আর্টিস্ট। তার সেই অপরাধে এক বিধবাকে অনাথা মেয়ে নিয়ে অকূলে ভাসতে হলো। জানি নে সে কোন্ বীমা কোম্পানীর দালাল, কি তার নাম। কিন্তু তার এ অপরাধ কখনো ক্ষমা করব না। অবহেলা অপমানকে খৃষ্টের মাথার কাঁটার মুকুটের মতোই শিরোধার্য করে নিতে হবে প্রত্যেক বীমা-দালালকে। তাদের ত্যাগ, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, একনিষ্ঠা, আন্তরিকতা আর দক্ষতার ওপর নির্ভর করছে অসংখ্য ভাবী বিধবা আর ভাবী পিতৃহীন পিতৃহীনার ভবিষ্যৎ। এ এক মহান দায়িত্ব। বীমার দালালী শুধু অর্থকরী পেশা নয় দাদা। একে আমি জীবনের এক মহান ব্রত বলেই গ্রহণ করেছি।"

অম্লান বাড়রীর বীমাদালাল-জীবনের প্রথম মক্কেল হলেন মহেশ মুস্তফী, বড় ব্যাংকের ছোটো কেরানী। লেজার-কীপার। মোটা লেজার খাতায় পরের টাকার নির্ভুল হিসাব লেখেন, বয়স চল্লিশের কিছু বেশী, চেহারা পঞ্চাশের মতো। বারুইপুর থেকে যাতায়াত করেন চাকরিতে, খানিকটা ট্রেনে, খানিকটা ট্রামে বাসে। একদিন চেক ভাঙাতে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো অম্লান বাড়রীর, আর সামান্য পরিচয় থেকে দ্রুতবেগে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে অম্লানের দক্ষতা অসামান্য। অচিরেই অম্লানের জানা হয়ে গেল নিঃসন্তান বিপত্নীক অবস্থায় তিনি সম্প্রতি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছেন। শহরের চড়া বাড়িভাড়া পোষাতে পারেন না, তাই বারুইপুরে রেল-স্টেশনের ধারে একটা ছোট বাড়িতে বাস করেন। পত্নী মালতী মুস্তফী সেলাই শেখান বাড়ির পাশেই একটি মেয়ে-ইস্কুলে। বেতন যা পান তা না বলাই ভালো। বেশী বয়সে দ্বিতীয় বার বিয়ে করে ফেলে একটু অনুতপ্ত, একটু চিন্তিত ছিলেন মহেশ মুস্তফী। ব্যাংকে তো

পুঁজি কিছুই নেই, অসময়ের সম্বল হতে পারে এমন অলংকারও কিছু দিতে পারেননি স্ত্রীকে। হঠাৎ একজন তরুণ সহকর্মী মারা গেল দুদিনের অসুখে। অমনি মুস্তফীর মনে হলো মানুষের জীবন পদ্মপাতার জলের মতো, এই আছে এই নেই। হঠাৎ তিনি চোখ বুজলে তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের কি গতি হবে? কিছুই তো ব্যবস্থা করতে পারেননি এদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্যে। বারুদ তৈরিই ছিলো, তাতে স্ফুলিঙ্গ যোগালে অম্লান বাড়রী। ফলে মহেশ মুস্তফীর জীবন অম্লানের মধ্যস্থতায় পাঁচ হাজার টাকার জন্যে বিশ বছরী মেয়াদে বীমায়িত হয়ে গেল। ভারী পয়মন্ত মক্কেল তিনি, দোকানদারী ভাষায় "ভাল বউনি"। মুস্তফীর পরে জীবনের পর জীবন দ্রুতবেগে বীমায়িত হতে লাগলো অম্লানের হাতে, অম্লানের অ্যাকাউন্টে জমা হতে লাগলো কমিশনের পর কমিশন, কোম্পানী খুশী হলো করিৎকর্মা অম্লান বাড়রীর করিৎকর্মণ্যতা দেখে। কিন্তু এর জন্যে অম্লান ধন্যবাদ দিলে মহেশ মুস্তফীর পয়মন্ততাকে। মনে মনে চিরজীবনের জন্যে মুস্তফীর কাছে ঋণী হয়ে গেল অম্লান।

তারপর ব্যাংকের সেই শাখা থেকে অনেক দূরে অন্য শাখায় বদলি হয়ে চলে গেলেন মহেশ মুস্তফী। দৈনিক যাতায়াতের দূরত্ব অনেকখানি বেড়ে গেল। ধীরে ধীরে অম্লানের স্মৃতির পর্দা থেকে হারিয়ে গেলেন মহেশ মুস্তফী।

তারপর বলতে লাগলো অম্লান—"জীবনবীমা আমার দিন-রাতের নেশা হয়ে উঠলো। যারা গরীব, যারা মধ্যবিত্ত, তাদের জীবনবীমা করাতে লাগলুম তাদের পোষ্যদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্যে। যারা গরীব নয়, মধ্যবিত্তও নয়, তাদের জীবনবীমা করাতে লাগলুম তাদের দেওয়া মোটা মোটা প্রিমিয়ামগুলো বারোয়ারী বীমা ভাণ্ডারকে ফাঁপিয়ে তুলবে বলে। বীমার কমিশনের টাকায় আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভরে উঠতে লাগলো। কষে চালাতে লাগলুম পরের জীবনবীমা করানো, আর নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমানো। ময়রা যেমন নিজের সন্দেশ খায় না, আমার জীবন তেমনি আমি বীমা করাইনি দাদা।"

"কেন ?"

"করবো কার জন্যে বলুন ? আমি মলে কাঁদবার তো কেউ নেই।"

মরলে কাঁদবার লোক রেখে যাবার জন্যে অনেকে ব্যস্ত হয়। কিন্তু ব্যস্ত হয়নি অম্লান বাড়রী। তার স্মৃতি আচ্ছন্ন করে রয়েছে বিশ বছর আগে স্টীমারে দেখা সেই সদ্য-পিতৃহারা মেয়েটি।

সেই স্টীমারে অম্লানের হৃদয়ের জমিতে পড়েছিল প্রেম-বটের ছোট্ট বীজ। এই বিশ বছর ধরে সেই বীজ থেকে অংকুরিত হয়ে প্রেমের বটবৃক্ষ শাখায়-প্রশাখায় বিস্তৃত। তার মন জুড়ে জ্বলছে আশার প্রদীপ, একদিন হয়তো দেখা হবে তার সেই স্টীমার-সঙ্গিনীর সঙ্গে, তখন তার কাজে লেগে হয়তো ধন্য হতে পারবে তার জমানো টাকা। সেই দিনের প্রতীক্ষা করে ব্যাংকে টাকা জমছে অম্লানের।

কেটে গেল অম্লানের বীমা জীবনের দশ বছর। তার পর একদিন অম্লানের বীমা কোম্পানীর কাছে চিঠি এলো মহেশ মুস্তফীর। তিনি জানতে চেয়েছেন, তাঁর জীবনবীমার পলিসিটা আর চালু না রেখে কোম্পানীর কাছে সমর্পণ করে দিলে তিনি কত টাকা এখনই পেতে পারেন। সে চিঠি কোম্পানী পাঠালে অম্লান বাড়রীর হাতে ; কেন না অম্লানেরই মক্কেল মহেশ মুস্তফী। বারুইপুর থেকে চিঠি লিখেছেন মহেশবাবু, অম্লানের বীমা-জীবনের সর্বপ্রথম মক্কেল। অসাধারণ দুরবস্থায় না পড়লে চালু বীমা মেয়াদের মাঝপথে বন্ধ করে দেবার লোক তিনি নন। এতদিন তাঁর খোঁজ নেয়নি বলে লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে অম্লান সোজা চলে গেল বারুইপুর। মহেশ মুস্তফীর বাড়ী খুঁজে পেতে দেরী হলো না। স্টেশন থেকে মিনিট খানেক দূর ছোট্ট একতলা পশ্চিমমুখো পুরোনো জরাজীর্ণ ইটের পাঁজর-দেখানো বাড়ী। সেই বাড়ীর সামনের দিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন জরাজীর্ণ এক ভদ্রলোক। পশ্চিম দিগন্তে ঢলে-পড়া অন্তিম সূর্যের দিকে দুর্বল দৃষ্টি মেলে হয়তো ভাবছেন তাঁর জীবনসূর্যের পশ্চিম দিগন্তের কথা। ভদ্রলোকের অনতিদূরে একটা ছোট্ট নীচু টুল দাঁড়িয়ে আছে।

রাজরোগে আক্রান্ত চেহারা। ভুল হবার জো নেই। বছর দশেক পর এই প্রথম মহেশবাবুকে এমনটি দেখবে ভাবতে পারেনি অম্লান। শিউরে উঠলে ভেতরে ভেতরে, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করলে না। মুখে সহজ হাসি আনবার চেষ্টা করে বললে, "আপনাকে দেখতে এলুম মহেশ-বাবু। অনেক দিন পর।" অকারণ শুধালে না, 'কেমন আছেন ?' তার পরিবর্তে বললে, "চিনতে পারছেন তো ? আমি অম্লান বাড়রী। সেই জীবনবীমার—"

"বড় সুখী হলুম অম্লানবাবু।" বললেন ক্ষীণ কণ্ঠে মহেশ মুস্তফী। তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, "বীমা অফিস থেকে পাঠিয়েছে বুঝি ?"

এতদিন খোঁজখবর নেয়নি বলে লজ্জিত বোধ করে অম্লান বললে, "কোম্পানীর তরফ থেকে আমি আসিনি মহেশবাবু। এসেছি নিজের তরফ থেকে। কবে অসুখ হলো, কবে চাকরি ছাড়লেন কিছুই জানি নে। হঠাৎ কোম্পানীতে আপনার চিঠি যেতেই—"

অদূরের টুলটা দেখিয়ে মহেশবাবু বললেন, "আগে বসে নিন অম্লানবাবু। না না, আর কাছে এগোবেন না। বড় মারাত্মক ব্যাধি। গ্যালপিং নয় যে চট করে ফুরিয়ে যাব। তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছি আর চোখের সামনে বেড়ে যেতে দেখছি স্ত্রী-কন্যার দুর্দশা। আমি মৃত্যু চাই, কিন্তু মৃত্যু পাইনে অম্লানবাবু।"

"ও কথা ভাবছেন কেন মহেশবাবু ?" অম্লান বললে। "টি-বি আজকাল আকছার ভালো হচ্ছে।"

ম্লান হেসে মহেশবাবু বললেন, "এ টি-বি আর ভালো হবার নয় অম্লানবাবু। ডাক্তারও জবাব দিয়ে গেছে। ধরা পড়েছে আড়াই বছর হলো, কিন্তু বুকে গোপন বাসা বেঁধেছিলো অনেক আগে। গোড়ার কারণ ম্যালনিউট্রিশান—পুষ্টির অভাব। আর সে জন্যে দায়ী হয়তো আমার এই জীবনবীমা।"

চমকে উঠলো অম্লান বাড়রী। তবে কি তাঁর এই কাল ব্যাধির জন্য

জীবনবীমার দালাল অম্লান বাড়রীকেই প্রকারান্তরে দায়ী করছেন মহেশ মুস্তফী ?

"দশ বছর আগের কথা ভাবছি অম্লানবাবু।" বলতে লাগলেন মহেশ মুস্তফী। "হঠাৎ ভাবলুম আমি চোখ বুজলে আমার পরিবারের উপায় হবে কি? তাদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্যে চোখ বুজে জীবনবীমা করে ফেললুম পাঁচ-হাজারী। প্রিমিয়াম যোগাতে দুধ বন্ধ করে দিতে হলো, মাছ খাওয়াও এক রকম ছেড়েই দিলুম—সুরু হলো কোনোরকমে ডাল-ভাত খেয়ে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি। হয়তো বীমা না করে ঐ প্রিমিয়ামের টাকায় একটু দুধ-মাছ খেয়ে দেহের পুষ্টি বাড়ালে আমার টি-বি হতো না।"

এই দৃষ্টিকোণ থেকে অম্লান জিনিসটাকে ভেবে দেখেনি কখনো। আত্মপক্ষ-সমর্থনী জবাব চিন্তা করছে, এমন সময় মহেশ মুস্তফী বললেন, "কিন্তু সে জন্যে আমি আফসোস করি নে অম্লানবাবু।"

সত্যিই সেজন্যে তাঁর কোনো আফসোস বা নালিশ নেই, সেটা নিঃসংশয়ে বোঝা গেল তাঁর কণ্ঠস্বর এবং বলার ভঙ্গী থেকে। কিন্তু মহেশ মুস্তফীর নিজের মনে কোনো আফসোস বা নালিশ না থাকলেও অম্লান বাড়রীর মনে হ'তে লাগলো মহেশবাবুর এই দুর্গতির জন্য সে-ই দায়ী ; এ ক্ষতি যথাসম্ভব পূরণ না করলে তার বিবেক তাকে কোনো দিন ক্ষমা করবে না।

"এক দিকে বীমার পাঁচ হাজার টাকা, অন্য দিকে আমার স্ত্রী মালতী আর আমার সাত বছরের মেয়ে। মাঝখানে উঁচু দেয়ালের মতো ব্যবধান দাঁড়িয়ে আছি আমি। ব্যবধানটি সরে গেলেই, এই পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে ওরা বেঁচে যায়। আমার সঙ্গে এরাও তিলে তিলে কেন মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাবে? এরাও যদি আমারই সঙ্গে রওনা হয়, তাহলে আমার এই বীমার যে কোনো সার্থকতাই থাকবে না অম্লানবাবু।" বলে দম নিতে লাগলেন মহেশ মুস্তফী। কাশি চেপে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পুরোপুরি চেপে রাখতে পারলেন না।

"অত কথা বলবেন না মহেশবাবু।" বললে অম্লান। "কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে আপনার।"

"কথা না কয়ে থাকতে তার চেয়ে বেশী কষ্ট হয় অম্লানবাবু।" বললেন মহেশ মুস্তফী। "আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউ তো আসে না, সবাই বয়কট করেছে। ডাক্তার বলে দিয়েছে এখানকার চিকিৎসায় আর কিছু হবার নয়; চলে যাও উঁচু হিল স্টেশনে, স্যানাটোরিয়ামে। এদিকে ছ' মাসের ভাড়া বাকী, বাড়ীওয়ালা গলাধাক্কার শাসানি দিয়েছে। মুদী দোকানের বাকী না শুধলে আর জিনিস দেবে না। মালতীর স্কুলেরও চাকরিরও এই শেষ হপ্তা। তার পর পতির মতো সতীও বেকার।"

করুণ তিক্ত হাসি হেসে উঠলেন মহেশ মুস্তফী, আসন্ন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে বেপরোয়া শেষ হাসির মতো। সে হাসির ব্যথা বিঁধলো এসে জীবনবীমার দালাল অম্লান বাড়রীর বুকে। এমনি করুণ কাহিনী অনেক ছড়িয়ে আছে বাংলা দেশ জুড়ে। মহেশ মুস্তফীর মতো অসহায় টি-বি গ্রস্তের অভাব আর যে দেশেই থাক, বাংলা দেশে নেই। সোনার বাংলার লাখো হতভাগ্যের অন্যতম হতভাগ্য এই মহেশ মুস্তফী। কিন্তু অম্লান বাড়রীর কাছে মহেশ মুস্তফী লাখের ভেতর তুচ্ছ অন্যতম নয়; এঁকে দিয়েই হয়েছিল তার বীমা-জীবনের শুভ সূত্রপাত। এঁর জীবনের, আর এঁর স্ত্রী-কন্যার মঙ্গল-অমঙ্গলের দায়িত্ব তো এড়িয়ে যেতে পারে না অম্লান। ধর্মে সইবে না। আর ধর্মে যদি বা সয়, বিবেক রেহাই দেবে না তার হৃদয়কে।

বাড়রীর ভাবনার কুয়াশা ঠেলে এগিয়ে এলো মহেশ মুস্তফীর হঠাৎ প্রশ্ন—"কিন্তু আমার চিঠির জবাবটা তো বললেন না অম্লানবাবু? আমার বীমাপত্র কোম্পানীর কাছে সারেণ্ডার করে দিলে তার বদলে এখখুনি কত পাওয়া যাবে? কিছু টাকা যেমন করে হোক চাই-ই যে। দশ বছরে হাজার তিনেক টাকা প্রিমিয়াম দিয়েছি। তার বদলে এখন শুধু নগদ কয়েক শো টাকা চাই।"

ব্যাপারটা হালকা নয়। তবু তাকে হালকা করে দিয়ে অম্লান হেসে বললে, "নিতান্ত সহজ ব্যাপারকে আপনি অকারণ শক্ত করে দেখছেন মহেশ-

বাবু! বীমা সারেণ্ডার করে দিলে আপনার ডাহা লোকসান, আমার রেকর্ড খারাপ আর লোকসান দুই-ই। বীমাপত্র কোম্পানীর জিম্মায় জমা রেখে কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা ধার নিতে পারেন আপনি, শতকরা ছ' টাকা সুদে। তার কোন দরকার নেই। শতকরা মাত্র দু' টাকা সুদে আমার অনেক টাকা ব্যাংকে পড়ে আছে। আমি আপনাকে ধার দিচ্ছি আপনার যত টাকা লাগে। শোধ দেবেন যখন খুশী, সুদ নেহাত যদি দিতেই চান তো ব্যাংকের ঐ শতকরা দু' টাকা সুদটাই দেবেন। এই নিন আমার কাছে এখন তিনশো টাকা আছে। পরে আরো—ও কি মহেশবাবু?"

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন মহেশবাবু। তারপর বোধ হয় লজ্জা পেয়ে সামলে নিয়ে কোঁচার ডগা দিয়ে চোখ মুছে ফেললেন। বললেন, "কিছু নয় অম্লানবাবু। হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠেছিলো একটু। আপনজনে আমাদের ছেড়েছে, একটা পোস্টকার্ড লিখেও খোঁজ নেয় না। আপনার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই, অথচ আপনি—"

আবার হেসে উঠে অম্লান বললে, "এতে যে আমার পুরো স্বার্থ রয়েছে মহেশবাবু। সেটা আপনাকে খুঁটিয়ে বোঝাবার চেষ্টা না-ই বা করলুম। বীমা কোম্পানী বড়লোক, তার কাছ থেকে চড়া সুদে ধার নিয়ে তেলা মাথায় তেল না ঢেলে বরং আমার কাছ থেকে ব্যাংকের অল্প সুদেই ধার নিন। তাতে আমাদের দুয়েরি সুবিধে। ধরুন টাকাটা।"

"রান্না সারা হলে একটু পরেই মালতী আসবে অম্লানবাবু।" বললেন মহেশ মুস্তফী। "টাকাটা ওর হাতেই দেবেন। লক্ষ্মীর জিনিস আর এ লক্ষ্মীছাড়া হাতে নিতে চাই নে।"

টাকাটা অম্লান রেখে দিলে বুকপকেটে, শ্রীমতী মুস্তফীর হাতেই দেবে বলে। মনে মনে একটু ভেবে দেখলে ব্যাপারটা। ডাক্তার যে বলে দিয়েছেন এখানকার চিকিৎসায় আর কিছু হবার নয় তার কারণ হয়তো এই যে দক্ষিণা আর ওষুধের দাম দেবার সামর্থ্য মুস্তফীদের আর নেই; নইলে দক্ষিণা প্রাপ্তির সম্ভাবনা যত দিন থাকে তত দিন ডাক্তাররা তো সহজে হাল ছাড়েন না! অবশ্য কথাটা যে তাঁরা সত্যিই বলেছেন, মহেশ মুস্তফীকে

দেখে সে বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না অম্লানের মনে। এ দারুণ যন্ত্রণা থেকে রক্ষা নেই মহেশবাবুর; এই জীবন্মৃত অবস্থায় তাঁকে টিকিয়ে রাখা অমার্জনীয় অপরাধ হবে বলেই মনে হলো অম্লান বাড়রীর—বরং অবিলম্বে যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারলে আরো ভালো। অতএব আর চিকিৎসা নয়। আর ছ' মাসের ভেতর না হোক অন্ততঃ বছর খানেকের ভেতর ৺গঙ্গাপ্রাপ্তি হোক মুস্তফীর, এই কামনা করলে অম্লান বাড়রী। যন্ত্রণাময় জীবন থেকে শান্তিময় চিরবিশ্রামের দেশে চলে যান মুস্তফী—বীমার পাঁচ হাজার টাকা তাঁর স্ত্রী-কন্যার কল্যাণ করুক। সীঁথির সিঁদুর মুছে যাবে শ্রীমতী মুস্তফীর; তা মুছুক। ঐ সিঁদুর বজায় রাখবার জন্য দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে এ ভাবে তিলে তিলে যন্ত্রণা সইবার জীবনে টিকিয়ে রাখা সতীর ধর্ম নয়, এ স্বার্থপরতা।

অম্লানের চিন্তাধারার আভাষ পেয়েছিলেন কি মহেশ মুস্তফী? তিনি বললেন, "ভেবেছিলুম আত্মহত্যা করে সব চুকিয়ে ফেলবো। রাতের আড়ালে চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে শুয়ে থাকবো ঐ রেললাইনের ওপর আড়াআড়ি ভাবে, রেলগাড়ীর তলায় কাটা পড়বো বলে। মুখটা লাইনের বাইরে এগিয়ে রাখবো, যাতে করে চাকার তলায় মুখটা থেঁতলে না যায়, লাশটাকে মহেশ মুস্তফীর বলে সনাক্ত করতে অসুবিধে না হয়। কিন্তু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলাম; আত্মহত্যা টের পেয়ে সেই অজুহাতে বীমা কোম্পানী যদি বীমার টাকা আটকে দেয়?"

"ঠিকই ভয় করেছিলেন মহেশবাবু। বীমাকারীর আত্মহত্যা নিষেধ।" বললে অম্লান।

"কিন্তু তার চাইতে বড়ো ভয় কি জানেন?" বললেন মুস্তফী। "মালতীর বৈধব্য। সীমন্তে সিঁদুর মুছে যাবে মালতীর, ভেঙে যাবে হাতের শাঁখা, শাড়ীতে থাকবে না পাড়, মুখে থাকবে না হাসি। তবু তাকে বাঁচতে হবে মেয়েটার জন্যে। নির্মম পৃথিবীর সমস্ত নির্মমতার সঙ্গে একা লড়াই করে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। সে যন্ত্রণা যে মালতীর পক্ষে কী মর্মান্তিক, তা আমি ভাবতেও শিউরে উঠি অম্লানবাবু।"

সে বিষয়ে অম্লানের সন্দেহ রইলো না মহেশ মুস্তফীর মুখের পানে তাকিয়ে। দেখলে মুস্তফীর গভীর দুটি চোখের ওপর নেমে এসেছে চোখের দুটি পাতা, আর দুটি চোখের কোণ থেকে নেমে আসছে ক্ষীণ অশ্রুধারা। আবার মুছে ফেললেন দু'চোখ মহেশ মুস্তফী। আবার বলতে লাগলেন, "সেকালের বেহুলার কথা বইতে পড়েছিলাম। আর একালে মালতীকে চোখে দেখছি। বেহুলা তার মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেলায় ভেসেছিলো স্বামীর দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনবে বলে। আর এই অকরুণ সংসার সমুদ্রে মুমূর্ষু স্বামীকে নিয়ে আশার ভেলায় ভাসছে মালতী। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ সমস্ত ব্যথা সইতে সে রাজী, তার বিনিময়ে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারে আমাকে। এর চাইতে বরং মালতী যদি আমার মৃত্যু-কামনা করতো অম্লানবাবু, আমি তা'হলে হাসিমুখে মরে যেতে পারতুম। আমি মৃত্যু চাই, বিশ্বাস করুন। আমি মৃত্যু-কামনা করি, কিন্তু শুধু ওরই মুখের দিকে চেয়ে আমি মৃত্যু-প্রার্থনা করতে পারি নে।"

অম্লান বললে, "প্রার্থনা করবার প্রয়োজনও নেই মহেশবাবু। অকারণ কেন এসব ভাবনা ভাবছেন?" আর মনে ভাবলে সত্যিই মৃত্যু প্রার্থনার প্রয়োজন নেই, দুয়ারে মৃত্যু আপনিই এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজরোগগ্রস্ত মৃত্যু-পথযাত্রী একাধিক দেখেছে অম্লান বাড়রী, তারা সবাই ব্যাকুল ভাবে কামনা করেছে বেঁচে থাকবার। মৃত্যুভীতি-অনেক-দেখা চোখে মহেশ মুস্তফীর মৃত্যু-প্রীতি দেখে একটু বিস্মিত হলো অম্লান বাড়রী।

মহেশ বাবুর পিছনে ঘরের জানালাটা ছিল খোলা। সেই জানালার ভেতর থেকে প্রশ্ন এলো নারী-কণ্ঠে, "হ্যাঁ গো, তুমি এখন খেয়ে নেবে কি? রান্না হয়ে গেছে।"

টুলের ওপর যেখানে বসে ছিল অম্লান, সেখান থেকে ঘরের ভেতরে দৃষ্টি যায় না, তাই প্রশ্নকারিণীকে সে দেখতে পেলে না। কিন্তু ঐ কণ্ঠস্বরের স্পর্শ লেগে তার হৃদয়ের তন্ত্রী যেন সহসা ঝংকৃত হয়ে উঠলো।

"একটু পরেই খাবো মালতী। তুমি একটু এদিকে এসো। অম্লান-বাবু এসেছেন, আমার পুরাতন বন্ধু।" বললেন মহেশ মুস্তফী।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। সুন্দরী তাঁকে বলা চলে না, কিন্তু তাঁকে সুশ্রী না বলে হৃদয় তৃপ্তি পায় না। ললাটের মাঝখানের টিপে আর সীঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর। দুঃখে যে আছেন বোঝা যায়, কিন্তু দুঃখ তাঁকে দমাতে পারেনি। চেহারা দেখে আন্দাজ করা যায় বয়স তিরিশ পেরোতে দু'-তিন বছর এখনো বাকী।

দাঁড়িয়ে উঠে দু' হাত জুড়ে নমস্কার জানালো অম্লান। স্মিতমুখে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে মালতী মুস্তফী বললেন, "আপনি বসুন। আমি এইখানে বসছি।" বলে বারান্দায় সিঁড়ির ধারে বসে পড়লেন। অপরিচয়ের সংকোচ অনায়াসে কাটিয়ে দেবার অসামান্য ক্ষমতা ভদ্রমহিলার।

তাঁর পানে একবার তাকিয়েই অম্লানের মনে পড়ে গেল বিশ বছর আগেকার সেই স্টীমারের সহযাত্রিনীর কথা। এত দিনের প্রতীক্ষা কি আজ শেষ হলো? হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠলো অম্লান বাড়রীর। ঘুচলো না সংশয়ের দ্বন্দ্ব। প্রশ্ন এলো মনে "মনে কি পড়ে আপনি ছোটোবেলায় কখনো স্টীমারে নারাণগঞ্জ থেকে—" কিন্তু সে প্রশ্ন মুখে আনতে ভরসা পেলো না অম্লান। জবাবে মালতী মুস্তফী যদি বলেন "না", তাহলে সেই নিদারুণ আশাভঙ্গের ব্যথা বড়ো দুঃসহ হয়ে বাজবে অম্লানের বুকে—তীরের কাছে এসে নৌকোডুবির মতো। আর যদি বলেন "হ্যাঁ", যদি নিঃসংশয়ে অম্লান জানে মৃত্যুপথযাত্রী রাজরোগীর দুর্ভাগ্যবতী এই জীবনসঙ্গিনীই তার সেই হারিয়ে-যাওয়া স্টীমার-সঙ্গিনী, তাহলে সে দুঃখই বা কেমন করে সইবে অম্লান? কোনো প্রশ্ন তাই সে করলে না। সংশয়-মোচন যখন দুঃখ ঘোচাবে না, দুঃখই দেবে, তখন তার চাইতে বরং থাকুক এই সংশয়ের দোলা।

"চরম দুঃসময়ে পরম বন্ধু এসে পড়েছেন, মালতী।" মুস্তফী বললেন। "সামনে অকূল দেখে ভেবে আকুল হয়েছিলুম; পেলুম কূলের ভরসা।"

"এই দু'বছর ধরে এত দুঃখ আপনারা সয়েছেন, অথচ আমি জানতে

পারিনি আপনাদের কোনো কাজে, এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না মহেশ-বাবু।” কথাটা মহেশ মুস্তফীকে বললে অম্লান, মালতী মুস্তফীকে শুনিয়ে।

আবার হাসলেন মালতী মুস্তফী তাঁর তুলনাবিহীন হাসি। বললেন, “দুঃখকে ভয় পেলেই তো আর দুঃখ ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে না। তাছাড়া ভেতরের কান্না বাইরে কেঁদে লাভ কি ?”

অস্তোন্মুখ সূর্যের লাল আলোয় চকচক করে উঠলো মালতী মুস্তফীর চোখ দুটি। আর ঐ দু'টি চোখের দিকে তাকিয়ে অম্লানের চোখের সামনে আবার ভেসে উঠলো বিশ বছর আগে পদ্মানদীর বুকে সেই স্টীমারের সঙ্গিনীর সঙ্গে প্রথম দেখার পরম মুহূর্ত। অম্লানের কর্তব্য স্থির হয়ে গেল।

তার পরের কাহিনীটুকু সংক্ষেপে বলা যায় আর সংক্ষেপে বলাই ভালো। অম্লান একদিন এসে বললে, “আমি ছ' মাসের ছুটি নিয়ে যাচ্ছি উঁচু স্বাস্থ্যকর হিল স্টেশনে। আপনারা চলুন আমার সঙ্গে, এ বাড়ীর পাট তুলে দিয়ে। আমার এক বন্ধুর চমৎকার বাড়ী খালি পড়ে থাকে সেখানে —যত দিন খুশী থাকতে পারবেন, এক পয়সা ভাড়া নেবে না বন্ধুটি ; বাড়ী ভাড়া সে দেয় না। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেবো।” বন্ধুর ভাড়াহীন বাড়ীর কথাটা মিছে কথা। মুস্তফীরা ঐ বাড়ীতে গেলে বাড়ীওয়ালাকে মাসের পর মাস নিয়মিত ভাবে বাড়ী ভাড়া গোপনে দেবার ব্যবস্থা করবে অম্লান।

তারপর বললে, “ও বাড়ীর কাছেই একটি আশ্রমও সেখানে আছে। আশ্রমের সেবকদের কাছ থেকে সব রকম সাহায্যও সর্বদাই পেতে পারবেন, যখন যা দরকার। আশ্রমের সবাই আমার চেনা।” এ কথাটা সত্যি। “তাছাড়া”, বললে অম্লান, “খুব উঁচুদরের একটি স্যানাটোরিয়াম আছে সেখানে। সেরা ডাক্তারদের চিকিৎসার সুযোগ চাইলেই পাওয়া যাবে। স্যানাটোরিয়ামের প্রায় সবাইকে আমি খুব ভালো চিনি। ডাক্তারের ফী, ওষুধের দাম কিছুই লাগবে না।” এও সত্য, শুধু শেষ কথাটা ছাড়া। খরচা লাগবে ঠিকই, সেটা গোপনে দেবে অম্লান।

শ্রীমতী মুস্তফী বললেন "কিন্তু…"

অম্লান বললে, "এর ভেতর আর কিন্তু নেই। ওখানে আশ্রমের একটা স্কুল আছে ছোটদের জন্যে, সেখানে আপনি সেলাই আর পড়ালেখা শেখাতে পারবেন। অল্প মাইনে, কিন্তু তাতেই আপনাদের চলে যাবে। ওখানে জীবন ধারণের খরচা বেশী নয়।" ঐ অল্প মাইনেটাও আশ্রম মারফত অম্লানই দেবে।

রাজী করাবার ক্ষমতা অসাধারণ অম্লান বাড়রীর। রাজী করিয়ে ফেললে সে মুস্তফীদের। তারপর তাদের নিয়ে আজ রওনা হয়ে চলে গেল উঁচু পাহাড়ী স্বাস্থ্যনিবাসে। চলে গেল পিছে ফেলে তার জীবনবীমার দালালী। জানি নে কবে সে ফিরবে। জানি নে আর ফিরবে কি না। শুধু এইটুকু জানি যে মনের সংশয় ঘোচাতে কখনো সে প্রশ্ন করবে না শ্রীমতী মালতী মুস্তফীকেঃ "আপনার কি মনে পড়ে খুব ছোটবেলায় কখনো স্টীমারে চড়ে নারাণগঞ্জ থেকে আপনি…" ইত্যাদি।

বাড়ী ছেড়ে অনাথবাবু চলে গেলেন। বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন তাঁর মধুর কারখানায়, যার "মধুভারতী" নামটি আরো বেশী সার্থক করে তুলবেন সারা দেশে তাঁর "ভারত" মার্কা মধু ছড়িয়ে দিয়ে। মধুভারতীর পাশেই মা-মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির, যেখানে তৈরী হয় ডজন ডজন মঙ্গলচণ্ডী মাদুলি। সে মাদুলি ধারণ করে পরীক্ষা পাস, দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে রেহাই, মকদ্দমা জয়, প্রেমে সাফল্য, চাকুরি প্রাপ্তি, পদোন্নতি, শত্রু নিপাত, ধনলাভ, স্ত্রীলাভ, পুত্রলাভ ইত্যাদি বহু কিছু সম্ভব হয়। প্রতিটি মাদুলির দাম মাত্র এক টাকা সওয়া পাঁচ আনা। এই মাদুলি আরো বেশী করে' বাজারে চালু করে আরো বেশী লোকের কল্যাণ করবেন অনাথবাবু। মধু আর মাদুলি, মাদুলি আর মধু—এই উপকরণ দিয়েই তিনি

উপকার করবেন জন-নারায়ণের। এই তাঁর জীবনের ব্রত। এই ব্রতে নিজেকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দিয়েই তিনি ভুলে থাকবেন একা থাকার দুঃখ। হিন্দু গৌরব, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত, আর্যপ্রেস, ডি. এম. বাগচী ইত্যাদি যতগুলো পঞ্জিকা বাজারে চালু, তার প্রত্যেকটিতে পুরো পাতা বিজ্ঞাপন ছাপা হয় অনাথবাবুর মঙ্গলচণ্ডী মাদুলির। প্রতি বছর। অর্ডার আসে প্রচুর, বলেছেন অনাথবাবু, আর প্রচুর পয়সা আসে অনাথবাবুর পকেটে।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম বোকাদের মাথায় কাঁটাল ভাঙবার এ ব্যবসা কি ধোঁকাবাজি নয়? অনাথবাবু বলেছিলেন, "তা যদি বলো, তাহলে এ সংসারটাই যে ধোঁকার টাটি। আর মাদুলিকে যদি ভুয়ো বলে দুয়ো করো তাহলে তো ভগবানকেও কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে হয়। কথায় বলে—বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর। ভগবানকে বিশ্বাস করো উপকার পাবে; অবিশ্বাস করো উপকার পাবে না। বিশ্বাসটুকু ফাঁকা হয়ে গেলেই ভগবানও ফাঁকা, মাদুলিও ফাঁকা। বিশ্বাসের ওপরই চলছে দুনিয়া, চলছে আমার মঙ্গলচণ্ডী মাদুলি। অবিশ্বাস আনে দুঃখ, বিশ্বাস আনে শান্তি। বিশ্বাসের ক্ষেত্র প্রশস্ত করার চাইতে বড়ো মঙ্গল-ব্রত দুনিয়ায় আর কি আছে ধনপতি? এই কাগজখানা পড়ে দেখ।" বলে ছাপানো মঙ্গলচণ্ডী মাদুলি ধারণ ও ব্যবহার-বিধি আমায় পড়তে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক মাদুলির সঙ্গে এই কাগজখানা পাঠানো হয়। প্রথমেই লেখা আছে —মনে পূর্ণ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস নিয়ে এ মাদুলি ধারণ করতে হবে, তা না হলে ফল পাওয়া যাবে না। তারপর প্রত্যেক মাদুলি ধারণকারীর অবশ্য কর্তব্য হিসেবে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও পবিত্রতা রক্ষার যে-সব বিধি দেওয়া আছে, সেগুলো পালন করলে এমনিতেই দেহ ও মনের স্বাস্থ্যোন্নতি হবার কথা। মনে হলো এই বিধিগুলোই আসল, মাদুলিটা নিতান্তই ফাউ বা ফাঁকি মাত্র।

"কিন্তু এই ফাউ বা ফাঁকিটুকু না হলে ঐ আসলগুলো আসতো না।" বলেছিলেন অনাথবাবু। "পাঁজি পরামর্শ করে যারা চলে তারা কি ধরণের মানুষ তা তো জানো? দেহ মনের এই স্বাস্থ্যবিধিগুলো এমনিতে তাদের

ক'জন মানতো ? কার অত ধৈর্য ? কার বা অমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ? মঙ্গলচণ্ডী মাদুলি ধারণ করে মা মঙ্গলচণ্ডীকে তুষ্ট রাখবার জন্যে যারা এ বিধিগুলো মানবে, তাদের উপকার হবেই। এ ছাড়া বিশ্বাসেও অনেক ক্ষেত্রে সুফল ফলবে। মাত্র একটাকা সওয়া পাঁচ আনা খরচা করে ক্রেতারা যা উপকার পাবে তার দাম এক টাকা সওয়া পাঁচ আনার ঢের বেশী। এই মাদুলি প্রচার করে এই যে এত লোকের উপকার করছি, এতে পাপ যদি কিছু হয়, সে পাপের বোঝা আমি শিরোধার্য করে নেবো ধনপতি।" বহুর ভালোর জন্যে বহু পাপের বোঝা আপন মাথায় বইবার আত্মত্যাগের গৌরবে তাঁর চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠেছিলো।

পাঁজির বিধান যাদের কাছে বেদবাক্য, যন্ত্রের চাইতে মন্ত্র যাদের কাছে বেশী সত্য, তাঁরাই মঙ্গলচণ্ডী মাদুলির খদ্দের। সোজা সত্য পথে যাদের মঙ্গল করা সম্ভব নয়, বাঁকা ফাঁকির পথে অনাথবাবু তাদের মঙ্গল করেন মঙ্গলচণ্ডী মাদুলির মধ্যমে। এতে দুপয়সা যদি তার পকেটে আসে তো আসুক। ক্ষতি কি ? আপত্তিই বা কিসের ?

অনাথবাবু চলে গেলেন। এখন থেকে এ বাড়ীতে থাকবেন বীমাদালাল নন্দদুলাল নন্দী। এতদিন বাড়ীর সদর দরজায় নাম-ফলক ছিলো না, যাবার দিনে লাগিয়ে গেলেন অনাথবাবু। তাতে ইংরিজি হরফে লেখা : এ. পি. রায় চৌধুরী। বললেন "এ. পি. দেখে লোকে ভাববে অতুল প্রসাদ, অনাদি প্রসাদ, অরুণ প্রকাশ, অমল প্রকাশ, এমন কি হয়তো অজিত প্রসাদ। কিন্তু কেউ কি কল্পনাও করতে পারবে এই এ. পি. মানে অনাথপিণ্ডদ ?"

শুধালেম, "যাবার মুখে এ খেয়াল কেন অনাথবাবু ?"

অনাথবাবু বললেন, "এ খেয়াল তো যাবার মুখেই হয় ধনপতি। চলে যাবার আগেই তো চিহ্ন রেখে যাবার সাধ জাগে।" বলে' আবৃত্তি করে শোনালেন ৺প্রজ্ঞাপারমিতার কবিতা থেকে :

"স্রোতের শ্যাওলা ভাবে : স্রোতে ভেসে থেকে থেকে থেকে
জল বক্ষে যাবো চিহ্ন রেখে ;

স্রোত ভাবে : চিহ্ন মোর রেখে যাবো দুই তীরে।
ফুল ফোটে, ফুল হাসে, পাখী যায় ডেকে ;
কবি ভাবে : ফুলে ফুলে, পাখীদের ভিড়ে
আমার স্মরণ-চিহ্ন গান দিয়ে রেখে যাবো ঘিরে।"

★

লেকের ধারে দিগন্তবাবু বললেন, "অনাথবাবু শেষটায় বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, রামপ্রসাদবাবু ?"

রামপ্রসাদবাবু বললেন, "বাড়ী ছাড়লে আর কোথায় ? সাবলেট করে ভাড়াটে বসিয়ে গেছে ; প্রতি মাসে কম-সে-কম পঞ্চাশটি টাকা মুনাফা মারবে অনাথ। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।"

"বাড়ীওয়ালা আপত্তি তুলবে না ?" প্রশ্ন করলেন ব্যোমব্রহ্মবাবু।

রামপ্রসাদ বললেন, "তুলবে কি করে ?" সাবলেট তো আর বলছে না অনাথ। বাড়ী তো অনাথের নামেই রইলো। নন্দদুলাল এ পাড়ায় বাড়ী খুঁজছিলো হন্যে হয়ে, পেয়ে ধন্য হয়ে গেল। নন্দর এখন পোয়া বারো। ছিল বীমাদালালীর ঘোড়দৌড়ে দক্ষিণপাড়ার দুনম্বর ঘোড়া, হয়ে গেল এক নম্বর। কিন্তু হলে হবে কি ? অম্লানের সঙ্গে তুলনা হয় না নন্দর।"

হঠাৎ রামপ্রসাদবাবু পূব দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঐ এসেছেন।"

ব্যোমব্রহ্মবাবু বললেন, "কে ?"

রামপ্রসাদবাবু বললেন, "আমাদের অবচেতনবাবু।"

একটু পরেই আসন গ্রহণ করতে করতে সাইকো-অ্যানালিস্ট ধূর্জটি ধর বললেন, "আপনারা তো কিচ্ছু খবর রাখেন না। জানেন ওদিকে ভুজঙ্গ চৌধুরী গোপনে গোপনে কি কাণ্ড করে বসে আছে ?"

জানেন না এঁরা কেউ। এমন কি রামপ্রসাদবাবু পর্যন্ত নয়। তবু

অত সহজে হার মানতে রাজী নন তিনি। বিখ্যাত ধনী-দুলাল এবং ধনকুবের ভুজঙ্গ চৌধুরীর অনেক খবরই তিনি রাখেন; ধূর্জটিবাবুর প্রশ্নের সুর শুনেই সম্ভাব্য ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে হেসে বললেন, "জানি নে মানে? যেদিন থেকে অমন একটি লেডি সেক্রেটারী ভুজঙ্গের, সেদিন থেকেই জানি কেলেংকারী একটা শেষ পর্যন্ত—"

"কেলেংকারী? আপনার অবচেতন মনে দেখছি একটা কেলেংকারী কমপ্লেক্স্ কাজ করছে, রামপ্রসাদবাবু! কেলেংকারী টেলেংকারী কিছু করেছিলেন নাকি মশাই? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—" অট্টহাসির তরঙ্গে রামপ্রসাদবাবুকে ভাসিয়ে দিলেন ধূর্জটিবাবু। তারপর বললেন, "কেলেংকারী কিছু করেনি ভুজঙ্গ। গোলাপডাঙায় নিরালা বাবার আশ্রমের লাগোয়া পূব দিকে প্রায় দুশো বিঘে জমি কিনেছে; আজই দলিল রেজেস্ট্রি হলো।"

অবিশ্বাসের হাসি হেসে রামপ্রসাদবাবু বললেন, "ভুজঙ্গ চৌধুরীর সব খবরই দেখছি সঙ্গে সঙ্গে আপনার নখদর্পণে এসে যায়।"

রামপ্রসাদবাবুর হাসির অবিশ্বাসটুকু লক্ষ্য করে পাল্টা মৃদু হেসে সাইকো-অ্যানালিস্ট্ ধূর্জটি ধর বললেন—"দর্পণ আমার কোন নখেই নেই, রামপ্রসাদবাবু। ওই দুশো বিঘে জমি হচ্ছে প্রাণকান্ত পাখিরার। পাখিরার উকিল সম্পর্কে আমার মেজো শালা। ঠন্‌ঠনিয়ারাও শুনেছি ঐ জমি কিনবার তালে ছিল, আর নিরালা বাবাকে ভক্তি দেখিয়ে হাত করবার চেষ্টা করেছিলো। পাখিরা আবার নিরালা বাবাকে খুব মানে কিনা! কিন্তু ওখানে কারখানা টারখানার পত্তন বোধকরি নিরালা বাবার তেমন পছন্দ নয়। দুশো বিঘে জমি পেলে তাই ভুজঙ্গ চৌধুরী। পেলে না ঠন্‌ঠনিয়ারা।"

"কিন্তু ওখানে দুশো বিঘে জমি দিয়ে করবে কি ভুজঙ্গ?" শুধালেন দিগন্তবাবু।

"গড়ে তুলবে বসতি, উপনিবেশ, জনপদ, কলোনী।" বললেন ধূর্জটি ধর। "চৌধুরীদের দুই পুরুষের বস্তি উৎখাত করে চৌধুরী ম্যানশ্যান্স্ বানিয়েছিল ভুজঙ্গ, বাপকে না জানিয়ে; তাই দেখে বাপের বুক

ভেঙে রয়েছে। বাপকে খুশী করবে এই দুশো বিঘে জমির জঙ্গল, বাঁশবন সব উৎখাত করে বসতির পত্তন করে। ঝড়ের বেগে কাজ এগিয়ে নেবার জন্যে সেরা কনট্র্যাক্টর লাগিয়েছে। মাস দুয়েকের ভেতর বস্তির পত্তন করে উদ্বোধন করবার জন্য একবারেই নিয়ে আসবে অনঙ্গ চৌধুরীকে।"

"পিতৃভক্তি আছে ভুজঙ্গ চৌধুরীর", বললেন ব্যোমব্রহ্মবাবু। "অনেক পরিবারকে ঘরছাড়া করে বাপকে দুঃখ দিয়েছিল, এবার অনেক পরিবারকে ঘর দিয়ে বাপকে আনন্দ দেবে।"

"সচেতন মনে তাই বটে।" বললেন সাইকো-অ্যানালিস্ট। "কিন্তু ভুজঙ্গের অবচেতন মনে রয়েছে যার আসল প্রেরণা, সে আজ বেঁচে নেই।" কে সে? এই প্রশ্ন জেগে উঠলো প্রত্যেকের মনে, ধ্বনিত হলো না কোনো মুখে। সেই অধ্বনিত প্রশ্নের জবাবে ধূর্জটি ধর ধীরে ধীরে বললেন—

"প্রজ্ঞাপারমিতা।"

"অনাথের মেয়ে?" চম্‌কে উঠে প্রশ্ন করলেন রামপ্রসাদবাবু।

"হ্যাঁ, অনাথের মেয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা।" বললেন ধূর্জটি ধর। "আপনারা হয় তো জানেন না, প্রজ্ঞাকে পুত্রবধূ করবার কল্পনা জেগেছিল অনঙ্গ চৌধুরীর মনে, এ আমি তাঁর ঘরে বসে তাঁর নিজের মুখে শুনেছি। সেই কল্পনার আভাস পেয়েছিল ভুজঙ্গ, প্রজ্ঞাপারমিতার রঙে রঙীনও হয়ে উঠেছিলো ভুজঙ্গের হৃদয়। কিন্তু চলে গেল প্রজ্ঞাপারমিতা। তারই স্মৃতিতে ভুজঙ্গ গড়ে তুলবে গোলাপভাঙায় দুশো বিঘের নতুন জনপদ, খস্‌ড়া পরিকল্পনাও তৈরী হয়ে গেছে। বস্তি উৎখাত করে যে বিরাট চৌধুরী ম্যান্‌শ্যান্‌স্ উঠেছিলো, তার উদ্বোধনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলো প্রজ্ঞাপারমিতা। অনঙ্গ চৌধুরীকে বলেছিলো ঐ ম্যানশ্যান উৎখাত করে বসতির পত্তন করলে তার উদ্বোধনে সে আসবে খুশী হয়ে। হয়তো ভুজঙ্গ ভাবছে তার এই নতুন জনপদের উদ্বোধনে—ও কে, বিশ্বম্ভরবাবু না?"

ধূর্জটিবাবুর দৃষ্টির গতি লক্ষ্য করে দেখা গেল দূরে লেকের জলের কিনারা ঘেঁষে বেড়াচ্ছেন বিশ্বম্ভরবাবু, সঙ্গে তাঁর কন্যা শর্বরী।

বজ্রশেখরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সঙ্গে ওঁর মেয়েও এসেছে দেখছি। অনেকদিন বাদে দেখলুম ওঁকে মেয়েকে নিয়ে লেকে বেড়াতে।"

"ডাকবো নাকি ?" বললেন দিগন্তবাবু। ব্যোমব্রহ্মবাবু বললেন "থাক্। আসবার হলে এমনিতেই তো আসতেন। মেয়ের সঙ্গেই বেড়াতে দিন ওঁকে।"

"কিন্তু প্রজ্ঞার ভাই বোধিসত্ত্ব যে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল" বললেন দিগন্তবাবু, "মনোবিকলনের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি সে বিষয়ে কি বলেন ধূর্জটিবাবু ?"

ধূর্জটি ধর বললেন, "বোধিসত্ত্ব যে উধাও হবে বাড়ী ছেড়ে, এ আমি আগেই জানতুম, সাইকো-অ্যানালাইজ করে।"

"বলেন কি ?" বললেন অবিশ্বাসপ্রবণ রামপ্রসাদবাবু। "সাইকো-অ্যানালিসিসের জেরা সইতে রাজী হয়েছিল বোধিসত্ত্ব ?"

"হেঃ হেঃ হেঃ! হাসালেন রামপ্রসাদবাবু।" বললেন সাইকো-অ্যানালিস্ট ধূর্জটি ধর। "সাইকো-অ্যানালিসিস কি আর ওকে বলে কয়ে করেছি ? একদিন নয়, দুদিন নয়, বেশ কয়েকদিন ওকে জানতে না দিয়েই সাইকো-অ্যানালাইজ করে জেনে নিয়েছিলুম শুধু দিদির টানেই ও বাড়ীতে আটকে আছে ; প্রজ্ঞাপারমিতা সরে গেলেই ও মা বাবাকে ছেড়ে পালাবে। ওর মনে একটা কম্‌প্লেক্‌স্ গড়ে উঠেছিলো যে অনাথবাবু আর সংঘমিত্রা দেবী ওর আসল বাপ-মা নন।"

"অদ্ভুত ! আশ্চর্য !"

"ব্যাড্‌মিণ্টন বলের অবস্থা তো জানেন ? তাকে এধারের র‍্যাকেট তাড়িয়ে দেয় ওধারে, আর ওধারের র‍্যাকেট তাড়িয়ে দেয় এধারে, বেচারা কোথাও পায় না স্নেহের আশ্রয়। তেমনি অবস্থা ছিল বোধিসত্ত্বর ওর বাপ-মার কাছে—স্নেহের আশ্রয় পায়নি কারো কাছেই। আঘাত পেয়ে পেয়ে ক্রমে সে বাপ-মার কাছ থেকে নিজেকে যতই সরিয়ে নিয়েছে, ওর বাপ-মার বিরূপতাও ততই বেড়ে উঠেছে। এই দুষ্ট চক্রের আবর্তনের ফলে একদিকে বাপ-মা, অন্যদিকে ছেলে, মাঝখানের

মাটিতে চিড় ধরে তাই থেকে ফাটল তৈরি হলো আর সেই ফাটল হতে লাগলো চওড়া থেকে আরও চওড়া। এমনি সময় হয়তো কেউ একজন তাকে বোঝালো মা-বাবা তাকে ভালবাসে না ; ভালোবাসে তার দিদিকে।"

"ফলে বোধিসত্ত্বর হিংসে হল দিদির ওপর ?"

"হতে পারতো, কিন্তু প্রজ্ঞাপারমিতার স্নেহ পেয়ে এমনি ধন্য হয়েছিল বোধিসত্ত্ব যে, হিংসার কথা তার কল্পনাতেই এলো না। বোধিসত্ত্ব তার দিদিকে মনে মনে দেবী বানিয়ে নিলে ; ওর অবচেতন মন চাইলে দিদির ভেতরেই ওর বাবা-মাকেও পেতে।"

রামপ্রসাদবাবু বোধ করি প্রথম থেকেই ধূর্জটিবাবুর এই অবচৈতনিক বিশ্লেষণগুলো অবিশ্বাসের কানে শুনছিলেন। একতরফা ধাপ্পা মেরে যাচ্ছেন ধূর্জটিবাবু, এই সন্দেহ নিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, "অনাথ-সংঘমিত্রা ওর প্রকৃত বাপ-মা নন—এত বড় সন্দেহ যদি জাগলো মনে, তা হলে সে বিষয়ে দিদিকে কিছুই শুধালে না কেন বোধিসত্ত্ব ?"

"অমন দিদির সত্যিকারের সহোদর সে নয়, এ কল্পনা যে তার কাছে কি অসহ্য ছিল তা কল্পনাও করতে পারবেন না আপনারা।" বললেন ধূর্জটি ধর। "ঐ প্রসঙ্গ দিদির সামনে উত্থাপন করাই অসম্ভব ছিলো বোধিসত্ত্বর পক্ষে।"

ব্যোমব্রহ্মবাবু কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নকণ্ঠে শুধালেন, "কিন্তু ছেলেটা পালিয়ে গেল কোথায় বলতে পারেন ?"

ধূর্জটিবাবু বললেন, "তা পারিনে। কিন্তু কোথাও গিয়ে অসহায় হয়ে পড়বার ছেলে নয় বোধিসত্ত্ব। যেখানেই যাবে, নিজের জায়গা করে নেবে ; যেখানেই থাকবে, সর্দারী করবে। তৈমুরলঙ্গের কাহিনী পড়েছেন তো ইতিহাসে ? ছেলেবেলায় খোঁড়া বলে লোকে ঠাট্টা করতো, তাতেই ক্ষেপে উঠে তৈমুরের জেদ চেপে গেল, এই খোঁড়ার মুরোদ দেখাতে হবে হুনিয়াকে। দেখালেও তাই, দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী হয়ে। বোধিসত্ত্বর কাহিনীও অনেকটা তেমনি। চেহারা তার ভাল নয়, রং কালো—দুয়েতেই দিদির উল্টো। তার ওপর তার ধারণা দুনিয়ায় সে অনাথ, অসহায়, একা, কেউ

নেই তার আপনজন। এক দিদি প্রজ্ঞাপারমিতা, কিন্তু তার সঙ্গে নেই সত্যিকারের রক্তের সম্পর্ক, দুদিন বাদে সে চলেও যাবে। সুতরাং নিজের ওপরই ভরসা রেখে দুনিয়ায় দাঁড়াতে হবে তাকে, অর্জন করতে হবে দুরন্ত শক্তি। তা ছাড়া অসাধারণ দিদির যোগ্য ভাই হতে হলে তাকেও হতে হবে অসাধারণ। তার অসাধারণ হবার সাধনার পেছনে এই ছিলো প্রেরণা।"

লেকের ধারে পায়চারী করতে চলে গেলেন ধূর্জটি ধর। সঙ্গে গেলেন না কেউ, বাকী সবাই পদচারণার চাইতে বৈঠকের বেশী পক্ষপাতী।

ধীরে ধীরে পূব থেকে পশ্চিমে আর পশ্চিম থেকে পূবে পায়চারি করছিলেন বিশ্বম্ভর রায় এবং তাঁর কন্যা শর্বরী রায়। গিয়ে দেখি তাদের সঙ্গে পায়চারিতে যোগ দিয়েছেন ধূর্জটি ধর। বিশ্বম্ভরবাবুর মাথার টাক ঢাকা গান্ধী টুপি দিয়ে। আমায় দেখে খুশী হয়ে বললেন, "এই যে ধনপতিবাবু!"

ধূর্জটিবাবু বললেন, "আপনাদের আলাপ-পরিচয় আছে দেখছি।"

"সম্প্রতি হয়েছে।" বললেন বিশ্বম্ভরবাবু। "এই সেদিন আমার বাড়ীর ছাদে পদধূলিও দিয়ে এসেছেন যে। তুই চিনতে পারিসনি শর্বরী? সেই যে তোর হাতের তৈরী চা আর নারকেলের সন্দেশ—"

শর্বরী বললে, "পেরেছি বই কি বাবা।" বলে স্নিগ্ধ হাসির অভ্যর্থনা জানালে আমাকে। সেই ক্ষণিক হাসির আলোয় মনে হলো যেন অপরূপ হয়ে উঠেছে বিগত জলবসন্তের স্মৃতিচিহ্নমাখা তার রূপহীন মুখখানি। এমনি হাসিই নিশ্চয় শর্বরীর মুখে দেখেছিল শিল্পী কিশোর চৌধুরী।

বললাম, "সেদিন ছাতে আপনার সঙ্গে আলাপ হতে পারেনি। সেই ক্ষতিটা আজ পুষিয়ে নিতে চাই। আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে জানিনে। এসেছিলেম যেদিন প্রথম এ পাড়ায়, সেদিন ভাবতেও পারিনি আমার স্মৃতির ভাণ্ডার এমন অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হবে।"

সাইকো-অ্যানালিস্ট বললেন, "জীবনে যত অভিজ্ঞতা, তার সাড়ে

বারো আনাই তো অপ্রত্যাশিত, আর বাঁচবার বারো আনা মজাই তো সেইখানে।"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "ঠিকই বলেছেন। জীবনের অভিজ্ঞতা কতক আনন্দের, কতক বেদনার। তারপর তারা যখন যায় অতীত হয়ে, তখন তাদের স্মৃতি-রোমন্থনে মিশে থাকে আনন্দ বেদনা। জীবনের যে দিনগুলো চলে যায়, তারা তো আর ফিরে আসে না ধূর্জটিবাবু।"

"সেইটেই হয়তো বাঁচোয়া।" বললেন ধূর্জটি ধর।

"হয়তো তাই ধূর্জটিবাবু।" বললেন বিশ্বম্ভরবাবু। "কিন্তু প্রজ্ঞাপারমিতা আর ফিরে আসবে না কোনদিন, একথা যেন ভাবতেই পারিনে। যে ফাঁক সে রেখে গেল, সে ফাঁক আর কোনদিনই ভরবে না।"

"একজনের ফাঁক কোনদিন অপর কাউকে দিয়ে ভরে না বিশ্বম্ভর-বাবু।" বললেন ধূর্জটি ধর। "ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখুন।"

"বিজ্ঞান ছোট নয়; তুচ্ছ নয় মানি, কিন্তু বিজ্ঞানকেই জীবনের দেবতা বানিয়ে তুলতে চাইনে ধূর্জটিবাবু।" বললেন বিশ্বম্ভরবাবু। "মানুষকে সত্যিকারের মানুষ বানিয়েছে তার বুদ্ধি নয়, তার হৃদয়। আমার হৃদয় সুধায় ভরে দিয়ে গেছে প্রজ্ঞাপারমিতা।"

"আপনারও দেখছি প্রজ্ঞা-কমপ্লেক্স্।" বললেন ধূর্জটি ধর। "প্রজ্ঞার বাবারও যা হয়নি।"

"হয়নি, এ আমি ভাবতেই পারিনে ধূর্জটিবাবু। আপনি ওর বাইরের ধৈর্যের মুখোসটাই দেখেছেন, ভেতরের হাহাকারটা শুনতে পাননি। সন্তান হারানোর কি যে ব্যথা, তা তো নিজে বাপ না হলে বোঝা যায় না ধূর্জটি-বাবু।"

ধূর্জটিবাবু কি একটা অস্পষ্ট অজুহাত দিয়ে আমাদের থেকে বিছিন্ন হয়ে চলে গেলেন।

ব্যথিত কণ্ঠে বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "ছি ছি, হঠাৎ বেফাঁস কথা বলে বড় দুঃখ দিলুম ধূর্জটিবাবুকে।"

শুধালেম, "কি কথা, বিশ্বম্ভরবাবু ?"

"ঐ যে বললুম সন্তান-হারানোর ব্যথা বাপ না হলে কেউ বুঝতে পারে না।" বললেন বিশ্বম্ভরবাবু। "ধূর্জটিবাবুর স্ত্রী-সৌভাগ্য হয়েছিল, কিন্তু সন্তান-সৌভাগ্য কোনদিন হয়নি। এই জন্যেই ওঁর অবচেতন মনে বরাবর একটা হীনম্মন্যতা, যাকে বলে ইনফিরিঅরিটি কমপ্লেক্স্। খেয়াল না করে হঠাৎ ওর বড় ব্যথার জায়গায় আঘাত করে ফেলেছি। এক সময় গিয়ে বুঝিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসতে হবে।"

"আপনিও কি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব পড়েছেন ?"

"ধূর্জটি বাবুরই কৃপায়। ফ্রয়েডের উনি ভারি ভক্ত কিনা! ছ'বছর আগে স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, তারপর থেকে মনোবিজ্ঞান আর সাইকো-অ্যানালিসিস্ নিয়েই আছেন। ফ্রয়েড্ অনেক সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু দুনিয়ার কোনো সত্যিই হয়তো পুরো সত্য নয়, কোনো মিথ্যেই হয়তো পুরো মিথ্যে নয় ধনপতিবাবু। হ্যাঁ, কি যেন শুনতে চেয়েছিলেন শর্বরীর কাছে ?"

শর্বরীকে বললাম, "অনেক মুখে শুনলাম প্রজ্ঞাপারমিতার কথা। ওঁর সহপাঠিনী আপনি, আপনার মুখে ওঁর কথা কিছু না শুনে মন আমার তৃপ্ত হবে না, শর্বরী দেবী। শুনেছি তিনি ছিলেন অতুলনীয়া, অনির্বচনীয়া। আপনি তাঁর প্রিয়তমা সহপাঠিনী বলেই জানি, তাই আপনাকে প্রশ্ন করছি প্রজ্ঞাপারমিতা কি ভালবাসেন নি কাউকে ?"

"ভালোবাসাই তো ছিল ওর জীবন-দর্শন।" বললে শর্বরী। "ওর চোখে কেউ তুচ্ছ ছিল না, সামান্য ছিল না কেউ। ঘৃণা ছিলো না ওর প্রকৃতিতে। সবাইকে প্রজ্ঞা ভালোবেসে গেছে।"

"আমি বোঝাতে চাচ্ছি উনি বিশেষ কাউকে—"

"মানে যাকে বলে প্রেমে পড়া, ফলিং ইন্ লভ্?" বললেন বিশ্বম্ভরবাবু। "আমার কি মনে হয় জানেন ধনপতিবাবু ? তিলোত্তমা প্রজ্ঞাপারমিতা খুঁজে পেলে না তার তিলোত্তমকে। দুনিয়ার তিলোত্তমাদের এই তো ট্র্যাজেডি।"

আমি বললেম, "কিন্তু তিলোত্তমা কি তিলোত্তমকেই খুঁজে বেড়ায় বিশ্বম্ভরবাবু? অথবা তিলোত্তম কি চায় শুধু তিলোত্তমাকেই? প্রবাদে কি বলে না প্রেম অন্ধ? সাধারণের প্রেমে কখনো কি ছেয়ে যায় না অসাধারণের চিত্ত?"

বিশ্বম্ভরবাবু ছলছল কণ্ঠে বললেন, "সেকি প্রেমের কথা জানি নে ধনপতিবাবু, কিন্তু সত্যিকারের প্রেম অন্ধ নয়—তারই আছে সত্যিকারের চোখ। সেই পারে সাধারণের ছদ্মবেশের আড়ালে লুকোনো অসাধারণকে খুঁজে বার করতে। তাই তো অনেকেই যাকে চিনলে না, সেই তাকেই অদ্বিতীয় শিল্পী কিশোর চৌধুরী সারা হৃদয় দিয়ে—"

বিশ্বম্ভরবাবুর স্নেহ-করুণ দৃষ্টি ঘুরে গেল কন্যা শর্বরীর দিকে। তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়ে শর্বরী হাসির ছলে বললে, "ও কথা থাক, বাবা।"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "ঠিক বলেছিস্ মা। কিশোরের কথা তুলে এখন মিছে দুঃখ পাওয়া বই তো নয়? দেশ ছেড়ে চলে গেল, হয় তো এদেশে আর ফিরবেই না কিশোর। তার পিছে ফেলে যাওয়া স্টুডিয়োতে কে কাজ করছে জানিস্ মা শর্বরী?'

"কে বাবা?"

"শিল্পী গোপীকিঙ্কর। গুণী সাধক, নামী আঁকিয়ে, কিন্তু কোথায় তার তুলিতে কিশোর চৌধুরীর সেই যাদু? কোনো তুলনাই হয় না মা, কিশোরের সঙ্গে গোপীর।"

"তুলনা উচিতও নয়, বাবা। তুলনায় বড় দুঃখ পেতো প্রজ্ঞা। সে বলতো শিল্প, সাহিত্য, আর সংগীতের সাধক যারা, সুন্দরের পূজায় তারা সবাই সহ-পূজারী, কম্‌রেড্; যে যার সাধ্যমতো অঞ্জলি দেয় দেবীর বেদীতলে। আমরা শ্রদ্ধা করবো তাদের সেই অঞ্জলির নিষ্ঠাকে; হিসেব করবো না কে দিলে গোলাপ, কে দিলে গন্ধরাজ, কে দিতে পারলে শুধু টগর বা কাঁটালী চম্পা।"

একটু ভেবে বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "তা বটে মা, তা বটে। কিন্তু

আমরা সাধারণ মানুষ তো আর ভাবগ্রাহী জনার্দন হতে পারি নে, তাই বিচার করি বাইরের প্রকাশ দেখে।"

"সংঘমিত্রা দেবী বলতেন—প্রজ্ঞা ছিলো পরশমণি।" বললাম শর্বরীকে।

"সত্যিই পরশমণি ছিল প্রজ্ঞা" অভিভূত কণ্ঠে বললে শর্বরী রায়। "গুরুদেবের কবিতায় পড়েছি 'সে শুধু চায় নয়ন মেলে, দুটি চোখের কিরণ ফেলে, অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।' প্রজ্ঞার ব্যক্তিত্বে ছিলো সেই সহজিয়া যাদু। অনেক লোহা সোনা হয়ে গেছে তার সেই অনায়াস যাদুর পরশে। সেই আমায় শিখিয়েছে জীবনে শ্রেষ্ঠ সার্থকতা নিজের সুখে নয়, কল্যাণের সাধনায়। সে-ই শিখিয়ে গেছে জীবনে পাওয়াটাই বড় কথা নয়, না-পাওয়ারও আছে আপন মহত্ত্ব।"

হয়তো আরো কিছু বলার ছিল, কিন্তু এইখানেই থেমে গেল শর্বরী। একটু থেমে তারপর বললে, "আপনি তো সেদিন আমাদের বাড়ী চিনে গেছেন, ধনপতিবাবু। ওদিকে যদি আবার কখনো আসেন, পদার্পণ করলে বড় সুখী হবো। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

বিদায় নিয়ে ওঁরা চলে গেলেন যেদিকে, তার বিপরীত পথ ধরে অগ্রসর হলাম। বেশী দূর অগ্রসর হবার আগেই প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এলেন বিশ্বম্ভরবাবু। বললেন, "দুটো কথা কইবার জন্যে মেয়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ছুটে এলাম ধনপতিবাবু। অনেক কথাই আপনার সঙ্গে বলবার ছিল, কিন্তু ওদিকে আজই সন্ধ্যেবেলা আসবেন প্রফেসর শান্তনু সেন, শর্বরীকে পড়ানো সরু করতে। প্রথম দিন আজ আমার থাকা চাই-ই, নইলে অভদ্রতা হবে।"

"প্রফেসর শান্তনু সেন? ইংরিজির প্রফেসার?"

"হ্যাঁ, চেনেন নাকি আপনি?"

"নাম শুনেছি।'

"নাম-করা প্রফেসরই যে। শেক্স্পীয়ারের ওপর একজন সেরা

অথরিটি। শর্বরীকে ইংরিজি অনার্স পড়াবার ভার নিয়েছেন বিনা পারিশ্রমিকে, শর্বরী যাতে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়ে প্রজ্ঞার ইচ্ছা পূর্ণ করে কলেজের নাম রাখে। কিন্তু যা বলতে আপনার কাছে একা ছুটে এসেছি সেইটে শুনুন। শর্বরীর পাণি-প্রার্থনা করেছিল কিশোর, তা তো জানেন। শর্বরীকে ভেবে দেখবার সময় দিয়েছিল সে। সে সময় যখন পার হলো তখন আমায় একখানা তোড়া পাঠালে কিশোর তার বালক ভৃত্যের হাতে। সাদা গোলাপের তোড়া, তারি মধ্যমণি একটি টুকটুকে রক্ত-গোলাপ, যেন কিশোর হৃদয়ের রক্তে রাঙানো। সঙ্গে একখানা মুখ আঁটা খাম, আমার নাম লেখা। খাম খুলে দেখি চিঠি ; আমাকে নয়, শর্বরীকে লিখেছে কিশোর। লিখেছে—সুচরিতাসু, এই পুষ্প-স্তবক আমার প্রতিভূ। গ্রহণ করিলে বুঝিব গৃহীত হইলাম। জীবনে আপনাকে লাভ করিলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিব।”

“এই ভাষা ?”

“হুবহু এই ভাষা। একেবারে অন্তরে গাঁথা হয়ে আছে আমার। কোনোদিন ভুলবার নয়। ছোট্ট চিঠি ; কিন্তু প্রাণের কি অসীম ব্যাকুলতা ঐ ক'টি কথায়! নেপালী ছোকরা ভাঙা-ভাঙা আধ বাংলা আধ হিন্দীতে বললে—জবাবের জন্য সে অপেক্ষা করবে, তার প্রভু বাইরে অপেক্ষা করছেন গাড়ীতে, মনের মতো জবাব পেলে ভেতরে আসবেন। তোড়া আর চিঠি দিলুম শর্বরীর হাতে চুপি চুপি তার পড়ার ঘরে। বললুম—আমি অপেক্ষা করছি দোরগোড়ায়, জবাবের জন্যে বাইরে গাড়ীতে অপেক্ষা করছে কিশোর চৌধুরী। একটু সময় নিলে শর্বরী। মনে ভেবেছিলুম তোড়াটি রাখবে সে, চিঠিতে লিখে দেবে 'পুষ্পস্তবক গ্রহণ করিলাম'। কিন্তু তোড়া আর খামটি আমার হাতে ফেরত দিলে শর্বরী। আমি বললুম, 'ভালো করে ভেবে দেখ মা'। শর্বরী বললে, 'দেখেছি বাবা'। বলে চলে গেল তার পড়ার টেবিলে। আমার মেয়েকে আমি চিনি। বুঝলুম—তার সিদ্ধান্ত আর বদলানো যাবে না। কৌতূহলী হয়ে মুখ-খোলা খাম থেকে চিঠি খুলে দেখলুম জবাব কি লিখেছে শর্বরী।”

"কি দেখলেন ?"

"দেখলুম কিছুই লেখেনি শর্বরী। কিশোরের চিঠিখানাই যেমন ছিল তেমনি ফেরত দিয়েছে। কিশোরের নেপালী বালক ভৃত্যের হাতে দিলুম ঐ তোড়া আর ঐ চিঠি ; নিজে গিয়ে ফেরত দিতে পারলুম না। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল ছোকরা। একটু পরেই শুনলুম গাড়ীতে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ। চিরদিনের জন্যে চলে গেল কিশোর চৌধুরী।"

নীরব হলেন বিশ্বম্ভরবাবু। কন্যার দুঃখ ভেবে, না বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর শ্বশুর হতে না-পারার বেদনায় জানিনে। তারপর বললেন, "একটি কথা আপনাকে বলা হয়নি ধনপতিবাবু। গোলাপের তোড়াটি যখন ফিরে গেল কিশোরের হাতে, তখন তার বুকে ছিলো না মধ্যমণি সেই রক্ত গোলাপটি।"

আমি বললাম, "এই তো ভালো হলো বিশ্বম্ভরবাবু। মধ্যমণি-হারা পুষ্প-স্তবকে রইলো না প্রত্যাখ্যানের রূঢ় অমর্যাদা। কিশোর বুঝে নিলে শর্বরী গ্রহণ করে নি তার আজীবন সাহচর্যের স্থূল নিমন্ত্রণ, কিন্তু পরম মর্যাদায় শিরোধার্য করে নিয়েছে তার হৃদয়ের রক্ত-রাঙা শ্রদ্ধার অর্ঘ্যটুকু। কিশোরের স্মৃতিতে চিরন্তন হয়ে থাকবে শর্বরী আর ঐ রক্ত-গোলাপ।"

"কিন্তু আপনার কি মনে হয় না কিশোরের মুখ চেয়ে শর্বরী নিজেকে স্যাক্রিফাইস করলে ?" বললেন বিশ্বম্ভরবাবু। "ওকে না পেয়ে কিশোর যে কি হারালো সেইটে ও একবার ভেবে দেখলে না শর্বরী। তাছাড়া ঐ যে একটু আগে আপনাকে বললে—জীবনে পাওয়াটাই বড় কথা নয়, না-পাওয়ারও আছে আপন মহত্ত্ব, আমার তো মনে হয়, ও হলো না-পাওয়ার ব্যথা ভুলবার ভুয়ো সান্ত্বনা। ওতে কোনো সত্য নেই। কি বলেন ?"

আমি বললাম, "কোনো সত্য নেই, একথা মানিনে। না-পাওয়া যেখানে শুধুই না পাওয়া, সেই না-পাওয়ায় আছে কেবল অকরুণ শূন্যতা ; কিন্তু বাইরে না পাওয়া যেখানে অন্তরে পাওয়া, সেই না-পাওয়ার আছে আপন মহিমা।"

"সহজ মানুষ আমি, ওসব কঠিন কথা বুঝি নে ধনপতিবাবু।" বললেন বিশ্বম্ভরবাবু। "শর্বরী জীবনে সুখী হোক, সেই আমার জীবনে সবচেয়ে বড়ো কামনা। কিন্তু এরপর আপনার কি মনে হয় আর কাউকে বিয়ে করে সুখী হতে পারবে শর্বরী ?"

জবাব দেবার দায়িত্ব থেকে আমায় রেহাই দিয়ে নিজেই বললেন, "পারবে না। সংসারী আর হবে না শর্বরী, নিজেকে বিলিয়ে দেবে কল্যাণ সাধনার ব্রতে। ভারী চাপা মেয়ে। তাই ওকে লুকিয়ে এই ক'টি কথা বলতে এলুম আপনাকে। জানিনে তো কবে আবার দেখা হবে। শর্বরীকে চিনেছিলো প্রজ্ঞাপারমিতা, চিনতে পেরেছিলো কিশোর চৌধুরী, আর চিনেছে বোধিসত্ত্ব। তাই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার আগে বিদায় নিলে না বাপ-মা'র কাছ থেকে, বিদায় নিয়ে গেল তার শর্বরীদির কাছে।"

"বোধিসত্ত্ব কেন পালালো, কোথায় পালালো কিছু জানেন নাকি বিশ্বম্ভরবাবু ?"

"শর্বরী হয়তো জানে।" বললেন বিশ্বম্ভরবাবু। "শর্বরীকে বোধিসত্ত্ব যা বলছিল তারি খানিকটা ভাসা-ভাসা শুনে অনুমান করছি এক বিরাট জনকল্যাণ পরিকল্পনা ঢুকেছে ভুজঙ্গ চৌধুরীর মাথায়। অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এসে তাইতেই মেতে যাবে বোধিসত্ত্ব, পরে তাইতেই মাতিয়ে নেবে শর্বরীকে। আপনার বোধহয় বিশ্বাস হচ্ছে না ধনপতিবাবু ?"

"অবিশ্বাসের কি আছে বলুন ?" বললাম আমি।

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "অনেক বদনাম আছে ভুজঙ্গ চৌধুরীর। হয়তো ভাবছেন বদাচরণে যে সদা অভ্যস্ত সে হঠাৎ সদাচরণে মেতে উঠবে কেন ?"

আমি আমার প্রিয় দোহাটি আবৃত্তি করে বললাম ঃ

"বোষ্টম ধরিলে পাঁঠা হয় তার যম।
শাক্ত যদি সুক্তো ধরে সেও নহে কম॥

বদাচরণের শাক্ত ভুজঙ্গ চৌধুরী সদাচরণের সুক্তো ধরেছে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই বিশ্বম্ভরবাবু।"

খুশী হয়ে বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "শুনে বড় খুশী হলেম ধনপতি বাবু। তাছাড়া বদনাম যতটা রটে তার কিছুটা যদি বা বটে, সবটা হয়তো সত্যি নয়। কিন্তু কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শর্বরী হয়তো—তাছাড়া ওদিকে যদি আবার প্রফেসর শান্তনু সেন—"

আমি সংক্ষেপে বললাম, "নমস্কার বিশ্বম্ভরবাবু।"

নমস্কার জানিয়ে বিশ্বম্ভরবাবু বিদায় নিলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, "গরীবের বাড়ীতে পদধূলি কিন্তু দেবেন আরেক দিন।"

কিছুদিন অসুস্থ ছিল দেহ মন, লেখনী ছিল অলস। সে আলস্য ভেঙে আজ আবার ডায়েরি লিখতে বসেছি।

পথে দেখা হয়েছিল অতুল চম্পটীর সঙ্গে। চম্পটী নমস্কার জানিয়ে বললে, "বড্ড শুকিয়ে গেছেন যে, অসুখ হয়েছিল বুঝি?"

`আমি মাথা হেলিয়ে বললাম, "আপনার খবর ভালো তো?"

অতুল চম্পটী বললে, "ভালো আর কি করে বলি? মেয়েটা বুকে শেল হেনে চলে গেল।"

বললাম, "আহা! কি হয়েছিল?"

"এক ছোঁড়ার সঙ্গে অনেক দিন থেকেই লুকিয়ে গুজুর-গাজুর চলছিল, তারি সঙ্গে চলে গেছে। অবিশ্যি রেজেস্টিরি করে বিয়েটা করেছে। কিন্তু কি নেমকহারামী, সেইটে একবার ভাবুন।"

বললাম, "মনের মতো বর পেয়েছে, ভালোই তো।"

বিস্মিত কণ্ঠে চম্পটী বললে, "মেয়েমানুষের আবার মন কি মশাই? বাপকে লুকিয়ে মনের মানুষের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া, এ তো আপনার গিয়ে ইয়ের সামিল হলো।"

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময় চম্পটী আবার সুরু

করলে, "অবিশ্যি এত সাহস মেয়ের হতো না, যদি গোপনে ওর মা'র—মানে আমার সহধর্ম্মিণীর—আস্কারা আর উস্কানী না পেতো।"

শুধালেম, "গিয়ে চিঠি-পত্র দেয় নি?"

চম্পটী বললে, "আজ্ঞে তা দিয়েছে। জামাই ছোঁড়া আবার কেতাদুরস্ত। ম্যাট্রিক ফেল্ কিনা! দুজনায় মিলে আশীর্বাদ চেয়ে পাঠিয়েছে। দু-ছত্তর আশীর্বাদ পোস্টকার্ডে ছাড়তেই হবে। নইলে পথে-ঘাটে রাত বিরেতে বেরোতে হয়, কোন ফাঁকে পেছন থেকে তাক করে মাথা দুফাঁক করে দেবে বলা তো যায় না!"

বললাম, "দিবাকর দালাল মশায়ের বাগানবাড়ী কি কিনে নিয়েছেন ভুজঙ্গ চৌধুরী?"

অতুল চম্পটী হেসে বললে, "অনেক খবরই রাখেন না দেখছি। কত যে ওলোট-পালোট হয়ে গেল—"

কৌতূহলী হয়ে শুধালেম, "কাদের ওলোট-পালোট হলো?"

"কার হলো না বলুন? ভুজঙ্গ চৌধুরী, দিবাকর দালাল, দময়ন্তী দালাল, রাহুল, সানন্দা সান্যাল—আর সঙ্গে সঙ্গে এই বেচারা অতুল চম্পটী। শুনবেন নাকি সব কথা?"

বললাম "নিশ্চয়।"

চম্পটী বললে, "তাহলে মশাই একটু চা খাওয়াতে হবে যে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। আর সেই সঙ্গে যদি এক আধখানা কেক, আর সিঙ্গেল বা ডবল ডিমের মামলেট। চলুন না ঐ রেষ্টুরাণ্টে।"

রেস্তোরাঁয় খেতে খেতে কাহিনী শোনাতে লাগল অতুল চম্পটী। বললে, "শুনুন তাহলে খুলে বলি। দালাল মশাই আমায় বলেছিলেন 'ভুজঙ্গকে একবার বাগানবাড়ীটা ভালো করে দেখিয়ে নিয়ে এসো।' বাগানবাড়ী রওনা হয়ে গেলুম চৌধুরী মশাইর গাড়ীতে। আমি আর চৌধুরী মশাই। মালীকে আগেই জানানো ছিল। মালী ওদিকে খানা-পিনা আরাম আয়েসের তোফা বন্দোবস্ত করে রেখেছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাগানবাড়ী আর বাগান দেখাতে লাগলুম, ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন

চৌধুরী মশাই। বাগানবাড়ীর পশ্চিমধারে ফোয়ারার পাশে উঁচু পাথরের চৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে এক পাথরের তৈরী সুন্দরী। পাথরে যে অমন রূপ ক্ষোদা যায়, ও জিনিস চোখে না দেখলে আপনার বিশ্বেস হবে না। ঐ মূর্তি দেখতে গিয়েই তো যত গোল।"

"পাথরের মূর্তি দেখে?"

"আজ্ঞে, পাথরের মূর্তি বলে তাকে চট করে চেনাই যায় না যে। বলিহারি বাহাদুরি ক্ষোদাইকারের। আর, কি বলবো আপনাকে, লাগবি তো লাগ, ঠিক সেই সময় দালাল মশায়ের মেয়ে দময়ন্তীও কলেজের এক মাস্টারকে ঐ পাথুরে সুন্দরী দেখাচ্ছেন।"

বললাম "মাস্টার নয়, প্রফেসর।"

চম্পটী বললে, "ঐ হলো। দময়ন্তী দেখাচ্ছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ঠিক এমনি সময় দেখতে গেলেন চৌধুরী মশাই। পেছনেই আমি। ওদিক পানে চোখ পড়তেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন চৌধুরী মশাই, যেন চোখের সামনে দেখেছেন ভূত, অথবা হেলেন অব ট্রয়। দেখি হুজুরের জবর নজর পড়ে গেছে দময়ন্তী দালালের ওপর—পলক পড়ছে না চোখে। আস্তে আস্তে বললুম, 'দালাল মশাইর মেয়ে হুজুর, দময়ন্তী দালাল।' হুজুরের চোখের তারা দুটো অমনি যেন দপ করে নেচে উঠলো। তারপর সেই পাথুরে সুন্দরীর সামনে হুজুরের আলাপ পরিচয় হয়ে গেল দময়ন্তী দালালের সঙ্গে। একবার মরজি হলে হুজুর আলাপ জমাতে এক নম্বর। তারপর তিনজনে ঐ পাথরের মূর্তি দেখতে লাগলেন। আমি পেছনে দাঁড়িয়ে। ঐ পাথরের মূর্তিটি নাকি জ্যান্ত মানুষ সামনে রেখে দেখে দেখে ক্ষোদাই করেছিল শ-দেড়েক বছর আগে মস্ত ওস্তাদ এক বিদেশী ক্ষোদাইকার অনেক টাকা নিয়ে। টাকা যিনি দিয়েছিলেন—মানে এই বাগানবাড়ীর পত্তনীকার আদি মালিক, মস্ত জমিদার—সোনার মোহরও ছিল তাঁর কাছে খোলামকুচি। নাম তাঁর সূর্যকিশোর। আর এই সুন্দরীকে নাকি এনেছিলেন বাইরে থেকে। যেমন তার রূপ আর যৌবন—তা ঐ পাথরের মূর্তিটি একবার দেখলেই বুঝতে পারবেন—তেমনি তার অপ্সরার মতো নাচ

আর কিন্নরীর মতো গান। সূর্যকিশোর এই সুন্দরীকে নিয়ে মেতে গেলেন। দিনরাত তাকে নিয়ে এই বাগানবাড়ীতেই পড়ে থাকেন। মোসায়েবদের আসরও জমে, বোতল গেলাসও চলে। বিষয়কর্ম দেখা চুলোয় গেল। ঘরে সতী সাধ্বী সহধর্মিণী কাঁদেন কাটেন আর মা কালীর কাছে জোড়ার পর জোড়া পাঁঠা মানত করেন। কিন্তু কাঁদা-কাটা আর মানতে কিছু হলো না। শেষটায় নায়েব মশাইকে পাঠালেন বাগানবাড়ীতে।…"

"তারপর?"

তারপর নায়েব বাগানবাড়ী গিয়ে মনিবকে বললেন, "হুজুর, আপনাকে একবার মহালে বেরোতেই হবে। নইলে আদায়পত্র সব বন্ধ। বিষয় আশয় লাটে উঠবে।" মনিব সূর্যকিশোর বললেন, "উঠুক।" কিন্তু নায়েব ঘুঘু ওস্তাদ। বুঝিয়ে দিলেন বিষয়-আশয় লাটে উঠলে এই সুন্দরীকে আর রাখা যাবে না। সূর্যকিশোর ক্ষেপে উঠে বললেন—বিষয়-আশয় নীলামে উঠলেও সুন্দরী প্রাণের টানে থাকবে, সে বাঁধন এড়াতে পারবে না। নায়েব বললেন, "কিন্তু এ হালে তখন তো তাকে রাখতে পারবেন না হুজুর। স্বর্গের অপ্সরীকে তো আর ঘুঁটে-কুড়ুনির হালে রাখলে চলবে না। তাই বলি কি হুজুর, দিন দুয়েকের জন্যে মহালটা ঘুরে আসবেন চলুন। তারপর বাগান বাড়ীতে ফিরে তো আসবেনই।" শৌখিন জমিদার তখন সুন্দরীর কাছ থেকে দুদিনের ছুটি নিয়ে মহালে বেরোলেন। এই ফাঁকে তাঁর সতী সাধ্বী পত্নী এলেন বাগানবাড়ীতে। এসে সুন্দরীকে বললেন, "আমার স্বামী তোমাকে অনেক দিয়েছেন। আমার যত অলঙ্কার আছে, তাও সমস্তই তোমাকে দেবো। তার বিনিময়ে তুমি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। আমার জীবন তুমি ব্যর্থ করে দিও না। তুমি আমার ছোট বহিনের মতো। তোমার দুটি হাত ধরে আমি আমার স্বামীকে ভিক্ষা চাইছি।" বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন সেই পেশাওয়ালী নাচিয়ে গাইয়ে সুন্দরীর হাত ধরে।

সুন্দরী ধীরভাবে বললে, "বহিন, যা আমি পেয়েছি তার বেশীতে আমার প্রয়োজন নেই। তোমার স্বামীকে তুমি ফিরে পাবে। তুমি আমার কাছে এসেছিলে, এ কথা গোপন থাকুক।"

মহালের কাজ কোন রকমে তাড়াতাড়ি সেরে বাগানবাড়ীতে ফিরে এলেন জমীদার সূর্যকিশোর। এসে দেখেন বদলে গেছে আবহাওয়া। সে হাসি নেই সুন্দরীর চোখে-মুখে। সে প্রাণ নেই চলার ছন্দে। সে আনন্দ নেই সংগীতের মূর্ছ্নায়।

শুধালেন সুন্দরীকে। সুন্দরী বললে, "আমার ফিরে যাবার সময় হয়েছে। আপন মুলুকে ফিরে যাবো।"

মাথায় যেন বজ্রপাত হলো সূর্যকিশোরের। তিনি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না। নিজের জীবনের সঙ্গে এমন নিবিড় করে মিশিয়ে নিয়েছেন সুন্দরীকে, যে সুন্দরীবিহীন জীবন কল্পনা করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সেই সুন্দরী চলে যাবে তাঁকে ছেড়ে, তাঁর জীবন শূন্য করে দিয়ে?

তিনি বললেন, "এ অসম্ভব। আমায় ছেড়ে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।"

সুন্দরী দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "আমায় যেতেই হবে। আমি যাবো। আর আমার এখানে ভালো লাগছে না।" সুন্দরীর এই কঠোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রূপটি আগে কখনো দেখেন নি সূর্যকিশোর। নিঃসংশয়ে অনুভব করলেন চলে যাওয়ার সংকল্প থেকে সুন্দরীকে কিছুতেই টলানো যাবে না। তখন বললেন, "যদি যাবেই, মানবে না কোনো মানা, তবে একটি শেষ প্রার্থনা আমার পূর্ণ করো।"

সেই একটি প্রার্থনা পূরণেরই ফল এই পাথরের তৈরী অপরূপ নারী-মূর্তি। সুন্দরীকে মডেল করে সারা দুনিয়ার অন্যতম সেরা ভাস্কর সেরা পাথরে ক্ষোদাই ক'রে ক'রে গেলেন এই অমূল্য শিল্পসৃষ্টি। বিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে সুন্দরী বলে গেল সূর্যকিশোর যেন তাঁর স্ত্রী এবং শিশুপুত্রের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা না করেন। সূর্যকিশোর দেখলেন সুন্দরীর চোখে জল। তাঁর নিজের চোখও জলে ভরে উঠলো। শুধালেন —আবার করে দেখা হবে। সুন্দরী জবাব দিলে—ইহ জীবনে আর দেখা হবে না।

অতুল চম্পটীর মুখে কাহিনী শুনতে শুনতে মনে হলো অনাথ চৌধুরীর মুখে শোনা ৺প্রজ্ঞাপারমিতার কবিতা :

"দেহ দিয়ে মোরা দেহেরে বাসি যে ভালো,
আছে তাই ভালোবাসা—
দেহ আছে, তাই আছে দেহাতীত প্রেম।"

হয়তো সূর্যকিশোর আর সুন্দরীর দেহগত আকর্ষণ অগ্রসর হয়েছিল দেহাতীত প্রেমে পরিণতির পথে, আর দূরে চলে গিয়ে হয়তো সুন্দরী এই কথাটাই প্রমাণ করে গেল।

সুন্দরীর বিদায়ের পর তার মর্মর মূর্তিটি স্থাপিত হলো সেই বেদীর ধারে, যে বেদীর ওপর বহু চাঁদিনী রাতে স্বর্গীয় সঙ্গীতে সূর্যকিশোরকে মুগ্ধ করেছে সুন্দরী। তারি পাশে বাগানবাড়ীর ফোয়ারা তো নয়, সে যেন সূর্যকিশোরের অফুরান অশ্রুধারা। সুন্দরীর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি, অথবা নিতে পারেন নি সূর্যকিশোর। ইহলোকে তাঁদের আর দেখা হয় নি।

সুন্দরীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন সূর্যকিশোর। হয়েছিলেন কর্তব্যপরায়ণ স্বামী, কর্তব্যপরায়ণ পিতা। কিন্তু ভুলতে পারেন নি সুন্দরীকে। সুন্দরীকে হারাবার পর আর বেশী বছর তিনি বাঁচেন নি। যে কয় বছর বেঁচেছিলেন, বাগানবাড়ীতে চলে যেতেন অনেক চাঁদিনী সন্ধ্যায়, গিয়ে নীরবে একা বসতেন শূন্য বেদীতে। তাকিয়ে থাকতেন সুন্দরীর মর্মর মূর্তির মুখের পানে ; কল্পনায় শুনতেন স্মৃতির সংগীত।

শোনা গেছে তাঁর মৃত্যুর পর অনেক চাঁদিনী রাতে সুন্দরীর মর্মরমূর্তির পাশে এসে দাঁড়াত সুন্দরীর বিদেহী মূর্তি, হয়তো বা বিদেহী সূর্যকিশোরের দর্শন আশা করে।

"বাবার ইচ্ছে এ বাগানবাড়ীটা বিক্রী করে দেন।" বললেন দময়ন্তী দালাল। "অসম্ভব, এ জিনিস কখনো বিক্রী করা যায়? আমি তো বাবাকে কিছুতেই দেবো না বেচতে।"

"খুব ভালো দাম পেলেও নয়?" শুধালেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

"না, খুব মোটা লাভ পেলেও নয়। ছুনিয়ায় টাকার লাভটাই তো একমাত্র লাভ নয়।" বললেন দময়ন্তী দালাল। "তাছাড়া টাকা বাবার যা আছে তার চাইতে আরো বেশীর প্রয়োজন দেখিনে।"

ভুজঙ্গ চৌধুরী বললেন, "মানুষের আরো বেশীর প্রয়োজন কি কখনো ফুরোয় দময়ন্তী দেবী ?"

দময়ন্তী বললে, "প্রয়োজন ফুরোয়। যা ফুরোয় না, সেটা হচ্ছে খাঁই, প্রয়োজন নয়।"

ভুজঙ্গ চৌধুরী কিছু না বলে একটু হাসলেন।

ফিরবার পথে চলতি গাড়ীতে বসে ভুজঙ্গ চৌধুরী চম্পটীকে বললেন, "এ বাগানবাড়ী আমার চাই-ই চম্পটী। জোরালো জেদের সুর শুনে আনন্দে গদগদ হলো চম্পটী। সবিনয়ে মাথা চুলকে বললে, "তাহলে আপনাকে একবার দালাল বাড়ীতে জুতোর ধুলো দিতে হবে যে হুজুর।"

ভুজঙ্গ চৌধুরী বললেন, "দেবো।"

দিলেনও। চম্পটীকে নিয়ে গেলেন একদিন দালাল ভবনে।

"কিন্তু ঐ নিয়ে যাওয়াই শেষকালে আমার কাল হলো।" বললে অতুল চম্পটী। "চৌধুরী মশাইকে ভেতরে নিয়ে গেলেন দালাল মশাই, বৈঠকখানায় এক পেয়ালা চা আর জলখাবার পাঠিয়ে দিলেন আমার জন্যে। এর পর একদিন ওঁরা গেলেন বাগানবাড়ীতে। ওঁরা মানে তিন দালাল আর এক চৌধুরী। সেদিন আর আমি রইলুম না সঙ্গে। গেলেন দিনের সুরুতে, ফিরলেন দিনের শেষে।"

"তারপর ?"

"তারপর দালাল-বাড়ীর চৌকাঠ ঘন ঘন মাড়াতে লাগলেন চৌধুরী মশাই। বুঝলুম বাগানবাড়ী বেচবেন না দালাল মশাই।"

"বেচবেন না ?" বললাম আমি।

"তারপর একদিন বুড়ো অনঙ্গ চৌধুরী মশাইকে দর্শন করে এলেন দালাল কর্তা-গিন্নী।" বললে অতুল চম্পটী। "এখন ছুহাত এক হয়ে যাওয়ার কথাবার্তা একদম পাকা।"

বললাম, "দময়ন্তী বিয়ে করতে রাজী হলেন ভুজঙ্গ চৌধুরীকে ?"

চম্পটী বললে, "কুবেরের ঘরণী হতে কোন্ মেয়ের না সাধ যায় বলুন ? তা ছাড়া ভারি মাতৃভক্ত দময়ন্তী দালাল। আর দালাল-গিন্নীও ভুজঙ্গ বলতে অজ্ঞান। হুজুরও মা ডেকেছেন দালাল-গিন্নীকে। নিজের মা নেই কিনা! মনও ঝুঁকেছে দময়ন্তীকে ঘরের লক্ষ্মী বানাতে।"

চম্পটীকে শুধালেম, "রাহুল রায়ের খবর কি ?"

"কি সুক্ষণেই যে উনি ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছিলেন আর সেরে উঠেছিলেন দময়ন্তী দালালের শখের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে! ব্যস্, সেই থেকে ওঁর নেকনজরে। তারপর যেই ভুজঙ্গ দময়ন্তী মিলনের কথাবার্তা হয়ে গেল, অমনি দেখতে দেখতে রাহুল রায়ের আঙুল ফুলে কলাগাছ। ছিলেন রোগা মাইনের কেরানী, এখন মোটা মাইনের অফিসার না সেক্রেটারী কি যেন হয়েছেন। কোম্পানী থেকে পাওয়া খাসা বাংলো প্যাটার্ন বাড়ী, চাকর-বাকর, কোম্পানীর হাওয়া গাড়ীতে যাওয়া-আসা। সায়েবি পোশাক, —কোট, পাৎলুন, নেকটাই। এখন দেখলে তো চিনতেই পারবেন না। সব হয়েছে ভুজঙ্গ চৌধুরীর কলমের এক আঁচড়ে। আর ঐ আঁচড়ের পেছনে হয়তো দময়ন্তী দালালেরই একটি মুখের কথা। এক ইনফ্লুয়েঞ্জা কি কাণ্ড করে দিয়ে গেল ভেবে দেখুন একবার।"

"মোটা মাইনের পদের দায়িত্ব সামলাতে পারছেন রাহুল রায় ?" শুধালেম আমি।

"ছেলেখেলার মতো।" বললে চম্পটী। "পদ্য লেখার একটু বাতিক ছিল বটে, কিন্তু কোম্পানীর কাজগুলো রাহুলবাবুর একেবারে নখদর্পণে। আজকাল তো পদ্য-টদ্যও একেবারে ছেড়ে দিয়ে কাজে মেতে গেছেন। তাছাড়া ঐ যে আপনার গিয়ে মিস্ সানন্দা সান্যাল—"

"কি হয়েছে তাঁর ?"

চৌধুরী মশাই ওঁকেই এখন রাহুল রায়ের সেক্রেটারী করে দিয়েছেন। অবিশ্যি মাইনেও বাড়িয়ে দিয়েছেন।" বললে অতুল চম্পটী। "একে রাহুল রায় পোক্ত কাজের লোক, তায় মিস্ সান্যালের মতো অমন

সেক্রেটারী। সোনায় সোহাগা। মিস্ সান্যাল কিন্তু বেশ একটু বদলে গেছেন, এইটে নজর করেছি।"

"কি রকম ?"

"সে দাপট আর দেখতে পাইনে মিস্ সান্যালের। চৌধুরী মশাই সমীহ করে চলতেন তাঁর সেক্রেটারী মিস্ সান্যালকে ; সেই মিস্ সান্যাল সমীহ করছেন রাহুল রায়কে। অথচ রাহুল রায়ের দাপট দূরে থাক, মিস্ সান্যালের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়েও কথা বলে না। একটু লাজুক ধরণের মানুষ কিনা ! তাছাড়া—"

তা ছাড়া যে কি, তা আর বললেন না অতুল চম্পটী ; মুখে পুরে দিলে শেষ কাটলেটের শেষ অংশটুকু।

শুধালেম ভুজঙ্গ চৌধুরীর খবর।

চম্পটী বললে, "ওঁকে অনেকখানি আওতায় এনেছিলেন সেক্রেটারী সানন্দা সান্যাল। এবার দময়ন্তী দালালের আওতায় পুরো এসে গেলেন চৌধুরী মশাই। বাগানবাড়ী তো যৌতুকই পাবেন। আমার দালালীটা মাঠে মারা গেল। কিন্তু গোলাপডাঙায় যে মস্ত জমি কিনেছেন চৌধুরী মশাই, ওটার দালালীতে আমার লোকসান পুষিয়ে গেছে। ঐ জমির ওপরই নগর পত্তনের এলাহি ব্যবস্থা হচ্ছে। ব্যবসাকে ব্যবসা, দেশের কাজকে দেশের কাজ, নাম-কে-নাম। এই নগর পত্তনের ব্যাপারে হুজুর ডান হাত করেছেন রাহুল রায়কে। আর রাহুলের ডান হাত সানন্দা সান্যাল। চৌকস মেয়ে, সে কথা একশোবার বলবো। নইলে অ্যাদ্দিন ধরে হুজুরের মতো বাঘা কাপ্তান মনিবকে একেবারে—" বলে' এক চুমুকে চায়ের পেয়ালার বাকী চাটুকু অদৃশ্য করে' ফেলে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললে চম্পটী। বললে, "বড্ড উব্‌গার করলেন মশাই। তার ওপর অনেক দুঃখে মনটা ভারী হয়ে ছিল, আপনার কানে হালকা করে দিলুম। নইলে এত কথা আমি সহজে বলিনে।"

'বয়'কে ডেকে রেস্তোরাঁর পাওনা মিটিয়ে দিলাম। চলে গেল চম্পটী।

ঠিকই বলেছিল অতুল চম্পটী। চমৎকার বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী; গেটের বুকে জমকালো নাম-ফলকে জ্বলজ্বল করছে রাহুল রায়ের নাম। ইংরিজি হরফে, কিন্তু ইংরিজি কায়দায় সংক্ষেপিত নয়। গ্যারাজে কোলাপ্‌সিবল্‌ গেটের আড়ালে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে ঝক্‌ঝকে সুদর্শন গাড়ী। গ্যারাজের ওপরের ঘরে বোধহয় বাস করে গাড়ীর ড্রাইভার।

এ বাড়ীতে একটি মাঝারী আয়তনের পরিবার অসামান্য স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে। বাস করছে রাহুল রায় একা। অবশ্য ভৃত্য আছে, আছে বাবুর্চি।

বেশভূষা বদলেছে রাহুল রায়ের। নেই সেই আধ অপ্রতিভ আধ অসহায় ভাব। মনে হলো কেরানী রাহুলের সঙ্গে সঙ্গে মরেছে কবি রাহুল; এ রাহুল রায় কবিও নয় কেরানীও নয়, চৌধুরী কোম্পানীর একজন উঁচু পদের কর্মঠ কর্মচারী। কিন্তু না, রাহুল মানে না তা।

"এখন আর খাতার বুকে আবেগ ঢেলে কালির আঁচড় কেটে কেটে কথার পর কথা সাজিয়ে কাব্য করি নে ধনপতিবাবু।" বললে রাহুল। "এখন রচনা করছি বাস্তব জীবন-কাব্য। মরেনি কবি রাহুল রায়। এবার হয়েছে সত্যিকারের জীবন-কবি। পুঁজিতন্ত্রকে গাল দিয়ে সর্বহারা-জাগানো যে সব কবিতা লিখেছি তাতে সর্বহারারা কতটা জেগেছে জানিনে; কিন্তু পুঁজিবাদের ইমারত থেকে একখানা ইঁটও খসেছে বলে মনে হয় না। দুনিয়ার কি উপকার করতে পারতুম আমার ঘরে বসে অমন কবিতা লিখে? কিন্তু এখন? বিরাট বিস্তীর্ণ পোড়ো জমিকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলছি দ্রুতবেগে। দেখতে দেখতে সেখানে জেগে উঠবে নতুন জনপদ, যেখানে আশ্রয় পাবে আশ্রয় পাবার যোগ্য দরিদ্র এবং বাস্তুহারার দল, দারিদ্র্য এবং বাস্তু হারানোটাই যাদের একমাত্র গুণ নয়, যারা তাদের

শ্রম দিয়ে নতুন সম্পদ উৎপন্ন করে তারি অংশ ভোগ করবে আপন যোগ্যতায়। এ জনপদ হবে না দাতব্য লঙ্গরখানা। এখানে গড়ে উঠবে নানা রকমের কুটীর-শিল্প। স্থাপিত হবে বিদ্যায়তন। বসবে নতুন হাট। কত জীবনের কত ধারা এসে মিলবে এইখানে। এই তো জীবন-কাব্য, ধনপতিবাবু। এ কাব্য-রচনার ভার কবি রাহুলের ওপর দিয়েছেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।"

"হঠাৎ এ ঝোঁক কেন চাপ্‌লো ভুজঙ্গ চৌধুরীর মাথায় ?"

"আমার মনে হয় এ জিনিস হঠাৎ হয়নি ধনপতিবাবু। সম্ভবতঃ এতে মিস্ সান্যালের অনেকখানি প্রভাবও কাজ করছে। নিজের জীবনেই তিনি অনুভব করেছেন বাস্তু হারিয়ে যাযাবব হবার নির্মম বেদনা। পদ্মা-পারের মেয়ে তিনি। দেশ-বিভাগের পর গঙ্গাপারে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন।"

"ভুজঙ্গ চৌধুরীর সেক্রেটারী সানন্দা সান্যাল ?"

"হ্যাঁ, তিনিই। কৃতিত্ব আছে তাঁর, এ কথা আপনার কাছে বলতে কোন বাধা দেখিনে। এই জনপদ পরিকল্পনার অংকুর হয়তো প্রথমে এসেছিল ভুজঙ্গ চৌধুরীর মনে, কিন্তু সেই অংকুর যে ধীরে ধীরে জলের বুকে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায় নি, পরিণত হতে পেরেছে মহীরুহে, এর পেছনে মিস্ সান্যালের অবদান অনেকখানি। ওঁর ভেতরে প্রাণশক্তির যে কি প্রাচুর্য্য, অথচ উচ্ছ্বাস-চঞ্চলতার বাহুল্য নেই, আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না ধনপতিবাবু।"

সানন্দা সান্যালের উচ্ছ্বাস-অচঞ্চলতার বর্ণনায় উচ্ছ্বাস-চঞ্চল হয়ে উঠলো রাহুল রায়। ওর ভেতরের সেই পুরাতন কবিটী যেন মাথা উঁচিয়ে নিজের জানানি দিতে চাইছে।

"চৌধুরী কোম্পানীতে আমি কাজ করছি মিস্ সান্যালের আগে থেকে।" বলতে লাগলেন রাহুল রায়। "মনের পটে আজো জ্বলজ্বল করছে সেদিনের ছবি, সানন্দা যেদিন প্রথম এলেন ভুজঙ্গ চৌধুরীর সেক্রেটারী হয়ে। আমরা অফিসের সবাই তখন ভুজঙ্গ চৌধুরীকে জানি,

সানন্দা সান্যালকে জানিনে। চিন্তিত হলুম সানন্দার জন্যে। রসময়বাবু—আমাদের একজন সহ-কেরানী—ছিলেন সাহিত্য-শৌখিন দিল্‌খোলা লোক, অবসর বিনোদন করতেন ইংরিজি কবিতা পড়ে। তিনি একটি বিখ্যাত ইংরিজি ছড়া থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আওড়ালেন—'কাম ইনটু মাই পার্‌লার, সেইড্‌ দি স্পাইডার টু দি ফ্লাই।' এস গো আমার ঘরে; মাছিকে বললো মাকড়সা। কিন্তু দেখা গেলো এ মাছি আলাদা ধাতুর, আলাদা ধাতের। মাছি এলো না মাকড়সার আওতায়, মাছির আওতায় এসে অনেক বদলে গেল মাকড়সা। তারপর দেখা গেল সানন্দা-মাছির প্রাণশক্তির যাদুতে ধীরে অথচ দৃঢ় নিশ্চিত গতিতে ভুজঙ্গ-মাকড়সার অসাধারণ পরিবর্ত্তন। উপমাটা হয়তো তেমন জুতসই হলো না ধনপতিবাবু, কিন্তু বিনা উপমায় এমন জিনিস তো বোঝানো সম্ভব নয়। ভয় হচ্ছে উপমা দিয়েও হয়তো ভালো বোঝাতে পারলুম না।"

আমি বললাম, "বুঝেছি আমি। শুধু বুঝেছি নয়, অনুভব করেছি। আমি তো দেখেছি সানন্দাকে।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রাহুল রায় বললেন, "তাহলে আপনি কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। সানন্দার মতো সেক্রেটারী পাওয়া বিরাট সৌভাগ্যের কথা ধনপতিবাবু। সৌভাগ্যবান ভুজঙ্গ চৌধুরী।"

কি যেন কিছুক্ষণ ভাবলেন রাহুল রায়। তারপর ধীরে ধীরে করুণ আনমনা সুরে বললেন, "সানন্দা সান্যাল এখন আমার সেক্রেটারী।"

বিস্ময়ের ভান করে বললাম, "ভুজঙ্গ চৌধুরী নয়?"

রাহুল রায় বললেন, "না। আমার।" কথার সুরে মনে হলো যে সানন্দা সান্যালের মতো সেক্রেটারী পাওয়া বিরাট সৌভাগ্যের কথা, সেই সানন্দাকে সেক্রেটারী পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতে পারছেন না রাহুল রায়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভুজঙ্গ চৌধুরী আর তাঁর সেক্রেটারী সানন্দা সান্যালকে মনের চোখে এতদিন সমান উঁচুতেই দেখে দেখে অভ্যস্ত রাহুল, সেই অভ্যাসের ঘোর এখনো বুঝি কাটে নি। সেই উঁচু সানন্দার পায়ের

তলা থেকে হঠাৎ খামখেয়ালে মাটী সরিয়ে দিয়েছে ভুজঙ্গ, আর তেমনি খামখেয়ালী হাতে হঠাৎ ঠেলে তুলে দিয়েছে রাহুলকে। ফলে সানন্দা নেমে গেছে রাহুল রায়ের অধীনে, আর রাহুল হয়েছে তার ওপরওয়ালা—ইংরিজিতে যাকে বলে 'বস্'। আর এই ওপর-ওয়ালাগিরির লজ্জায় সানন্দার চোখে চোখ ফেলতে পারছে না রাহুল রায়। ভাবছে সানন্দার এই অধঃপতনেব জন্যে সে-ই যেন অপরাধী ; এই অপরাধবোধই একটা কমপ্লেস্-এর রূপ নিয়েছে রাহুলের মনে।

"একটা প্রশ্ন করবো ধনপতিবাবু। জবাব দেবেন?" শুধালেন রাহুল রায়। বললাম, "দেবো।"

"এলোমেলো, ছেলেমানুষি প্রশ্ন। শুনে হাসবেন না তো? মনে করবেন না তো কিছু?"

বললাম, "না।"

রাহুল বললে, "গল্পের শ্রেষ্ঠী-কন্যা হৃদয় হারায় বাগানের মালীর ছেলের কাছে। রাজকুমারীর মন জুড়ে থাকে রাখাল ছেলে। এমনটি কি শুধু গল্পেই সম্ভব? বাস্তবে কি এমনটি ঘটে না?"

আমি বললাম, "এমন হামেশাই ঘটতে পারে রাহুলবাবু। হৃদয় বেহিসাবী ; তার গতি তো শুধু সমতলেই আবদ্ধ নয়। নিচে থেকে সে উঁচুদিকেও তাকায়, আর উঁচু থেকেও তাকায় নিচু দিকে। নিচেকার মিটমিটে প্রদীপও ভালোবেসে কামনা করে আকাশের চাঁদকে। আকাশের চাঁদও যে তুলসীতলার ভীরু প্রদীপের কাছে হৃদয় হারায় না, অমন গ্যারান্টিই বা কে দিতে পারে? হৃদয় মানে না কোনো বাধা, শোনে না কোনো বারণ।"

আমার কথা শুনে প্রথমে খুশীতে ভরে উঠলো রাহুলের মুখ। তার পরেই আবার বিষণ্ণ হয়ে উঠে তিনি বললেন, "আমিও তাই ভাবি। কিন্তু হৃদয়ের সব আশার তো পূরণ হয় না জীবনে। তাই তো মানুষের জীবনে এত ট্র্যাজেডি, আর সেই ট্র্যাজেডিকে তবু হাসির আড়ালে লুকিয়ে রাখতে হয়।...চা নিন ধনপতিবাবু।"

চেয়ে দেখি চা এসে গেছে। তুলে নিলাম এক পেয়ালা। এক পেয়ালা তুলে নিলেন রাহুল রায়। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে চোখ বুজে এলোমেলো ভাবতে ভাবতে এলোমেলো ভাবেই মনে হলো রাহুল রায়ের হৃদয়-ঘড়ির পেণ্ডুলামে দুলে দুলে বার বার ধ্বনিত হচ্ছে একটি নাম : দময়ন্তী রায়। দময়ন্তী রায়। দময়ন্তী রায়। সহসা থমকে থেমে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল পেণ্ডুলাম। করুণ কান্না স্পন্দিত হতে লাগলো। সোনালী বোর্ডের বুকে লেখা দময়ন্তী রায় থেকে 'রায়' মুছে গিয়ে সেখানে কোন্ এক অদৃশ্য হাতের পরিচালনায় সাদা খড়িতে ধীরে ধীরে লেখা হতে লাগলো চৌধু—

"ধনপতিবাবু!"

রাহুল রায়ের হঠাৎ ডাকে স্বপ্ন ভেঙে গেল। রাহুল রায় বললেন, "স্যাণ্ডউইচ নিন একখানা। শুধু চা খেতে নেই।" আমার ক্ষণস্থায়ী চোখ-বোজা দিবাস্বপ্ন লক্ষ্য করেন নি রাহুল রায়। স্যাণ্ডউইচ নিলাম একখানা।

"মেয়েদের সাইকোলজি আপনি কেমন বোঝেন ধনপতিবাবু?" রাহুল রায়ের প্রশ্ন। গ্যারাজেব ওপরের খুপরি থেকে গ্যারাজওয়ালা বাংলোতে এসে মেয়েদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন রাহুল রায়। অথবা মাথা হয়তো আগেও ঘামাতো, শুধু বাইরে ছিলো না তার প্রকাশ।

বললাম, "বুঝিনে।"

"ঠাট্টা করছেন?" হো হো করে হাসবার চেষ্টা করে বললেন রাহুল রায়। "মেয়ে-মনস্তত্ত্বেও আমি একজন বিশেষজ্ঞ, যাকে বলে 'অথরিটি', এইটেই আপন খুশীতে আপনি মেনে নিয়ে বলতে লাগলেন, "দ্বিজেন্দ্রলাল আশ্চর্য গান লিখে গেছেন : পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে! নারীর পতিতোদ্ধারিণী রূপের প্রতীক এই গঙ্গা। নারী শ্রদ্ধা করে পুরুষের পৌরুষকে, কিন্তু ভালোবাসে পুরুষের অসহায় রূপ—রোগে, শোকে, বিপর্যয়ে, হীনতার পাঁকে, যে ক্ষেত্রে নারী ভূমিকা নিতে পারে উদ্ধারকর্ত্রীর। সেবা, ত্যাগ, মায়া, সহানুভূতি দিয়ে পুরুষকে সে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ধার করবার চেষ্টা

করে। যাকে সে উদ্ধার করে তোলে—কি রোগ থেকে, কি নৈতিক অধোগতি থেকে—তার ওপর আপন অধিকার সে মনে মনে প্রতিষ্ঠা করে নেয়। কিন্তু—"

"কিন্তু?"

"মনে মনে প্রতিষ্ঠা করা সেই দাবী বাইরে জাহির করে সেই দাবী আদায় করতে হয়তো সংকোচ আসে, দ্বিধা আসে, আসে সংশয়। হয়তো বা মর্যাদা-বোধ দাঁড়ায় পথরোধ করে। বুক ফাটলেও নাকি মেয়েদের মুখ ফোটে না। তাই নাকি ধনপতিবাবু?"

"সে স্বভাবটা মেয়েদেরই একচেটিয়া নয়, রাহুলবাবু। পুরুষদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় তাই।"

রাহুল রায় একটু ভেবে বললেন, "হয়তো তাই ধনপতিবাবু।" আবার বললেন, "হয়তো তাই।"

বুঝলাম আমাকে রাহুল রায় যেকথা বোঝাতে চাইছেন সে কথা সোজা ভাষায় সোজাসুজি আমায় বলতে তাঁর বাধছে। তাই ইঙ্গিত, উপমা, রূপকের অবতারণা।

"মুখে রুপোর চামচ নিয়ে যদি জন্ম নিতুম" বললেন রাহুল রায়, "তাহলে আমার জীবনের ইতিহাস আজ অন্যরূপ নিত।"

হয় তো তাই, রাহুল। তোমার সেই সোনালী কল্পনার "রায়" মুছে গিয়ে হয়তো "চৌধুরী" হতো না।

"কিন্তু জন্মাই নি বনেদী বড়লোকের ঘরে। জন্মেছি গরীব মধবিত্ত ঘরে।" বললেন রাহুল রায়। "সে আমার লজ্জা নয়, ধনপতিবাবু; সেজন্য দুঃখও করিনে। বরং সেই আমার গর্ব, সেই আমার গৌরব। তৈরি তখ্‌তের ওপর এসে অনায়াসে আসীন হওয়াতে কি পৌরুষ আছে? আমি সুযোগ পেলেই আপন তখ্‌ত তৈরি করে নেবো আপন পৌরুষে। পা দিয়েছি সেই সুযোগের সিঁড়িতে। সেই সুযোগ দিয়েছেন ভুজঙ্গ চৌধুরী তাঁর নিজের প্রয়োজনে। আমি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এইটেই প্রমাণ করবো যে, গরীব পরিবারে জন্মালেই সে হেয় হয় না,

যোগ্যতায় সে ধনীবংশজাতকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই আমার চ্যালেঞ্জ, ধনপতিবাবু। হ্যাঁ, একটা কথা। এই সুযোগ, নতুন উঁচু পদের এই দায়িত্ব নিতে হয়তো আমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতুম। কিন্তু পিছিয়ে যেতে দেন নি সানন্দা সান্যাল। ভরসা দিয়েছেন, ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন আমার পৌরুষের গর্ব। বলেছেন 'ছিঃ! দায়িত্ব দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে কেন রাহুলবাবু? ক্যাপিট্যালিস্টকে ধিক্কার দিয়ে কবিতা লিখেছিলেন না? সেই ক্যাপিট্যালিস্ট যখন যেচে এলো সোনার সুযোগ দিতে, তখন আপনিই কাপুরুষের মতো পিছিয়ে গেলে কোথায় থাকবে আপনার সেই ধিক্কারের মর্যাদা? ক্যাপিট্যালিস্টের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই হবে আপনাকে। আর এতে আমার আপ্রাণ সহযোগিতা পাবেন আপনি।' সেই অভয়বাণী আমার ওপর কাজ করলে যাদুমন্ত্রের মতো। আমি মাথা পেতে নিলুম নতুন দায়িত্ব, পুঁজিপতির এই মস্ত চ্যালেঞ্জ।"

"আপনাকে ফাদার কন্‌ফেসর বানাতে চাইতে ধনপতিবাবু"—বলতে লাগলেন রাহুল রায়, "কিন্তু আরেকটা কথা না বলে পারছিনা। সানন্দা সান্যাল যে আমার কত বড় ভরসা আর প্রেরণা, ওঁর ওপর যে আমার কতখানি নির্ভর, তা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না। ভুজঙ্গ চৌধুরী নিদারুণ ব্যথা দিয়েছে তাঁকে, তাই কর্মপ্রতিভায় আমি চৌধুরীকে ছাড়িয়ে যেতে পারি—এইটে প্রমাণ করেই তিনি চৌধুরীর ওপর প্রতিশোধ নিতে চান। তাই আমার সেক্রেটারী হয়ে তিনি যেন মরিয়া হয়ে কোমর বেঁধেছেন আমাকে এগিয়ে দেবার কাজে। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখতে পাই বড় উদাস হয়ে পড়েন সানন্দা। যেন আর তাঁর ভালো লাগছে না এ অফিসের কাজ, এখানকার মেয়াদ যেন তাঁর ফুরিয়ে গেছে। হয়তো আমার কাজকর্ম ভালো করে গুছিয়ে তিনি একদিন বিদায় নেবেন। সেদিনের কথা ভাবতেও ভয় পাই ধনপতিবাবু। দায়িত্বময় কর্মজীবনে কর্মপ্রতিভাময়ী উৎসাহদায়িনী নারী যে পুরুষের কত বড় শক্তি, মিস্ সান্যালকে দেখে আমি তা বুঝতে পারছি।"

আমি বললাম, "আপনার ভয় নেই রাহুলবাবু। আপনার পাশে থেকে আপনাকে এগিয়ে দেওয়াকে তিনি যখন ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন তখন আপনাকে ফেলে তিনি চলে যাবেন না। এগিয়ে দেবার আর এগিয়ে যাবার তো কোনো শেষ নেই।"

মনে পড়ে' গেল ৺প্রজ্ঞাপারমিতার কবিতার দুটি লাইন ঃ

"রয়েছে সীমান্ত পারে আরো কত অন্তহীন সীমা,
দিগন্তের অন্তরালে আছে আরো অন্তহীন পথ।"

রাত্রি গভীর। বাইরে মেঘলা আকাশ, ভেতরে ভাবনার মেঘ জমেছে আমার মনের আকাশে। দু' চোখের পাতা ভারী। সারা দেহ জুড়ে আসন্ন অবসাদের আভাস।

সহসা নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে কার আবির্ভাব? চেয়ে দেখি সৌম্য-দর্শন প্রবীণ সন্ন্যাসী। মুখে করুণার সুধাহাস্য জ্যোতিঃ। দীর্ঘ ঋজু দেহ। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দুটি চোখ। বললেন, "আমি নিরালা বাবা। ডেকেছিলে, তাই কাছে এলেম।"

"ডেকেছিলেম হয় তো, মনে মনে, অবচেতনার আড়ালে। তাই এসেছেন এমন অসময়ে, সুদূর গোলাপডাঙার নিরালাশ্রম থেকে?"

"এলেম তোমার গরজের ছলে, কিন্তু আসলে নিজেরই গরজে।" আসন গ্রহণ করে বললেন নিরালা বাবা। "আমার সম্বন্ধে অনেক মুখ থেকে অনেক কথাই হয়তো শুনেছ। আমি এলেম আমার মুখ থেকে কিছু শোনাতে।"

আমি বললেম, "শোনান।"

"শোনো প্রথম থেকে।" বলতে লাগলেন নিরালা বাবা। "সে

অনেক দিনের কথা। নিয়তির বিধানে গোলাপডাঙার নদীর ধারে বটবৃক্ষের তলায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেম ছন্নছাড়া, ভবঘুরে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, অবসন্ন আমি। আমায় পরম আদরে একান্ত আগ্রহে আপন ভবনে আশ্রয় দিলে গোলাপডাঙার অনেক জমির প্রবীণ মালিক গগন পাল। তার ছিল ভবনদী পারের কাণ্ডারী আধ্যাত্মিক গুরুর প্রয়োজন। কবে স্বপ্নে বাণী শুনেছিল ছদ্মবেশে মহাপুরুষ আসবেন তাকে উদ্ধার করতে। ভেবে নিলে আমিই সেই ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ। আমার আশ্রয় পাবার জন্যে আমাকে দিলে আশ্রয়। পেতে লাগলুম রাজসিক সম্মান, আরাম, যত্ন। কিন্তু সে জীবন দ্রুতবেগে অসহ্য হয়ে উঠলো গগন পালের বাড়াবাড়িতে। তার প্রোপাগণ্ডায় চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল অলৌকিক ক্ষমতাশালী এক মহাপুরুষ এসেছেন তার গৃহে—ভগবানের অংশ অবতার। চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগলো দর্শনার্থী দর্শনার্থিনীর দল। কেউ চায় মুক্তি, কেউ দীক্ষা, কেউ পাদোদক, কেউ মাদুলি, কেউ আশীর্বাদ, এমনি আরো কত কি। যা আমি নই, এরা সবাই আমায় তাই ভাবতে লাগল। যে সম্মান আর বিশ্বাস আমার পাওনা নয়, তাই আমার ওপর বর্ষিত হতে লাগলো শিলাবৃষ্টির মতো। পালিয়ে যাবার জন্যে ক্ষেপে উঠ্‌লুম। কিন্তু পলায়ন আমার পক্ষে নানাভাবে অসম্ভব করে রেখে দিয়েছিল গগন পাল; মনে মনে হয়তো তার ভয় ছিল আমি হঠাৎ পালিয়ে যেতে পারি। সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমি নিরালা থাকতে ভালোবাসি; তাই থেকে কেমন করে আমার নিরালা বাবা নামটা চালু হয়ে গেল। আর সেই থেকে নিজেকে নিরালায় পাওয়া আমার পক্ষে আরো কঠিন হয়ে উঠল। ওদিকটায় অনেকদিন ধরেই একটি অবতারের আসন শূন্য ছিল, অনেক নরনারী প্রতীক্ষা করছিল ঐ আসন কে এসে পূর্ণ করবে, কবে এসে পূর্ণ করবে। আমার ওপর সেই অবতারত্ব চাপাতে পেরে তারা যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। আমাকে প্রথম আবিষ্কার আর প্রচার করার বিরাট গৌরবটা লাভ করলে গগন পাল।”

শুধালেম, "আপনার গোলাপডাঙায় আসবার আগের জীবনের কথা কিছু শোনাবেন কি, নিরালা বাবা ?"

নিরালা বাবা বললেন, "সন্ন্যাসের আগের জীবন ভুলে থাকাই উচিত ধনপতি। তা ছাড়া, সে-সব কাহিনী তোমার কানে খুব শ্রুতি-মধুরও লাগবার কথা নয়। এইটুকু শুধু জেনে রাখো যে জীবনে সুন্দর, মহৎ আর মধুরের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় হয়েছে তার চাইতে ঢের বেশী পরিচয় পেয়েছি জীবনের কঠোর, নির্মম, কুৎসিত, বীভৎস ও কদর্য রূপের। অমৃতের চাইতে বেশী দেখেছি বিষ, কল্যাণের চাইতে বেশী অকল্যাণ, পুণ্যের চাইতে পাপ, আলোর চাইতে অন্ধকার।"

"সংসার-ধর্ম আপনি কি কখনো পালন করেন নি, নিরালা বাবা ?"

নিরালা বাবার বুক থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "জীবনে জ্ঞাতসারে কোন পাপ করি নি। তবু যখন নিজের জীবনে বহু মর্মান্তিক দুঃখ ব্যথা সইতে হলো, তখন মনে হলো ভগবান নেই; যদি বা থাকেন, তিনি দয়াময় বা কল্যাণময় নন। তাকে দিয়ে মানুষের কোনো আশা ভরসা নেই। মানুষকেই করতে হবে মানুষের কল্যাণ। মানুষের কল্যাণ সাধনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবো পণ করলুম। কিন্তু ক্রমে দেখলুম প্রাণ আমার যত আকুল, কল্যাণ করবার তত ক্ষমতা আমার হাতে নেই। দুনিয়ার একটা বড়ো ট্রাজেডি এই যে, কল্যাণ করবার ক্ষমতা যাদের আছে, কল্যাণ করবার কামনা তাদের নেই; কামনা যাদের আছে, তাদের ক্ষমতা নেই। গোলাপডাঙায় নিরালা বাবা হয়ে দেখলুম বিনা আয়াসে একটা কেষ্টো বিষ্টু হয়ে উঠ্ছি, কাছে আর দূরে মাথার পর মাথা আমার চরণ-ধূলার তলে নত হবার জন্যে ব্যস্ত। দিনে দিনে বেড়ে উঠছে আমার ভক্তসংখ্যা, যাদের কাছে আমার শ্রীমুখের বাণী বেদবাক্যের সমতুল্য। মনে হলো আমার মানবকল্যাণ সাধনার ব্রত সফল করবার জন্যে ভগবানই যেন এই ক্ষমতা আমার হাতে

তুলে দিচ্ছেন। তখন ভাব্‌লুম ভগবান যখন নিরালা বাবাই বানালেন আমাকে, তখন নিরালা বাবা রূপেই মানুষের কল্যাণে এ জীবন উৎসর্গ করে কাজ করে যাবো। তাই আমি করে চলেছি ধনপতি। যদি নিরালাশ্রমে কখনো যাও তো দেখবে সারা আশ্রমে শ্রম-শিল্পকে কতখানি মর্যাদা দিয়েছি। তাতে কত দুঃখী, কত দুঃখিনীর কর্ম-সংস্থান হয়েছে। অলস বিশ্রামের ঠাঁই নেই নিরালাশ্রমে। জীবন-দেবতা আমাদের কর্মজীবনের সঙ্গেই মিশে আছেন, এইটে মনে রেখে কর্মযোগ আর সেবাধর্মে আত্মোৎসর্গ করে দেওয়াই মহৎ জীবনের আদর্শ, এই বাণীই আমি প্রচার করছি। ঈশ্বর মাথার ওপরে থাকুন—"

বাধা দিয়ে শুধালেম, "আপনার কি ঈশ্বর-দর্শন হয়েছে, নিরালা বাবা?"

নিরালা বাবা বললেন, "এই প্রশ্ন ওঁকারও একদিন আমাকে করেছিল। এখন সে আমার ডান হাত, তখন সে তরুণ ডাক্তার। সে একদিন হঠাৎ এসে বললে, 'আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' আমি বললুম, 'দেখি নি, তোমাকেও দেখাতে পারবো না।' শুনে ওঁকার চলে গেল। তারপর একদিন এসে বললে, 'আমাকে ঠাঁই দিন আপনার এই মহতী কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে।' অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ওঁকার। তখন অবশ্য তার অন্য নাম, কিন্তু ওর সংসারী নামটা এখন আর ব্যবহার করতে চাই নে। তরুণ ডাক্তার ওঁকার। অদ্ভুত হাত যশ, প্রচুর নামডাক। শহরের সেরা প্রবীণ ফিজিশিয়ান ডাক্তার ঘোষাল নিজের অনেক রোগী-রোগিণীর চিকিৎসার ভার আপন দায়িত্বে ওঁকারের হাতে সঁপে দিতেন। তাঁর বিশ্বাস তাঁর চাইতে অনেক বিষয়ে ওঁকারের সূক্ষ্ম অনুভূতি—যাকে বলে 'ইন্‌টুইশ্যন্'—অনেক বেশী। এমনি একটি রোগিণী ছিল মল্লিকা। আসন্ন মৃত্যুর আভায় বুঝি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল মল্লিকার মুখ। তারি পানে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল তরুণ ডাক্তার ওঁকার। দূরে সরে গেল ডাক্তার-রোগিণী সম্পর্ক। এলো আত্মার আত্মীয়তা। বেঁচে উঠবার আগ্রহ নিদারুণ ঐকান্তিক হয়ে উঠলো মল্লিকার। তাকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্যে মরিয়া

হয়ে উঠলো ওঁকার। মল্লিকা ভালো হয়ে উঠলে একসূত্রে গাঁথা হবে দুজনের জীবনমাল্য, এই ভাবলে মনে মনে। কিন্তু ওঁকার আর ডাক্তার ঘোষালের সম্মিলিত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে একান্ত অনিচ্ছায় চিরবিদায় নিয়ে চলে যেতে হলো মল্লিকাকে। অন্ধকার নেমে এলো ওঁকারের জীবনে। তাঁর মনে হলো আর কখনো সে হাসতে পারবে না।”

তারপর মল্লিকাকে হারিয়ে সংসারে আর যেন কোনো আকর্ষণ রইল না ওঁকারের, কোন মহান্ ব্রতে আপন জীবন উৎসর্গ করে দিতে পারলে সে বেঁচে যায়। হৃদয়ে তার মরু-সাহারার শূন্যতা, নিরালা বাবার কাছে সে চাইতে এসেছে শান্তির আশ্রয়।

“কিছুতেই ওঁকারকে ফিরিয়ে দিতে পারলুম না ধনপতি। দেখলুম শ্মশান-বৈরাগী নয় সে, বৈরাগ্য তার সত্যিই এসেছে।” বললেন নিরালা বাবা। “মল্লিকাকে ওঁকার আগে কখনো দেখে নি, কিন্তু মল্লিকা তবু তার শেষ ক'টি দিনে সুধায় ভরে দিয়েছিল ওঁকারের জীবন, মল্লিকার শেষ ক'টা দিন সুধায় ভরে দিয়েছিল ওঁকার। বিদায়ের ব্যথা বুকে নিয়ে চলে গিয়েছিল মল্লিকা, এ ব্যথা ভুলতে পারে নি ওঁকার। তখন নিরালাশ্রমের এক প্রান্তে ছোট্ট একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সবেমাত্র পত্তন হয়েছে। তারই ভার নিয়ে সে রয়ে গেল গোলাপডাঙায়। ওর মতো ডাক্তার পেয়ে ধন্য হলো গোলাপডাঙা। সেই চিকিৎসালয় এখন চমৎকার হাসপাতালে পরিণত হয়েছে, আর তারি সঙ্গে রয়েছে একটি মাতৃমঙ্গল এবং শিশুমঙ্গল বিভাগ—সারা গোলাপডাঙার সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে তার সুযোগ পাচ্ছে। দেখলে তুমি খুশী হবে ধনপতি। ওঁকার যে শুধু এই বিভাগগুলোই দেখাশোনা করছে তাই নয়। দেখা-শোনা করছে আরো অনেক কিছু। নিরালাশ্রমে রয়েছে ছোটদের জন্যে পাঠশালা, বয়স্কদের জন্যেও শিক্ষায়তন। গোলাপডাঙায় নিরক্ষর রাখবো না, আমাদের নিরালাশ্রমের শিক্ষাবিস্তার বিভাগের এই ব্রত। শিক্ষা মানে শুধু লেখাপড়া শিক্ষাই নয়; ধর্মনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, জনসেবা আর হাতের কাজ শেখাও বটে। স্বয়ংসম্পূর্ণ জনপদের আদর্শে এই গোলাপডাঙাকে

গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছি, করছি। বৃহৎ ব্যাপার নয়, মহৎ ব্যাপার লক্ষ্য আমাদের। বৃহৎকে ভয় করি—বড় বড় কল-কারখানায় কল্পনাতেও শিউরে উঠি, মনে হয় ওর আড়ালে কল্যাণের ছদ্মবেশে অকল্যাণ লুকিয়ে আছে। কল্যাণ ছড়িয়ে থাকুক ছোট ছোট খুচ্‌রো চেহারা নিয়ে, কল্যাণের পাইকারি পাহাড় গোলাপডাঙায় আমি চাই নে। মাত্রা-ছাড়ানো বৃহতে প্রাণের সবুজ মরে যায়, তাই অতি-বৃহৎকে আমার বড় ভয়।···থাক্ সে সব কথা। ওঁকারের কথা বলছিলুম। মল্লিকার প্রেম সে ভুলতে পারে নি। মল্লিকার প্রেমই এমন মহান করেছে ওঁকারকে, মানুষের সেবার ব্রতে তাকে বিলিয়ে দিয়েছে এমন করে। ওঁকার পাশে না থাকলে আমার কল্যাণব্রতের আদর্শ একা আমি এতখানি সফল করে তুলতে পারতুম না। মল্লিকাকে চোখে দেখিনি, কিন্তু তাঁকে ধন্যবাদ, সে বেঁচে ওঠেনি বলে।”

মর্মাহত, বিস্মিত কণ্ঠে শুধালেম, “কেন?” অর্থপূর্ণ গম্ভীর হাসি হাসলেন নিরালা বাবা। তারপর বললেন, “যদি বেঁচে উঠতো মল্লিকা, তাহলে অসহায়, গরীব, নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্তদের কল্যাণে সেবাব্রতে এমন করে নিজেকে বিলিয়ে দিত না ওঁকার। তাহলে সে আজ হতো ডাকসাইটে চড়া ভিজিটের আর কড়া মেজাজের ডাক্তার। তার অসামান্য চিকিৎসা-প্রতিভার লক্ষ্য হতো মোটা টাকা রোজগার, মানুষের কল্যাণ নয়। হয়তো তার জীবন-সঙ্গিনী—”

“মল্লিকা?”

“মল্লিকা নাও হতে পারতো ধনপতি।” হেসে বললেন নিরালা বাবা। “মল্লিকার আসন্ন-মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে যে লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলো তরুণ ডাক্তার ওঁকারের রোমান্টিক মন, সেই মুগ্ধতার আড়ালে মিশে ছিল অসহায়া মৃত্যু-ভয়-ব্যাকুলার প্রতি দরদ। মৃত্যুর হাত থেকে মল্লিকাকে উদ্ধারে সফল হলে সেই সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে যেতো সেই দরদের রঙীন রামধনু। মল্লিকার রূপ থেকে মুছে যেতো সেই একান্ত অসহায় ব্যাকুলতার করুণ লাবণ্য। কে জানে, হয় তো তখন দৃষ্টি বদলে যেতো ওঁকারের, চোখ

থেকে মুছে যেতো তার সেই পুরাতন মোহের অঞ্জন। তাই বলি, যে মল্লিকা চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল বলে ওঁকার ভাবলে তার প্রেম-জীবনে আর অন্য নারীর ঠাঁই নেই, সেই মল্লিকাই বেঁচে উঠলে হয়তো আজ অন্য কোনো নারীই ওঁকারের জীবন-ব্যাপিনী প্রিয়তমা হয়ে তাকে দিয়ে পেশাদারী ডাক্তারী করাত। মল্লিকা মরে জয় করে রেখে গেল ওঁকারকে, তাকে বিলিয়ে দিয়ে গেল কল্যাণ-ব্রতের সাধনায়। গভীর ব্যথাই আপন সুখদুঃখের সংকীর্ণ জগৎ থেকে তাকে জনকল্যাণের বৃহত্তর জগতে এগিয়ে দিয়েছে।”

আমি বললাম, “কিন্তু যদি কখনো মনে দুর্বলতা আসে ওঁকারানন্দের ? যদি এই সন্ন্যাস-আশ্রম ছেড়ে সংসার-আশ্রমে প্রবেশের জন্যে উতলা হয়ে ওঠে তাঁর মন ? তখনো কি তাকে আটকে রাখবেন আপনি ?”

খুশী হয়ে নিরালা বাবা বললেন, “অতি সুন্দর প্রশ্ন করেছো ধনপতি। এ প্রশ্ন আমারো মনে জেগেছিল। জবাব বলি শোনো। সন্ন্যাস-আশ্রম একমুখো রাস্তা নয়। তাই এ আশ্রম থেকে সংসার-আশ্রমে ফিরে যেতে বাধা নেই। যে সেবাব্রতে নেই প্রাণের আনন্দের যোগ, আছে শুধু আত্মনিগ্রহ আর আত্মবঞ্চনার গ্লানি, সে তো মিথ্যে, সে তো অকল্যাণময়। বৃহৎ ব্যথা পেয়ে মানুষ যখন পরের কল্যাণে আপন বিলিয়ে দেয়, তাতে থাকে আপন ব্যথা ভোলার আনন্দ, সেই আনন্দই তার কল্যাণ সাধনার মূল। এই আনন্দের যোগ যেদিন থাকবে না, এমন দিন যদি কখনো আসে, যেদিন সংসারেই বৃহত্তর আনন্দের সন্ধান পেয়ে সংসার-আশ্রমে ফিরে যেতে ঐকান্তিক আকুলতা জাগবে ওঁকারের মনে, সেদিন মুক্তপ্রাণে তাকে মুক্তি দেবো, বলবো ফিরে যাও ওঁকার।...”

“তেমন সম্ভাবনা কি আছে, নিরালা বাবা ?”

“দুবার আঘাত পাবার পর তেমন সম্ভাবনা ওঁকারের জীবনে আর আছে বলে মনে হয় না ধনপতি।” বললেন নিরালা বাবা। “তবু, কথায় বলে ঃ মন না মোতি, টলতে কতক্ষণ ?” একটা দীর্ঘশ্বাস যেন বেরিয়ে এলো নিরালা বাবার বুক থেকে।

“মানুষকে মহৎ কল্যাণের কাজে প্রেরণা দেবার জন্যে বোধ হয় বড়

ব্যথার প্রয়োজন, ধনপতি।" বললেন নিরালা বাবা। "কন্‌হৈয়ালাল কম্বলওয়ালার নাম শুনেছো কি ?"

বললাম, "শুনেছি। অগুনতি টাকার মালিক।"

নিরালা বাবা বললেন, "নিরালাশ্রম সংঘের হাসপাতাল ফাণ্ডে দু লক্ষ টাকা দিতে সে একান্ত আকুল। আমি সে টাকা নিতে এখনো রাজী হইনি।"

"কেন ?"

"এ টাকা সে দিতে চাইছে তার ধর্মপত্নী সাবিত্রী কম্বলওয়ালার আত্মার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আর তার স্মৃতি রক্ষার জন্যে। সম্প্রতি স্বর্গীয়া হয়েছে সাবিত্রী, তাই মহা শোকে আকুল কন্‌হৈয়ালাল। পত্নীর প্রতি পতির কর্তব্যে অনেক ত্রুটি হয়েছে তার; সাবিত্রী বেঁচে থাকতে খেয়াল হয় 'নি, এখন অনুতাপের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। এই দু'লাখ টাকা সে যেন তার প্রায়শ্চিত্তের দক্ষিণা দিতে চাইছে ঝোঁকের মাথায়। আকস্মিক আবেগের মুখে দেওয়া অর্থ মহৎ সেবার পুণ্য কাজে আমি গ্রহণ করতে চাই নে ধনপতি। দু' হপ্তা তাই সময় দিয়েছি কম্বলওয়ালাকে। শোক আর অনুতাপের প্রথম জোয়ারটা এই দু' হপ্তায় ভাঁটিয়ে যাবার সময় পাবে। প্রথম ঝোঁকটা কাটিয়ে উঠে তারপর ধীর স্থির মস্তিষ্কে কম্বলওয়ালা যদি আবার আসে দু' লাখ টাকার চেক্ নিয়ে, সে চেক্ তখন গ্রহণ করবো।"

নিরালা বাবা বলতে লাগলেন, "তাই বলছিলাম ধনপতি যে, মানুষের যে কোনো মহৎ কাজের উৎস সন্ধান করতে গেলেই দেখা যাবে সেখানে গুপ্ত রয়েছে কোনো না কোনো গভীর বেদনাবোধ। কম্বলওয়ালাকে বাইরে থেকে দেখলে অনেকে হয় তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না অবিরাম অর্থ-ঝন্‌ঝনানির স্মৃতি আর কল্পনায় ভরা ওর মনে পত্নীপ্রেমের মতো সূক্ষ্ম অনুভূতিরও ঠাঁই মেলে। কিন্তু এইটে যেন কখনো ভুলো না ধনপতি যে বাইরের চেহারাটা মানুষের পুরো চেহারার আভাস দেয় না। সাবিত্রী-পত্নীর সত্যবান-স্বামী হতে পারে নি বলে কি অসীম ব্যথায় ভরে আছে বিপত্নীক কম্বলওয়ালার সারা হৃদয়, আমি তা অনুভব করেছি। স্থূল দেহে সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতি থাকা অসম্ভব নয় জেনো।"

জানি। বিশ্বাস করি। বিপত্নীক হবার অল্প দিন আগে একটি নিদারুণ হৃদয়-ঘটিত ট্র্যাজেডি ঘটে গিয়েছিল শুনেছি কম্বলওয়ালার জীবনে। 'হেলেন অব্ ট্রয়' ছবিতে হেলেনের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য বহু অনুসন্ধানে বহু অর্থব্যয় করে একটি নতুন মুখ আনিয়েছিলেন কম্বলওয়ালা। চমৎকার বয়স। চমৎকার চেহারা। চমৎকার নাচের কায়দা। চমৎকার গানের গলা। চমৎকার হাসি। চমৎকার কথা বলার ভঙ্গী। নামটিও চমৎকার—চম্পা বাঈ। গান গেয়ে মাত করেছে অনেক আসর, মুজরার মোটা টাকার মোটা অংশ খয়রাত করে দিয়েছে অবলীলায়। অর্থ এসে অনায়াসে পায়ে লুটিয়ে পড়ে চম্পার, লুটিয়ে পড়তে পারলে খুশী হয়। দীর্ঘ সুগঠিত সুঠাম দেহ চম্পার, অনায়াস নৃত্যভঙ্গীতে যেন পাখির পালকের মতো হাল্কা বলে ভুল হয় দর্শকদের চোখে। রূপালী পর্দায় অভিনয় করেনি কখনো। পর্দায় তাকে নামাবার চেষ্টা করেছে একাধিক চিত্র প্রতিষ্ঠান, কিন্তু মর্জি করাতে পারে নি চম্পার। অবশেষে কম্বলওয়ালার ছবিতে 'হেলেন' হয়ে নামতে খুশী হয়ে রাজী হয়ে এসেছিল, বেশ মোটা টাকা আগাম নিয়ে, এবং আরো টাকার কড়ারে। হেলেনের কাহিনী আর হেলেনের ভূমিকা তার যৌবন-চঞ্চল খামখেয়ালী মনে অত্যন্ত ভাল লেগেছিল বলে।

চম্পাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন কন্হৈয়ালাল কম্বলওয়ালা। একটি নারীদেহে এত রূপ, এমন প্রাণোচ্ছলতা কখনো কল্পনা করতে পারেন নি তিনি। চম্পাবাঈর রাতুল চরণপদ্মে হৃদয় লুটিয়ে পড়লো কম্বলওয়ালার।

কম্বলওয়ালার সঙ্গে কিন্তু কোনো কথাই বলে নি চম্পা। সঙ্গে রয়েছে শেখর নামে এক লম্বা চওড়া সুশ্রী চৌকস ছোকরা, সেক্রেটারীর মতো। কথাবার্তা যা বলা দরকার সবই বলে সে। নিজেকে রহস্যময়ী করে রাখবার জন্যেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, নিজের চারিদিকে একটা আড়ালের আবহাওয়া যেন কায়েমী করে রেখে দিয়েছে চম্পা।

শয়নে স্বপনে যখন তখন চম্পাবাঈর মুখখানি ভেসে ওঠে

কম্বলওয়ালার চোখের সামনে। এক মুহূর্ত ভুলে থাকতে পারেন না তাকে। বুকের ভেতরটা সর্বদাই তারই জন্য হাহাকার করতে থাকে। পাগল হয়ে যাবেন নাকি কম্বলওয়ালা? একেই কি হিন্দীতে বলে পেয়ার? —আর উর্দুতে মুহব্বৎ? তবে কি কম্বলওয়ালা প্রেমে পড়ে গেছেন চম্পা বাঈ-র, আর সেই প্রেমেরই এই দুঃসহ জ্বালা?

চলচ্চিত্র প্রযোজনার মাঠে কম্বলওয়ালা কোমর বেঁধে নেমেছিলেন চলচ্চিত্র-শিল্প-প্রীতিতে মশগুল হয়ে বা মুনাফা কামাবার উদ্দেশ্যে নয়। ছবি তোলাটা উপলক্ষ্য ; লক্ষ্য ছিল ছবি তোলার অবকাশে প্রচুর সুন্দরীর দৈহিক সান্নিধ্যের শিহরণ। টাকার জোরে ছবি তোলা উপলক্ষ্য করে জীবনে একটু রঙীন বৈচিত্র্য উপভোগ করবে, এই ছিল কম্বলওয়ালার মনের কামনা। কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেল! এমন করে মন বাঁধা পড়ে যাবে তা তো জানা ছিল না কম্বলওয়ালার।

একটা পার্টি দিলেন কম্বলওয়ালা তাঁর বাগানবাড়ীতে। কোনো এক সুযোগে চম্পাবাঈকে একা ডেকে নিলেন তাঁর গোলাপ কুঞ্জে গোলাপগুচ্ছ দেখাবেন বলে। সেইখানে চম্পাকে রাঙা গোলাপ দেখাতে দেখাতে আপন হারিয়ে প্রাণের দুয়ার কখন খুলে ফেললেন, খেয়াল রইল না কম্বলওয়ালার।

আগুনের মতো জ্বলে উঠলো চম্পাবাঈ। তারপর যে চুক্তি-পত্রে সে সই দিয়েছিল সেইটি কম্বলওয়ালার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে আর নিজের চেক বই খুলে তাড়াতাড়ি লিখে সই করে একখানা চেক দিয়ে দিলে কম্বলওয়ালার হাতে। বললে, "যে টাকা আগাম নিয়েছিলুম সে টাকা পুরো শোধ করে দিলুম। তোমার ছবিতে আমি অভিনয় করবো না।"

ক্ষমা চাইতে গেলেন, বোঝাতে গেলেন কম্বলওয়ালা। কিন্তু বৃথা। চম্পাবাঈ চলে গেল, একটিবারও ফিরে তাকালে না।

তারপর? তারপর কম্বলওয়ালা প্রেডাক্‌শ্যনস্‌ তুলে দিলেন কম্বলওয়ালা। কর্মীদের প্রাপ্য পাই পর্যন্ত মিটিয়ে দিলেন। ছবি সম্বন্ধে

প্রশ্নের জবাবে করুণ হেসে বললেন, "হেলিন্ চলে গেল। আর হেলিন্ অব্ ট্রয় হবে কেমন করে?" স্টুডিও থেকে ফোটো সংগ্রহ করে রেখেছিলেন চম্পাবাঈ-র। সেই ফোটোই এখন হলো তাঁর সান্ত্বনা। আর চম্পার আপন হাতে লেখা আপন হাতে সই করা সেই অনেক টাকার অমূল্য চেকটি। সেটি কখনো ভাঙাবেন না কম্বলওয়ালা, রেখে দেবেন চম্পা বাঈর স্মৃতিচিহ্নরূপে। কম্বলওয়ালার জীবনটাকে যেন তচনচ করে দিয়ে গেল চম্পাবাঈ। আর এমনি সময় মারা গেলেন পত্নী সাবিত্রী কম্বলওয়ালা। চম্পা বিদায়ের বজ্রাঘাতের পরেই এ শোকটা বেশী করে বেজেছে, তাই বুঝি সাবিত্রীর আত্মার তৃপ্তির জন্যে নিরালাশ্রমের হাসপাতাল ফাণ্ডে দু লাখ টাকা দিতে ব্যাকুল কন্‌হৈয়ালাল কম্বলওয়ালা? মনে প্রশ্ন জাগলো, কম্বলওয়ালার এই ব্যাকুলতার মূলে কাকে হারানোর বেদনা—সাবিত্রী কম্বলওয়ালা, না চম্পাবাঈ? কিন্তু এই বদান্যতার মূলে যে বেদনা, তাতে সন্দেহ ছিল না আমার। এ কথাও মনে মনে স্বীকার করলাম যে পৃথিবীতে বড় বেদনা আছে বলেই বড় বদান্যতা আছে।

নিরালা বাবা বললেন, "প্রজ্ঞাপারমিতার কথা শোনাতে এসেছি। এইবারে তার কথা বলি শোনো। ওর মা সংঘমিত্রা দেবীর সঙ্গে নিরালাশ্রম দেখতে এসেছিল প্রজ্ঞা। আমার মন তখন গভীর নিরাশার অন্ধকূপে। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি মানুষের মনুষ্যত্বে, তার বর্তমানে, তার ভবিষ্যতে। নিরালাশ্রমে আমাকে কেন্দ্র করে যে গোষ্ঠী গড়ে উঠছে তার ভেতর যেন দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যৎ বিরোধ, দলাদলি, চক্রান্তের বীজ। মনে হলো যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বিরাট একটি প্রদীপ, তার সলতের ওপর জ্বলছে একটি বিরাট শিখা, কিন্তু সে শিখার রং সোনালী নয়, কালো। সে শিখা আলোর নয়, অন্ধকারের; চারধারের সমস্ত আলো যেন পতঙ্গের মতো এসে ঐ অন্ধকারের কালো শিখায় এসে তাইতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। হু হু করে কমে চলেছে জগতের আলোর ভাণ্ডার। আতঙ্কিত হয়ে ভাবছি এভাবেই দুনিয়ার সব আলো কি নিঃশেষ হয়ে যাবে?…চারদিকে দেখছি শুধু শূন্য, শুধু অন্ধকার, শুধু অন্তহীন নিরালা। এমনি সময় এলো

প্রজ্ঞাপারমিতা। আমার মনের অন্ধকার দূর হয়ে গেল তার আবির্ভাবে। তার হাসির সুরে শুনতে পেলাম অনন্ত আশার বাণী, তার দৃষ্টির আলোয় যেন দূর হয়ে গেল নৈরাশ্যের অন্ধকার। মনে হলো আমার চরম আধ্যাত্মিক সংকটের সময় প্রজ্ঞা যেন ভগবৎ-প্রেরিত আশার দূত। নিরালাশ্রমের দায়িত্ব, গোলাপডাঙার দায়িত্ব ছেড়ে উধাও হয়ে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার জন্যে প্রাণ পালাই পালাই করছিল। প্রজ্ঞার আবির্ভাব যেন আমায় নীরবে মৃদু তিরস্কার করে বললে, অন্ধকার ঘিরে আসছে বলেই তো আলোর মশাল জ্বেলে রাখতে হবে, পালিয়ে পিছিয়ে গিয়ে মুখ ঢেকে থাকলে চলবে কেন ?"

"ঘুরে ঘুরে সে দেখতে লাগলো নিরালাশ্রমের বিভিন্ন বিভাগ, সঙ্গে ডেকে নিলে আমাকেও। সে ডাকের সহজ যাদুকে এড়াতে পারলুম না ধনপতি। গেলুম। দেখলুম নিরালাশ্রমের কর্মযোগ আর সেবাব্রতের আদর্শ ভালো লেগেছে প্রজ্ঞাপারমিতার, সেই ভালো লাগার আলো ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে।...মল্লিকার কুঞ্জে ফুটে ছিল অনেক মল্লিকা। খোঁপায় পরম যত্নে গুঁজে নিতে লাগল প্রজ্ঞাপারমিতা। 'ফুল যে কি ভালোই বাসে মেয়েটা।' বললেন সংঘমিত্রা। তারপর ভুলে গেলেন আমি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী। বললেন 'মেয়ের বয়স হয়েছে। এইবারে সুপাত্র পেলেই—' সুপাত্র! চমকে উঠলুম। ও দিক দিয়ে একেবারেই এগোয়নি আমার চিন্তাধারা। সত্যিই তো বয়স হয়েছে প্রজ্ঞাপারমিতার। দেহ-মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে উপযুক্ত সাথীর প্রতীক্ষায়। কিন্তু কোথায় সেই উপযুক্ত সাথী ? কে সেই উপযুক্ত সাথী ? তখনো মল্লিকা-কুঞ্জে মল্লিকা-মশগুল প্রজ্ঞাপারমিতা। তাকালুম মেয়েটার দিকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবলুম 'এ পৃথিবীতে কোথায় এর উপযুক্ত সাথী ?'..."

"তারপর ?"

"মল্লিকা-কুঞ্জ থেকে ফিরে এলো প্রজ্ঞাপারমিতা। খোঁপায় গোঁজা মল্লিকা ফুল। অপূর্ব দেবীপ্রতিমা। দেখে আবার মনে হলো কোথায়

এর উপযুক্ত সাথী ? ওঁকারকে যখন প্রথম দেখলে প্রজ্ঞাপারমিতা, সন্ন্যাসী ওঁকার তখন ডাক্তার ওঁকার। একটি রোগীকে দেখতে ব্যস্ত। রোগীটি গোলাপডাঙার এক চাষার ছেলে। তাকে তন্ময় হয়ে দেখছে ওঁকার, ওঁকারকে তন্ময় হয়ে অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে প্রজ্ঞাপারমিতা, আর তাদের দুজনের তন্ময়তা দেখছি আমি। ওঁকারকে দেখে যেন আর সব কিছু, এমনকি নিজেকেও ভুলে গেছে প্রজ্ঞাপারমিতা। তাকালুম ওঁকারের দিকে। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলুম ; প্রজ্ঞার দৃষ্টির আলোয় ওঁকারকে যেন নতুনরূপে দেখতে পেলুম। এমন সুন্দর, সুঠাম, সুপুরুষ ওঁকার, এ তো আগে কখনো এমন করে চোখে পড়েনি ! কিছুক্ষণ পর আনন্দের হাসি ফুটে উঠলো ডাক্তার ওঁকারের মুখে। এইবারে সে চাষার ছেলেটি সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হতে পেরেছে বোঝা গেল। সেবিকাকে নির্দেশ দিয়ে বালক রোগীটিকে সাদর আশ্বাস দিয়ে এদিকে আসতেই ওঁকার দেখলে প্রজ্ঞা-পারমিতাকে। দেখেই চম্‌কে উঠে যেন মোহগ্রস্তভাবেই অর্ধস্ফুট স্বরে বলে উঠলো 'মল্লিকা !' প্রজ্ঞাপারমিতাও যেন সহসা চম্‌কে হয়ে উঠে তারপর বললে 'মল্লিকা'। খোঁপায় গোঁজা তার মল্লিকা ফুল, হাতে দুলে উঠলো মল্লিকার গুচ্ছ।…"

"তারপর ?"

"মনে হলো তাদের যেন সেই প্রথম দেখা নয়। যেন প্রতীক্ষিত আর প্রতীক্ষিতার শেষ হয়েছে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা। চিকিৎসা ভবন ঘুরে ঘুরে দেখতে চাইলে প্রজ্ঞা, ঘুরে ঘুরে তাকে দেখাতে নিয়ে গেল ওঁকার, পিছে পড়ে রইলুম আমি, আর আমার মন জুড়ে অনেক ভাবনা। তারপর বিদায় নিয়ে মার সঙ্গে ফিরে গেল প্রজ্ঞাপারমিতা, কিন্তু আমার মনে হতে লাগলো প্রজ্ঞা তার মনের অনেকখানি পিছে রেখে গেল নিরালাশ্রমে। দোলা দিয়ে গেল, দোলা নিয়ে গেল। আপন হৃদয়ে নিয়ে গেল দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব রেখে গেল ওঁকারের হৃদয়ে। প্রজ্ঞাপারমিতাকে বিদায় দেবার পর থেকেই লক্ষ্য করলুম কেমন যেন বিষণ্ণতা, অবসন্নতা ছেয়ে ফেলেছে ওঁকারের মন। যেন সংশয় জেগেছে তার মনে, কোন্‌টা বৃহত্তর সত্য—ত্যাগ না ভোগ,

বৈরাগ্য না অনুরাগ, সন্ন্যাস না সংসার? পরদিন প্রত্যুষে উঠে ওর ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মুক্ত বাতায়ন পথে চেয়ে দেখি তার আসনে বসে যেন ধ্যান করছে ওঁকার। পঞ্চগ্রন্থির ওপর তার গ্রন্থ সাজানো, গ্রন্থের ওপর এক গুচ্ছ মল্লিকা। চলে এলাম কিছু না বলে। শঙ্কা জাগলো মনে—তবে কি আশ্রম ছেড়ে চলে যাবে ওঁকার, প্রজ্ঞাপারমিতার অমোঘ আকর্ষণে? ডান হাত ভেঙে যাবে নিরালা বাবার? মন আমার আকুল আর্তনাদ ভাসিয়ে দিলে অসীম শূন্যে: তুমি কি ওঁকারকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, প্রজ্ঞাপারমিতা?"

"তারপর?"

"তারপরের কাহিনীটুকু তো তুমি জানো ধনপতি! মানসিক দ্বন্দ্বের দরুণ, না প্রাকৃতিক কারণে জানি নে, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তারপর আশঙ্কা থেকে আমায় চিরমুক্তি দিয়ে চির বিদায় নিয়ে চলে গেল প্রজ্ঞাপারমিতা।"

*

ভুজঙ্গ আর দময়ন্তীর দুহাত এক হয়ে গেছে, প্রজ্ঞাপারমিতা। ঐশ্বর্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য হাত মিলিয়েছে, রোমান্টিক মিলন এ নয়। অথবা এই হয়তো পরম রোমান্টিক।

এবার 'হৈমবতীনগর'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেই নিরালাশ্রমে বানপ্রস্থে চলে যাবেন অনঙ্গ চৌধুরী। দময়ন্তীর পছন্দ করা নাম 'হৈমবতী নগর।' এ উদ্বোধন উৎসবে তুমি থাকবে না, এ দুঃখ সইতে পারছেন না অনঙ্গ চৌধুরী।

তোমাকে চিরতরে হারিয়ে তোমার মা অনেকের মা হয়েছেন নিরালাশ্রমে। এই অনেকের অন্যতম ওঁকার, নিরালা বাবার প্রধান শিষ্য

ওঁকার, অসামান্য সুপুরুষ ওঁকার। তার সুপৌরুষ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল সেবাব্রতী ত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশে। যে রূপে তাকে পাবার নয়, তার সেই রূপেই মুগ্ধ হয়ে অসম্ভবের অপূরণীয় তৃষ্ণা নিয়ে তুমি ফিরে এসেছিলে নিরালাশ্রম থেকে। তোমার অন্তরের ঝড় সেদিন হয়তো কেউ টের পায় নি।

ভালো লাগছিল না দিবাকর দালালের। জামাতা ভুজঙ্গের মহাকীর্তি চৌধুরী ম্যানশ্যন্স্-এর সঙ্গে তুলনা করে দুশো বিঘে জমির ওপর এই বস্তি (বসতি বা জনপদ বলতে রাজী নন দিবাকর দালাল) পত্তনের পাগলামিকে মহা অপকীর্তি বলে মনে হয়েছে তাঁর। কিন্তু উপায় কি ? তাঁকে আর আমোল দিচ্ছে না কেউ, শুনছে না তাঁর এক ফোঁটা পরামর্শ ,তাই অবহেলিত বোধ করে ক্ষেপে উঠেছিলেন তিনি। আবার ব্যাংক করবেন, দেখিয়ে দেবেন অনঙ্গ আর ভুজঙ্গ চৌধুরীকে যে দিবাকর দালাল এখনও মরে নি।

তারপর তার সেই ক্ষ্যাপামী গেছে, দূর ক'রেছে দময়ন্তী। গোড়ায় ছিলেন মাস্টার, ফিরবেন সেই মাস্টারীতে। হৈমবতী নগরের শিক্ষায়তন পরিচালনায় একটা বড় অংশ নেবেন তিনি। অনেক মগজে জ্ঞানের সোনালী আলো জ্বালিয়ে বাকি জীবনটা গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাংকে লালবাতি জ্বালাবার প্রায়শ্চিত্ত করবেন দিবাকর দালাল। শুনে খুসী হ'য়েছেন অনঙ্গ চৌধুরী, প্রীতির আলিঙ্গনে বেঁধে ছলছল চোখে ছোট বেয়াইকে বলেছেন, "বেঁচে থাকো দিবাকর।"

বিদায় দিনে অনাথবাবুকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিলাম রেললাইনের ধারে লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত। সেইখানেই আমাকে থামিয়ে দিলেন অনাথবাবু, বল্লেন, "তোমার জীবনের লেভেল ক্রসিং এখনও আসেনি ধনপতি।" বল্লাম, "কিন্তু বড় দেখবার ইচ্ছে ছিল আপনার মধু আর মাদুলীর কারখানা।"

অনাথবাবু বল্লেন, "আজ সারা পৃথিবী জুড়ে মধু আর মাদুলীর

যে বিরাট লীলা চলেছে, আমার মধ্য দিয়ে তার আর কতটুকু প্রকাশ, ধনপতি ? ছোট্ট আমার পুঁজি, ছোট্ট আমার কারখানা। এটুকুর মধ্য দিয়ে সাধারণ দুঃখী মানুষের যতটুকু কল্যাণ পারছি করে যাচ্ছি।"

লেভেল ক্রসিং-এর গেট বন্ধ ; লাইনের ওপর দিয়ে একটা মালগাড়ী গজেন্দ্রগমন করছিল। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না অনাথবাবুর। সেই শেষ সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করে তিনি বল্লেন, "যাবার বেলায় ঝুলিতে নতুন ভুল কিছু নিয়ে চলেছি কিনা জানিনে, ধনপতি। কিন্তু পুরোনো অনেক ভুলের ভাঙা টুকরোগুলো পিছে ফেলে গেলাম। আজ মনে হচ্ছে অল্প ক'টা দিনের ভেতর আমার ওপর দিয়ে পরিবর্ত্তনের একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল। এই যে সরে গেছে মালগাড়ী, লাইন-ক্লিয়ার, খুলে গেছে লেভেলক্রসিং-এর গেট। এবার বিদায় দাও, ধনপতি।" বল্লাম, "আবার কবে দেখা হবে অনাথবাবু ?"

তিনি বললেন, "দেখা হয়ত আর হবে না, ধনপতি।"

রেল লাইন পেরিয়ে চলে গেলেন অনাথবাবু, তাঁর বাণপ্রস্থী-মালবাহী ঠেলাগাড়ী অনুসরণ করে। তিনি পথের বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটিবারও পিছন ফিরে তাকালেন না অনাথবাবু।

নতুন বাংলো বাড়ীতে বড়ো একা বোধ করছে রাহুল, শুনেছিলাম সানন্দার বাবা সোমনাথ সান্যালের কাছে।

"এত চট্ করে এমন অসামান্য উন্নতি", বললেন সোমনাথ সান্যাল, "তবু বেচারা সুখী হ'তে পারেনি ; সুখী হতে কোথায় যেন তার বাধছে।"

বললাম, "হয়ত তিনি ভাবছেন, খেয়ালী ভুজঙ্গ চৌধুরী যেমন চট্ করে তাঁকে তুলেছেন, তেমনি চট্ করে নামিয়েও দিতে পারেন।"

সোমনাথ সান্যাল হেসে বললেন, "তা পারে না ধনপতি।" সে ভয় রাহুলের একেবারে নেই। চৌধুরী প্রতিষ্ঠানে রাহুল এখন শুধু ওপরেই

উঠবে, নীচে নামবে না। তার পেছনে রয়েছে দময়ন্তী—চৌধুরী কোম্পানীর কর্ণধার ভুজঙ্গের যে কর্ণধার।"

"কিন্তু রাহুল সম্বন্ধে দময়ন্তীর এত আগ্রহ কেন, সোমনাথবাবু?"

"কেন, তুমি কি জান না, রাহুলের ইনফ্লুয়েঞ্জা সারিয়েছিল শখের হোমিওপ্যাথ দময়ন্তী? ওর ওষুধে সেরে উঠেই তো দময়ন্তীকে চির কৃতজ্ঞ বানিয়ে রেখেছে রাহুল। চৌধুরী কোম্পানীতে রাহুলের তাই চিরবসন্ত। তাছাড়া—"

"তাছাড়া—?"

"যদি ভেবে থাক হৈমবতীনগর চালু হয়ে গেলেই রাহুলের গুরুত্ব কমে যাবে, তাহ'লে ভুল ভেবেছ, ধনপতি। আরও একাধিক পরিকল্পনা আছে ভুজঙ্গের, যাতে রাহুলের প্রতিভা আর কর্মশক্তি আরও বেশী কাজে লাগবে। কিন্তু তখন সানন্দা আর থাকবে না তার পাশে।"

চমকে উঠে বললাম, "কেন?"

"হৈমবতীনগর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পরে এখানকার চাকরীতে ইস্তফা দেবে সানন্দা। যে স্কুলে পড়াত সেই স্কুলেই ফিরে যাবে।"

বললাম, "কিন্তু আমি যে আশা করেছিলাম রাহুল রায়ের কর্ম-সঙ্গিনীকে দেখতে পাবো তার জীবন-সঙ্গিনী রূপে।"

সোমনাথ সান্যাল বললেন, "সে যে আমারও একান্ত আশা ছিল ধনপতি, আর এই স্বপ্নেই তো আত্মহারা হয়ে ছিল সানন্দা। কিন্তু হৃদয় তার হতাশায় ভেঙে গেছে, রাহুলের দিক থেকে এতটুকু সাড়া না পেয়ে। সত্যিই আমি বুঝতে পারি নে ধনপতি, রাহুল কি অন্ধ? —না পাষাণ?"

কিন্তু না। অন্ধও নয়, পাষাণও নয় রাহুল। জীবনে সানন্দাকে পেলে ধন্য হয়ে যায় সে, অহোরাত্র ধ্যান করছে সানন্দার, কিন্তু সানন্দার মত নারী-রত্ন যে তারই কণ্ঠে পরাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে বরমাল্য হাতে প্রতীক্ষা করছে, এইটে কিছুতে তার কল্পনায় আসে নি।

রাহুল রায়কে বুঝিয়েছি তার ভুল। দুঃখ দিয়েছে বলে রাহুল ক্ষমা চেয়েছে সানন্দার কাছে। চেয়েছে তার আশ্রয়। তারপর দুজনে মিলে

প্রণাম করেছে সোমনাথবাবুকে। সোমনাথবাবু পরম আনন্দে আশীর্বাদ করেছেন তাঁদের দুজনকে।

আমি তাদের আগামী সানাই-র মিঠে কান্নার সুর শুনতে পাচ্ছি, প্রজ্ঞাপারমিতা। আর মনে পড়ছে তোমার সেই কবিতার চরণগুলি ঃ

"পত্র ঝরা শেষ হলো, ঝরিবার পত্র নাহি আর,
রিক্তশাখ মৌন তরু করে হাহাকার।
সহসা সুদূর হতে তরুশাখে এসে এক পাখি
কহে, "ওরে রিক্ত তরু, সিক্ত কেন আঁখি ?
রিক্ত না রহিবি তুই, নব পত্র আসিবে আবাব।"
তরু কেঁদে কহে, "হায়, আসিবে নূতন পত্র জানি ;
যে পত্র ঝরিয়া গেছে সে পত্র ফিরিবে না তো আর।"

তুমি এসেছিলে, তুমি চলে গেছ ; আর তুমি ফিরে আসবে না প্রজ্ঞাপারমিতা !